প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকশ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে— যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোন শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

অষ্টম পুনর্মুদ্রণ ঃ ফেব্রুয়ারি, 2016

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী ও অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : ভূগোল **সাম্মানিক স্তর**

পাঠক্রম : পর্যায় : EGR 06 : 01

	রচনা	সম্পাদনা
পর্যায় 1	ড. জ্যোতির্ময় সেন	ড. কানন চ্যাটার্জী
পর্যায় 2	ঐ	ঐ
পর্যায় 3	ঐ	ঐ
পর্যায় 4	ঐ	ঐ
পর্যায় 5	ঐ	ঐ
পর্যায় 6	ঐ	ঐ
পর্যায় 7	ঐ	ঐ

পাঠক্রম : পর্যায় : EGR 06 : 02

	রচনা	সম্পাদনা
পর্যায় 7	ড. কল্পনা মিত্র	ড. কানন চ্যাটার্জী
পর্যায় 8	ঐ	ঐ
পর্যায় 9	ঐ	ঐ
পর্যায় 10	ড. শিবদাস ঘোষ	ঐ
পর্যায় 11	ড. কল্পনা মিত্র	ঐ

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনওভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ড. অসিত বরণ আইচ

কার্যনির্বাহী নিবন্ধক

নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EGR – 06

পর্যায়
1

সম্পদ সম্পর্কিত ভূগোল

একক 1	❑ সম্পদের ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ	7-31
একক 2	❑ সম্পদের বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারিতা তত্ত্ব	32-46
একক 3	❑ প্রকৃতি ও সম্পদ এবং সংস্কৃতি ও সম্পদ	47-75
একক 4	❑ মানুষ ও সম্পদ	76-141
একক 5	❑ অচিরাচরিত শক্তির উৎস	142-165
একক 6	❑ সম্পদ হ্রাস ও সম্পদ সংরক্ষণ	166-206
একক 7	❑ স্থিতিশীল উন্নয়ন	207-220

পর্যায়
2

সম্পদ ভূগোলবিদ্যা **(Geography of Resources)**

একক 7A	❑ সম্পদের ব্যবহার—উৎপাদন প্রক্রিয়া, প্রযুক্তি ও পরিবেশের গুণমান	223-232
একক 8A	❑ সম্পদের ব্যবহার—বনজ সম্পদ ও পশু সম্পদ	233-272
একক 8B	❑ সামুদ্রিক সম্পদ	273-298
একক 9	❑ সম্পদের ব্যবহার—কৃষি ও মানব সম্পদ	299-362
একক 10	❑ খনিজ ও শক্তি সম্পদ	363-440
একক 11	❑ সম্পদ হ্রাস ও সম্পদ সংরক্ষণ এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন	441

একক 1 ❑ সম্পদের ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ

গঠন

1.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

1.2 সম্পদ চেতনা

1.3 সম্পদ উন্নয়নের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

1.4 সংজ্ঞা

1.5 সম্পদের প্রকৃতি

1.6 সম্পদ সম্পর্কে কয়েকটি প্রচলিত ভ্রান্তধারণা

1.7 সম্পদ প্রাকৃতিক বাধা ও নিরপেক্ষ সামগ্রী

1.8 সম্পদের শ্রেণিবিভাগ

1.9 সম্পদ সৃষ্টির উপাদান

1.10 সারাংশ

1.11 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1.12 উত্তরমালা

1.1 প্রস্তাবনা

আফগানিস্তান পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশের মধ্যে অন্যতম, আর যুক্তরাষ্ট্র (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা, U.S.A.) পৃথিবীর ধনী দেশগুলোর মধ্যে একটি। প্রথমটি অনুন্নত, দ্বিতীয়টি উন্নত দেশ। এখন প্রশ্ন জাগা খুব স্বাভাবিক, কেন এমনটি হল? আফগানবাসীরা কি মার্কিনীদের চেয়ে শ্রমবিমুখ না কম পরিশ্রমী? উত্তর হল এর কোনটি তো নয়, বরং আফগানবাসীরা মার্কিনীদের তুলনায় অনেক বেশী কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। এবার তবে প্রশ্ন করতে হয় উভয় দেশের মধ্যে উন্নয়নের এত ফারাক কেন? উত্তর হল আফগানিস্তানে মানব উদ্যোগের (Human Enterprise) সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সম্পদের (বিশেষ করে খনিজ সম্পদের) একান্ত অভাব। প্রকৃতি তার দরাজ হাতে যুক্তরাষ্ট্রকে সাজিয়ে দিয়েছে অতুল বৈভবে, আর বঞ্চিত করেছে আফগানিস্তানকে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র খনিজ সম্পদ, উর্বর মাটি আর মানব উদ্যোগে ভরপুর, আফগানিস্তানে মানব উদ্যোগের সম্ভাবনা কিছু মাত্রায় থাকলেও খনিজ সম্পদ ও উর্বর মাটির অভাবে দেশটি বিত্তহীন হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত

অর্থনীতিবিদ জিমারম্যান-র একটি উক্তি মনে আসে, “Resources are the base of both security and opulence; they are the foundation of power and wealth. They affect man’s destiny in war and peace” (World Resources and Industries) অর্থাৎ সম্পদ নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির ভিত্তি তথা শক্তি ও ঐশ্বর্যের উৎস। সম্পদ যুদ্ধ ও শান্তি উভয় সময়েই মানুষের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে।

উদ্দেশ্য ঃ

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- সম্পদের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারবেন।
- সম্পদের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও বণ্টন সম্পঞ্চে ধারণা করতে পারবেন।
- অতীতে সম্পদ সম্বন্ধে মানুষ কী ধারণা পোষণ করত তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- কী কী বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সম্পদকে ভাগ করা যায় বা সম্পদের শ্রেণিবিভাগ কিসের ভিত্তিতে করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

1.2 সম্পদ চেতনা (Resource Consciousness)

সম্পদ সম্পর্কে মানুষের এই আগ্রহ নুতন কিছু নয়, বহু যুগ ধরেই মানুষ ভেবে আসছে যে আগামীদিনের খাবার কোথা থেকে আসবে? সম্পদ বা জমির দখল নিয়ে বিবাদ নতুন কিছুই নয়। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায় যে কোন খনিজ সম্পদের অধিকার নিয়ে বা জলসীমা নিয়ে দ্বন্দ্ব নতুন কোন ঘটনা নয়।

যদিও সম্পদ সম্পর্কে আগ্রহ পুরনো, তবুও সাম্প্রতিককালে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে সম্পদ চেতনার নতুন ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আজকের মানুষের অভাববোধ ও ভোগ প্রাচীনকালের চেয়ে অনেক গুণ বেড়ে গেছে। আধুনিক যুগের মানুষের সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার ভিত্তি হল সম্পদ। এই নতুন সম্পদ চেতনা মানুষের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ক্রমবিবর্তনের ধারাবাহিক ফসল। আদিমকালে মানুষের সম্পদ সম্পর্কিত চেতনা ছিল খুব স্থূল। মানুষ যুগ যুগ ধরে নানাবিধ বাধা-নিষেধের মধ্যে শৃঙ্খলিত জীবনযাপন করত, কারণ ঐ সময় একদিকে যেমন ছিল কঠোর সামাজিক অনুশাসন, অন্যদিকে ছিল সামন্তরাজা ও ধর্মযাজক ও পুরোহিতের অত্যাচার। সে যুগে বেশীর ভাগ মানুষ দাস ও ভূমিদাস (serl) হিসেবে অভিজাত সম্প্রদায় রাজন্যবর্গ, শক্তিমান একনায়ক, পুরোহিত বা যাজকদের ভোগবিলাসের পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করত। প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের ব্যক্তি-স্বাধীনতার কথা শোনা গেলেও তা ছিল কিছু সংখ্যক সুযোগ সন্ধানীর জন্য। যোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু হল বিভিন্ন প্রকার আবিষ্কার যার জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল পশ্চিমী দেশগুলো। কলকারখানার সংখ্যা বাড়তে থাকে, বাড়তি পণ্য বিক্রয়ের জন্য বাজারের খোঁজ চলতে থাকে। শুরু হয় উপনিবেশ স্থাপনের চক্রান্ত। উপনিবেশ থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে কিভাবে নিজের দেশে ঐ সম্পদের গুণগত ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন এনে তাকে আবার উপনিবেশে পাঠিয়ে কি করে আরও ধনী হওয়া যায় তার প্রতিযোগিতা শুরু

হয়ে যায়। একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সম্পদের নতুন আবিষ্কার ও ব্যবহারের সাথে সাথে যেমন মানুষ তার অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে ও ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ ক্রমশঃ দূরীভূত হতে থাকে। বাণিজ্যক্ষেত্রে এই শৃঙ্খল মুক্তি অবশ্য অবাধ বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে এসেছিল, শিল্প ক্ষেত্রে দেখা যায় স্বাধীন শিল্পোদ্যোগ (free enterprise system)। অনেকে মনে করেন অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যাপক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সামাজিক ও সরকারী বাধা-নিষেধের জাল অপসারণের ফলে সম্ভব হয়েছে। তাঁরা আরও মনে করেন যে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং বাণিজ্য ও মুনাফা অর্জনের অবাধ অধিকার থাকলেই সবচেয়ে বেশি জনকল্যাণ হবে। প্রকারান্তরে বলতে হয় অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় (coordination) ঘটবে।

বলতে গেলে গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়েই এই মতবাদ সত্য ও অভ্রান্ত বলে ধরে নেওয়া হত। 1890 সালে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ Alfred Marshall (আলফ্রেড মার্শাল) এই অবাধ বাণিজ্যনীতি মতবাদের বিরোধীতা করেন। তার মতে নিজ নিজ উন্নতি করলেই দেশের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হবে এমন মনে করা ঠিক নয়। কখনও কখনও ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থ বিপরীতমুখী হয়ে থাকে। মাটি, অরণ্য, খনিজ ও শক্তিসম্পদ, জলপ্রবাহ প্রভৃতি মৌলিক সম্পদের ক্ষেত্রে জনস্বার্থ রক্ষার জন্য দরকার সঠিক সরকারী নীতি। এজন্য দেশের সার্বজনীন কল্যাণের জন্য সরকারেরও কিছু করার আছে। পরবর্তীকালে পিগু (Pigou), কেইনস্ (John Meynand Keynes) ও এই মত সমর্থন করেন।

ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক স্বার্থের সাথে সরকারের যে সমস্ত বিষয়ে তফাৎ রয়েছে, দেশের সম্পদ বিশেষ করে মাটি, জল, বনভূমি প্রভৃতি মৌলিক সম্পদের সংরক্ষণ তাদের অন্যতম। ব্যবসায়ীর প্রধান লক্ষ্য হল অল্প সময়ে বেশি লাভ করা। তার দৃষ্টিভঙ্গী বর্তমান বা নিকট ভবিষ্যতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আগামী একশ বা দুশো বছরে সম্পদ নিঃশেষিত হলে দেশের সামগ্রিক চেহারায় কি পরিবর্তন আসবে সেটা তার লক্ষ্য থাকে না। যেমন একজন কাঠ বিক্রেতার লক্ষ্য হল বন থেকে কিভাবে সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় কাঠ কেটে তা থেকে বেশী লাভ করা যায়। কিন্তু বনভূমি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেলে তার প্রভাব যে মাটি কিংবা জলবায়ুর ওপর পড়বে সেদিকে তার দৃষ্টি থাকে না। তেমনিভাবে একজন কয়লা ব্যবসায়ী কয়লা সম্পদ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণের জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। কারণ তারও লক্ষ্য হল কিভাবে কয়লা খনি থেকে সর্বাধিক কয়লা তোলা যায়। উভয়বিধ ক্ষেত্রেই সামাজিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই বনভূমি, মাটি, খনিজদ্রব্য ইত্যাদি মৌলিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সরকারী হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজনীয়। এজন্য দীর্ঘমেয়াদী কার্যসূচী গ্রহণ করতে হয়, যদিও এতে আশু ফলাফলের সম্ভাবনা থাকে না। জনগণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এরকম দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা শুধুমাত্র সরকারের পক্ষেই সম্ভব।

তাই সামাজিক স্বার্থরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য মার্শাল সরকারী নীতি ও হস্তক্ষেপকে সমর্থন করেছেন।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে মার্শালের এই মতবাদ বর্তমানে প্রত্যেক জাতি ও সরকারকে সম্পদ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছে।

1.3 সম্পদ উন্নয়নের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

(Historical background of resource development)

গোটা পৃথিবীতে সম্পদ চেতনার যে বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তার পেছনে রয়েছে নিম্নলিখিত কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাবলী—

(i) এদের মধ্যে প্রধান হল যুক্তরাষ্ট্রে বসতি বিস্তারের ঘটনা। যখন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আর বিনামূল্যে জমি সংগ্রহ করা সম্ভব হল না, তখন থেকে এই নবচেতনার উন্মেষ হয়।

(ii) দুটি বিশ্বযুদ্ধ শক্তির ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সব রাষ্ট্রকে সচেতন করে তুলেছে। আধুনিক যুদ্ধ সম্পদের অধিকারকে কেন্দ্র করেই ঘটে থাকে। এই যুদ্ধ সফলতার সাথে পরিচালনা করতে হলে দেশের সম্পদ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন, কারণ এর ওপরেই নির্ভর করে সামরিক শক্তি। বিভিন্ন দেশে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করে দেশের শক্তি বৃদ্ধি করতে সব রাষ্ট্রনায়ক চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন।

(iii) ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবিসম্বাদী ফল হিসেবে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে গোটা পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। তা প্রতিরোধ করার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট (Franklin Delano Roosvelt) নিউ ডিল (New Deal) নামে যে অর্থনৈতিক সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তা ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে বিশেষ জনপ্রিয় হয়। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বণিক স্বার্থে মৌলিক উপাদানসমূহ যাতে বরাবরের জন্য ব্যবহার না হয় তার ব্যবস্থা করাই সরকারী হস্তক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য। পরবর্তীকালে অন্যান্য দেশেও রুজভেল্ট মডেল-এ পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

(iv) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে দুই বড় শক্তি-শিবিরের (যুক্তরাষ্ট্র ও পূর্বতন প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়া) মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই (cold war) ও এই সম্পদ-চেতনার একটি বর্হিপ্রকাশ। উভয় দেশই অর্থনৈতিক উন্নয়নে সচেষ্ট হয়। এজন্য তারা বিভিন্ন দেশের ওপর অর্থনৈতিক প্রভুত্ব কায়েম করতে চায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের পেছনে এদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত থাকত।

(v) প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রের পতনের পর মুক্ত অর্থনীতির জন্য নতুন করে সওয়াল শুরু হয়েছে।

(vi) ইদানীং "বিশ্বায়নের" (globalisation) যুগে যুক্তরাষ্ট্রের "দাদাগিরি" চোখে পড়ার মতন। আমাদের দেশ ভারতবর্ষের দিকে অকালে এই সত্যটি ধরা পড়ে অবাধ বাণিজ্য (free trade) রীতি গ্রহণের ফলে প্রাথমিক অবস্থায় প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকলেও পরে বণিকগোষ্ঠী আরও বেশি মুনাফা অর্জনে এবং ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের জন্য একচেটিয়া বাজার প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়েছে। এজন্য বহুজাতিক কর্পোরেশন (multinational

corporation) গঠিত হয়েছে। অবাধ বাণিজ্য মুখোশের আড়ালে অবাধ লুণ্ঠনের চেহারা নিয়েছে এবং নিচ্ছে। অবাধ বাণিজ্য নীতির ভিত্তি ছিল যে অবাধ প্রতিযোগিতা, তা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপের দাবি প্রবল হয়ে উঠেছে। সামগ্রিক কল্যাণের খাতিরে দেশের সম্পদ সরকার কর্তৃক পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত হবার পক্ষে জনমত ঝুঁকছে। ভারতের অবাধ বাণিজ্যনীতি সর্বক্ষেত্রে শুরু হয়েছে। তাই এর ফলাফলের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

(vii) আধুনিক রাষ্ট্রের আয়তন বড় ও গঠন খুব জটিল। নাগরিক জীবন (civic life) সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য জীবনের প্রায় সবক্ষেত্রেই সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন। সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে অনেক দেশেই প্রাকৃতিক উপকরণের ওপর সরকারী মালিকানা স্থাপিত হয়েছে। এমন কি ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতেও মৌলিক সম্পদ সংরক্ষণের ব্যাপারে সেই সেই দেশের সরকার সজাগ হয়ে উঠেছে।

(viii) সম্পদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে চেতনা বাড়ার ফলে ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা তাদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে ধীরে ধীরে সজাগ হয়ে উঠেছে। সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি বিষয়ে তারা নজর দিতে শুরু করেছে।

(ix) 1991 সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের পর থেকে পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা বজায় রাখার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে আলাপ আলোচনা শুরু হয়েছে। কৃষিতে কৃত্রিম সার ব্যবহারের বিপদজনক দিক নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। শিল্পদূষণ নিয়ে পরিবেশবিদ্‌রা গবেষণা চালাচ্ছেন। আর্সেনিক যুক্ত জল নিয়েও সরকার যথেষ্ট উদ্বিগ্ন।

(x) জীবাশ্ম জ্বালানীতে (fossil fuel) যে পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) বের হয়, তাতে এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা না নিলে পৃথিবীর আবহাওয়া দূষিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বনভূমি ধ্বংস ও জলাভূমি কমে যাওয়ার ফলে মানব প্রজাতির জৈব বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে আশঙ্কাজনক অবস্থা তৈরী হয়েছে।

(xi) সমীক্ষায় দেখা যায় বিগত বছরে অন্তত 1.2 বিলিয়ান হেক্টর জমির উৎপাদিকা শক্তি কমে গেছে। অথচ আগামী শতাব্দীর মাঝামাঝি লোকসংখ্যা প্রায় দু'গুণ হয়ে যাবে।

1.4 সংজ্ঞা (Definition)

পেটারসনের (J. H. Paterson)-এর মতে ভূগোলে প্রাকৃতিক ও মানুষের তৈরি বিষয়গুলোকে সমীক্ষা করা হয় শুধুমাত্র বস্তু হিসেবে নয়, সম্পদ হিসেবেও। 'সম্পদ' কথার অভিধানগত অর্থ হল প্রাণীকূল ও মানুষের জীবনকে টিকিয়ে রাখার সহায়কবস্তু—'means of support—support for the animal life and for man' কথাটিকে একটু ঘুরিয়ে বলল দাঁড়ায় মানুষ ও জীবজন্তুদের বেঁচে থাকবার জন্য যা কিছু দরকার সে সব কিছুই হল সম্পদ বা Resource।

ইংরেজী রিসোর্স (Resource) কথাটি বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই Re (রি) এবং source (সোর্স);

রি বলতে বুঝি আবার বা পুনরায় (again) আর সোর্স হল উৎস। 'রিসোর্স' কথাটির সাথে সময়ের যোগসূত্র বিদ্যমান। কোন জিনিস প্রকৃতিতে থাকলেই হবে না, প্রকৃতিপ্রদত্ত বস্তুকে মানুষের প্রয়োজনের উপযোগী করে নিতে হবে। বলা যেতে পারে উৎস বা পদার্থের কার্যকারীতা সৃষ্টি করতে হবে এবং এই কার্যকারীতাই হল সম্পদ।

<u>রিসোর্সের অভিধানগত অর্থ থেকে আমরা পেলাম—</u>

(i) যার ওপর কেউ সাহায্য, সহযোগিতা এবং যোগদানের জন্য নির্ভর করতে পারে (that upon which one relies for aid, support or supply).

(ii) কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার (Means to attain given ends)।

(iii) সুযোগ থেকে সুবিধে গ্রহণের ক্ষমতা ও অসুবিধে ঠেকানো (the capacity to take advantage of opportunities or to extricate oneself from difficulties)।

অর্থবিদ্যায় 'wealth'-কে সম্পদ বলে। অর্থবিদ্যায় সম্পদ বলতে বোঝায় এমন কোন বস্তু (i) যার উপভোগ বা অভাবমোচনের ক্ষমতা আছে, (ii) যার যোগান চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর ও (iii) যা বিক্রয় যোগ্য। কিন্তু অর্থনৈতিক ভূগোলে সম্পদ বলতে কোন পদার্থ বা বস্তুকে বোঝায় না। একে (সম্পদ) মানুষের চাহিদা মেটাবার উপায় হিসাবে দেখা যায়।

Dictionary of Social Sciences-এর মতে সম্পদ হল মানব পরিবেশের সেই সব দিক যা দিয়ে মানুষের অভাব মেটানোর কাজে সুবিধে হয়, বা অভাব পূরণ করে এবং সামাজিক লক্ষ্য মেটায় বা মেটাতে সাহায্য করে "Resources are those aspects of man's environment which render possible or facilitate the satisfaction of human wants and the attainment of social objectives..." সোজা কথায় বলা যায় সেই সব উপাদান যা মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় বা আবশ্যক সেগুলোকে সম্পদরূপে গণ্য করা যায়।" "All those elements of the earth which are useful or necessary to man can be considered as resources"—বিখ্যাত সম্পদ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক E. W. Zimmermann সম্পদের এক সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন।

তাঁর মতে সম্পদ বলতে কোন বস্তু বা পদার্থকে বোঝায় না; কোন বস্তু বা পদার্থ কাজ করে নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা অভাবপূরণ করতে যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় সেই কর্মক্ষমতাকে সম্পদ বলে। "The word 'resource' does not refer to a function which a thing or substance may perform or to an operation in which it may take part namely the functions or operation of attaining a given end, such as, satisfying a want।" তাঁর মতে পরিবেশের যে বৈশিষ্ট্য ও বিষয়সমূহ মানুষের প্রয়োজনে সাহায্য করে এবং মানুষের অভাব ও চাহিদাগুলো পূরণ করার কাজে উপযোগী হয় সেগুলোই সম্পদ—"Features of environment which are considered to be capable of serving man's needs; they are given utility by the capabilities and wants of man"। তাই বলা যায় সম্পদ

বস্তু নয়—বস্তুর কার্যকারিতাই সম্পদ। কার্যকারিতা বলতে বোঝায় অভাবমোচনের ক্ষমতা। কার্যকারিতা ব্যক্তিগত তথা জাতীয় অভাবও পূরণ করে। তাই যে ক্ষমতা দিয়ে বস্তু (দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয়বিধ) ব্যক্তিবিশেষের এবং সমাজ তথা জাতির বা দেশের অভাবকে পূরণ করে তাকেই সম্পদ আখ্যা দেওয়া হয়। সম্পদ হল অভাবমোচনের উপায়। প্রকৃতির বাধা এবং প্রতিরোধ দূর করে ও প্রাপ্ত অভ্যন্তরীণ সুযোগের যথোপযুক্ত ব্যবহার করে বস্তুর যে কার্যকারিতা মানব সমাজের একক ও সামগ্রিক অভাবমোচন করে তাই সম্পদ। উদাহরণ হিসেবে খনিজ তেলের কথা ধরা যেতে পারে। বোম্বে হাই-এ (Bombay High) উত্তোলিত খনিজ তেল বর্তমানে সম্পদ। কিন্তু 1974-র আগে যখন ঐ খনিজ তেল সমুদ্রগর্ভের শিলাস্তরে ছিল তখন তাকে সম্পদ বলা হত না। অনুরূপভাবে, কেরালার উপকূলের বালিতে প্রচুর মোনাজাইট ও ইলমেনাইট পাওয়া যায়। এই মোনাজাইট থেকে থোরিয়াম ও ইউরেনিয়াম এবং ইলমেনাইট থেকে টাইটেনিয়াম পারমাণবিক ও তেজস্ক্রিয় খনিজ সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু কেরালা উপকূলের বালি থেকে যতদিন পর্যন্ত এই পরিমাণবিক ও তেজস্ক্রিয় খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করা হয় নি ততদিন এই বালি সম্পদ হিসাবে গণ্য হয় নি। তামিলনাড়ুর নেভেলীর লিগনাইট প্রকল্প চালু হবার আগে তার (লিগনাইট) ব্যবহার ছিল না বলে তখন তাকে সম্পদ বলা হত না। বর্তমানে লিগনাইট থেকে তাপবিদ্যুৎ, সার ইত্যাদি পাওয়া যায় বলে তাকে সম্পদ বলে ধরা হয়। তাই সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে বোম্বে হাই-এর খনিজ তেল, কেরালা উপকূলের বালি কিংবা তামিলনাড়ুর লিগনাইট সম্পদ নয়—এদের কার্যকরী ক্ষমতাই সম্পদ।

মানুষের চাহিদা পূরণে বা কল্যাণে জল, বাতাস, সূর্যালোক প্রভৃতির উপযোগিতা বা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই এরা সম্পদের পর্যায়ভুক্ত।

সম্পদের পরিধি শুধুমাত্র বস্তুগত পদার্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অরণ্য চাষের জমি, খনিজ সম্পদ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বস্তুগত পদার্থ ছাড়াও জ্ঞান ও বুদ্ধি, স্বাস্থ্য, সামাজিক বন্ধন, স্বাধীনতা প্রভৃতি অবস্তুগত পদার্থ সম্পদের পর্যায়ভুক্ত। কারণ মানুষের ইচ্ছাশক্তি তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি, নতুন নতুন কলাকৌশল ইত্যাদির ওপর নির্ভর করছে সম্পদের সৃষ্টি, প্রসার ও বিকাশ। এজন্য বলা হয়ে থাকে সম্পদ গতিশীল। আর সম্পদের গতিশীলতাই দেশের অর্থনীতির অগ্রগতির চাকাকে সামনে চালিত করে। পরাধীন ভারতের সম্পদ ছিল সীমিত। ভারত তখন ছিল একটি অনগ্রসর দেশ। স্বাধীনতা লাভের পর পণ্ডিত নেহেরুর নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় সরকার একাধিক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণের মাধ্যমে নতুন নতুন সম্পদ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে বলে ভারত আজ পৃথিবীর অন্যতম উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। বলা যেতে পারে সময়ের সাথে সাথে সম্পদের প্রসার ও সংকোচন হতে পারে।

আবার এও বলা হয়ে থাকে বস্তুর কার্যকারিতা প্রকৃত বা সম্ভাব্য হতে পারে।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে—

1. সম্পদ প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে আহৃত বা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট উপযোগী সামগ্রী।

2. সম্পদ মানুষের পরিবেশের অংশ।
3. বস্তু বা পদার্থের কার্যকারিতা ও কর্মসম্পাদনের ক্ষমতাই সম্পদ।
4. সম্পদ মানুষের চাহিদা মেটায়, অভাবমোচন করে।
5. সম্পদ মানুষের আকাঙ্খা ও সামাজিক লক্ষ্যপূরণ করে।
6. সম্পদ সামাজিক লক্ষ্য মেটায় বা মেটাতে সাহায্য করে।
7. সম্পদ হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি।
8. কোন বস্তুর বাস্তব কার্যকারিতাই সম্পদ।
9. সম্পদ কোন জড়পদার্থ বা বস্তু নয়।
10. সম্পদ হল প্রকৃতি, মানুষ ও তার সংস্কৃতির মিলিত প্রচেষ্টার ফল।
11. মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অর্থাৎ সামগ্রিক কল্যাণসাধনই সম্পদের একমাত্র লক্ষ্য।
12. মানুষের চাহিদা, সামর্থ ও জ্ঞানের নিরিখে সম্পদ চিহ্নিত হয় অর্থাৎ সম্পদ গতিশীল।
13. সম্পদের পরিধি কেবলমাত্র বস্তুগত পদার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, অবস্তুগত পদার্থ যথা জ্ঞান ও বুদ্ধি, সামাজিক বন্ধন ইত্যাদি সম্পদের পর্যায়ভুক্ত।
14. সম্পদের প্রয়োগবিধি সম্পদের বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল (কয়লা, খনিজ তেল প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ প্রয়োজনমত ব্যবহার করা যায়, কিন্তু সূর্যকিরণ, বাতাস ইত্যাদি উপাদানগুলোকে সঞ্চিত রেখে চাহিদামত ব্যবহার করার পদ্ধতি এখনও করায়ত্ত নয়)।
15. কোন সম্পদই সীমাহীন নয়। আপাতদৃষ্টিতে কোন কোন সম্পদ অফুরন্ত বলে মনে হলেও পৃথিবীর অধিকাংশ সম্পদই সীমাবদ্ধ।

1.5 সম্পদের প্রকৃতি (Nature of Resources)

সম্পদের ধারণা স্থান-কাল (spatiotemporal) নির্ভর। সম্পদ নির্দিষ্ট ও স্থানু নয় এটি বস্তুগত (tangible) ও অবস্তুগত (intangible)ও হতে পারে। এটি সীমিত বা অসীম উভয় প্রকারই হতে পারে। এটি মানুষের চেতনা ও উপলব্ধি নির্ভর। সম্পদের উন্নতি প্রযুক্তি নির্ভর। উদাহরণের সাহায্যে উপরোক্ত বিষয়সমূহ আলোচনা করা হল।

(i) **সম্পদের ধারণা স্থান-কাল নির্ভর**—F.A.O.-র তথ্য অনুসারে 1985 সালে হেক্টর প্রতি গম উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্র (6,842 কেজি) ফ্রান্স (5,597 কেজি) এবং চীন যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল

করেছিল, এটি স্থান নির্ভর ধারণা। কিন্তু ঐ একই সংস্থার 1996 সালের তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে আয়ারল্যান্ড (8,997 কেজি/হেক্টর), নেদারল্যান্ডস্ (8,961 কেজি) এবং বেলজিয়াম-লুক্সেমবার্গ (8,884 কেজি) যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল। উল্লেখ্য, গম উৎপাদন 1996 সালে যুক্তরাজ্য (8,113) চতুর্থ স্থান অধিকার করে, যদিও গত 12 বছরে ঐ দেশের গম উৎপাদনে অনেক বেড়েছে। তাই বলা যেতে পারে স্থান ও কালের তফাতে সম পরিমাণ জমির কার্যকারিতা পাল্টিয়ে যায়।

(ii) **সম্পদ নির্দিষ্ট ও স্থানু (static) নয়**—বস্তুর কার্যকারিতা নির্দিষ্ট নয়। জমির উৎপাদিকা শক্তিরও পরিবর্তন হতে পারে। একই জমি হতে বর্তমানের তুলনায় ভবিষ্যতে বেশি ফলন পাওয়া যেতে পারে বা এর বিপরীতও হতে পারে। একই পরিমাণ জমি থেকে একই সময়ে বিভিন্ন দেশে প্রাপ্ত ফলনের পরিমাণ বিভিন্ন হতে পারে। অনুরূপভাবে, কাঁচামাল থেকে মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা ও প্রযুক্তিতে পার্থক্যের দরুণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণে তফাৎ ঘটতে পারে।

(iii) **সম্পদ বস্তুগত ও অবস্তুগত হতে পারে**—কয়লা, লোহা, খনিজ তেল ইত্যাদি বস্তুগত উপকরণ থেকে সম্পদ সৃষ্টি হতে পারে, আবার মানুষের শ্রম, কর্মকুশলতা, উদ্ভাবনী শক্তি ইত্যাদি অবস্তুগত উপকরণ মানুষের চাহিদা পূরণ করে সম্পদ সৃষ্টি করে।

(iv) **সম্পদ সীমিত বা অসীম হতে পারে**—সূর্যালোক, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি উপকরণগুলো অসীম। এরা অনন্তকাল ধরে চলে আসছে এবং চলবে। আবার কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি খনিজ সম্পদ ব্যবহারের ফলে একদিন না একদিন শেষ হয়ে যাবে যদিও সাময়িকভাবে এদের কার্যকারিতা বাড়ানো যায়, তবুও এর একটি সীমা আছে। তাই পৃথিবীতে খনিজসম্পদের সঞ্চয় ক্রমশ কমে আসছে। এখানে মেডোস এবং মেডোস (1979) এর Limits to growth থেকে কিছু সম্পদের স্থায়িত্ব তুলে ধরার লোভ সামলাতে পারছি না। মেডোস এবং মেডোস-এর মতে বিভিন্ন সম্পদের স্থায়িত্ব কাল হল নিম্নরূপ—

সম্পদ	**আনুমানিক আরও যত বছর চলার সম্ভাবনা রয়েছে**
কয়লা	150
খনিজ তেল	50
প্রাকৃতিক গ্যাস	119
লোহা	173
তামা	48
অ্যালুমিনিয়াম	55

উপরোক্ত সারণি আমাদের মনে শঙ্কা জাগায়। বাসযোগ্য ও চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমে আসার

দরুণ উলম্বভাবে সম্প্রসারণের (vertical expansion) প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শুধু বড় বড় শহরেই নয়, শহরতলিগুলোতেও (suburban) বহুতলা ফ্ল্যাট তৈরী হচ্ছে।

(v) **সম্পদ মানুষের চেতনার বহিঃপ্রকাশ**—মানুষ তার চেতনা ও উপলব্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করে কোনটিকে সম্পদ বলা হবে, আর কোনটিকে সম্পদ বলা হবে না, বা মানুষ বাস্তববুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করে সম্পদকে কেন সংরক্ষণ করতে হবে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে বা ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলে জলের অপচয় হতে দেখেও মানুষ তা রোধে এগিয়ে আসে না। কিন্তু শুষ্ক অঞ্চলে অল্প বৃষ্টি বা শিশিরের জলকে মানুষ জমিতে কাজে লাগাবার জন্য কি প্রাণপাত করে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে নির্বিচারে গাছ কাটা হচ্ছে, কিন্তু দেরীতে হলেও পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি এলাকার অরণ্য ধ্বংসের বিরুদ্ধে মানুষ ধীরে ধীরে সোচ্চার হচ্ছে। বনভূমি ধ্বংসের ফলে কোথাও উর্বর জমি পতিত (fallow) জমিতে পরিণত হচ্ছে। আবার কোথাও চেষ্টা চলছে কৃত্রিম অরণ্য সৃষ্টি করে ভূমিক্ষয় রোধ করার। ও তাকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাবার।

(vi) **সম্পদ উন্নত প্রযুক্তির ফসল**—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের দরুণ উন্নততর দেশগুলো শিল্প, কৃষি, খনিজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে চরম উন্নতি করেছে এবং সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে উন্নতির শীর্ষে পৌঁছেছে।

1.6 সম্পদ সম্পর্কে কয়েকটি প্রচলিত ভ্রান্তধারণা (Some popular misconceptions about resources)

শত শত বছর ধরে অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় সম্পদের স্থান ছিল নগণ্য। সংগঠনের বিষয় হিসেবে শুধুমাত্র জমি, শ্রম ও পুঁজিকে গুরুত্ব দেওয়া হত কিংবা ব্যয় ও দাম, চাহিদা ও যোগান নির্ধারণের অভাব স্বীকার করতে হত। ধনবিজ্ঞানীদের দ্বারা একরকম উপেক্ষিত হয়ে সম্পদ সম্বন্ধে ধারণা কেবলমাত্র প্রকৃতিবিজ্ঞানী (Physical scientist) ও প্রাকৃতিক ভৌগোলিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমান যুগে মানুষ সম্পদ সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। আস্তে আস্তে সম্পদ সম্পর্কে মানুষের ধারণা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়েছে। সম্পদের সংজ্ঞা বর্তমানে বহুবিস্তৃত। সম্পদ সম্বন্ধে ভুল ধারণাগুলো দূর করা দরকার, কারণ এখনও অনেকে সম্পদ সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করেন।

সম্পদ সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলো হল—

(a) যে সব জিনিসের বস্তুগত অস্তিত্ব রয়েছে, সেগুলোকেই শুধুমাত্র মানুষ সম্পদ বলে মনে করে, অবস্তুগত পদার্থগুলোকে সম্পদ বলে গণ্য করে না। এটি কিন্তু একটি খুব ভুল ধারণা। এটি ঠিক যে কয়লা, লোহা আকরিক, খনিজ তেল, বনভূমি ইত্যাদি বস্তুসম্পদ হিসেবে কাজ করে থাকে।

কিন্তু সাথে সাথে এও মনে রাখা দরকার যে, অবস্তুগত জিনিস (যেমন শিক্ষা, স্বাধীনতা, সামাজিক নিরাপত্তা, গণস্বাস্থ্য) ও সম্পদ হিসেবে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বলা যেতে পারে যে বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানগুলোর পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সম্পদ সৃষ্টি হয়।

(b) সম্পদ বলতে এতকাল শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদকেই বোঝানো হত। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়াও মানবিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদকে বর্তমানে সম্পদের অঙ্গীভূত বলে মনে করা হয়। কিন্তু এও ভুল ধারণা। বস্তুতপক্ষে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিই তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, কারণ এই সম্পদই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব সম্পদের দরজা খুলে দিয়েছে।

(c) সম্পদ সম্পর্কে সঠিক কোন ধারণা না থাকার দরুণ আগে সম্পদকে সীমাহীন উপাদান হিসেবে ভাবা হত, যথেচ্ছভাবে খনিজ সম্পদ সংগ্রহ করা হত। কিন্তু আমরা জানি সম্পদের ভাণ্ডার সীমাবদ্ধ। এমন কি এর দরুণ প্রবাহমান সম্পদ (flor resource)-র কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

(d) সম্পদ সম্পর্কে আর একটি ভুল ধারণা হল কোন জিনিসকে বিচ্ছিন্নভাবে সম্পদ হিসেবে গণ্য করা। কিন্তু এককভাবে কোন বস্তুই সম্পদ বলে বিবেচিত হয় না। কয়লা বা খনিজ তেল সম্পদ নয়, তাদের কার্যকারিতাই সম্পদ। আবার এই কার্যকারিতা নির্ভর করে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, কারিগরী দক্ষতা, সরকারী দক্ষতা ইত্যাদির ওপর। স্থান-কাল ভেদে এইসব বিষয় আবার পাল্টায়। তাই সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করার সময় কয়লা বা খনিজ তেলকে এককভাবে না বিচার করে একটি বিশেষ স্থান ও কালে জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি, শাসনব্যবস্থা ও সরকারী নীতি, অর্থনৈতিক উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে তা বিচার বিবেচনা করা দরকার।

(e) শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন বস্তুসম্পদকে সম্পদ বলে বিবেচনা করার দরুণ অনেকে সম্পদকে নির্দিষ্ট (fixed) ও স্থানু (static) বলে ভেবে থাকেন, কিন্তু আমরা জানি সম্পদ স্থানু নয়। এটি অনির্দিষ্ট ও গতিশীল "Those who still insist that the natural environment is constant and that the supply of 'land' is fixed, face powerful array of opposing authorities" মানুষের প্রয়োজন ও প্রচেষ্টা অনুসারে সম্পদ বাড়ে ও কমে। সম্পদ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষের সৃষ্টি। মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিই তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মিচেলের (Welsey. c. Mitchell) ভাষায় "In comparably greatest among human resources is knowledge. It is greatest because it is the mother of other resources"। এর সৃষ্টির ক্ষমতা অনেকক্ষেত্রেই মানুষের ওপরেই নির্ভর করে।

(f) অনেকে প্রাকৃতিক বাধা ও প্রতিরোধকে সম্পদ থেকে আলাদা করে দেখেন। কিন্তু দিনের পর যেমন রাত-আলোর পাশে অন্ধকার তেমনি সম্পদ ও বাধা-প্রতিরোধ এক অবিচ্ছেদ্য বাধা। একটি ছাড়া অপরটি ভাবা যায় না। অবস্থাভেদে বাধা ও প্রতিরোধও সম্পদ বলে গণ্য হয়ে উঠতে পারে। সত্যি বলতে কি, আধুনিক বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল প্রকৃতির বাধা ও প্রতিরোধকে উন্নত সাংস্কৃতিক সম্পদের সহায়তায় সম্পদ হিসেবে তৈরী করে নেওয়া। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে জিমারম্যান সম্পদ ও প্রতিরোধকে শ্যাম দেশীয় যমজ বলে উল্লেখ করেছেন, "The two worlds should be as inseparable as siamese twins in resource thinking."

1.7 সম্পদ, প্রাকৃতিক বাধা ও নিরপেক্ষ সামগ্রী (Resource, Resistance and Neutral stuff)

পৃথিবীতে যে সব বস্তু আছে তাদের মূলত দু'ভাগে ভাগ করা যায়—(এক) মুক্ত বস্তু, (দুই) অর্থনৈতিক বস্তু। প্রথমটি হল এমনসব বস্তু যাদের যথেষ্ট উপযোগিতা ও কার্যকারিতা থাকলেও যোগান অফুরন্ত বলে এসব বস্তুর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। যেমন, জল, অক্সিজেন ইত্যাদি। যোগান অসীম বলে এদের গুরুত্ব তেমনভাবে অনুভব করা যায় না। কিন্তু এমন কিছু বস্তু আছে যাদের যোগান সীমাবদ্ধ। এজন্য ঐসব বস্তু সংগ্রহ ও উৎপাদন করতে আমদের যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়। এদের অর্থনৈতিক বস্তু বলে। মুক্ত বস্তুরও উপযোগিতা আছে। এগুলোর সরবরাহ অসীম। পক্ষান্তরে, অর্থনৈতিক বস্তুরও উপযোগিতা আছে। আবার এগুলো দুষ্প্রাপ্য। তাই সম্পদের ক্ষেত্রে মুক্ত বস্তুর চেয়ে অর্থনৈতিক বস্তুকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। কার্যকরী বস্তুগুলোকেই আমরা সচরাচর সম্পদ বলে চিহ্নিত করে থাকি।

পৃথিবীতে এমন কিছু বস্তু আছে যারা মানুষের অভাবমোচন তো করেই না, উল্টে মানুষের ক্ষতি করে বা কার্যকলাপে বাধা দান করে। অশিক্ষা, কুসংস্কার, অনুর্বর মাটি, দুর্ঘটনা, দূষণ, ঝড়, অতিবৃষ্টি বা প্লাবন ইত্যাদি। এ ধরণের বস্তুকে বাধা বা প্রতিরোধ (resistance) বলে। এরা মানুষের উদ্যমে বা উদ্যোগে বাধা সৃষ্টি করে থাকে।

অর্থাৎ,

(i) সম্পদ = মানুষের সামগ্রিক উন্নতির অনুকূল উপাদানের ক্ষমতা বা (x)

(ii) প্রতিরোধ বা বাধা = মানুষের সামগ্রিক উন্নতির প্রতিকূল উপাদানের শক্তি বা (y)

সুতরাং, সম্পদের কার্যকারিতা = x – y।

যদি x-এর ক্ষমতা y-র বেশী হয়, সে ক্ষেত্রে সম্পদ সংগ্রহ বা সম্পদ সৃষ্টি চলবে। কিন্তু যদি দ্বিতীয়টির (y) ক্ষমতা প্রথমটির (x) চেয়ে বেশি হয়, তবে সম্পদ সংগ্রহ বা সম্পদ সৃষ্টির প্রকল্প বাধাপ্রাপ্ত হবে।

প্রতিরোধকে চার ভাগে ভাগ করা যায়, যথা— (i) প্রাকৃতিক, (ii) মানসিক, (iii) সামাজিক এবং (iv) অর্থনৈতিক প্রতিরোধ।

পৃথিবীতে এমন কিছু বস্তু আছে যারা মানুষের ক্ষতি করে না বা মানব উদ্যোগে বাধা সৃষ্টি করে না বা মানব উদ্যোগের বাধা সৃষ্টি না করে আবার মানুষের কোন কাজে লাগে না। অর্থাৎ এই জাতীয় উপকরণের মানুষের ওপর কোন অনুকূল বা প্রতিকূল প্রভাব নেই। এদের নিরপেক্ষ সামগ্রী (neutral stuff) বলে।

মানুষের কাজ হচ্ছে উন্নত সাংস্কৃতিক সম্পদের সাহায্যে নিরপেক্ষ সামগ্রীকে সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করা এবং বাধা বা প্রতিরোধকে সম্পদে পরিণত করা। মানুষ যত নতুন নতুন সম্পদ আবিষ্কার করছে নিরপেক্ষ উপাদানের সংখ্যা তত কমছে। বলা চলে সম্পদ ও নিরপেক্ষ উপাদানে সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক।

আজকের নিরপেক্ষ উপাদান আগামীতে তাই সম্পদে পরিণত হতে পারে। তাই নিরপেক্ষ উপাদানের ধারণা আপেক্ষিক ও গতিশীল। নিরপেক্ষ সামগ্রীকে সম্পদ এবং বাধাকে সম্পদ বা নিরপেক্ষ সামগ্রীতে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে কার্যকারিতা তত্ত্ব (Functional theory) দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়। এই নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

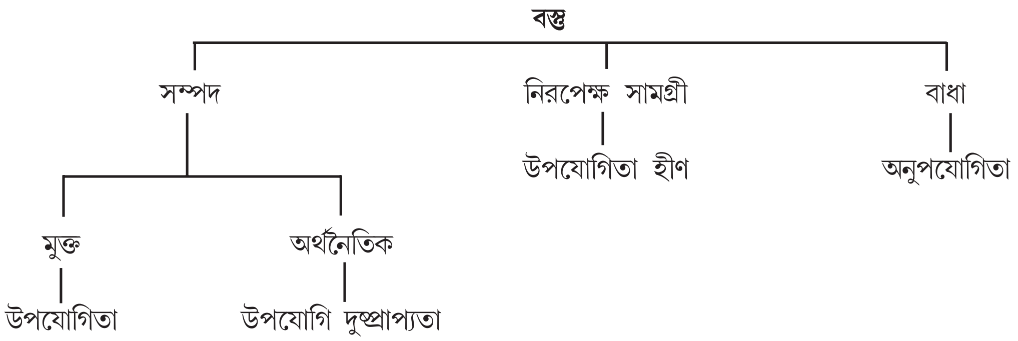

সম্পদ = + উপযোগিতা

নিরপেক্ষ সামগ্রী = ± উপযোগিতা

প্রতিরোধ বা বাধা = – উপযোগিতা

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে বিভিন্ন বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে উপযোগিতা বিশ্লেষণ করা হয়।

1.8 সম্পদের শ্রেণীবিভাগ (Classification of resources)

প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে সম্পদকে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। একটি অতি প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ হল—

(a) **জমি (Land)** — স্থান (space) ও প্রাকৃতিক (physical) সম্পদ উভয় অর্থে।

(b) **পুঁজি বা মূলধন (Capital)** — এটি আবার তিনপ্রকার স্থির পুঁজি, উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি ও বিনিময়যোগ্য পুঁজি।

(c) **শ্রম (Labour)** — অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত মানুষের মানসিক ও কায়িক ক্ষমতা।

সম্পদকে আবার প্রকৃত, সম্ভাব্য ও লীন এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

জিমারম্যানের মতে বস্তুর (১) সজীবতা এবং (২) স্থায়িত্ব ও ব্যবহার অনুযায়ী সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—জৈব ও অজৈব সম্পদ।

বিশদভাবে আলোচনা করলে সম্পদকে নিম্নলিখিত নয় ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—

(i) সম্পদের প্রকৃতি অনুসারে

(ii) সম্পদের স্থায়িত্ব অনুসারে

(iii) সম্পদের অবস্থান অনুসারে

(iv) সম্পদের অধিকার অনুসারে

(v) সম্পদের বন্টন অসাম্য অনুসারে

(vi) সম্পদের প্রাপ্তি অনুসারে

(vii) সম্পদের জৈবিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে

(viii) সম্পদের উদ্ভব অনুসারে

(x) সম্পদের উপলব্ধি অনুসারে

সারণি—1.1

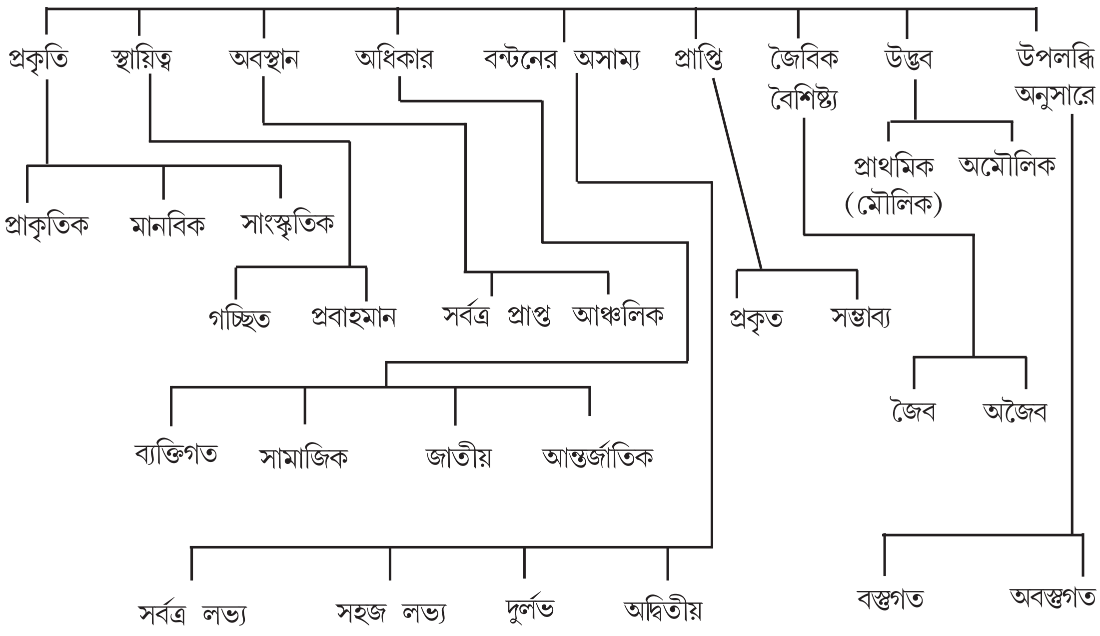

(i) **প্রকৃতি অনুযায়ী সম্পদ তিন প্রকার—**

(a) **প্রাকৃতিক সম্পদ** — প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে পাওয়া সম্পদ যেমন জল, বায়ু, খনিজ পদার্থ, মাটি ইত্যাদি।

(b) **মানবিক সম্পদ** — ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ যেখানে সম্পদ, যেমন—জনসংখ্যা, কর্মদক্ষতা, কৃষি শ্রমিক ও খনিশ্রমিক ইত্যাদি।

(c) **সাংস্কৃতিক সম্পদ** — মানুষের সংস্কৃতি থেকে পাওয়া সম্পদ যেমন জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রযুক্তি, সংগঠন, কারিগরী দক্ষতা ইত্যাদি।

(ii) **স্থায়িত্ব অনুসারে প্রাকৃতিক সম্পদকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—**

(a) **গচ্ছিত (fund) সম্পদ ও (b) প্রবহমান (flow) সম্পদ।**

বিশদ আলোচনা

প্রবাহমান ও গচ্ছিত সম্পদের তুলনা

প্রবহমান সম্পদ	**গচ্ছিত সম্পদ**
(1) যোগান অফুরন্ত, তাই নিঃশেষিত হবার প্রশ্ন ওঠে না।	(1) যোগান সীমিত, ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে তা নিঃশেষিত হয়ে যাবে।
(2) ব্যবহারের যোগান কমলেও বৃদ্ধি সম্ভব।	(2) ব্যবহারের যোগান কমলেও বৃদ্ধি সম্ভব নয়।
(3) জৈব সম্পদ সাধারণভাবে প্রবহমান সম্পদ।	(3) অজৈব সম্পদ সাধারণভাবে গচ্ছিত সম্পদ।
(4) অবাধ সম্পদ বহুপ্রকার; খনিজ পদার্থ ছাড়া আর সব প্রাকৃতিক উপাদানই পূরণশীল, যেমন জলবিদ্যুৎ, সৌরশক্তি, বাতাস ইত্যাদি।	(4) প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে শুধুমাত্র খনিজ পদার্থ গচ্ছিত সম্পদ।
(5) সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই।	(5) সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে।
(6) বেশীর ভাগ অবাধ সম্পদ স্থানান্তরযোগ্য নয়, তবে অনেক পূরণশীল সম্পদ স্থানান্তরযোগ্য।	(6) অধিকাংশ গচ্ছিত সম্পদ স্থানান্তরযোগ্য।
(7) ব্যবহার সমস্যা সৃষ্টি করে না, তবে অতি ব্যবহার সাময়িক সমস্যা সৃষ্টি করে।	(7) ব্যবহার সমস্যা সৃষ্টি করে।
(8) বিকল্পের প্রয়োজন নেই।	(8) বিকল্পের সন্ধান প্রয়োজন।
(9) অবাধ ও পূরণশীল সম্পদ কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যয়বহুল।	(9) গচ্ছিত সম্পদ সবক্ষেত্রেই ব্যয়বহুল।

প্রবহমান সম্পদ	গচ্ছিত সম্পদ
(10) পৃথিবীর মোট তাপ ও শক্তিসম্পদের মাত্র 20 শতাংশ এই সম্পদ থেকে আসে।	(10) গচ্ছিত সম্পদ পৃথিবীর তাপ ও শক্তিসম্পদের প্রায় 40 শতাংশ যোগান দেয়।
(11) এই সম্পদ ব্যবহারে পরিবেশ দূষিত হবার সম্ভাবনা থাকে না।	(11) গচ্ছিত সম্পদ ব্যবহারে পরিবেশ দূষিত হবার সম্ভাবনা থাকে।
(12) এই সম্পদ শিল্পোৎপাদনে পরোক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে।	(12) এই সম্পদ শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে।
(13) নিরপেক্ষ উপাদানের প্রাপ্তিযোগ্যতা ও সম্পদ সৃষ্টির মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব থাকে না বললেই চলে।	(13) ভৌগোলিক দূরত্ব থাকে। জাপান ভারত থেকে আকরিক লোহা (নিরপেক্ষ উপাদান) দেশে নিয়ে গিয়ে লোহা ও ইস্পাত (সম্পদ) উৎপাদন করে।

(a) **গচ্ছিত/ক্ষয়িষ্ণু/অপুনর্ভব সম্পদ**— যে সব সম্পদ সীমিত বা বহুদিন ধরে ব্যবহারের ফলে শেষ হয়ে যায় কিংবা যে সম্পদকে আবার একই পরিমাণে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না, তাকে গচ্ছিত/ক্ষয়িষ্ণু/অপুনর্ভব সম্পদ বলে।

অর্থাৎ গচ্ছিত সম্পদের পরিমাণ নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ, এর বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ নেই, যেমন খনিজ পদার্থ মাটির নীচে নির্দিষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত থাকে, ঠিক কলসীর জলের মতন। ব্যবহারের ফলে একদিন না একদিন তা শেষ হয়ে যাবে।

নির্দিষ্ট স্থানের সঞ্চয় ফুরিয়ে গেলে আবার কোন এক নতুন স্থানে সব বস্তুর পরিমাণ নির্দিষ্ট, তাদের ব্যবহার কমিয়ে ফেলে বিকল্প (alternate) বস্তু ব্যবহার করতে হয়। যেমন কয়লা, বহুদিন ধরে ব্যবহারের ফলে কয়লা শেষ হয়ে আসছে বলে আমাদের দেশে কয়লার ইঞ্জিনের পরিবর্তে ডিজেল এবং বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের ব্যবহার বেড়েছে। কয়লাকে তাপবিদ্যুৎ শক্তিতে (thermal power) রূপান্তরিত করেও ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া ধৌত প্রক্রিয়ার (Coal washery) মাধ্যমে (কয়লার) জ্বালানী শক্তি বাড়ানো হচ্ছে। কিছু কিছু গচ্ছিত সম্পদ ব্যবহারের ফলে একেবারে শেষ হয়ে যায়। যেমন খনিজ তেল বা কয়লা। আবার কিছু কিছু খনিজ পদার্থ আকার পাল্টিয়ে টিকে থাকে, যেমন আকরিক লোহা। ইস্পাত বা কোন যন্ত্রপাতি হিসেবে এটি অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে। অজৈব সম্পদ গচ্ছিত সম্পদ।

(b) **প্রবহমান/অফুরন্ত/পুনর্ভব সম্পদ**— যে সব সম্পদ বারংবার ব্যবহার করলেও শেষ হবার বা ক্ষয়

হবার সম্ভাবনা থাকে না, তাদের অফুরন্ত সম্পদ বলে। যেমন সূর্যকিরণ, বাতাস, আলো ইত্যাদি। কিছু কিছু সম্পদ ব্যবহারের ফলে কমে যায় কিন্তু আবার বেড়ে গিয়ে ব্যবহারের যোগ্য হয়ে যায়—যেমন গরমকালে পুকুরের জল বা নদীর জল শুকিয়ে গেলেও বর্ষায় তা আবার বেড়ে যায়। এই ধরণের সম্পদকে পুণর্ভব (renewable) সম্পদ বলে। যেমন অরণ্য বা মৎস্য সম্পদ। এই সম্পদ ব্যবহারের পর আবার নতুন সম্পদ তৈরি হয়। কোন বিশেষ সময়ে সম্পদ ফুরিয়ে গেলেও প্রকৃতির নিয়মে নতুন করে সম্পদ সৃষ্টি হয়। যেমন মানব সম্পদ। প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে ভরা মানুষ নিত্য নতুন সম্পদ আবিষ্কারে নিয়োজিত রয়েছে। জৈব সম্পদ প্রবহমান সম্পদ।

প্রবহমান ও গচ্ছিত সম্পদ ব্যবহারের সময়ে দ্বিতীয়টির ব্যবহার যতদূর সম্ভব কমিয়ে প্রথমটির (প্রবহমান) ব্যবহারে বেশি যত্নবান হওয়া উচিত। প্রবহমান সম্পদের যোগান অফুরন্ত হওয়ায় তা সমস্যার সৃষ্টি করে না, আধুনিক পরিবেশ বিজ্ঞানীরা প্রবহমান সম্পদের (flow/resources) অপব্যবহার (misuse) রোধ করার পরামর্শ দেন। তাঁদের মতে এর ফলে সম্পদের স্রোত একদিন শেষ হতে পারে। এছাড়া অপব্যবহারের ফলে প্রবহমান সম্পদের গুণগতমান (Quality) ও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বৃষ্টির জলে অম্লের প্রাচুর্য, বাতসে ধুলো বা ধোঁয়া, ইত্যাদি নানা সমস্যা দেখা দেয়। ফলতঃ সম্পদের কার্যকারিতা কমে যায়। তাই বলা যায় প্রবহমান সম্পদ দুই প্রকার—

(i) মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে পরিবর্তনযোগ্য

(ii) অপরিবর্তনীয়

কিন্তু গচ্ছিত সম্পদের যোগান নির্দিষ্ট হওয়ায় তার সংরক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়।

(iii) অবস্থান অনুযায়ী সম্পদকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—যেমন (a) **সর্বত্রপ্রাপ্ত**, (b) **আঞ্চলিক সম্পদ।**

(a) **সর্বত্রপ্রাপ্ত সম্পদ**— যে সব সম্পদ পৃথিবীর সবখানে পাওয়া যায়। কোন অঞ্চলের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, তাদেরকে সর্বত্রপ্রাপ্ত সম্পদ বলে, যেমন জল, বাতাস, সূর্যকিরণ, মাটি ইত্যাদি।

(b) **আঞ্চলিক সম্পদ**— যে সব সম্পদ পৃথিবীর সবখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলেই পাওয়া যায়, তাঁদেরকে আঞ্চলিক সম্পদ বলে। লোহা, তামা, কয়লা, সোনা এই জাতীয় সম্পদের উদাহরণ—

(iv) মালিকানা বা অধিকারের ভিত্তিতে সম্পদকে চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(a) **ব্যক্তিগত**, (b) **সামাজিক**, (c) **জাতীয়** এবং (d) **আন্তর্জাতিক সম্পদ**।

(a) **ব্যক্তিগত সম্পদ**— মানুষের কিছু ব্যক্তিগত পার্থিব বস্তু যেমন ঘরবাড়ি, টাকা-পয়সা, জমি, চারিত্রিক গুণ, বিদ্যাবুদ্ধি ও স্বাস্থ্য ইত্যাদি।

(b) **সামাজিক সম্পদ**— সমাজের মঙ্গলের জন্য, সমাজের অধীন যে সম্পদ তাকে সামাজিক সম্পদ বলে। যথা, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, পাঠাগার ইত্যাদি।

(c) **জাতীয় সম্পদ**— জাতীয় সম্পদ হল যে কোন দেশের প্রতিটি নাগরিকের সম্পদের সমষ্টি। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, যথা—কৃষিজমি, বনভূমি, জলবায়ু, তথা রেলপথ, পোতাশ্রয়, সোনারখনি, তেলখনি ইত্যাদি জাতীয় সম্পদ।

(d) **আন্তর্জাতিক সম্পদ**— এটি হল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সম্পদের সমষ্টি অর্থাৎ যে সব পার্থিব ও অপার্থিব বস্তু মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে লাগে, যেমন বায়ুমণ্ডলের মহাদেশীয় অঞ্চল।

(v) **বন্টনের অসাম্য অনুযায়ী** সম্পদকে চার ভাগে ভাগ করা যায়, যথা— (a) **সর্বত্রলভ্য সম্পদ,** (b) **সহজলভ্য সম্পদ,** (c) **দুর্লভ সম্পদ,** (d) **অদ্বিতীয় সম্পদ।**

(a) **সর্বত্রলভ্য সম্পদ**— মানুষের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় বস্তু যা পৃথিবীর প্রায় সবখানে পাওয়া যায়, যেমন—বালি, জল, বাতাস, সূর্য্যালোক ইত্যাদি।

(b) **সহজলভ্য সম্পদ**— কিছু কিছু বস্তু সবখানে পাওয়া না গেলেও বেশীর ভাগ স্থানে পাওয়া যায়, যেমন স্বাভাবিক উদ্ভিদ, বৃষ্টির জল, চাষোপযোগী জমি।

(c) **দুর্লভ সম্পদ**— কিছু কিছু বস্তু আছে যেগুলো কয়েকটা মাত্র স্থানে পাওয়া যায়। যেমন মালয়ের রবার বা ইন্দোনেশিয়ার কাছাকাছি সমুদ্রতলদেশ থেকে প্রাপ্ত টিন।

(d) **অদ্বিতীয় সম্পদ**— কিছু কিছু সম্পদ আছে যা পৃথিবীতে কেবলমাত্র একটি স্থানে পাওয়া যায়, যেমন অ্যালুমিনিয়াম তৈরীর উপাদান পৃথিবীতে কেবলমাত্র কানাডাতেই পাওয়া যায়।

(vi) **সম্পদের প্রাপ্তি অনুযায়ী** সম্পদ হল দু'প্রকার যথা, (2) **প্রকৃত,** (2) **সম্ভাব্য সম্পদ।**

(a) **প্রকৃত বা সমৃদ্ধ সম্পদ**— যে সব বস্তু ক্রমাগত ব্যবহার হয়ে চলেছে, কেবলমাত্র সঞ্চিত অবস্থায় সীমাবদ্ধ নেই, তাদেরকে প্রকৃত বা সমৃদ্ধ সম্পদ বলে। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের জলবিদ্যুৎ সম্পদ।

(b) **সম্ভাব্য সম্পদ**— যে সব সম্পদের ভৌগোলিক অস্তিত্ব আছে, অথচ ব্যবহারযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোন অর্থসামাজিক বা প্রাকৃতিক কারণে ঐ সম্পদের পুরোপুরি ব্যবহার সম্ভব হয় না। এদের সম্ভাব্য সম্পদ বলে। যেমন আফ্রিকা মহাদেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তার উৎপাদন অতি সীমিত।

(iii) **জৈবিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে** সম্পদকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—যথা, (a) **জৈবিক সম্পদ** ও (b) **অজৈবিক সম্পদ।**

(a) **জৈবিক সম্পদ**— যে সব সম্পদের জীবন আছে যেমন মানুষ জীবজন্তু, গাছপালা, তাদের জৈবিক সম্পদ বলে। জৈব সম্পদের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ হল মানব সম্পদ। এর কারণ এই সম্পদের যেমন দৈহিক

শক্তি আছে, তেমনি মননশক্তি আছে যা তাকে পুরো সম্পদের পরিচালনায় সাহায্য করে।

(b) **অজৈবিক সম্পদ**— অনুভূতিহীন জড় পদার্থ সমূহ হল অজৈবিক সম্পদ। এরা কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় হিসেবে অবস্থান করে। মানুষ তার প্রয়োজনে সেগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজে লাগিয়ে থাকে। জল, বাতাস, খনিজ পদার্থ এগুলো অজৈব সম্পদের অন্তর্গত। এগুলো থেকে বিভিন্ন শক্তি পাওয়া যায়, যা অজৈব শক্তি নামে পরিচিত।

জৈব ও অজৈব শক্তির তুলনা

জৈব শক্তি	অজৈব শক্তি
(1) প্রবহমান সৌরশক্তি। মুক্তশক্তি নয়।	(1) ইহা মুক্তশক্তি, অতীতের সঞ্চিত সৌরশক্তি থেকেই এর সৃষ্টি।
(2) এই শক্তির পৌনঃপুনিক ব্যয় (recurring cost) অনেক।	(2) পৌনঃপুনিক ব্যয় কম।
(3) ব্যবহারের জন্য জড়শক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়।	(3) ব্যবহারের জন্য জৈবশক্তির ওপর নির্ভর করতে হয়।
(4) কম শক্তিশালী।	(4) বেশী শক্তিশালী। বলদে টানা লাঙল ও ডিজেল ইঞ্জিনের মধ্যে তুলনা করলে এটা পরিষ্কার হবে।
(5) ক্রমবর্ধমান সম্পদ।	(5) ক্ষয়সহিষ্ণু সম্পদ।
(6) কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে এই শক্তির ব্যবহার বেশি লক্ষ্য করা যায়।	(6) শিল্পনির্ভর অর্থনীতিতে ব্যবহার বেশী দেখা যায়। যেমন কয়লা বা ডিজেলের সাহায্যে কলকারখানা বা ইঞ্জিন চলে না।
(7) জৈবশক্তি নিজেই কাজ করতে পারে, যন্ত্রের ব্যবহারের দরকার নেই।	(7) যেহেতু স্বয়ংচালিত নয়, তাই এই শক্তি ব্যবহারের জন্য যন্ত্রের প্রয়োজন হয়।

(viii) **উদ্ভব বা উৎপত্তিগত দিক দিয়ে সম্পদকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—**

(a) **প্রাথমিক বা মৌলিক সম্পদ** এবং (b) **অমৌলিক সম্পদ।**

(a) **প্রাথমিক বা মৌলিক সম্পদ** — জল, বাতাস, সূর্যালোক ইত্যাদি প্রকৃতির বস্তু সমূহকে প্রাথমিক বা মৌলিক সম্পদ বলে।

(b) **অমৌলিক সম্পদ** — মানুষ যখন প্রকৃতিদত্ত বস্তুকে শ্রমের দ্বারা আরও উন্নততর সামগ্রীতে পরিণত করে, তখন তাকে অমৌলিক সম্পদ বলে। একটু উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। মানুষ মাটিতে গম, আখ, চা-পাতা ইত্যাদি ফলায়, পুনরায় যন্ত্রের সাহায্যে সেগুলোকে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে।

(ix) **উপলব্ধি বা অনুভব অনুসারে** সম্পদকে দু'ভাগে ভাগ করা হয় যেমন (a) **বস্তুগত সম্পদ** ও (b) **অবস্তুগত সম্পদ**।

(a) **বস্তুগত সম্পদ** — জল হল তরল পদার্থ, কিন্তু লোহা আকরিক হল কঠিন পদার্থ, আবার বাতাস গ্যাসীয় পদার্থ, স্পর্শগত অস্তিত্বকে বস্তুগত সম্পদ বলে।

(b) **অবস্তুগত সম্পদ** — স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিকল্পনা, স্বাধীনতা এগুলোর কোনটার স্পর্শগত অস্তিত্ব নেই, অর্থাৎ স্পর্শহীন এবং প্রধানত মানুষের সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে সৃষ্ট উপাদানই হল অবস্তুগত সম্পদ।

সম্পদের বিস্তৃত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হল যে কয়েকটি সম্পদ একই প্রকার, শুধুমাত্র শ্রেণীভাগের সুবিধার্থে আমরা তাদের ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছি। যেমন প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে প্রকৃতিদত্ত বিভিন্ন বস্তু, অর্থাৎ জল, মাটি, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি। আবার অজৈব সম্পদের মধ্যেও উপরোক্ত বস্তু রয়েছে। অন্যত্র জল, বাতাস, সূর্য্যালোক হল প্রাথমিক (মৌলিক)। প্রবহমান সম্পদ আর খনিজ পদার্থ গচ্ছিত সম্পদের উদাহরণ। এজন্য মনে হয় সম্পদের কার্যকারিতার উপাদান হিসেবে সম্পদের শ্রেণীবিভাগ করা অনেকটা কষ্টসাধ্য। আমরা জানি মানুষ স্বীয় অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিবিধানে সম্পদকে কাজে লাগাচ্ছে। প্রকৃতিদত্ত বস্তুকে স্বীয় বিচারবুদ্ধিতে ও কলাকৌশলের মাধ্যমে সম্পদে পরিণত করছে। এই বিচারে সম্পদকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

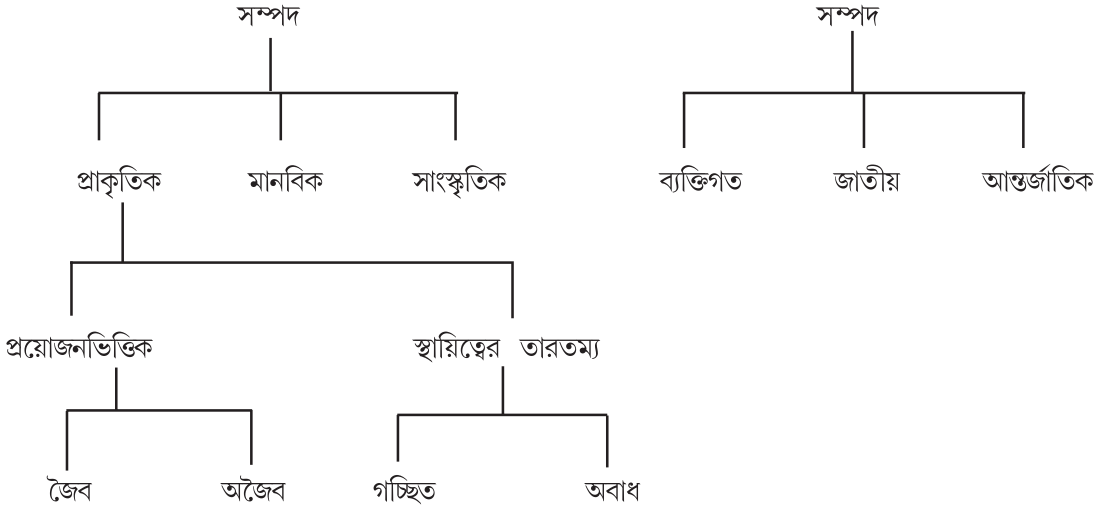

1.9 সম্পদ সৃষ্টির উপাদান (Factors of Resource Creation)

কোন কিছু উৎপাদন করতে গেলে প্রয়োজন ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং ব্যবস্থাপনা। এই চারটিকে উৎপাদনের উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়। যেকোন ধরণের উৎপাদনের জন্য এই চারটি উপাদান লাগে। সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তেমনি প্রয়োজন প্রকৃতি, মানব এবং সংস্কৃতির। প্রকৃতিকে বলা যেতে পারে ভূমি (প্রকৃতির দান)। মানব শক্তি হল শ্রম এবং সংস্কৃতির মধ্যে মূলধন ও ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্রকৃতি, মানব এবং সংস্কৃতি—এই তিন উপাদানের ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্টি হয় সম্পদের। নিম্নে তিনটি উপাদান নিয়ে আলোচনা করা হল—

(a) **প্রকৃতি** (Nature) ঃ জল, বায়ু, খনিজ পদার্থ, মৃত্তিকা ইত্যাদি প্রকৃতির দান। এই বস্তুগুলি নিরপেক্ষ সামগ্রীরূপে অথবা প্রকৃতির বাধা হিসাবে সঞ্চিত রয়েছে। মাটির নীচে আছে খনিজ পদার্থ, উপরে ও ভূগর্ভে রয়েছে জলাধার ও জলপ্রবাহ। জলপ্রবাহ (যেমন জলপ্রপাত বা খরস্রোতা নদী) বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে সহায়ক। আবার এই জলপ্রবাহ যেখানে মৃদুস্রোতা ও স্বচ্ছসলিলা সেখানে সেচের কাজে এই জলপ্রবাহকে ব্যবহার করা যায়। এই সব প্রকৃতির দানগুলি মানুষকেই তার প্রয়োজন সিদ্ধির উপযোগী করে নিতে হয়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ কাজটি সম্পন্ন হচ্ছে ততক্ষণ ঐ বস্তু সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে না।

(b) **মানুষ** (Man) ঃ মানুষ সম্পদের সৃষ্টিকারী তথা ভোগকারী। সম্পদ অর্থে যে কার্যকারিতা বোঝায় সে কার্যকারিতা মানুষের সহযোগে কেবল সৃষ্টি করা সম্ভব। মানুষ নিরপেক্ষ সামগ্রীকে সম্পদে পরিণত করে। প্রকৃতির বাধাকে নিরপেক্ষ সামগ্রীতে কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে সম্পদে রূপান্তরিত করে। মানুষের সহযোগিতা না থাকলে প্রকৃতির দান নিরপেক্ষ সামগ্রী হিসাবেই পড়ে থাকত। সম্পদ হিসাবে তার উত্তরণ ঘটত না। পৃথিবীর অনেক অঞ্চল আছে যেখানে মনুষ্যবসতি না থাকায় প্রকৃতির দানের যথোপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হয়নি। আফ্রিকার প্রত্যন্ত প্রদেশে যেদিন মানুষের গর্বিত পদসঞ্চার ঘটল তখনই বিচিত্ররূপী আফ্রিকার অফুরন্ত সম্পদ ভাণ্ডারের দুয়ার মানবজাতির সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল। তাই মানুষ একটি উপাদান এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

(c) **সংস্কৃতি** (Culture) ঃ সম্পদ সৃষ্টির কাজে মানুষ তার দৈহিক শক্তি দিয়ে যেমন সহযোগিতা করছে তেমনি মানবশক্তি দিয়ে সহায়তা করছে। কাজ করতে গিয়ে দেখা গেছে নিজ হাতে করার থেকে কোন যন্ত্র নিয়ে কাজ করলে বেশি কাজ করা যায়। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। পরস্পর হানাহানি না করে সংঘবদ্ধ হয়ে বাস করলে কিছু অধিকার ত্যাগ করে কতকগুলি নিয়মনীতি তৈরী করে নিলে, অভাব মেটানো অনেক সহজ হয়ে আসে। এই চিন্তা থেকেই গড়ে উঠল নিত্য নতুন সমাজব্যবস্থা। এই সব বুদ্ধিবৃত্তি, যন্ত্র, কর্মপদ্ধতি, নিয়মনীতি সমাজব্যবস্থাই সংস্কৃতি নামে পরিচিত। শিক্ষা-দীক্ষা, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য, সভ্য ভদ্র আচরণ, সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রা সম্পদের অবস্তুগত (non-material) উপাদান।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সম্পদ, প্রকৃতি, মানুষ এবং সংস্কৃতির যৌথ প্রক্রিয়ার স্বর্ণ ফসল। এককভাবে কোন

উপাদান দ্বারা সম্পদ সৃষ্টি সম্ভব নয়। সম্পদ পরিণতিলাভ (Resourceship) প্রকৃতি, মানুষ এবং সংস্কৃতির যৌথ প্রক্রিয়ার অবদান। সম্পদের কার্যকারিতাতত্ত্ব আলোচনাকালে এই তথ্য প্রমাণিত হবে। তবে প্রকৃতি ও মানুষ হল মৌলিক উপাদান। সংস্কৃতি সহায়ক উপাদান।

সম্পদের উপাদান

- প্রকৃতি
- মানুষ
- সংস্কৃতি

অনুশীলনী

(i) সম্পদের সংজ্ঞা নির্দেশ করুন।

(ii) সম্পদ সম্পর্কে মানুষের চেতনার বহিঃপ্রকাশ কিভাবে হতে পারে বলে আপনার ধারণা?

(iii) সম্পদ সম্পর্কে কয়েকটি প্রচলিত ভ্রান্তধারণা সম্পর্কে বলুন।

(iv) সম্পদের শ্রেণীবিভাগ করুন।

(v) প্রবহমান ও সঞ্চিত সম্পদের তুলনা করুন।

(vi) সম্পদ সৃষ্টির উপাদানগুলি কী কী উল্লেখ করুন।

(vii) পুনর্ভব ও অপুনর্ভব সম্পদ বলতে কী বোঝেন?

1.10 সারাংশ

দুটো দেশের মধ্যে উন্নয়নের যে ফারাক, তার মূলে রয়েছে সম্পদের অস্তিত্ব। সম্পদের প্রাচুর্য্য হেতু একটি দেশ উন্নত হয়, আবার আর একটি দেশ অনুন্নত হয়। সম্পদ সম্পর্কে মানুষের চেতনা নতুন কিছু নয়, অবশ্য সাম্প্রতিককালে পাশ্চাত্য দেশগুলোর সম্পদ চেতনার নতুন ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কারণ আধুনিক মানুষের অভাববোধ আগের তুলনায় বহুগুণ বেড়ে গেছে। তাই চলছে নিত্যনতুন সম্পদ আহরণের চেষ্টা বা তার বহুবিধ ব্যবহারের প্রচেষ্টা। প্রকৃতির বাধা-প্রতিরোধকে অতিক্রম করে মানুষ তারই সৃষ্ট সংস্কৃতির সাহায্যে নিজের সতত পরিবর্তনশীল অভাব মেটানোর উপযোগী করে সম্পদ তৈরী করে নিচ্ছে।

সম্পদ তিনটে উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত—মানুষ, প্রকৃতি ও সম্পদ। এটি কোন বস্তুবিশেষ নয়, বস্তুবিশেষের কার্যকারিতা। আবার অনেক অবস্তু যা মানুষের অভাবমোচন করতে পারে, তাকেও সম্পদ বলে ধরা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সম্পদ সম্পর্কে আগে কয়েকটা ভুল ধারণা ছিল, যেমন এককালে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদকেই সম্পদ বলে বিবেচনা করা হত। তেমনি আগে সম্পদকে সীমাহীন উপাদান হিসাবে ধরা হত। আর একটি ভুল ধারণা ছিল কোন জিনিসকে বিচ্ছিন্নভাবে সম্পদ হিসেবে গণ্য করা।

সম্পদকে প্রাকৃতিক, মানবিক এবং সাংস্কৃতিক এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রাকৃতিক সম্পদকে

আবার পুনর্ভব ও অপুনর্ভব এই দুই সম্পদে ভাগ করা যায়। এছাড়া আছে জৈব সম্পদ (যে সব সম্পদে জীবনের অস্তিত্ব আছে) এবং অজৈব সম্পদ (কার্যকারিতাযুক্ত জড় পদার্থ)। এছাড়া ব্যক্তিগত মালিকানা, অবস্থান, মালিকানা বা অধিকার, বন্টনের অসাম্য ও সম্পদের প্রাপ্তি অনুযায়ীও সম্পদকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

1.11 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1. সম্পদ কাকে বলে? বিশদ আলোচনা করুন।

2. সম্পদ কোন বস্তু বা পদার্থকে নির্দেশ করে না। কোন বস্তু বা পদার্থ যে কার্য সম্পন্ন করতে পারে তাকেই নির্দেশ করে—এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করুন। কিভাবে সংস্কৃতি ও মানুষের চাহিদা সম্পদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে, তা বিবৃত করুন।

3. সম্পদ সম্পর্কে সাধারণ ভ্রান্ত ধারণাগুলি উল্লেখ করুন।

4. সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

5. সম্পদের ধারণাটি গতিশীল—ব্যাখ্যা করুন।

6. সম্পদ, প্রতিরোধ ও নিরপেক্ষ উপাদানের গতিশীল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।

7. প্রকৃতি, মানুষ এবং সংস্কৃতির গতিশীল ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে সম্পদের বিবর্তন ঘটে—এই উক্তিটির বিশ্লেষণ করুন।

8. সম্পদের শ্রেণীবিভাগ করুন।

9. সম্পদ উন্নয়নের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1. সম্পদ সৃষ্টির বিভিন্ন উপাদানগুলি কী কী?

2. সম্পদের উন্নয়নের ঐতিহাসিক পটভূমিকা আলোচনা করুন।

3. গচ্ছিত ও প্রবহমান সম্পদের পার্থক্য কী?

4. জৈবিক ও অজৈবিক সম্পদ বলতে কী বোঝেন?

5. প্রাকৃতিক ও মানবিক বাধা কী?

6. পুনর্ভব সম্পদ কী?

1.12 উত্তরমালা

অনুশীলনী—1

(i) 1.4 অংশ দেখুন।

(ii) মানুষ তার চেতনা ও উপলব্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করে কোনটিকে সম্পদ বলা হবে, আর কোনটিকে বলা হবে না, বা মানুষ বাস্তববুদ্ধি বিবেচনা করে সম্পদকে কেন সংরক্ষণ করতে হবে। লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে নির্বিচারে গাছ কাটা হচ্ছে, কিন্তু দেরীতে হলেও পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি এলাকায় অরণ্য ধ্বংসের বিরুদ্ধে মানুষ ধীরে ধীরে সোচ্চার হচ্ছে। বনভূমি ধ্বংসের ফলে কোথাও উর্বর জমি পতিত (fallow) জমিতে পরিণত হচ্ছে। আবার কোথাও চেষ্টা চলছে কৃত্রিম অরণ্য সৃষ্টি করে ভূমিক্ষয় রোধ করার ও তাকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাবার।

(iii) 1.6 অংশ দেখুন।

(iv) 1.8 অংশ দেখুন।

(v) 1.8 অংশের বিশদ আলোচনা লক্ষ্য করুন।

(vi) 1.9 অংশ দেখুন।

(vii) যেসব সম্পদকে বারংবার ব্যবহার করলেও শেষ হবার বা ক্ষয় হবার সম্ভাবনা থাকে না, তাদেরকে পুনর্ভব বা অফুরন্ত সম্পদ বলে। যেমন—সূর্যকিরণ, বাতাস, আলো ইত্যাদি।

সে সব সম্পদ সীমিত বা বহুদিন ধরে ব্যবহারের ফলে শেষ হয়ে যায় কিংবা যে সম্পদকে আবার একই পরিমাণে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না তাকে অপুনর্ভব বা গচ্ছিত বা ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ বলে।

যেমন—খনিজ তেল, কয়লা ইত্যাদি।

<u>সর্বশেষ প্রশ্নাবলী</u> ঃ

1.1.4 অংশ দেখুন।

2.1.4 অংশ দেখুন।

3.1.6 অংশ দেখুন।

4.1.4 অংশ দেখুন।

5.1.5 অংশের 4. (ii) নং দেখুন।

6.1.7 অংশ দেখুন।

7.1.9 অংশ দেখুন।

8.1.8 অংশ দেখুন।

9.1.3 অংশ দেখুন।

<u>সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী</u> ঃ

1.1.9 অংশ দেখুন।

2.1.3 অংশ দেখুন।

3.1.8 অংশের বিশদ আলোচনা দেখুন।

4.1.8 অংশ দেখুন।

5.1.7 অংশ দেখুন।

6.1.8 অংশ দেখুন।

একক 2 ❑ সম্পদের বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারিতা তত্ত্ব

গঠন

2.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

2.2 সম্পদের বৈশিষ্ট্য

2.3 সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্ব

2.4 সম্পদের কার্যকারিতার বিবর্তন

2.5 সম্পদের কার্যকারিতার নিয়ন্ত্রক

2.6 সারাংশ

2.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

2.8 উত্তরমালা

2.1 প্রস্তাবনা

যে কোন বস্তুকেই সম্পদ বলা চলে না, সম্পদ বলে বিবেচ্য হতে গেলে কোন বস্তুর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে, যেমন :

(a) বস্তুটির উপযোগিতা বা অভাব মোচনের ক্ষমতা (utility)

(b) তার কার্যকারিতা (functionality)

(c) তার ক্ষয়শীলতা (obsolescence)

(d) সুগম্যতা বা আহরণযোগ্যতা (accessibility)

(e) সার্বজনীনী চাহিদা (universal need)

(f) প্রয়োগযোগ্যতা (serviceability)

(g) গ্রহণযোগ্যতা (acceptability)

(h) পরিবেশমিত্রতা (eco-friendliness) এবং

(i) সীমাবদ্ধতা বা অস্থিতিস্থাপকতা (limitation or inaccessibility)

আমরা এই এককে এ বিষয়টি প্রতিপাদিত করে বুঝতে চেষ্টা করব।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি

- সম্পদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানার প্রয়োজনীয়তা কী তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- এছাড়া সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্ব অর্থাৎ কী কী বৈশিষ্ট্য থাকলে আমরা সম্পদ বলে উল্লেখ করতে পারব, তা নির্ধারণ করতে পারবেন।

2.2 সম্পদের বৈশিষ্ট্য

আমরা প্রস্তাবনাতেই বলেছি যে বস্তুমাত্রই সম্পদ নয়। কোন বস্তুকে সম্পদ বলে পরিগণিত হতে গেলে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলি থাকতে হবে।

1. উপযোগিতা বা অভাবমোচনের ক্ষমতা ঃ অর্থশাস্ত্রে (Economics) উপযোগিতা বলতে অভাবমোচনের ক্ষমতাকে বোঝায়। যে বস্তু বা পদার্থের অভাবমোচনের ক্ষমতা আছে, তাকে সম্পদ বলে। আর যে সব বস্তুর এই ক্ষমতা নেই অর্থাৎ উপযোগিতা নেই, তাদের সম্পদে হিসেবে গণ্য করা চলে না। জেমস্ ওয়াট কর্তৃক বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত কয়লা মাটিতে লুক্কায়িত অবস্থায় ছিল। কিন্তু বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর থেকে কয়লার ব্যবহার শুরু হল। আধুনিক যুগে কয়লা ছাড়া মানুষের চলে না। কেবলমাত্র বস্তুগত পদার্থই নয়, মানুষের কায়িক শ্রম, চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিমত্তা, শিল্প প্রভৃতি ব্যক্তি ও সমষ্টির অভাব মেটায় বলে সেগুলোও সম্পদ।

2. কার্যকারিতা ঃ সম্পদের দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য হল কার্যকারিতা, অর্থাৎ কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা, যেমন জল যা তৃষ্ণা নিবারণ করা ছাড়া ও পরিবহন এবং শিল্পে কাজে লাগে, জলের এই প্রকার কার্যকরী ভূমিকার দরুণ আমরা তাকে সম্পদ বলি।

3. ক্ষয়শীলতা ঃ সম্পদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ক্ষয়শীলতা। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ্ স্যামুয়েলসন-এর মতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কার আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের অনেক বস্তুকেই অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে। যেমন চটের বস্তা ও থলির স্থান নিয়েছে কাগজ, প্লাস্টিক ও নাইলনের ব্যাগ, প্রাকৃতিক রবারের বদলে ব্যবহার করা হচ্ছে কৃত্রিম রবার, সূতীর কাপড়ের স্থান নিয়েছেথ টেরিলিন, টেরিকট ও সিন্থেটিক শাড়ি।

4. সুগম্যতা বা আহরণ যোগ্যতা ঃ আমরা জানি ব্যবহারের উপযোগী অবস্থায় কোন বস্তুকে পেলে

তবেই তা দামী হয়ে ওঠে। হিমালয় অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাকে ব্যবহার করা যায় নি, কারণ হল দুর্গমতা। অনুরূপভাবে হিমালয় পার্বত্য এলাকার কাঠ ও খনিজ সম্পদকে পরিবহণের অসুবিধের দরুণ ঐ সব বস্তুকে ঠিকমত ব্যবহার করা যায় না। দুর্গম অঞ্চল থেকে খনিজ সম্পদ আহরণও বেশ ব্যয়বহুল। পক্ষান্তরে, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার দৌলতে দামোদর উপত্যকার কয়লা ও ছোটনাগপুরের বিভিন্ন খনিজ সম্পদের সমাবেশে পশ্চিমবঙ্গ-বিহার সীমান্তে শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে। কিন্তু এখানেই কিছু গ্রাম আছে যেগুলো তিনদিক দিয়েই নদী দিয়ে ঘেরা। সেখানকার নদীর চলে প্রচুর তরমুজ জন্মায়, আবার দুগ্ধজাত দ্রব্যও সুলভে মেলে অথচ যোগাযোগের অসুবিধের দরুণ ওই সব সামগ্রী সেখানকার অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে না বললেই চলে।

5. সার্বজনীন চাহিদা ঃ তাকেই সম্পদ বলা হবে যার সার্বজনীন চাহিদা আছে। কথাটিকে একটু ঘুরিয়ে বললে বলতে হয় যে সব বস্তুর ব্যাপক চাহিদা আছে, তাকে সম্পদ বলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় কোনও ব্যক্তিগত চাহিদা বস্তুকে সম্পদে পরিবর্তিত করতে পারে না, যেমন চা, কফি মানুষের ব্যক্তিকেন্দ্রিক চাহিদা, কিন্তু সূর্যালোক, বাতাস, জল ইত্যাদি সার্বজনীন চাহিদা।

6. প্রয়োগযোগ্যতা ঃ যে বস্তু যত বেশী পরিমাণে ব্যবহার হবে অর্থাৎ যে দ্রব্য যত বেশী পরিমাণে মানুষের অভাবমোচন করতে পারবে সেই দ্রব্যের উৎপাদনও তত বেড়ে যাবে ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদে পরিণত হবে। যেমন খনিজ তেল, লোহা, কয়লা ইত্যাদি। তাই বলা চলে উৎপাদনমুখীতা হল সম্পদের একটি বিশেষ গুণ।

7. গ্রহণযোগ্যতা ঃ সম্পদ সকলেরই দরকার। যেমন চিরাচরিত শক্তির উৎস হিসেবে কয়লা; অচিরাচরিত শক্তির জন্য সৌরশক্তি একটি গ্রহণীয় সম্পদ।

8. পরিবেশমিত্রতা ঃ সম্পদ শুধুমাত্র ব্যবহার করলেই চলবে না। লক্ষ্য করতে হবে তার কাজ যেন পরিবেশকে বিষাক্ত না করতে পারে যেমন সৌরশক্তি পরিবেশমিত্র সম্পদ, কারণ পরিবেশের ওপর তার কোন প্রতিক্রিয়া পড়ে না। জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে না, কিন্তু তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনকালে যে ছাই বেরিয়ে আসে, তা আশেপাশে এলাকার ওপর এসে জমে ও সবশেষে জমিকে বন্ধ্যা করে তোলে। তাই পরিবেশ মিত্রতার স্বার্থ ও সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে যুক্তিযুক্ত ব্যবহার করে সম্পদের স্থায়িত্ব বাড়ানো উচিত।

9. সীমাবদ্ধতা ঃ সম্পদের যোগান সীমাহীন, বলতে গেলে প্রকৃতির দান হিসেবে তা একরকম নির্দিষ্ট। চাইলেই এদের যোগান বাড়ানো যায় না বলে সম্পদ অস্থিতিস্থাপক। মালথাস, অ্যাডাম স্মিথ, আলফ্রেড মার্শাল মেডোস, অসবোর্ন ইত্যাদি অর্থনীতিবিদ্রা সম্পদকে সীমাবদ্ধ মনে করেন। মেডোস তো “Limits to

growth”—তে কয়েকটি সম্পদের আয়ুকাল নিয়ে এক বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন। অধ্যাপক অসবোর্ন-এর মতে সম্পদের ক্রমবর্ধমান দুষ্প্রাপ্যতা উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

2.3 সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্ব (Functional theory of Resources)

প্রকৃতিদত্ত সামগ্রীকে নিজের প্রয়োজন-উপযোগী করে নেবার মানবিক প্রয়াস সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য। যে বস্তুর কোন কার্যকরী গুণ নেই, যাকে ব্যবহার করলেও কাজ পাওয়া যায় না, যার চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা নেই, তা সম্পদ নয়। জিম্যারম্যান (1933)-র আগে Mitchell (মিচেল), Marshall (মার্শাল), Bowman (বাওম্যান) প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ সম্পদের কার্যকারিতার বিষয়টি উল্লেখ করেন। তবে জিমারম্যানই সর্বপ্রথম সম্পদের কার্যকারিতাকে তত্ত্বের আকারে প্রকাশ করেন (1933)। তাঁর এই তত্ত্বে কোন বস্তুকে শুধুমাত্র কিছু ভৌত (Physical) ও রাসায়নিক গুণাবলীর সমষ্টি হিসেবে দেখানো হয় না। সম্পদ হতে গেলে ঐ বস্তুর উপযোগিতা থাকা দরকার। পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা (economic depression) মানুষকে শুধুমাত্র সম্পদ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছে তাই নয়, এই মন্দা কাটিয়ে ওঠার জন্য মানুষ বিজ্ঞান, প্রযুক্তির সাহায্যে কীভাবে আরও বেশি করে কাজে লাগানো যায় তা খুঁজতে উৎসাহী হয়েছে। আর এই আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে জিমারম্যান কোন বস্তুর কাজ করার ক্ষমতাকে সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্বে বিশ্লেষণ করেছেন।

কার্যকারিতা তত্ত্বের মূল কথা হল ঃ

1. পদার্থের কার্যকরী শক্তির সম্পদ।
2. সংস্কৃতির কার্যকরী ক্ষমতাও সম্পদ।
3. সংস্কৃতির কার্যকারিতা সম্পদের উপযোগিতা বাড়ায়।
4. কার্যকারিতা আছে বলে সম্পদের পরিধি ব্যাপক।
5. চাহিদা সম্পদের কার্যকারিতা বাড়ায়।

6. প্রশাসনিক দক্ষতা সম্পদের কার্যকারিতা বাড়ায়।

7. কার্যকারিতার সাপেক্ষে সম্পদ গতিশীল প্রকৃতির।

8. আর্থ-সামাজিক আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পদের কার্যকারিতার অনুঘটক।

1. **পদার্থের কার্যকরী শক্তিই সম্পদ ঃ** সম্পদের কার্যকারিতা বস্তু, অবস্তু এবং তাদের কর্ম সম্পাদনের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল। নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে এই সম্পর্ক দেখানো হল —

বস্তু + কার্যকারিতা = সম্পদ (কয়লা)

অবস্তু + কার্যকারিতা = সম্পদ সমাজব্যবস্থা

কার্যকারিতাহীন বস্তু = সম্পদ নয় (মরুভূমি)

কার্যকারিতাহীন অবস্তু = সম্পদ নয় (কুসংস্কার)

সম্পদ – কার্যকারিতা = সম্পদ নয় (অনুর্বর জমি)

2. **সংস্কৃতির কার্যকরী ক্ষমতা ও সম্পদ ঃ** প্রকৃতিদত্ত বস্তুকে মানুষ তার উন্নত জ্ঞানভাণ্ডার তথা উদ্ভাবিত সাংস্কৃতিক সম্পদের সহায়তায় কার্যকারি করে সম্পদ তৈরি করছে বা কোন পদার্থকে তার দরকার মেটাবার মত তৈরী করে নিচ্ছে। It is technology which gives value to the stuff which it processes; and as the useful arts advance the gifts of nature are remade (Hamilton, W.H., Control of strategic materials (an article), অর্থাৎ হ্যামিলটনের মতে প্রযুক্তি বস্তুকে মূল্যদান করে ও পরিবর্তন প্রক্রিয়া চালু রাখে। এভাবে কলাকুশলতার যত উন্নতি হয়, প্রকৃতির দান তত পুনর্নির্মিত (remade) হয়। Zimmerman-র মতে "Resources are dynamic not only in response to increased knowledge, imporved arts, expanding science, but also in response to changing individual wants and objectives" অর্থাৎ সম্পদ গতিশীল। এই গতিশীলতা সৃষ্টি হয় মানুষের পরিবর্তিত অভাব ও সামাজিক উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, শুধুমাত্র জ্ঞান, উন্নত কলাকৌশল ও সম্প্রসারণশীল বিজ্ঞানের জন্য নয়, এই বিচারে সংস্কৃতির কার্যকরী ক্ষমতাও সম্পদ।

3. **সংস্কৃতির কার্যকারিতা সম্পদের উপযোগিতা বাড়ায় ঃ** মানুষের অভাব মেটানো কার্যকলাপের সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছে প্রকৃতি। প্রকৃতির দানের মধ্যেই তাকে কাজ করতে হয়। নতুন করে কোন পদার্থ সৃষ্টি করার সাধ্য তার নেই। প্রকৃতি যে সব জিনিষ মানুষকে দিয়েছে, সেগুলোকেই ঘষে মেজে নিত্য নতুন প্রয়োজনের উপযোগী করে তৈরী করে নিয়ে ক্রমবর্ধমান অভাব মেটানোর ব্যবস্থা করতে হয়। আর এই

অভাব মেটাতে গিয়েই বস্তুর কার্যকারিতা সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ ঘটে। নীচের চিত্রের সাহায্যে জিমারম্যান উন্নত সমাজব্যবস্থায় সম্পদ সৃষ্টির প্রয়োজনে মানুষ, সংস্কৃতি ও প্রকৃতির সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন।

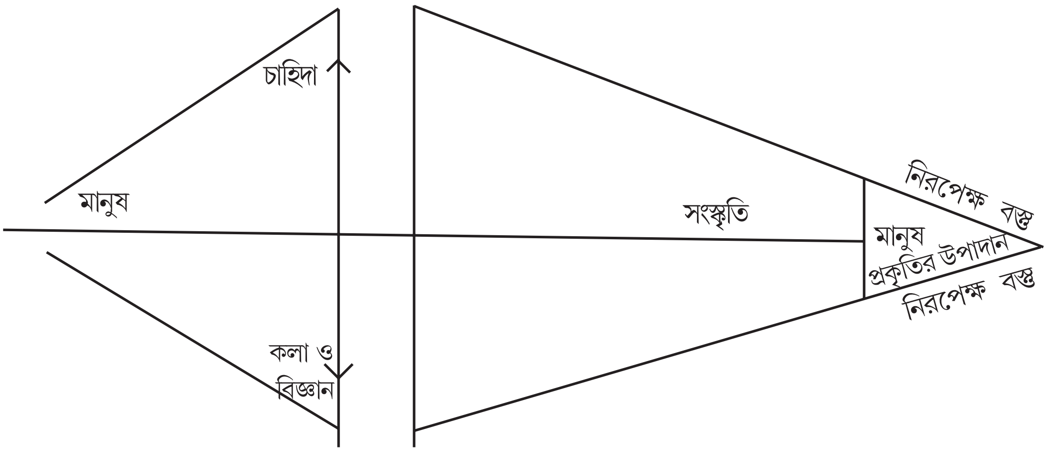

চিত্র — জিমারম্যান এর মতানুসারে নিরপেক্ষ বস্তু থেকে সম্পদ সৃষ্টির প্রক্রিয়া

4. **কার্যকারিতা আছে বলে সম্পদের পরিধি ব্যাপক ঃ** সম্পদের কোনও নির্দিষ্ট পরিধি নেই। ব্যবহারযোগ্যতা অনুযায়ী সম্পদের পরিধি বাড়ে, আবার কমেও। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। আজ থেকে একশ বছর আগেও খনিজ তৈলকে কেবলমাত্র জ্বালানী শক্তিরূপে ব্যবহার করা হত। বর্তমানে ঐ তেলকে নানাবিধ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমান যুগ পেট্রো-রাসায়নিক শিল্পের যুগ। পেট্রোলিয়াম থেকে নানাবিধ সামগ্রী তৈরী হচ্ছে। কৃত্রিম তন্তু, রান্নার গ্যাস, প্লাস্টিক, কীটনাশক, প্রশাধন ইত্যাদি কত কী—বলা যেতে পারে পেট্রোলিয়ামের কার্যকারিতা বেড়েছে। আমাদের দেশে এখনও পলিথিন, প্লাস্টিকের ঠোঙা, প্যাকেট ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু মাটিতে মিশে যায় না বা সহজে পচে না বলে বিদেশে বহুদিন এগুলোর ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে। পরিবর্তে চটের ব্যাগ, থলে, কাগজের ঠোঙার ব্যবহার বেড়েছে। অর্থাৎ পলিথিন, প্লাস্টিকের ব্যবহার কমেছে। পরিবর্তে পুরনো সামগ্রী অর্থাৎ কাগজ, চটের ব্যবহার পুনরায় বেড়েছে।

5. **চাহিদা সম্পদের কার্যকারিতা বাড়ায় ঃ** মানুষের তিনটি মৌলিক চাহিদা হল খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়। মানুষের প্রাথমিক অবস্থায় এগুলোর চাহিদা ছিল সামান্যই। কিন্তু সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে এগুলোর চাহিদাও বাড়ল। শুধু তাই নয়, এগুলো ব্যবহারেও বৈচিত্র্য এসেছে। নীচে চিত্রের সাহায্যে মানুষের চাহিদার বিবর্তন দেখানো হলে।

১। সাংস্কৃতিক উন্মেষের আগে চাহিদা ঃ

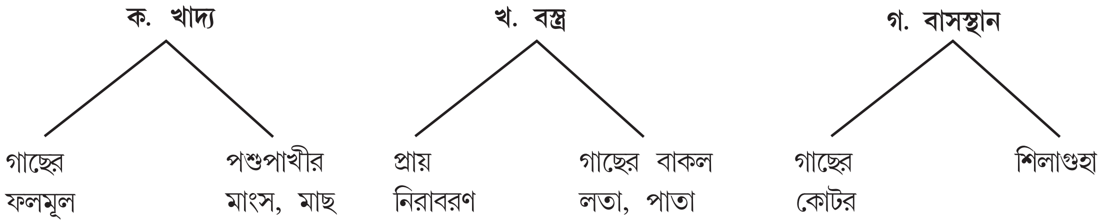

২। সাংস্কৃতিক উন্মেষের পরে চাহিদা ঃ

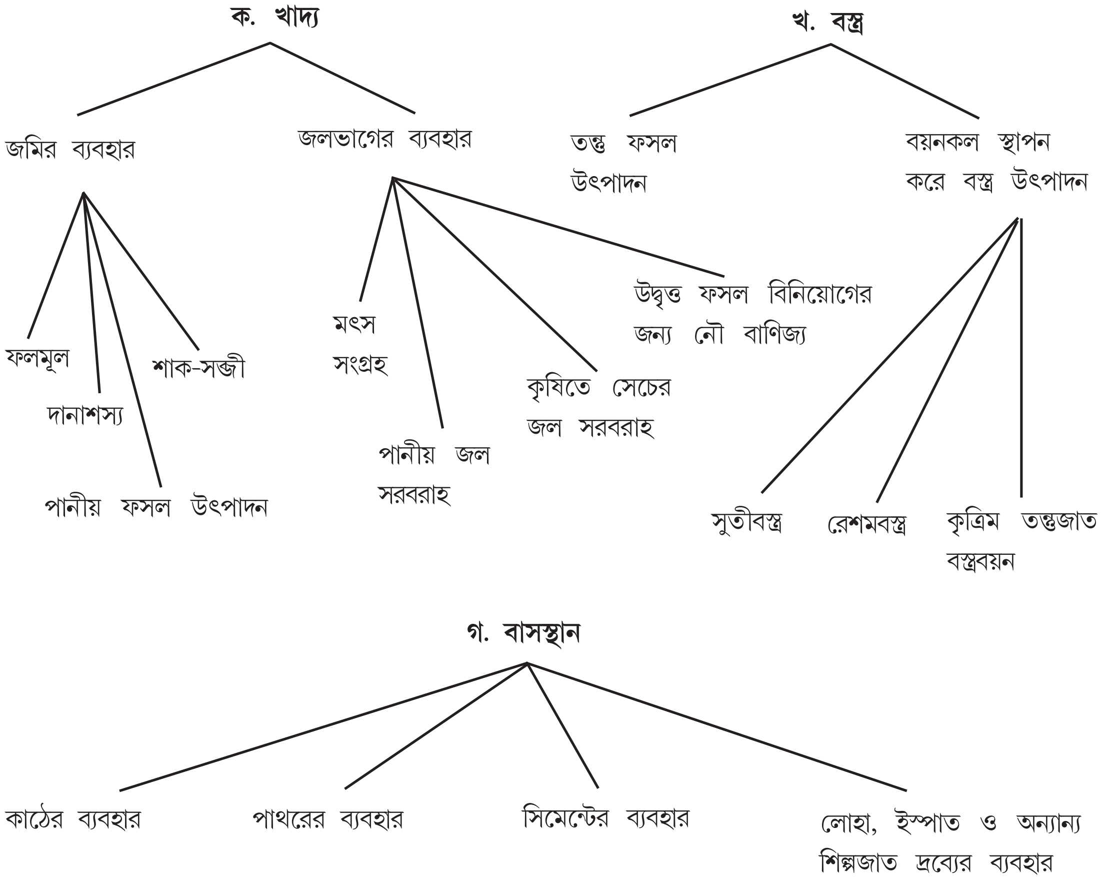

6. **প্রশাসনিক দক্ষতা সম্পদের কার্যকারিতা বাড়ায় ঃ** প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা ও সদিচ্ছা সম্পদের কার্যকারিতা বাড়ায়। ইংরেজ আমলে ভারতে বার্ষিক মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল মাত্র 20 (বিশ) টাকা। 1997-98 সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 237 (দুশো সাঁইত্রিশ) টাকা। এই বৃদ্ধি সম্ভবপর হয়েছে স্বাধীন ভারতের জনকল্যাণমুখী

সরকারী নীতি ও প্রশাসনিক সদিচ্ছার দরুণ। ইংরেজরা এদেশকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল। এদেশে শিল্প স্থাপন ও কৃষির উন্নতি কোনটিতেই তাদের উৎসাহ ছিল না। বর্তমানে ভারত কৃষিক্ষেত্রে স্বনির্ভর, শিল্পক্ষেত্রেও প্রায় 5 শতাংশ উন্নতির হার বজায় রেখেছে।

7. **কার্যকারিতার সাপেক্ষে সম্পদ গতিশীল প্রকৃতির ঃ** অরণ্য দূষিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে ও বিশুদ্ধ অক্সিজেন বাতাসে ছেড়ে বায়ুমণ্ডলের ভারসাম্য রক্ষা করে। গাছের পাতা থেকে বাষ্পীভবনের ফলে বনভূমির বাতাস আর্দ্র হয়। বনভূমি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়ায়। বনভূমির আবরণ থাকলে মাটির উপরিভাগ সহজে জলে ধুয়ে যায় না। কিন্তু এই বনভূমিকেই নির্বিচারে কাটার ফলে আমরা উপরোক্ত সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত তো হই, উপরন্তু নিজেদের বিপদ নিজেরা ডেকে আনি। আজ মানুষের অদূরদর্শিতা ও তাৎক্ষণিক লোভ বনভূমিকে বিধ্বস্ত করে চলেছে। ফলে বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে। U.N.O.-র প্রকাশিত World Resources (1998-99)-র বিভিন্ন ছত্রে এই ভয়ঙ্কর সমস্যার কথা উল্লেখিত হয়েছে। বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর পরিমাণ বাড়লে শুধুমাত্র যে তাপ বেড়ে চলে, তাই নয়, মেরু অঞ্চলে জমে থাকা হিমবাহও বেশি করে গলতে শুরু করবে, উপকূলবর্তী নীচু জায়গাও ডুবে যাবে অন্যদিকে বনভূমি ধ্বংস হবার ফলে বৃষ্টির পরিমাণ কমে গেছে, আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটবে। আজ থেকে 40 বছর আগেও শিলিগুড়িতে দুটো ঋতু ছিল—বর্ষা ও শীত। ইদানীং নির্দিষ্ট সময় ছাড়া বর্ষার দেখা মেলে না। এর কারণই হল বনভূমির ব্যাপক ধ্বংস। অপরপক্ষে, দার্জিলিং হিমালয় অঞ্চলে ধ্বংসের প্রবণতাও বেড়েছে।

আবার আমরা দেখি যে আণবিক শক্তি থেকে যেমন কল্যাণমূলক কাজ পাওয়া যায়, তেমনি এই শক্তি ব্যবহার করে একটা গোটা দেশকেই ধ্বংস করে দেওয়া যায়। তাই সম্পদ হিসেবে বনভূমি বা আণবিক শক্তির প্রকৃতি পরিবর্তনশীল।

8. **আর্থ-সামাজিক আদর্শ, লক্ষ্য সম্পদের কার্যকারিতার অনুঘটক ঃ** 1955 সালে আমাদের দেশে বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন ছিল মাত্র 230 মিলিয়ান কিলোওয়াট, আর 1995-96 সালে তা বেড়ে দাঁড়াল 448 বিলিয়ান কিলোওয়াট। আবার অন্যত্র আমরা লক্ষ্য করেছি যে 1950-51 সালে ভারতে হেক্টর প্রতি চাল উৎপাদন ছিল 668 কেজি। 1990-91 সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল 1751 কেজি। একই পরিমাণ জমি থেকে আগে যে ফসল উৎপন্ন হত, বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নের প্রচেষ্টা নেওয়ায় বর্তমানে তার অপেক্ষা অনেক বেশী ফসল উৎপন্ন হচ্ছে। মানুষের আর্থ-সামাজিক আদর্শ ও লক্ষ্য যে সম্পদের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট কর্মদ্যোগে জাতীয় কার্যকারিতা বৃদ্ধির জ্বলন্ত নিদর্শন।

সম্পদ কার্যকারিতা তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য হল —

A. **আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য** (Regional specialisation) ঃ অঞ্চলভেদে সম্পদ সৃষ্টির প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন। পৃথিবীর সবখানে প্রাকৃতিক ভিত্তিভূমি এক নয়, সংস্কৃতিও একই প্রকার নয়। এজন্য এক একটি অঞ্চলে সম্পদ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় একটা নিজস্ব আঞ্চলিকতার ছোঁয়া পাওয়া যায়।

B. **নিত্য বহমানতা** (Free-flowness) ঃ সম্পদ সৃষ্টি ধারা নিত্য প্রবহমান। এর কোনও শব্দ নেই। মানুষের অভাবের (wants) যেমন সীমা-পরিসীমা নেই, তেমনি তা বেড়েই চলে। এজন্য মানুষ তার জ্ঞান, কার্যকারী দক্ষতা প্রয়োগ করে সম্পদের ভাণ্ডার ভরে তুলছে। সংস্কৃতির উচ্চস্তরে একটির পর একটি সম্পদ সৃষ্টি হয়েই চলেছে। অভাব মোচনের সাথে সাথে নিত্য নতুন অভাব সৃষ্টি হচ্ছে। একটি সম্পদ তৈরীর পরে আবার নতুন সম্পদ সৃষ্টির পালা শুরু হচ্ছে। মানুষের অভাব ও জ্ঞানই তার এই চিরন্তন সম্পদ সৃষ্টির পেছনে কাজ করছে।

C. **নিরপেক্ষা বস্তুকে সম্পদে রূপান্তর ও সম্পদের বিনাশ ঃ** মানুষ চিরন্তন প্রকৃতির নিরপেক্ষ সামগ্রীকে সম্পদে রূপান্তরিত করে চলেছে। আবার কখনও কখনও সম্পদের ব্যবহারযোগ্যতা ও উপযোগিতা কমে গিয়ে সেগুলো নিরপেক্ষ দ্রব্যে পরিণত হচ্ছে। প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ভেঙে যেমন সম্পদ সৃষ্টি হয়ে চলেছে তেমনি এর জন্য বহু বাধানিষেধও লঙ্ঘন করতে হচ্ছে। সম্পদ হিসেবে উপযোগিতা নষ্ট হয়ে গেলে সেগুলো আর অভাবমোচনের উপযোগী থাকে না। অকেজো, নিরপেক্ষ বস্তুতে পরিণত হয়। রাসায়নিক নীল (dye) তৈরী হওয়ার পর থেকে নীলের (indigo) চাষ উঠে গেছে। পাটের বিভিন্ন পরিবর্ত দ্রব্য (substitute) চালু হবার পর থেকে পাট চাষে মন্দা দেখা দিয়েছে।

আবার মানুষের অদূরদর্শিতা, অপব্যবহার, যুদ্ধবিগ্রহ সম্পদের বিনাশ ঘটায়। আমাদের দৈনিক জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু জল দিয়েই শুরু করা যাক। আধুনিক পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল জলের অভাব। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রচুর পরিমাণে জল নিয়ে ব্যবহার করার ফলে বিভিন্ন সমস্যা ক্রমশঃ তীব্র হয়ে উঠেছে। এতদিন প্রকৃতির মুক্ত দান মুক্ত সম্পদরূপে গণ্য করে মানুষ অবাধে জলের ব্যবহার করে এসেছে। ফলে গত দুই দশকে জলের পরিমাণ ও গুণাগুণ দুইই ক্রমশঃ ক্ষয় হয়েছে।

অরণ্যের ক্ষেত্রেও দেখি গোড়ায় সম্ভবতঃ স্থলভাগের $^1/_4$ ভাগ বনভূমি ছিল, কিন্তু নির্বিচারে বনভূমি কাটার ফলে বর্তমানে তো 15%-এ দাঁড়িয়েছে। F.A.O.-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী 1976 সালে পৃথিবীতে

মোট বনভূমির আয়তন ছিল 423 কোটি হেক্টর, বর্তমানে (1992) তা দাঁড়িয়েছে 386 কোটি হেক্টরে। এসবই ঘটছে মানুষের সম্পদের অপব্যবহারের ফলে। যুদ্ধও সম্পদের বিনাশ ঘটায়। এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রচুর মানব সম্পদের ধ্বংসের কথা স্বভাবতই এসে পড়ে।

D. **প্রাকৃতিক দ্রব্যের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ঃ** সম্পদ হিসাবে একটি বিশেষ দ্রব্যের ব্যবহারিক মূল্য সবসময় বদলাচ্ছে। আগে হয়ত কোন বস্তু একরকমভাবে ব্যবহৃত হত, আজ বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সাথে সাথে তা থেকে বিবিধ দ্রব্য উৎপাদিত হচ্ছে। যেমন একসময় খনিজ তেল শুধুমাত্র জ্বালানী হিসেবেই ব্যবহৃত হত, বর্তমানে পেট্রো-রাসায়নিক শিল্পের দৌলতে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী প্রস্তুত হচ্ছে, যেমন পলিমার, ন্যাপথা, ভেজলিন ইত্যাদি। অনুরূপভাবে কয়লারও কার্যকারিতা বেড়েছে। আজ থেকে 50 বছর আগেও 7 টন কয়লার যে কার্যকারিতা ছিল, এখন মাত্র 1 টন কয়লাতেই সেই পরিমাণ কাজ হচ্ছে।

E. **বর্তমানে দ্রুত ও ব্যাপকভাবে সম্পদ সৃষ্টি ঃ** সংস্কৃতির ক্রমাগত উন্নতির ফলে এখন অপ্রাণীজ শক্তি ও যন্ত্রের ব্যবহার বহুলাংশে বেড়েছে। তাই সম্পদ সৃষ্টির হার বর্তমান যুগে দ্রুততালে ঘটছে। কেবলমাত্র তাই নয়, জলে-স্থলে-আকাশে মানুষ সম্পদের খোঁজ চালাচ্ছে। তাই সম্পদ সৃষ্টির হার কেবল দ্রুত হয় নি, তা ব্যাপকভাবে বেড়েছেও।

অনুশীলনী - 1

(i) সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

(ii) সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্ব বলতে কি বোঝেন?

2.4 সম্পদের কার্যকারিতার বিবর্তন

সম্পদের কার্যকারিতাকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়—

1. মানুষের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে সম্পদ অর্জন

2. মানুষের কায়িক প্রচেষ্টায় সম্পদ সৃষ্টি

3. মানুষের কায়িক ও সংস্কৃতিক চেষ্টায় সম্পদ সৃষ্টি

4. এছাড়া রয়েছে শোষণ পর্যায়।

প্রথম পর্যায়ে মানুষ প্রকৃতির মুক্তদানে জল, বায়ু, সূর্যালোক গ্রহণ করে জীবনধারণ করে। এই পর্যায় বা পর্বে যখন সম্পদ মুক্ত অবস্থায় রয়েছে তখন সম্পদের কার্যকারিতা সব মানুষের কাছে সমান অর্থাৎ বড়লোক, গরীবলোক—সবার কাছে সূর্যকিরণ, বায়ু, বেঁচে থাকার পক্ষে অত্যাবশ্যক বস্তু। সর্বত্রপ্রাপ্ত এই সব বস্তুগুলো পেতে মানুষকে আলাদাভাবে কোন পরিশ্রম করতে হয় না। যেমন নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারা বছর ধরেই তাপমাত্রা 26° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি থাকে। সারা বছর সেখানে বৃষ্টি হয়। কিন্তু মাটি ভিজে, স্যাঁতসেঁতে

থাকায় ফসল ভালো হয় না, যদিও সেখানকার জলবায়ু উদ্ভিদ বিকাশের পক্ষে উপযোগী। কিন্তু মেরু অঞ্চলে একটানা ছ'মাস দিনের পর টানা ছ'মাস রাত্রি চলবে। তাপমাত্রা উদ্ভিদ বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়। তাছাড়া মাটি বরফে ঢাকা থাকায় সেখানে কৃষিকাজ করা সম্ভবপর নয়। এক্ষেত্রে মানুষ ইচ্ছে করলেই প্রকৃতিকে পাল্টাতে পারে না।

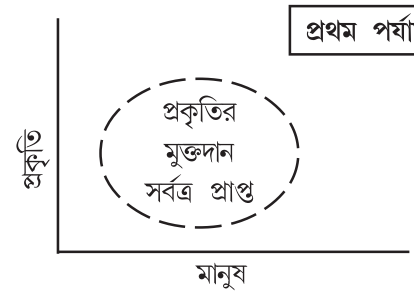

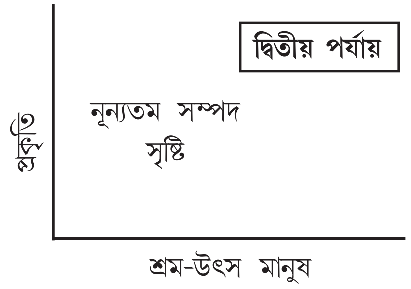

দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষ কেবল কায়িক পরিশ্রমে সম্পদ সংগ্রহ করে। যে মানুষ যত বেশী পরিশ্রম করতে পারে, সে তত বেশী সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে। তার আয়ও তত বেশী হয়। পক্ষান্তরে কর্মবিমুখ অলস প্রকৃতির মানুষের আর্থিক উন্নতি হয় না। এই পর্বে ন্যূনতম সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল মানুষ জীবন নির্বাহ করে। কারণ খনি থেকে অনেক শ্রম করে কয়লা সংগ্রহ করা যেতে পারে, কিন্তু কয়লা থেকে গ্যাস, পিচ, আলকাতরা পেতে গেলে মানুষকে কারিগরীজ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। নয়তো কায়িক পরিশ্রমের সাহায্যে পাওয়া ন্যূনতম সম্পদ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

উপরোক্ত দুই পর্বের মধ্যে তফাৎ এইটুকুই যে প্রথমটিতে মানুষের কোন ভূমিকাই নেই, প্রকৃতিই সব। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষ তার কায়িক পরিশ্রমের ফল ভোগ করে। প্রকৃতি থেকে পাওয়া বস্তুকে সে পরিশ্রমের মাধ্যমে কাজে লাগাচ্ছে।

উদাহরণ ঃ

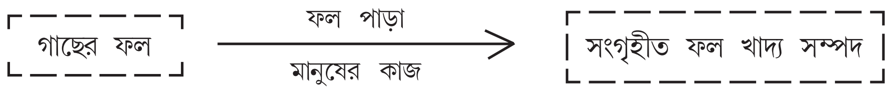

তৃতীয় পর্যায়ে কারিগরী দক্ষতা তথা প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা অর্জন করে মানুষ প্রকৃতি থেকে উপকরণ আহরণের দিকে অনেকটাই এগিয়ে যায়। প্রয়োজনমত ঐ উপকরণকে পরিবর্তন করে নতুন নতুন সম্পদ সৃষ্টি করে। একসময় সম্পদ উৎপাদন হয় সর্বাধিক। সম্পদের কার্যকারিতা এই পর্বে সবচেয়ে বেশী হয়। মানব-সংস্কৃতি এই পর্বে সবচেয়ে বেশি উন্নতি লাভ করে বলে মানুষ তার আর্থ-সামাজিক উন্নতির শীর্ষে পৌঁছায়।

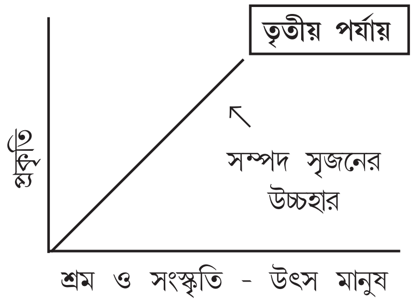

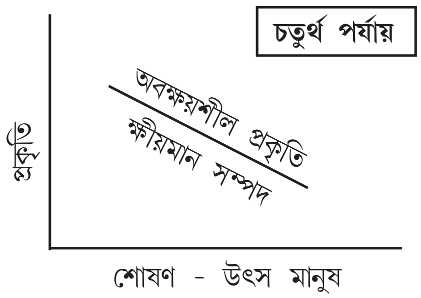

চতুর্থ পর্বে লোকসংখ্যা যত বাড়বে, প্রকৃতি ততই সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। এতে কেবলমাত্র সম্পদের হ্রাস ঘটে না। সম্পদকে শোষণ করার ফলে বিভিন্ন সমস্যা দেখা যায়। বায়ুমণ্ডলে দূষণের মাত্রা বাড়ে, জল দূষিত হয়। এমন কি, ওজন স্তর ozone layer ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ফলে সূর্যরশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব মানুষের ওপরে পরে। সামগ্রিকভাবে পরিবেশের অবনমন (environmental degradation) ঘটে। এমন কি, মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

2.5 সম্পদের কার্যকারিতার নিয়ন্ত্রক

সম্পদের কার্যকারিতা চারটি বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়, যেমন চাহিদা, প্রযুক্তি, সময় ও স্থান। নীচে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হল—

চাহিদা ঃ মানুষের অভাব বা চাহিদা দু'ধরণের—1. ন্যূনতম চাহিদা যথা, খাবার, পোযাক, মাথা গোঁজার ঠাঁই, 2. সাংস্কৃতিক চাহিদা, যেমন, শিক্ষা, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পরিষেবা যেমন বিদ্যুৎ, ডাক ব্যবস্থা, টেলিফোন ব্যবস্থা ইত্যাদি।

মানুষ প্রথমাবস্থায় ছিল গুহাচারী। তার প্রয়োজন ছিল অতি সীমিত। বনের পশুপাখী মেরে সে পুড়িয়ে খেত, বনের ফলমূল আর ঝরনার জল তার ক্ষুধা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তারপর পাথরে পাথর ঘসে আগুন জ্বালতে শিখল। একদিন সে লক্ষ্য করল খাবার পর তার আশ্রয়স্থলের বাইরে যে সব অবশিষ্টাংশ ফেলেছিল, তা থেকে ছোট চারা গাছ বেরিয়েছে ও পরে তাতে ফল ধরেছে। এইভাবেই সে একদিন চাষবাস শিখল। ক্রমশঃ তার ভোগের চাহিদা বেড়ে চলল। কৃষি ও প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নতির ফলে তার জীবনযাত্রার পরিবর্তন আসল। ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে নিত্য নতুন সম্পদ উৎপাদন করার তাগিদ বাড়ল। তাই বলা চলে চাহিদা সম্পদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে অন্যতম নিয়ন্ত্রক।

প্রযুক্তি ঃ এটি সম্পদের কার্যকারিতা বৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে ভারতে 1950-51 সালে প্রতি হেক্টরে চালের উৎপাদন ছিল 668 কেজি, 1970-71 তা বেড়ে দাঁড়াল 1123 কেজিতে আর 1990-91 সালে তা হল 1751 কেজি। কৃষিতে এই ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি উচ্চফলনশীল বীজ, সার, জলসেচ, ট্রাক্টর, হারভেস্টার প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে। অনুরূপভাবে শিল্পক্ষেত্রেও যন্ত্রপাতির ব্যবহার উৎপাদন বাড়িয়েছে।

যেমন বিদ্যুতের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা উত্তর যুগে যথেষ্ট অগ্রগতি লক্ষিত হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (1959-64) এদেশে বিদ্যুতের উৎপাদন ছিল 34.2 লক্ষ কিলোওয়াট, 1969-74 সালে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তা বেড়ে দাঁড়াল 70 লক্ষ কিলোওয়াট, আর 1997 সালে এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াল 13952 মেগাওয়াট। ভারতে লোহা ও ইস্পাতের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি লক্ষণীয়। এদেশে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (1991-96) ইস্পাতের উৎপাদন লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছিল 70 লক্ষ টন, চতুর্থ পরিকল্পনায় 94.4 লক্ষ টন। 1997-98 সালে এদেশে 141.4 লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদিত হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতির মূলে রয়েছে প্রযুক্তির উৎকর্ষতা। এজন্য বলা হয় প্রযুক্তি সম্পদের কার্যকারিতা বৃদ্ধির একটা অঙ্গ।

সময় ঃ সময়ের সাথে সাথে কোন বস্তুর কার্যকারিতা বদলায়। অনেক সময় নিরপেক্ষ বস্তুও সম্পদে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে কয়লা, খনিজ তেলের কথা স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে জেমস ওয়াট (James Watt) কর্তৃক বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত কয়লার ব্যবহার এত ব্যাপক ছিল না। অনুরূপভাবে খনিজ তেলকে শুধুমাত্র জ্বালানীর কাজে লাগানো হত। পেট্রো-রাসায়নিক শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতির সাথে সাথে এর বহুমুখী ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। বলা যেতে পারে সময়ের সাথে সাথে মানুষের আর্থ-সামাজিক জগৎ-এ পরিবর্তন এসেছে।

স্থান ঃ সম্পদের ব্যবহার বহুক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থান দ্বারা প্রভাবিত হয়। একে কার্যকারিতার স্থানিক বৈশিষ্ট্য বলে। ভারতে হেক্টর প্রতি ধান উৎপাদন হল 2,600 কেজি। পক্ষান্তরে চীনে এই পরিমাণ হল 5,780 কেজি। উভয় দেশের মাটি উর্বর হলেও ভারত ও চীনের ধান উৎপাদনের মধ্যে হেরফেরের কারণ হল এই দুই দেশে কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারে তফাৎ। তাই একই সম্পদের (মাটি) উৎপাদন আলাদা। আবার, দ্বীপময় দেশ জাপান ও ইল্যান্ড শিল্পক্ষেত্রে উন্নত। অথচ, এই দুই দেশের লোহা-ইস্পাত উৎপাদন এক নয়। ইস্পাত উৎপাদনে জাপান পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানের (1998) অধিকারী (10.45 কোটি মেট্রিক টন) আর ইংল্যান্ড দ্বাদশ স্থানের (1.72 কোটি মেট্রিক টন)। তাই ভূমিভাগ একই হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদন সমান নয়। আরও বলতে হয় যে ইংল্যান্ড শিল্প বিপ্লবের পীঠস্থান হলেও ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে জাপান ইংল্যান্ডকে ছাপিয়ে গেছে।

2.6 সারাংশ

উপসংহারে বলা চলে যে সম্পদ সম্পর্কিত ধারণা একান্তভাবে কার্যকারিতা নির্ভর। সম্পদের কার্যকারিতা সম্পর্কে পুরোপুরি উদাসীন থেকে পৃথিবীর সব বস্তুকে সম্পদ বলে গণ্য করা এবং প্রাকৃতিক বস্তু ও পদার্থ ছাড়া অন্য কিছুকে সম্পদ মনে না করা এটা যুক্তিযুক্ত নয়।

সম্পদের যে গুণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান ও মানুষের প্রয়োজন মেটায় তাই-ই সম্পদের কার্যকারিতা। বাস্তবিকপক্ষে, কার্যকারিতাই সম্পদ। এজন্য জিমারম্যান বলেছেন সম্পদ সম্পর্কিত ধারণা একান্তভাবে কার্যকারিতা

নির্ভর, যা মানুষের চাহিদা ও যোগ্যতা বা ক্ষমতা থেকে অবিচ্ছেদ্য।

2.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1. সম্পদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? আলোচনা করুন।
2. সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্ব বিশ্লেষণ করুন।
3. সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্বে মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।
4. সম্পদের কার্যকারিতা বিবর্তন ধারণাটি পরিস্ফুট করুন।
5. সম্পদের কার্যকারিতা কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1. সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী কী?
2. পদার্থের কার্যকরী শক্তিই সম্পদ—ব্যাখ্যা করুন।
3. সংস্কৃতির কার্যকারিতা সম্পদের উপযোগিতা বাড়ায়—বিশ্লেষণ করুন।
4. চাহিদা সম্পদের কার্যকারিতা বাড়ায়—একথা কেন বলা হয়ে থাকে?
5. সম্পদ সম্পর্কিত ধারণা একান্তভাবে কার্যকারিতা-নির্ভর—ব্যাখ্যা করুন।

2.8 উত্তরমালা

অনুশীলনী - 1

1. 2.2 অংশ লক্ষ্য করুন।
2. 2.3 অংশ দেখুন।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

1. 2.2 অংশ দেখুন।
2. 2.3 অংশ দেখুন।
3. 2.3 অংশ লক্ষ্য করুন।
4. 2.4 অংশ দেখুন।
5. 2.5 অংশ দেখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1. 2.3 অংশ দেখুন।
2. 2.3 অংশ দেখুন।
3. 2.3 অংশের 3 নং দেখুন।
4. 2.3 অংশের 5 নং দেখুন।
5. 2.6 অংশের সারাংশ লক্ষ্য করুন।

একক 3 ❑ প্রকৃতি ও সম্পদ এবং সংস্কৃতি ও সম্পদ

গঠন

3.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

3.2 প্রকৃতির আপাত বিরোধী স্বভাব

3.2.1 প্রকৃতি বন্ধু ও শত্রু

3.2.2 প্রকৃতি কৃপণ ও মুক্তহস্ত

3.2.3 প্রকৃতি অপরিবর্তনীয় ও পরিবর্তনশীল

3.3 প্রাকৃতিক সম্পদ বন্টনে অসামঞ্জস্য

3.4 প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের নীতি

3.5 সংস্কৃতি ও মানুষ

3.5.1 সংস্কৃতি স্রষ্টা মানুষ

3.5.2 সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক ত্রুটিসমূহ

3.5.3 প্রকৃতির অনুকরণ

3.5.4 প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন

3.5.5 সমতার লক্ষ্যে সংস্কৃতি

3.5.6 সংস্কৃতি ও যন্ত্র

3.5.7 সংস্কৃতি ও কৃষি

3.5.8 সংস্কৃতির স্থানান্তর

3.6 সারাংশ

3.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

3.8 উত্তরমালা

2.1 প্রস্তাবনা

আমাদের চারপাশে যে স্থল, জল ও বায়ুমণ্ডল রয়েছে, যা অনাদি অনন্তকাল ধরে জীবজগতের জীবনধারণের প্রয়োজন মেটাচ্ছে, যা সীমাহীন বৈচিত্র্য নিয়ে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জীবনযাত্রার ধরণ ও তাদের পার্থিব অভিযোজনকে (physical adjustment) প্রভাবিত করে চলেছে, তাই হল প্রকৃতি (Nature)। জিম্মারম্যান কথাটিকে ঘুরিয়ে একটু অন্যভাবে বলেছেন, (Nature) "is non-man. It is the cosmos in so far as it is unaffected by man" অর্থাৎ মানুষের প্রভাবমুক্ত পার্থিব সব পদার্থ ও শক্তির সমন্বয়ে সৃষ্ট সব উপাদান ও তাদের কাজকর্মকে প্রকৃতি বলে। প্রকৃতি বলতে যেমন জল, মাটি, সমুদ্র-নদী-ঝর্ণা, বিবিধ উদ্ভিদ, পাখি, কীটপতঙ্গ ও বিভিন্ন প্রকার জীবকে বোঝায়।

প্রকৃতি হল সব সম্পদ সৃষ্টির মূলে। প্রকৃতি-প্রদত্ত সব পদার্থ থেকে মানুষ তার প্রয়োজনীয় উপাদান নিয়ে সম্পদ সৃষ্টি করে চলেছে যা তার নিজের ও সমাজের মঙ্গলসাধন করছে। প্রকৃতিতে এমন কিছু পদার্থ আছে যা সরাসরি মানুষকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করছে। এরকম কিছু পদার্থ হল অক্সিজেন, সূর্যের আলো, বাতাস, পানীয় জল। এককথায় বলা যেতে পারে যে এরা প্রত্যক্ষভাবে সম্পদ সৃষ্টিতে নিয়োজিত রয়েছে। এদের মুক্তদান (free-gift) সম্পদ বলা চলে। আবার কিছু কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ আছে যেগুলো মানুষ নিজ শ্রম ও বুদ্ধির দ্বারা সম্পদে রূপান্তরিত করে। যেমন খনিজ পদার্থ থেকে মানুষ শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করে। প্রকৃতি প্রদত্ত খরস্রোতা নদীকে কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করে চলেছে। প্রকৃতি প্রদত্ত ভূমিতে ফসল ফলাচ্ছে। এই ধরণের নির্বাচিত দান (selected gifts) তাই মানুষের কাছে খুব প্রয়োজনীয়। তবে প্রসঙ্গত বলতে হয় প্রথম দানটি অর্থাৎ মুক্তদান সবার জন্য। পৃথিবীর সব দেশেই তা জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ নির্বাচিত দান-এর ওপর সংস্কৃতি ও প্রযুক্তি বিদ্যায় উন্নত দেশগুলোর প্রভুত্ব লক্ষ্যণীয়।

সবশেষে উল্লেখ করতে হয় যে কিছু কিছু প্রাকৃতিক বস্তুর দান অসীম (infinite) বলে মনে হলেও প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ প্রকৃতির দান মানুষ বাড়াতে বা কমাতে পারে না। তবে কার্যকারিতা বাড়িয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান বাড়াতে পারে। এসব কাজ করতে গিয়ে প্রকৃতির জগতে কিছু কিছু পরিবর্তন আসে, যার প্রভাব পরিবেশের ওপর পড়ে। উন্নত সংস্কৃতিকে হাতিয়ার করে মানুষ প্রকৃতির জগতে পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে।

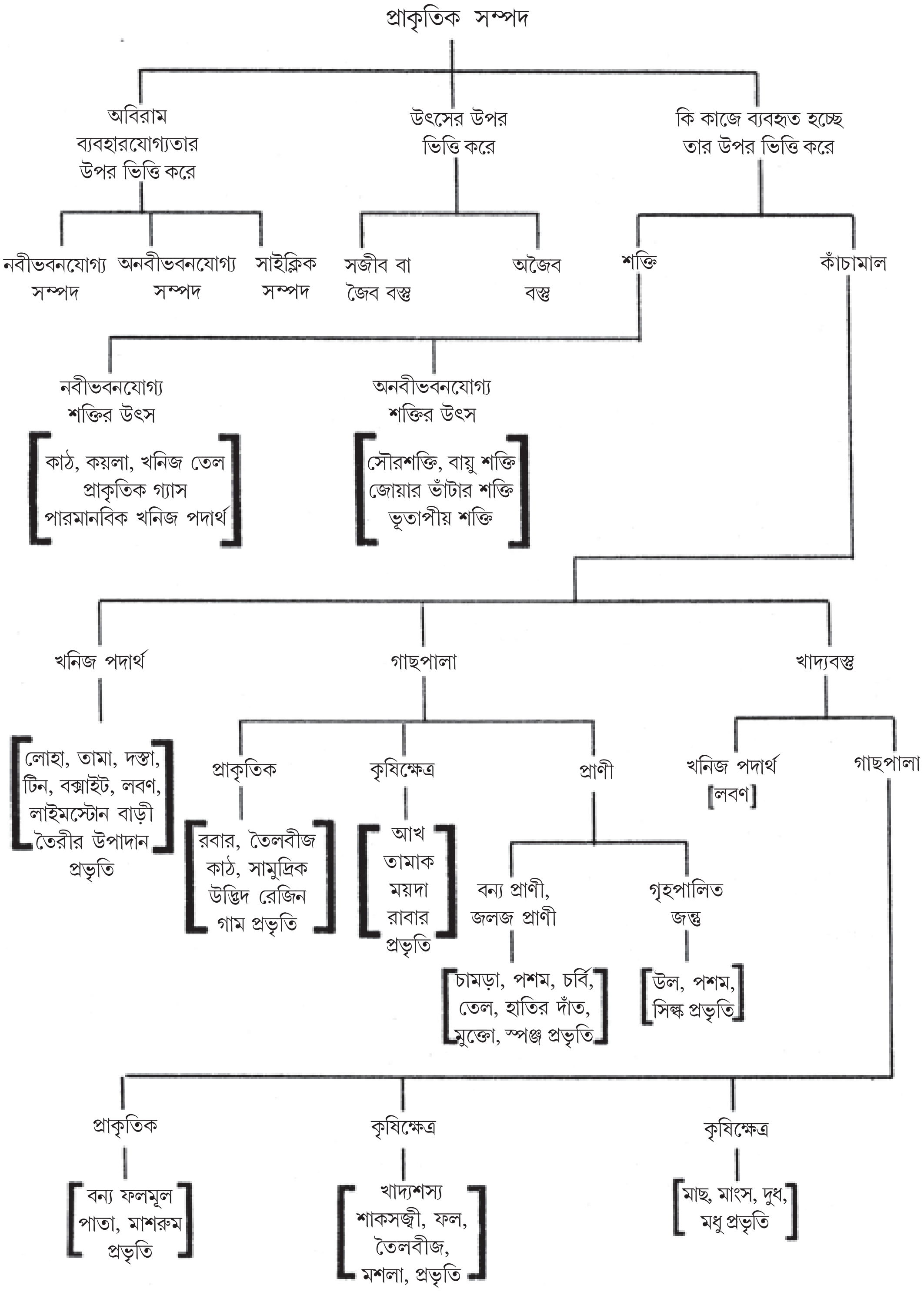
প্রাকৃতিক সম্পদ
অবিরাম ব্যবহারযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে
উৎসের উপর ভিত্তি করে
কি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে
নবীভবনযোগ্য সম্পদ
অনবীভবনযোগ্য সম্পদ
সাইক্লিক সম্পদ
সজীব বা জৈব বস্তু
অজৈব বস্তু
শক্তি
কাঁচামাল
নবীভবনযোগ্য শক্তির উৎস
কাঠ, কয়লা, খনিজ তেল প্রাকৃতিক গ্যাস পারমানবিক খনিজ পদার্থ
অনবীভবনযোগ্য শক্তির উৎস
সৌরশক্তি, বায়ু শক্তি জোয়ার ভাঁটার শক্তি ভূতাপীয় শক্তি
খনিজ পদার্থ
লোহা, তামা, দস্তা, টিন, বক্সাইট, লবণ, লাইমস্টোন বাড়ী তৈরীর উপাদান প্রভৃতি
গাছপালা
প্রাকৃতিক
রবার, তৈলবীজ কাঠ, সামুদ্রিক উদ্ভিদ রেজিন গাম প্রভৃতি
কৃষিক্ষেত্র
আখ তামাক ময়দা রাবার প্রভৃতি
প্রাণী
বন্য প্রাণী, জলজ প্রাণী
চামড়া, পশম, চর্বি, তেল, হাতির দাঁত, মুক্তো, স্পঞ্জ প্রভৃতি
গৃহপালিত জন্তু
উল, পশম, সিল্ক প্রভৃতি
খাদ্যবস্তু
খনিজ পদার্থ
[লবণ]
গাছপালা
প্রাকৃতিক
বন্য ফলমূল পাতা, মাশরুম প্রভৃতি
কৃষিক্ষেত্র
খাদ্যশস্য শাকসজ্বী, ফল, তৈলবীজ, মশলা, প্রভৃতি
কৃষিক্ষেত্র
মাছ, মাংস, দুধ, মধু প্রভৃতি

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- প্রকৃতি কী তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- প্রকৃতি কিভাবে সম্পদ সৃষ্টিতে সাহায্য করে চলেছে তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- প্রকৃতি থেকে সম্পদ আহরণ কি বাধাবন্ধনহীন না মানুষ অতি সহজেই প্রকৃতি থেকে সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সম্পদ আহরণ করতে গিয়ে মানুষের প্রকৃতির কী কী আপাতবিরোধী স্বভাবের সাথে পরিচয় হয়, তা বিশদ করতে পারবেন।
- মানুষ কীভাবে উন্নত সংস্কৃতির সাহায্যে প্রকৃতির ভয়াল-ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে সম্পদ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত রয়েছে তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- প্রকৃতির বিভিন্ন ত্রুটি দূর করতে সংস্কৃতির ভূমিকাই বা কি তা নির্ধারণ করতে পারবেন।
- কোন দেশ থেকে সংস্কৃতির স্থানান্তর কেন ঘটে থাকে এবং সংস্কৃতির স্থানান্তর সব সময়েই মঙ্গলজনক কিনা এইসব বিষয় আপনি বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

3.2 প্রকৃতির আপাতবিরোধী স্বভাব (Paradoxes of Nature)

প্রকৃতির সাহায্য ও সম্মতি নিয়ে এবং উন্নত সংস্কৃতি সহযোগে মানুষ সম্পদ সৃষ্টি করে। এই সৃষ্টি করতে গিয়ে মানুষ প্রকৃতির উদার হাতের দরাজ ছোঁয়া পায়, বলা যেতে পারে অনেকটা বিনা আয়াসেই সে প্রকৃতি থেকে সম্পদ আহরণ করে, আবার কোথাও কোথাও বাধার মুখোমুখি হয়। বলা যেতে পারে সম্পদ আহরণে সে যথষ্ট বেগ পায়। একাধারে স্থিতিশীল অন্যদিকে পরিবর্তনশীল। তাই বলা চলে বৈসাদৃশ্য প্রকৃতির এক স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীতে কোথাও শস্যশ্যামল প্রান্তর রয়েছে, কেথাও রয়েছে রুক্ষভূমি। গাঙ্গেয় সমভূমির পাশে অবস্থিত রাজস্থানের মরুভূমিকে আপাতদৃষ্টিতে বৈসাদৃশ্যই মনে হতে পারে। এই অসমতা মানুষের যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলীকে প্রভাবিত করে। মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নতির মাপকাঠিতে প্রকৃতির এই আপাত-বিরোধী স্বভাবের তীব্রতার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। অর্থাৎ কারিগরীজ্ঞানে যে দেশ যত উন্নত সেই দেশ প্রকৃতির ভয়াল ভ্রূকুটিতে ততটাই উপেক্ষা করতে পারবে। যুক্তরাষ্ট্র ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মধ্যে তুলনা করলেই এ সত্যটি ধরা পড়বে। তাই বলা চলে প্রাকৃতিক বৈপরীত্যের (Physical diversity) ধারণা স্থান ও কালভেদে আপেক্ষিক হবে।

প্রকৃতির আপাত-বিরোধী স্বভাব সাধারণত তিন প্রকার—(a) বন্ধু ও শত্রুভাবাপন্ন প্রকৃতি, (b) প্রাচুর্যময় ও কৃপণ প্রকৃতি, (c) স্থিতিশীল ও পরিবর্তনশীল প্রকৃতি।

3.2.1 প্রকৃতি, বন্ধু ও শত্রু (Neture, Friend and Foe)

প্রকৃতির এই দুই বিরোধী রূপকে Zimmermann নীচের এই লাইনগুলিতে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন, "So great are the blessings which nature bestows upon man that he is apt to forget, at times, the hardships she brings and the terrors she holds. The deadly cobra is no less natural than the honeybee or the nightingle, the destructive hurrieane no less natural than the useful trade wind, the tidal wave no less natural than the gentle rain that wets the good earth or the waterfall that drives the turbines" অর্থাৎ মানুষের ওপর প্রকৃতির এত আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে যে সময় সময় মানুষ তার বিভীষিকা ভুলে যায়। প্রকৃতিতে ভয়ানক কেউটে সাপ এবং মৌমাছি বা বুলবুল পাখি, ধ্বংসকারী হ্যারিকেন ঝড় ও প্রয়োজনীয় বাণিজ্যিক বায়ু, জোয়ার ভাটার ঢেউ ও মাটি ভেজানো হাল্কা বৃষ্টিপাত, বা টারবাইন ঘোরানো জলপ্রপাতের জল সবই স্বাভাবিক ব্যাপার, প্রকারান্তরে বলতে হয় প্রকৃতি কখনও মানুষের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে অভাবমোচনের উপযোগী অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে, আবার কখনও শত্রুভাবাপন্ন হয়ে অভাবমোচনের প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। প্রকৃতির দানগুলোকে মানুষ যখন সহজে বা বিনা বাধায় আহরণ করে, তখন প্রকৃতি হয়ে ওঠে মানুষের বন্ধু। জীবনধারণের জন্য পানীয় জল, সূর্যকিরণ, বায়ুপ্রবাহ, চাষোপযোগী উর্বর জমি, নাব্য নদী এ সবই অনুকূল প্রকৃতির উদাহরণ।

আবার এই প্রকৃতিই কখনো কালরূপ ধারণ করে মানুষের ক্ষতি করে। যে গঙ্গানদী তার অববাহিকাকে সুজলা সুফলা করে তুলেছে, সেই গঙ্গানদীতেই মাঝে মাঝে প্রলয়ঙ্করী বন্যা দেখা দেয়। বৃষ্টিপাত ছাড়া কৃষিকাজ সম্ভব নয়, কিন্তু সময় সময় প্রবল বৃষ্টি বা কখনো কখনো অনাবৃষ্টিতে শস্যের ক্ষতি হয়। বহুবিধ প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে বলে কখনো কখনো প্রকৃতি মানুষের কাছে শুষ্ক বলে গণ্য হয়। প্রতিকূল প্রকৃতিকে মানুষ সব সময় বশে আনার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। প্রকৃতি নয়নাভিরাম গোলাপের তলায় লুকিয়ে রেখেছে কাঁটা। আলো আর অন্ধকার পাশাপাশি অবস্থান করে। সমাজের সাথে আসে বাধা, "When one thinks of natural resources, he must not forget that there are also natural resistances" (Zimmermann)।

প্রকৃতি বন্ধু হলে মানুষের বৈষয়িক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়, আর প্রকৃতি শত্রু হলে মানুষের দুঃখ, হতাশা ইত্যাদি বাড়ে।

3.2.2 প্রকৃতি, কৃপণ ও মুক্তহস্ত (Nature, Niggardly and Bountiful)

প্রকৃতি একদিকে যেমন মানুষের বন্ধু ও শত্রু, অন্যদিকে তেমনি সে কৃপণ ও উদার। প্রকৃতি মানুষকে কিছু মুক্তবস্তু দান করেছে, যা মূল্যহীন, যেমন নিঃশ্বাস নেবার জন্য বাতাস, পান করার জন্য জল, বিশ্রাম নেবার জন্য স্থান, অনুকূল জলবায়ু, উর্বর মাটি, প্রাণী ইত্যাদি (she has few free gifts to offer

though these are priceless—air to breathe, water to drink, a place to rest, friendly climate, fertile soil, game, and so forth) প্রাচুর্যময় উদার প্রকৃতি মানুষের উন্নতির সহায়ক আর কৃপণ প্রকৃতি উন্নতির পরিপন্থী। প্রকৃতি কোন দেশকে দরাজ হাতে সম্পদ বিতরণ করেছে, কোথাও বা কৃপণের মত কিছুই বিতরণ করে নি। নেপাল, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ একেবারে নেই বললেই চলে, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়ায় খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য ঐ দুই দেশকে উন্নতির শীর্ষে পৌঁছতে সাহায্য করেছে। পাহাড়ী ভূভাগ বন্ধুর, এখানে কৃষি জমি নেই বলেই অর্থনৈতিক পরিবেশও অনুকূল নয়। মানুষকে জীবনসংগ্রামের তাগিদে প্রচুর মেহনত করতে হয়। পক্ষান্তরে, গাঙ্গেয় সমভূমির বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্রে জীবিকা অর্জনের পক্ষে আদর্শ পরিবেশ। এখানে বিনা আয়াসে মানুষ রুজি রোজগার করতে পারে।

এজন্য Zimmermann বলেছেন প্রকৃতির অপর্যাপ্ত মূল্যবান সম্পদগুলো সুগোপনে বহু প্রাকৃতিক অবরোধের দ্বারা সুরক্ষিত "Her real treasures are deeply hidden and well guarded by obstacles—resistances" প্রকৃতি শুধুমাত্র উদ্যোগী, পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান মানুষের কাছে উদার ও মুক্তহস্ত Nature rewards intelligent search and wise effort with a bounty that makes her free gifts appear miserly, valuable though they are.

3.2.3 প্রকৃতি, অপরিবর্তনীয় ও পরিবর্তনশীল (Nature, Constant and Changing)

প্রকৃতির তৃতীয় আপাতবিরোধিতা পরিবেশের অপরিবর্তনীয় ও পরিবর্তনশীল চরিত্রের মধ্যে ফুটে উঠেছে। পৃথিবীতে ভূমি ও কিছু কিছু প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ স্থির ও অপরিবর্তনীয়। উদাহরণ হিসেবে জলসম্পদ ও খনিজসম্পদের কথা বলা যেতে পারে। মানুষ নিজের ইচ্ছেতে এদের অবস্থান ও অনুপাতের রদবদল ঘটাতে পারবে না। প্রকৃতির নিয়মে সূর্য রোজ সকালে পূর্বদিকে উঠবে, পশ্চিমদিকে বিকেলে অস্ত যাবে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটানো যাবে না। পক্ষান্তরে আবহাওয়া, ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন ঘটে চলেছে। মানুষ তার বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে সম্পদের নতুন নতুন কার্যকারিতা সৃষ্টি করে চলেছে।

বৈপরীত্যের মধ্যে ঐক্য আনাই মানবসভ্যতার সাধনা। এজন্য প্রাকৃতিক সম্পদের এই পরস্পরবিরোধী স্বভাবের মধ্যে উন্নত সংস্কৃতির সাহায্যে সে নিত্যনতুনভাবে অভাব পূরণের ব্যবস্থা করে নিচ্ছে। আর এই অভাব পূরণ করতে গিয়ে কখনও কখনও সে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। যেমন দূষণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করে সে আগামী প্রজন্মকে গভীর সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মানুষের কাছে একশ বছর আগের পৃথিবী এবং বর্তমান পৃথিবীর মধ্যে অনেক ফারাক রয়েছে। অনেক বনভূমি কেটে আধুনিক শহর, শিল্পাঞ্চল (দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল) গড়ে উঠেছে। মরুভূমির রুক্ষ পরিবেশে গড়ে উঠেছে আধুনিক শহর (যেমন মধ্যপ্রাচ্যে)।

প্রকৃতিকে যখন কার্যকারিতার ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়, তখন দেখা যায় প্রকৃতি চিরপরিবর্তনশীল। আমরা জানি ভূগর্ভে খনিজ পদার্থের পরিমাণ সীমিত। ব্যবহারের ফলে তা ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হয়ে যাবে।

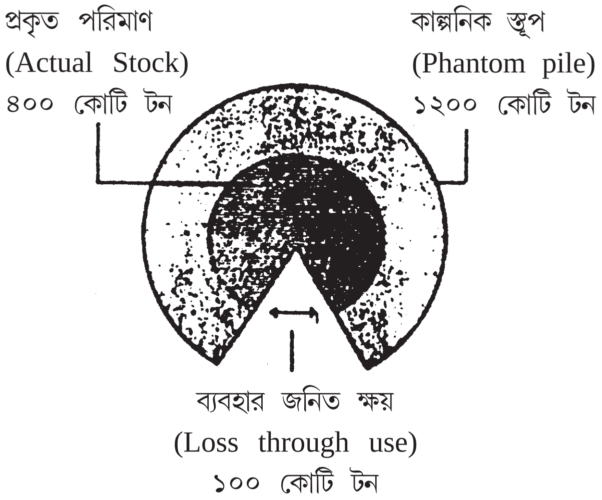

চিত্র — কাল্পনিক স্তূপ

কিন্তু মানুষ তার বুদ্ধি ও কারিগরী কৌশল প্রয়োগ করে নতুন নতুন ব্যবহার আবিষ্কার করে ও তা থেকে বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য উৎপাদন করে খনিজ পদার্থের উপযোগিতা বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। এই কারণে কাল্পনিক সম্পদ বা কাল্পনিক স্তূপ বা কাল্পনিক সঞ্চয় (Phantom pile) তত্ত্ব প্রাকৃতিক সম্পদের কার্যকারিতা ও উপযোগিতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। নিম্নোক্ত সূত্রের মাধ্যমে কাল্পনিক সঞ্চয় বা স্তূপকে প্রকাশ করা হয় ঃ

$$P = [F \times (O - L)]$$

এখানে P হল কাল্পনিক স্তূপ (Phantom Pile), F হল নির্দিষ্ট সম্পদের কার্যকারিতা যতগুণ বেড়েছে, O হল ঐ সম্পদের প্রকৃত পরিমাণ এবং L হল সম্পদের ব্যবহারজনিত হ্রাসের পরিমাণ।

ধরা যাক (i) 1950 সালে কোন দেশে কোক-কয়লার সঞ্চয় ছিল 5,000 টন (অর্থাৎ সূত্রানুসারে, O) (ii) কিন্তু গত 50 বছরে ঐ সম্পদের ব্যবহারজনিত হ্রাস ঘটেছে 1000 টন, (iii) কিন্তু ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী উন্নতি ঘটায় এক টন কোক-কয়লার সাহায্যে দু' টন আকরিক লোহা নিষ্কাশন সম্ভব হয়েছে। আবার কোক-কয়লা তৈরী করবার সময় ও নানাপ্রকার উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায়। এখন ধরা যাক যে, আগের তুলনায় বর্তমানে কয়লার কার্যকারিতা 5 গুণ বেড়েছে। আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে গত 50 বছরে 1000 টন কোক কয়লা খরচা হয়েছে। তা হলে বর্তমানে দেশে 4,000 হাজার টন কোক কয়লা সঞ্চিত আছে। তাই দেখা যাচ্ছে যে মোট কোক-কয়লার পরিমাণ 5,000 টন থেকে 4,000 টনে কমে গেছে বটে, কিন্তু ঐ 4,000 টন কয়লার কার্যকারিতা আগের তুলনায় 5 গুণ বেড়ে 20,000 টন হয়েছে (কাল্পনিক স্তূপ)।

স্থান ও কালভেদে কাল্পনিক স্তূপ বা কোনো সম্পদের কাল্পনিক সঞ্চয়ের পরিমাণ আপেক্ষিক। কারণ সম্পদের কার্যকারিতা বাড়ার প্রাথমিক শর্তই হল সংস্কৃতির উৎকর্ষতা। তাই—

(a) বিভিন্ন সময়ে একই সম্পদের কাল্পনিক স্তূপ বা সঞ্চয়ের পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে।

(b) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্পদের কাল্পনিক স্তূপ ভিন্ন হতে পারে।

(c) একই সময়ে বিভিন্ন সম্পদের কাল্পনিক স্তূপ ভিন্ন হতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে শুধুমাত্র কয়লা নয়, খনিজ তেল, লোহা, তামা প্রভৃতি সম্পদের কার্যকারিতা ধীরে ধীরে বাড়ছে। এভাবে মানুষ যখন বুদ্ধির দ্বারা প্রকৃতির মুক্তদানকে সম্পদে পরিবর্তিত করে, তখনই প্রকৃতির সম্প্রসারণ ও পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু অজ্ঞের মত ব্যবহার করলে প্রকৃতির কার্যকারিতা সংকুচিত হয়। বিশেষ করে পরিবেশ বিজ্ঞান সূত্র সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য এসব ঘটে থাকে। (Minerals, especially fuels, are used up, dissipated in use. Others are rendered useless by obsolescence. Still others are damaged by man beyond repair, mainly because of ignorance, especially of the laws of ecology— Zimmermann). মানুষ অবিবেচকের মত অনেক বনভূমি ধ্বংস করছে, কৃষিজমিকে বহুফসলীতে রূপান্তরিত করায় তার উর্বরাশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে, খনি থেকে কয়লা তোলার পর যথাযথভাবে ভরাট না করায় অনেক স্থানে ধস নামার উপক্রম হয়েছে (যেমন আসানসোল এলাকায়)। তাই বলা চলে প্রাকৃতিক সম্পদের এই সংকোচন ও প্রসারণ প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে না, মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার বিবেচনার ওপর তা বহুলাংশে নির্ভরশীল।

3.3 প্রাকৃতিক সম্পদ বন্টনে অসামঞ্জস্য

প্রাকৃতিক সম্পদ সকল ভূপৃষ্ঠে, ভূগর্ভে বা বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত। মানুষ এগুলোকে তার বিভিন্ন লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে ও বহুবিধ দ্রব্য উৎপাদনের কাজে রোজ ব্যবহার করছে। কিন্তু প্রকৃতির দান সবখানে সমভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নেই। কোথাও প্রচুর পরিমাণে খনিজ সম্পদে সঞ্চিত রয়েছে। কোথাও আবার সঞ্চয়ের পরিমাণ খুবই কম। ভূমি কোথাও উর্বর-কৃষিকাজের সহায়ক, যেমন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, আবার কোথাও অনুর্বর, কৃষির অনুপযোগী। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ, আবার নেপাল, ভুটান, আফগানিস্তানে খনিজ সম্পদ নেই বললেই চলে। ঐসব দেশের রুক্ষ্ম ভূপ্রকৃতি ও অনুর্বর মাটি কৃষিকাজের পক্ষে মোটেই সহায়ক নয়।

প্রাকৃতিক সম্পদের বন্টন শুধু যে অসমান, তা নয়, উপরন্তু বিভিন্ন সম্পদের বন্টন বিভিন্ন হারে অসমান। প্রাকৃতিক সম্পদের বন্টনের অসামঞ্জস্য অনুযায়ী বন্টন ব্যবস্থাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—

(i) কিছু কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ পৃথিবীর সবখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সর্বত্রলভ্য (abiquitious) সম্পদ, যেমন, সূর্যালোক, বাতাস ইত্যাদি। অক্সিজেন মানুষের জীবনধারণের জন্য একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ, যা পৃথিবীর সবখানে পাওয়া যায়।

(ii) কোন কোন প্রাকৃতিক সম্পদ সহজলভ্য। জিমারম্যানের ভাষায় Commonalities। এগুলো সবখানে

পাওয়া না গেলেও বেশীর ভাগ স্থানে পাওয়া যায়, যথা ভূমি, কৃষিজমি, কয়লা প্রভৃতি। এসব বস্তুর দুষ্প্রাপ্যতা থাকলেও এগুলো সহজে পাওয়া যায়।

(iii) কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ শুধুমাত্র অল্প জায়গাতেই পাওয়া যায়। এগুলো সহজলভ্য নয়, কষ্টসাধ্য। Zimmermann এগুলো দুষ্প্রাপ্য (scarces) না বলে দুর্লভ (rarities) বলেছেন। যেমন কানাডার নিকেল, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার টিন।

(iv) কতকগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ খুবই দুষ্প্রাপ্য। হয়ত গোটা পৃথিবীর একটি বা দুটি দেশে পাওয়া যায়। যেমন অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনে ব্যবহৃত ক্রয়োলাইট যা শুধুমাত্র গ্রীণল্যান্ডে পাওয়া যায়। পরমাণুশক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত রেডিয়ামও এইরকম আর একটি প্রাকৃতিক সম্পদ যা খুব কম স্থানেই পাওয়া যায়। Zimmermann এদেরকে বলেছেন অদ্বিতীয় (unparallel) সম্পদ।

প্রাকৃতিক সম্পদের অসম বন্টন মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। সিন্ধু-গঙ্গা অববাহিকা অঞ্চলের উর্বর মৃত্তিকা ভারতীয় উপমহাদেশের কৃষি উন্নতির মূলে। শুধু তাই নয়, নদীকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে এক অতি প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। অনুরূপ উদাহরণ মেলে টাইগ্রাস-ইউফ্রেটিস অববাহিকায় (ব্যবীলনীয় সভ্যতায়), নীল অববাহিকায় (মিশরীয় সভ্যতা)। প্রাকৃতিক সম্পদের অকৃপণ দানের দরুণ যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, জার্মানী এত উন্নতি লাভ করেছে। আবার সরকারী উদ্যোগের অভাবের দরুণ চীন বা ভারতে যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ঐ দেশ দুটির আশানুরূপ উন্নতি হয় নি। অথচ সৌদি আরবের মত মরুপ্রায় দেশে খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যের জন্য ঐ দেশটি এক ধনিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। আবার অনেক সময় কারিগরীজ্ঞান ও মূলধনের অভাবের দরুণ অনেক দেশের আশানুরূপ উন্নতি হয় না। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আফ্রিকা মহাদেশ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সবচেয়ে পিছিয়ে আছে। চাহিদা না থাকায় হিমালয় অঞ্চলের জলবিদ্যুৎ সম্ভারকে ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

কোন দেশে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলেই চলবে না, তাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। আর এ জন্য জানা দরকার ঐসব প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হবে কিনা বা বিভিন্ন খনিজ পদার্থের সমাবেশ কিরূপ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় দার্জিলিং জেলার বাগরকোটে কয়লা পাওয়া যায়। কিন্তু তা নিকৃষ্ট মানের। বাণিজ্যিকভাবে এই সম্পদের উত্তোলন লাভজনকও নয়। তাই এই অঞ্চলে কয়লা শিল্প গড়ে ওঠে নি। পৃথিবীর অনেক দেশেই নিকৃষ্টমানের আকরিক লোহা পাওয়া যায়, কিন্তু তা উত্তোলন করতে ও পরিবহন করতে (দুর্গম স্থানের জন্য) যে খরচ হবে, তা মোটেই লাভজনক হবে না। আবার কোন স্থানে শিল্প গড়ে উঠতে গেলে বহুবিধ খনিজ পদার্থের একত্র অবস্থান প্রয়োজন। পূর্ব ভারতে কয়লা, আকরিক লোহা, চুনাপাথর, ডলোমাইটের একত্র অবস্থান এখানে বহু লোহা-ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

3.4 প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের নীতি (Principles of utilisation of resources)

(i) প্রকৃতিতে সম্পদ বন্টনে কিছু অসামঞ্জস্যের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। আরও বলা হয়েছে (ii) প্রকৃতির কিছু আপাত স্বভাববিরোধী বৈশিষ্ট্যের কথা। (iii) আগে মানুষের চাহিদা ছিল অল্প, তাই প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ছিল সীমিত। এজন্য মানুষের জীবনযাত্রার মানও উন্নত ছিল না, (iv) সময়ের সাথে সাথে মানুষের চাহিদার যেমন বৈচিত্র্য বেড়েছে, তেমনি প্রাকৃতিক সম্পদের বহুমুখী ব্যবহারও সম্ভবপর হয়েছে। শুধু তাই নয়, সীমাহীন লোভের জন্য মানুষ প্রকৃতিদত্ত সম্পদকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করছে। ফলে প্রকৃতিতে একটা ভারসাম্যহীন অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন যথেচ্ছভাবে গাছ কাটার ফলে ভূমিক্ষয় হচ্ছে, বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। উষ্ণতা বাড়ছে। বরফ গলছে। আর এ সবই হচ্ছে মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশ (ethics) সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নয় বলে। এজন্য সম্পদের সুষ্ঠু ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী। প্রয়োজন কিছু বিশেষ নীতি মেনে চলা, যেমন—

(a) **প্রকৃতিক সাথে সহযোগিতা—** প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন প্রকৃতির সহযোগিতা। প্রাকৃতিক পরিবেশ যদি অনুকূল হয়, তবে তো কথাই নেই। মানুষ পরিবেশ থেকে নিজের খেয়ালখুশীমত সম্পদ আহরণ করে তা ব্যবহার করে ও উন্নতিলাভ করে। যেমন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়ান ফেডারেশন প্রভৃতি দেশ। অরণ্য সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও কঙ্গো অববাহিকার অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে নি।

এজন্য সেখানকার প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ দায়ী। ভারী ও শক্ত কাঠ, ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটি, যানবাহনের অপ্রতুলতা, বিষাক্ত সী-সী (tse-tse) মাছির উপদ্রব, কারিগরী জ্ঞানের অভাব ও চাহিদা না থাকায় কঙ্গো অববাহিকার অরণ্য সম্পদকে ব্যবহার করা সম্ভবপর হয়নি। ঐ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করতে হলে মানুষকে ঐ অঞ্চলের প্রতিকূল পরিবেশকে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগ করে অনুকূল করে নিতে হবে।

(b) **জীবনযাত্রা মান** (Standard of Living) — যে সব অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান নীচু, সেখানে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সম্ভবপর হয় না। কোন দেশে সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তার ব্যবহার সম্ভবপর হয় না প্রধানত মূলধন ও কারিগরী বিদ্যার অভাবের হেতু। আফ্রিকা মহাদেশের ক্ষেত্রে এ কথা খুবই খাটে। শুধু আফ্রিকাই বা বলি কেন, আমাদের দেশে প্রতি বছর যে পরিমাণ আকরিক লোহা উত্তোলন করা হয়, তার একটা বড় অংশ জাপানে রপ্তানী করা হয়। এর কারণ এ দেশে লোহা-ইস্পাতের কম কিছুটা চাহিদা। পক্ষান্তরে কারিগরী বিদ্যায় এগিয়ে থাকার দরুণ দেশে আকরিক লোহা যথেষ্ট থাকলেও জাপান ভারত থেকে আকরিক লোহা আমদানী করে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয় নি সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট উন্নত নয় বলে। তাই সম্পদ ব্যবহারের সময় এই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে।

(c) **সরকারী নীতি (Government Policy)** — জল প্রকৃতির অফুরন্ত দান। আমরা জলকে নানাভাবে ব্যবহার করি। কিন্তু জল থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের মত এক বড় কর্মযজ্ঞ এককভাবে করা সম্ভবপর নয়। নদীবক্ষে বিশাল বাঁধ, বাঁধের পেছনে কৃত্রিম জলাধার, পাওয়ার হাউস তৈরি, মূল্যবান যন্ত্রাদি কেনা, বিদ্যুৎবাহী তার ও স্তম্ভ বসানো ইত্যাদি নানাবিধ কাজে বিপুল খরচ করতে হয়। উপরন্তু, বাঁধ ও জলাধারের জায়গায় জন্য ক্ষতিপূরণ ও স্থানচ্যুত বাসিন্দাদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ, উৎপাদিত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য স্তম্ভ বসানোর জায়গা দখল, উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিক্রয়মূল্যের হার (rate) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জাতীয় স্তরে নির্ধারিত করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে দেশে দেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আনুকূল্যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো গড়ে উঠেছে।

সম্পদকে বিশেষ সময়ের নিরিখে ব্যবহার না করে ভবিষ্যত প্রজন্মের করা মাথায় রেখে ব্যবহার করতে হবে। অবৈজ্ঞানিকভাবে সম্পদকে ব্যবহার না করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যবহার করতে হবে, যাতে জলদূষণ, বায়ুদূষণ, মৃত্তিকা ক্ষয়, বনসম্পদ হ্রাস, জৈব বৈচিত্র্য সংকট ও আবহাওয়ার পরিবর্তন ইত্যাদি পরিবেশগত সমস্যা না দেখা দেয়। আমাদের মনে রাখতে হবে “There is enough for all. The earth is generous mother; she will provide plentiful abundance for all her children if they will but cultivate her soil in justice and peace” (Kirtley F. Mather : Enough and to Spare)। আর এ ব্যাপারে সরকারেরও কিছু করণীয় আছে বৈকি। সম্পদ সংরক্ষণ, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা, পরিবেশ দূষণ প্রতিহত করার দিকে সরকারকেই নজর দিতে হয়।

আমাদের দেশে স্বাধীনতার আগে এক সরকার (বিদেশী ব্রিটিশ সরকার) ছিল বটে, কিন্তু সেই সরকারের উদ্দেশ্য ছিল এ দেশের সম্পদ নিয়ে গিয়ে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটানো। ব্রিটিশ সরকার এদেশে রেলপথ স্থাপন করেছিল বটে, কিন্তু তার পেছনেও উদ্দেশ্য ছিল এদেশের অভ্যন্তরভাগের সম্পদ সংগ্রহ ও সিপাহী বিদ্রোহ (Sepoy Mutiny) দমন করার কাজে রেলপথকে যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা। পৃথিবীর সব উপনিবেশেই ঔপনিবেশিকরা একই কায়দায় সম্পদ লুণ্ঠন করেছে। এজন্য দেশে দেশে দরকার স্বাধীন সার্বভৌম সরকার যাদের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী আছে যা দেশকে কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলবে।

(d) উন্নত দেশের সহযোগিতা (Co-operation of developed countries) — অনুন্নত দেশগুলো আর্থিক, কারিগরীজ্ঞানের জন্য উন্নত দেশগুলোর দ্বারস্থ হয়। কারণ তারা জানে এছাড়া তাদের উন্নতি সম্ভবপর নয়। অনুন্নত দেশগুলোর শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় উন্নত দেশগুলো অংশ নেয়। আফ্রিকার বহু দেশের শিক্ষা ও চিকিৎসা পরিষেবায় ভারত সহ বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলো অংশ নেয়। এমন কি আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ সৌদি আরব বা ওমানের মত দেশগুলোতে বাইরের দেশ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আনতে হয়। U.N.O.-র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন ইউনেস্কো (UNESCO), হু (WHO) বা W.M.O. উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও আবহাওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য ও পরামর্শ দেয়। প্রায় সব দেশই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অন্য দেশের আর্থিক সহযোগিতা কামনা করে। এমনকি একসময়ের দোর্দন্ড

প্রতাপশালী সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর দেশগুলি আর্থিক অসুবিধে কাটিয়ে ওঠার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের শরণাপন্ন হয়েছে।

অনুশীলনী - 1

(i) প্রকৃতিকে বন্ধু ও শত্রু বলা হয় কেন বলুন।

(ii) প্রকৃতি একই সাথে উদার ও কৃপণ একথা কেন বলা হয়েছে বুঝিয়ে বলুন।

(iii) প্রকৃতির অনুকরণ কি সম্ভব? বুঝিয়ে বলুন।

3.5 সংস্কৃতি ও মানুষ (Culture and Man)

3.5.1 সংস্কৃতি স্রষ্টা মানুষ (Man the Culture-Builder)

জিমারম্যান এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন এইভাবে। প্রথমে ছিল প্রকৃতি। প্রকৃতি বলতে ছিল বসুন্ধরা ও অকাশের নক্ষত্র এবং ধরাপৃষ্ঠের পাথর, বালি, প্রাণী ও উদ্ভিদ ইত্যাদি। এরপর আবির্ভাব হল মানুষের। জীবজগতের সব প্রাণীদের মধ্যে মানুষই একা প্রকৃতির বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা অর্জন করেছিল। প্রকৃতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার নিজের ইচ্ছাকে চাপাতে এবং প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করতে (আংশিকভাবে হলেও) সে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে নিজের হাতকে শক্ত করল। এইভাবেই সৃষ্ট হল সুউচ্চ ইমারত যাকে আমরা বলি সংস্কৃতি।

At first there was nature. It included the earth and the sky and the stars in the sky and all that was and lived on the earth—rocks and sand, fauna and flona, earth and water energy and matter. Then came man; and man alone of all living creatures was given the power to lift himself out of the compass of nature, the right to set his will against the will of nature and to shape nature, or parts of it, to his will to strengthen his hand in his struggle with nature. Thus there arose that lofty edifice which we call culture (Zimmerman).

বস্তুতপক্ষে মানুষের অগ্রগতির ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, যে পৃথিবীতে প্রথম আবির্ভাব ঘটে প্রাকৃতিক সম্পদের, তারপর মানুষের। সেইসময় মানুষ ক্ষুধা মেটাত বনের ফলমূল, পশুর মাংস দিয়ে। প্রকৃতি তার কাজে বাধা সৃষ্টি করলেও সে নিজের বুদ্ধিসত্তায় আস্তে আস্তে প্রকৃতিকে জয় করতে শিখল।

একদিন মানুষ হিংস্র পশুদের বড় ভয় পেত। এদের সাথে সংগ্রামে সে পাথর ব্যবহার করতে শিখল। ক্রমে ক্রমে পাথরকে ছুঁচলো করে ব্যবহার করতে শিখল। একদিন পাথরে পাথরে ঘসে আগুন জ্বালাতে শিখল। মানুষ দেখল প্রাণীরা আগুনকে খুব ভয় পায়। পাহাড়ে পাথরের গর্তকে আরও বড় করে ফাটিয়ে নিজের মতন করে আস্তানা বানাল। ধীরে ধীরে সে বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার শিখল যা দিয়ে বুনো জন্তু জানোয়ারদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়। মানুষের কৃষি আবিষ্কারও কম আশ্চর্যজনক নয়। কৃষি আবিষ্কারের

পর মানুষের খাদ্যাভাস পাল্টাল। বস্তুতপক্ষে মানুষের সভ্যতার ইতিহাস হল সামনে এগিয়ে চলার ইতিহাস। অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের নিত্য নতুন কলাকৌশল আয়ত্ত করল, ধীরে ধীরে সভ্যতা গড়ে উঠল, ভাষার আবিষ্কার হল, মানুষ তার পশু প্রবৃত্তি নিবারণ করল, সমাজ সৃষ্টি হল, আইন প্রতিষ্ঠিত হল। এভাবে সৃষ্টি হল মানুষের সংস্কৃতি।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে সংস্কৃতি কী? জিমারম্যান-এর ভাষায় "Culture means education, learning, experience, religion, civilised behaviour, suppression of vicious animal instinets, co-operation replacing conflict, the law of fair play and justice suppressing the law of jungle" অর্থাৎ সংস্কৃতি বলতে বোঝায় শিক্ষা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, ধর্ম, সভ্য ব্যবহার, পশু প্রবৃত্তি দমন, সংঘাতের বদলে সহযোগিতা, জঙ্গলের আইনের বদলে যথার্থ ও সংগত আইন। হ্যাগেট সংস্কৃতি কথাটিকে আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে "Culture does not mean simply an interest in artistic pursuits.....culture does not mean race.....culture describes patterns of learned human behaviour that form an durable human template by which ideas and images can be transferred from generation to other, or from one group to another" (Peter Haggett, 1979, Geography : A Modern Synthesis) অর্থাৎ সহজ ভাষায় সংস্কৃতি বলতে শিল্পকলায় সময় কাটানোর নেশা বা কৌতুহল বোঝায় না, সংস্কৃতি জাতিকে বোঝায় না। এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে, এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীর মধ্যে সভ্যতা, সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ ও রূপান্তর সম্ভব হয় মানুষের জানা ও জানানোর আগ্রহের জন্য।

মানুষ ও প্রকৃতির যুগ্ম সৃষ্টি হল সংস্কৃতি। মানুষ স্রষ্টা, কিন্তু প্রকৃতির ভূমিকাও একেবারে নিষ্ক্রিয় নয়। মানুষের দ্বারা সংস্কৃতির সৃষ্টি হলেও প্রকৃতির সাহায্য ছাড়া সংস্কৃতি সৃষ্টি সম্ভবপর নয়। "The sum total of all the devices produced by man, whith the aid, advice and consent of nature, to assist him in the attainment of his objectives" জিমারম্যানের মতে মানুষ তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সব জিনিসপত্র প্রকৃতির সাহায্য, উপদেশ ও সম্মতি নিয়ে তৈরী করে তা হল সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি দু'রকম হতে পারে—(এক) বস্তুগত (tangible) সংস্কৃতি অর্থাৎ রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, যন্ত্রপাতি, সেচ ব্যবস্থা, কৃষি ইত্যাদি অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে পাওয়া উপাদানকে কাজে লাগিয়ে বা রূপান্তর ঘটাতে যে সংস্কৃতির দরকার হয়। (দুই) অবস্তুগত (intangible) সংস্কৃতি অর্থাৎ মানুষের শিক্ষা, সামাজিক রীতিনীতি, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদি।

সংস্কৃতির কাজ হল প্রাকৃতিক বাধা দূর করা ও মানুষের কর্মক্ষমতাকে বাড়ানো। বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে বলতে হয় সংস্কৃতির কাজ হল—

1. মানুষের শ্রমকে বেশি ফলদায়ী করা অর্থাৎ মানুষের শ্রমকে আরও বেশী উৎপাদনক্ষম করা।

2. প্রাকৃতিক ও মানবিক বাধাকে দূর করা।

3. প্রকৃতি ও মানুষের যৌথ উদ্যোগে মানুষের অভাব পূরণ করা বা চাহিদা মেটানো।

4. সামাজিক নিয়ম বা রীতিনীতি প্রতিষ্ঠা করা।

5. যন্ত্রসভ্যতার বিকাশ ঘটানো।

6. অর্থনৈতিক আনুষঙ্গিক উপকরণ সৃষ্টি করা।

7. মানবিক গুণাবলীর (Human Qualities) বিকাশ ঘটানো।

8 নতুন নতুন সম্পদ সৃষ্টি করা ও তা মানুষের কাজে লাগানো।

9. সংস্কৃতির দৈনিক বা স্থানগত (space) প্রসার ঘটানো (expansion).

10. সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীলতা আনা এবং

11. সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের সুখশান্তি নিশ্চিন্ত করা।

কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। মানুষ তার বুদ্ধিবলে খনি থেকে খনিজ সম্পদ আহরণ করে। প্রকৃতি খনি দিয়েছে বলেই খনিজ সম্পদ উত্তোলন সম্ভবপর হচ্ছে। আর এই খনিজ সম্পদ কাজে লাগিয়ে মানুষ দুর্গাপুর বা জামশেদপুরের মত ইস্পাত কারখানা গড়ে তুলেছে। প্রকৃতি অনুকূল বলেই পশ্চিমবাংলার দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় চা চাষ সম্ভবপর হয়েছে। এখানকার অধিবাসীরা চা পানে অভ্যস্ত হয়েছে। আবার প্রাকৃতিক কারণেই নীলগিরি পাহাড়ি এলাকায় কফি চাষ হয় এবং দক্ষিণ ভারতীয়রা কফি পানে অভ্যস্ত। প্রকৃতি অনুকূল বলেই পশ্চিমবাঙ্গলায় পাট চাষ হয় এবং পাটকে কেন্দ্র করে হুগলীর দু'তীরে অসংখ্য পাটকল গড়ে উঠেছে। আর পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করে অর্থাগমের পথ উন্মুক্ত হয়েছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃতির বাধা ও প্রতিরোধকে কাটিয়ে উঠে মানুষ নতুন সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। একসময় দামোদর নদ পশ্চিমবঙ্গবাসীদের কাছে বাংলার দুঃখের নদী নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু মানুষ তার বুদ্ধিবলে দামোদরের ওপর বাঁধ দিয়ে তার প্রবল জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধ তো করেছেই, উপরন্তু জমিতে জলসেচের, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে ও খাল কেটে জলপথে পণ্য চলাচলের ব্যবস্থা করেছে। সর্বনাশা দামোদর এখন কল্যাণময়ী দামোদরে রূপান্তরিত হয়েছে। দুরধিগম্য পর্বতের বাধা সত্ত্বেও মানুষ কঠোর পরিশ্রম ও কারিগরী কৌশল প্রয়োগ করে পাহাড়ী এলাকায় বসতী স্থাপন করেছে ও সেখানকার বিবিধ প্রকার সম্পদ সংগ্রহ করছে। পাহাড়ী এলাকার সৌন্দর্যকে কাজে লাগিয়ে মানুষ কিছু কিছু শৈল শহর (hill resort) ও মানুষ গড়ে তুলেছে। (যেমন দার্জিলিং, উটি)। অনুরূপভাবে মালভূমি রুক্ষ পরিবেশকে উপেক্ষা করে মানুষ খনিজ

সম্পদ সংগ্রহে ব্রতী হয়েছে। তার ফলস্বরূপ গড়ে উঠেছে রাঁচী, হাজারীবাগ, ডালটনগঞ্জ ইত্যাদি শিল্প ও খনিশহরগুলো।

অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে অনুসরণ করে মানুষ উন্নত সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। যেমন বলা চলে একসময়ে আফ্রিকার জঙ্গলে রবার (বুনো রবার) পাওয়া যেত। কিন্তু তা সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য হওয়ায় ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ার জমিতে রবারের কারখানাতে রবার উৎপাদন (synthetic) হচ্ছে। মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে রবারের কার্যকারিতা জানার পরই এই নতুন সম্পদ সৃষ্টি করেছে।

তাই দেখা যাচ্ছে মানুষ একা সংস্কৃতি সৃষ্টি করে নি। প্রকৃতির সাথে মিলিত ভাবেই করেছে। আমরা আগেই জেনেছি যে প্রকৃতি যেমন মানুষের সামনে অনেক সুযোগ-সম্ভাবনা তুলে ধরে তেমনি আবার কতকগুলো বাধারও সৃষ্টি করে। মানুষ সংস্কৃতির সাহায্যে একই সাথে দুটি কাজ করে থাকে। (culture has the dual function of enlarging resources and reducing resistances), যেমন—

1. সম্পদের সম্প্রসারণ (enlarging resources)
2. সম্পদের প্রতিরোধের সংকোচন (reducing resistances)

1. সংস্কৃতির সাহায্যে মানুষ
   (a) সম্পদের সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়ায়
   (b) সম্পদের গুণমানের উন্নতি ঘটাতে পারে
   (c) সম্পদের কার্যকারিতা বাড়াতে পারে
   (d) সম্পদের অপচয় রোধ তথা সংরক্ষণ করতে পারে

2. দ্বিতীয়টি অর্থাৎ প্রতিরোধের সংকোচনের ক্ষেত্রে মানুষ সংস্কৃতির মাধ্যমে
   (a) প্রতিরোধগুলোকে চিহ্নিত করতে পারে
   (b) বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি প্রয়োগ করে প্রতিরোধকে জয় করতে চেষ্টা করে
   (c) কুসংস্কার ও পরিবেশদূষণ ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করতে পারে। এজন্য জিমারম্যান বলেছেন, “There are many human resistances also”। জিমারম্যান সংস্কৃতির পরিধি আরও বিস্তৃত করেছেন। তাঁর ভাষায় “culture also functions in the form of education, sanitation, health service, training, church, government etc.”।

নীচে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে সম্পদের প্রসারণের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির ভূমিকা তুলে ধরা হল—

(a) **কৃষি সম্পদ প্রসারণের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির ভূমিকা** (Role of culture in the expansion of agriculture) ঃ জমিতে বীজ ছড়ালে তা থেকে চারাগাছ অঙ্কুরিত হয়। ধীরে ধীরে গাছ বড় হয় তা থেকে ফসল সংগ্রহ করা হয়। এসব আমরা জানি, কৃষির শুরুতে ফসলের উৎপাদন ছিল সীমিত যা ক্রমবর্ধমান জনতার চাহিদা মেটাতে পারত না (The natural ancestors of our modern cereals were punny grasses bearing little seed. Spontaneous yields soon proved insufficient as the number of eaters increased" Zimmermann)। তাই মানুষ উচ্চ ফলনশীল বীজ, সার ও জলসেচ প্রয়োগ করে বেশী ফসল ফলাতে সক্ষম হল। যেমন ড. নরম্যান বোরলগ কর্তৃক উন্নত প্রজাতির গমের বীজ উদ্ভাবন। শুধু মেক্সিকোতে নয়, পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে উচ্চ ফলনশীল গমের বীজের ব্যবহার কৃষিক্ষেত্রে এক বিপ্লব এনে দিয়েছে।

(b) **খনিজ সম্পদ প্রসারণে সংস্কৃতির ভূমিকা** (Role of culture in the enlargement of mineral resources) ঃ মাটির নীচে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ লুকিয়ে ছিল। যেমন কয়লা। অথচ শিল্প বিপ্লবের (industrial revolution) আগে পর্যন্ত এর ব্যবহার ছিল সীমিত। শিল্পের প্রয়োজনে এবং ভূতত্ত্ববিদ্যার (Geology) ক্রমবিকাশের ফলে এই খনিজ পদার্থের চাহিদা বহুগুণ বেড়ে গেল। রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, বোকারো, করণপুরা প্রভৃতি স্থানে কয়লার আবিষ্কার পূর্ব ভারতে শিল্প বিস্তারের পথ সুগম করল। ইদানীং স্যাটেলাইট বা উপগ্রহের মাধ্যমে তোলা ছবি থেকে ভূপৃষ্ঠের খনিজ সম্পদ সম্পর্কে আমাদের ওয়াকিবহাল করছে। অনুরূপভাবে, খনিজ তেলের উত্তোলন ভারতের বিভিন্ন স্থানে তৈল শোধনাগার স্থাপনে উৎসাহ জুগিয়েছে। শুধু তাই নয়, পেট্রোলিয়ামকে কেন্দ্র করে এদেশে পেট্রো-রাসায়নিক শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। তাই বলা চলে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার উন্নতি না ঘটলে মানুষের পক্ষে এত বিপুল পরিমাণে খনিজ সম্পদ আহরণ করা সম্ভব হত না এবং সেক্ষেত্রে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতি ব্যাহত হত।

এবার প্রকৃতির প্রতিরোধ সংকোচনের ক্ষেত্রে বা নিরপেক্ষ সামগ্রীকে সম্পদে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে সংস্কৃতির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা যাক। Zimmerman লিখছেন "Culture in the speardhead which man drives deeper into the realm of nature converting more and more neutral stuff into resources - and into resistance as well" অর্থাৎ সংস্কৃতি হল একটি ফলকাগ্র যা প্রকৃতি ও বাধার গভীরতর ক্ষেত্রে চালনা করে মানুষ নিরপেক্ষ সামগ্রীকে উত্তরোত্তর সম্পদে পরিণত করে। যে সব সম্পদ মানুষ ব্যবহার করতে জানে না বা নানা কারণে ব্যবহার করতে সমর্থ হয় না, তাদেরকে নিরপেক্ষ সামগ্রী বলে।

যন্ত্রসভ্যতা মানুষের দক্ষতা বাড়িয়েছে। এককালে ঘড়ি (watch) শিল্প, বস্ত্রবয়ন শিল্প পৃথিবীর বিশেষ জলবায়ু অঞ্চলগুলোতে বিকাশ লাভ করেছিল। আজ সব ধরণের জলবায়ুতেই এই সব শিল্প গড়ে উঠতে

দেখা যায়। এককালে মরুভূমিতে ফসল ফলানো ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। আজ জলসেচের সাহায্যে মরুভূমি শস্যশ্যামলা হয়ে উঠেছে। রাজস্থানের গঙ্গানগর জেলা ইন্দিরা গান্ধী খালের সাহায্যে শস্যশ্যামল হয়ে উঠেছে।

এবার নিরপেক্ষ উপাদানকে মানুষ কিভাবে সম্পদে পরিণত করে সে কথায় আসা যাক। আগে কয়লা থেকে শুধুমাত্র তাপ পেতাম, তা সে গৃহস্থলীর রন্ধনকার্যের জন্য হোক, কিংবা শিল্প কারখানার জ্বালানীর জন্য হোক বা কয়লা পুড়িয়ে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যই হোক। কলয়া পোড়াবার পর যে ছাই অবশিষ্ট থাকত, তা ফেলে দেওয়া হত, কারণ তার ব্যবহার সম্বন্ধে মানুষ ছিল অজ্ঞ। আজ সেই নিরপেক্ষ উপাদান ছাইকে মানুষ বাড়ি তৈরির সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করছে। ছাই থেকে ইঁট, টালি তৈরী হচ্ছে। অর্থাৎ একদা নিরপেক্ষ উপাদান সম্পদে পর্যবসিত হয়েছে।

আবার লিগনাইট-এর মতন নিম্নমানের কয়লাকে (তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়া) লোহা-ইস্পাত ও অন্যান্য ভারী শিল্পে ব্যবহার করা যায় না। এজন্য লিগনাইট কয়লাকে গুঁড়িয়ে কয়লার গুল বা ব্রিকেট তৈরী করা হয়। গৃহস্থালীর রান্নার কাজে ঐ গুল ব্যবহার করা হয়। যেমন দার্জিলিং-এর বাগরাকোট বা তিলধরিয়ায় যে লিগনাইট কয়লা পাওয়া যায়, তা বাণিজ্যিক দিক দিয়ে লাভজনক নয় বলে তা কাজে লাগানো হয় না। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দারা ঐ কয়লা দিয়ে গুল তৈরী করে। তেমনি সমুদ্রের নীচে অনেক ম্যাঙ্গানিজের গোলা (Manganege nodule) বহুদিন ধরে সঞ্চিত ছিল। সমুদ্রবিজ্ঞান (oceanography)-এর উন্নতির সাথে সাথে ঐ বিশাল পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজের ভাণ্ডার মানুষের হস্তগত হয়েছে। ঐ নিরপেক্ষ সামগ্রীকে মানুষ আজ উৎপাদনের কাজে লাগাচ্ছে।

কৃষির ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। অতীতে অনেক জমি পতিত থাকত। ঐ সব পতিত জমিতে সার প্রয়োগ করে, জলসেচ করে কৃষির আওতায় আনা হয়েছে। একদা নিরপেক্ষ ঐ পতিত জমি আজ মূল্যবান কৃষি সম্পদে পরিণত হয়েছে।

3.5.2 সংস্কৃতি ও প্রকৃতির ত্রুটিসমূহ (Culture and defects of nature)

From the standpoint of man, nature not only places many obstacles in his path, but appears to possess definte defects as a partner in production. These defects manifest themselves in insufficient production, production in the wrong place, and production in the wrong time (Zimmermann).

প্রকৃতি শুধুমাত্র বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। মানুষের পক্ষে অসুবিধে সৃষ্টিকারী প্রাকৃতিক বিষয়গুলোকে প্রকৃতির ত্রুটি (defects of nature) বলে। প্রাকৃতিক ত্রুটি তিন প্রকার হতে পারে—স্থানগত ত্রুটি

(Production in the wrong place), সময়গত ত্রুটি (Production at the wrong time) ও পরিমাণগত ত্রুটি (insufficient production)। এক দেশে যা ত্রুটি বলে গণ্য হয় (কিংবা একজনের কাছে বা এককালে) অন্য দেশে (কিংবা অন্যজনের ক্ষেত্রে বা অন্যকালে) তাকে ত্রুটি বলে মনে করা নাও হতে পারে। প্রকৃতির এইসব ত্রুটিগুলোকে সংশোধন করে মানুষের সংস্কৃতি তার নিজের চাহিদা ও পছন্দের সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে।

স্থানগত ত্রুটি ঃ পৃথিবীর সব দেশে সব সম্পদ পাওয়া যায় না। প্রথমেই খনিজ তেলের কথায় আসা যাক। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এই মহার্ঘ সম্পদ পৃথিবীর চারটি বলয়ে (মধ্যপ্রাচ্য, পশ্চিম ইউরোপীয় এবং দূরপ্রাচ্য বলয়) সীমাবদ্ধ রয়েছে। অথচ আধুনিক সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে খনিজ তেলকে কেন্দ্র করে। এবার রবারের কথায় আসা যাক। প্রাকৃতিক রবার বেশী উৎপাদিত হয় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায়। অথচ মোটরগাড়ি ও এরোপ্লেনের টায়ার তৈরী করতে রবারের প্রয়োজন হয়। উন্নত দেশ ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে রবারের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতির এই স্থানগত ত্রুটি যাকে আমরা ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা (limitation)ও বলতে পারি তা খনিজ, কৃষিজ, বনজ, সামুদ্রিক ইত্যাদি গচ্ছিত সম্পদের বন্টনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতির এই স্থানগত ত্রুটি দূর করবার জন্য মানুষ বিবিধ প্রকার যানবাহন ব্যবস্থা চালু করেছে। হিমায়নযন্ত্র (refrigeration) আবিষ্কার করেছে। এর ফলে একস্থানের পণ্য অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়ার সুবিধে হয়েছে ও ঐ দ্রব্যের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভবপর হয়েছে।

সময়গত ত্রুটি ঃ পৃথিবীর সব সম্পদ একই সময়ে পাওয়া যায় না। সম্পদের সৃজন ও আহরণের এই সময়গত পার্থক্যকে প্রকৃতির সময়গত ত্রুটি বলে। পৃথিবীর গম সংগ্রহের সময় নিয়েই আলোচনায় আসা যাক।

গম সংগ্রহের সময়	গম উৎপাদনকারী দেশ
অক্টোবর	উত্তর গোলার্ধের উচ্চ অক্ষাংশের দেশসমূহ যেমন ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেন।
মে-সেপ্টেম্বর	উত্তর গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের দেশসমূহ অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, রাশিয়া, ইউক্রেন, ফ্রান্স, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশ।
মার্চ-এপ্রিল	উত্তর গোলার্ধের ক্রান্তীয় বলয়ে অবস্থিত দেশসমূহ, যেমন, ভারত, পাকিস্থান, মিশর, মেক্সিকো।
নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী	দক্ষিণ গোলার্ধের বিভিন্ন গম উৎপাদনকারী দেশসমূহ, যেমন, দক্ষিণ আফ্রিকা, আর্জেন্টিনা, চিলি, নিউজিল্যান্ড।

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গম কাটা হচ্ছে। উত্তর গোলার্ধের উচ্চ অক্ষাংশের দেশগুলো অক্টোবরের পর প্রবল শৈত্যের কবলে পড়ে। তাই এই সব দেশগুলোতে বসন্তকালে গম লাগাতে (বাসন্তিক গম) হয়, আবার শরৎকালে গম কাটতে হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে এর বিপরীত অবস্থা দেখা যায়, সেখানে সাধারণত এপ্রিলের পর গম লাগান শুরু হয় এবং স্থান বিশেষে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত গম কাটা চলতে থাকে। অতএব আমরা দেখলাম সারা বছর গমের প্রয়োজন হলেও এই ফসলটি একটি বিশেষ ঋতুতেই বেশী উৎপাদিত হয়ে থাকে। কখনও কখনও নির্দিষ্ট ঋতুতে এত বেশী ফসল হয় যে গুদামে স্থান সংকুলানের অভাবে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। হিমঘরে ফসল রাখা, সেচ ব্যবস্থা চালু করা, বৈজ্ঞানিকভাবে খাদ্যশস্য সংরক্ষণ এগুলো হল প্রকৃতির সময়গত ত্রুটি সংশোধনের সাংস্কৃতিক উপায়।

পরিমাণগত ত্রুটি ঃ চাহিদার তুলনায় অনেক জিনিসের উৎপাদন কম হয়। এই ঘাটতি অভাব সৃষ্টি করে। অভাবপূরণ করতে বিদেশ থেকে ঐসব জিনিস আমদানী করতে হয়। যেমন ভারতে প্রচুর কয়লা আছে, কিন্তু বাংলাদেশে ঐ বস্তুটি প্রায় নেই বললেই চলে। বাংলাদেশ ভারত থেকে ঐ পণ্যটি আমদানি করে নিজের দেশের অভাবপূরণ করে। এগুলো হল পরিমাণগত ত্রুটি। পরিমাণগত এই ত্রুটি দূর করবার জন্য আমরা অনেক সময় পরিবর্তদ্রব্য (substitute) ব্যবহার করে থাকি, যেমন পাটের বদলে শন, কেনাফ বা আবাদী রবারের বদলে কৃত্রিম রবার ব্যবহার কিংবা দুধ ও মাংসের চাহিদা মেটাতে মিশ্র পশু প্রজনন।

3.5.3 প্রকৃতির অনুকরণ (Duplicating nature)

প্রকৃতিকে অনুকরণ করেই মানুষ অনেক সময় নিজ সংস্কৃতির সাহায্যে নিত্য নতুন সম্পদের সৃষ্টি করে চলেছে। রেশম এক প্রাকৃতিক উপকরণ, কিন্তু মানুষ রেশমকে অনুকরণ করে কৃত্রিম রেশম উৎপন্ন করছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের ফলে। অনুরূপভাবে, মানুষ প্রাকৃতিক রবারের অনুকরণে কৃত্রিম রবার (synthetic rubber), কৃষিজাত তন্তুর অনুকরণে কৃত্রিম তন্তু আবিষ্কার করেছে। তাই একদা প্রকৃতির দুর্লভ বা অপ্রতুল বস্তু সাংস্কৃতিক উন্নতির ফলে মানুষের করায়ত্ত।

ইদানীং মানুষের বুদ্ধিরও স্ফুরণ ঘটছে সুপার কম্পিউটার-এর ব্যবহারের মাধ্যমে।

3.5.4 প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন (Developmental of natural resources)

প্রকৃতিতে কিছু কিছু উপকরণ আছে, যা মানুষের সরাসরি কাজে লাগে, আবার ঐ উপকরণের কিছু অংশকে মানুষ অন্য কাজে ব্যবহার করে। যেমন সূর্যতাপ। উদ্ভিদের বিকাশে, ফলফুল ফোটাতে, জল বাষ্পীভূত করতে, বৃষ্টি ঘটতে এটি একটি অবশ্য উপকরণ। বলতে গেলে সূর্যতাপ ছাড়া প্রাণীজগৎ অচল। আজ সূর্যতাপকে মানুষ অন্যান্য কাজেও লাগাচ্ছে। যেমন সৌরতাপ শক্তি উৎপাদনে, সৌর কুকার ব্যবহারে ইত্যাদি। সংস্কৃতির উন্নয়নের ফলেই এটি সম্ভবপর হয়েছে। আবার প্রকৃতিতে এমন কিছু সম্পদ আছে, যা সরাসরি

ব্যবহার করা যায় না। যেমন খনিজ তেল। এটি পরিশোধন করে আমরা পেট্রোলিয়াম, ডিজেল ও কেরোসিন পাই। আবার পেট্রোলিয়াম থেকে বহুবিধ পেট্রো-রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হয়, যেমন ন্যাপথা, পলিমার ইত্যাদি। সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সাথে সাথে মানুষের আহরণের চেষ্টারও বিপুল ব্যাপ্তি ঘটেছে। বর্তমানে প্রাকৃতিক সম্পদের আবিষ্কার, উন্নয়নে ভৌগোলিক তথ্য প্রণালী বা G.I.S. (Geographic Information System), রিমোট সেন্সিং, উপগ্রহ সমীক্ষা (Satellite investigation), কম্পিউটারের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

3.5.5 সমতার লক্ষ্যে সংস্কৃতি (Culture aims at equalising)

সংস্কৃতির এক বৈশিষ্ট্য হল যে এর সহায়তায় কোন দেশ প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক সম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ দেশগুলো অপেক্ষা অর্থনৈতিকভাবে অনেকখানি এগিয়ে থাকতে পারে। জাপান প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে এগিয়ে থাকা এক দেশ। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হল খনিজসম্পদে এই দেশটি যথেষ্ট অনুন্নত। কিন্তু খনিজ সম্পদ আমদানি করে এই দেশটি শিল্পে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। লোহা আকরিকের অভাব থাকা সত্ত্বেও ভারত থেকে ঐ সামগ্রী আমদানী করে জাপান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইস্পাত উৎপাদক দেশে পরিণত হয়েছে। আবার বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ (আকরিক লোহা) থাকা সত্ত্বেও ভারত লোহা-ইস্পাত শিল্পে এতটা উন্নতি করতে পারে নি এবং ভারত অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ওপরের উদাহরণ থেকে আমরা দেখলাম যে সংস্কৃতির উন্নতির সাহায্যে মানুষ প্রাকৃতিক দৈন্যতা দূর তথা সম্পদ বন্টনে বৈষম্য দূর করতে পারে। সংস্কৃতির উন্নয়নের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এশিয়ার জাপান ও কোরিয়া সম্পদ সৃষ্টিতে এক অপরের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে।

অনুশীলনী - 2

1. সমতার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বলতে কি বোঝেন?
2. মানুষ কিভাবে প্রকৃতিকে অনুকরণ করে লাভবান হয়, ব্যাখ্যা করুন।

3.5.6 সংস্কৃতি ও যন্ত্র (Culture and machine)

প্রকৃতিকে বশে আনার জন্য মানুষ যত রকম পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে তার মধ্যে যন্ত্র অন্যতম। মানুষের কায়িক শ্রম লাঘব করেছে যন্ত্র। অল্প সময়ে প্রচুর উৎপাদন করা যাচ্ছে। যন্ত্রের সাহায্যে খুব সূক্ষ্ম কাজ অতি সহজেই সম্পন্ন করা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, মাটির তলা থেকে ও সমুদ্রের তলা থেকে খনিজ সম্পদ আহরণ করা যাচ্ছে। রিমোট সেন্সিং, সুপার কম্পিউটার, ভৌগোলিক তথ্য প্রণালী (G.I.S.)-র ব্যবহার মানুষের কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার এক বিপ্লব এনেছে। বলতে গেলে যন্ত্র ছাড়া

আধুনিক সভ্যতা অচল। যন্ত্র ব্যবহারের আগে পর্যন্ত প্রকৃতির ওপর সংস্কৃতির প্রভাব প্রধানত অগভীর (superficial) ছিল। কেউ কেউ বলতে পারেন শিল্পবিপ্লবের আগে পর্যন্ত সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্য (cultural landscape) প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যের এক পরিবর্তিত রূপ ছিল। "Until the coming of the machine the impact of culture on nature by and large, was superficial. One may say that before the age industrialization the cultural landscape was a mere modification of the natural landscape" (Zimmermann) কথাটিকে একটু ঘুরিয়ে বললে দাঁড়ায় যন্ত্রপাতি তৈরির আগেও সংস্কৃতি ছিল। কিন্তু প্রকৃতির উপর সংস্কৃতির এত ব্যাপক প্রভাব ছিল না। যন্ত্রগুলো যেন প্রকৃতি থেকে আলাদা এক একটি বিষয়, প্রাকৃতিক চিত্রকে তারা যেন এক নতুন রূপ দিয়েছে। কিন্তু শিল্প বিল্পবের আগে যন্ত্রগুলো ছিল সরল, মানুষের দৈহিক শক্তি (muscle power) বা পশুশক্তিতে (animal power) চালিত। চাষবাস করতে লাগল কোদাল, শাবল ও লাঙল, যাতায়াতের জন্য ছিল গরু-মোষের গাড়ি বা নদীপথে নৌকা। তাঁত বুনতে মাকু, লোহার জিনিস বানাতে ছেনি, হাতুড়ি, কাঠের জিনিস বানাতে করাত ও বাটালি। তবে এসবেরই একটা সীমাবদ্ধতা (limitation) ছিল। তারপরে আর সে এগোতে পারত না। ভাবতে অবাক লাগে এরকম সরল যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার নিয়ে মানুষ প্রকৃতির নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও টিকে থাকার প্রয়াস চালিয়ে গেছে। এই সময় প্রকৃতির ভূমিকাই ছিল বড়। মানুষ প্রাকৃতিক সমস্যা নিরসনেই ব্যস্ত থাকত। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের বদলে প্রকৃতির সাথে আপোস করেই সে টিকে থাকত।

সপ্তাদশ শতাব্দী হল শিল্পবিপ্লবের যুগ। কুটির শিল্প ধীরে ধীরে বৃহদায়তন শিল্পের স্থান করে দিল। জেমস ওয়াট (James Watt) কর্তৃক বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের আবিষ্কার, ফালটন (Falton) কর্তৃক বাষ্পপোতের আবিষ্কার পরিবহন ব্যবস্থায় বিপ্লব আনল। আর্করাইট (Arkwright) আধুনিক ফ্যাক্টরীর (বড় শিল্প) সূচনা করলেন। কৃষিকাজে ট্রাক্টর, কম্বাইন প্রভৃতি যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হল। ফলস্বরূপ কৃষির উৎপাদিকা শক্তি অনেক গুণ বেড়ে গেল। একদিন প্রকৃতি শান্তিতে নিদ্রিত ছিল, কিন্তু বৃহদায়তন যন্ত্রদানবের বজ্র নির্ঘোষে তার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটল। ক্রমে দৈহিক কিছু সুবিধে দিতে মানুষের শান্তি ব্যাহত হল।

যন্ত্রসভ্যতার লক্ষ্য হল মানব কল্যাণ, কিন্তু যন্ত্রসভ্যতা মানবকল্যাণকে কতটা এগিয়ে নিতে পেরেছে, সেই বিষয়ে আজ মানুষের মনে সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে। যন্ত্র মানুষকে কতটা যান্ত্রিক করে দিচ্ছে, তা বোঝাতে জিমারম্যান গড়পড়তা আমেরিকাবাসীদের যন্ত্রের সাথে তুলনা করেছেন। যন্ত্রই যে মানুষের নবীনতম সভ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করে তা জিমারম্যানের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাঁর ভাষায়, "The average American is a thing in the world, a man begotten by machines, ...for 300 years, the American has been on the move..... "Thus the machine, the symbol of devitalized artificiality and not the soil.....

is shaping.....the newest civilization. আধুনিক পরিবেশবিদ্‌দের মতে যন্ত্রনির্ভর সভ্যতা মানুষকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পল্লীপ্রকৃতির অরণ্যদেবতা প্রবন্ধে আমরা ঠিক এই সমস্যার মুখোমুখি হই। কবি লিখেছেন "মানুষ অমিতচারী। যতদিন সে অরণ্যচর ছিল ততদিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার আদান-প্রাদন, ক্রমে সে নগরবাসী হল, তখন অরণ্যের প্রতি মমত্ববোধ সে হারালো, যে তার প্রথম সুহৃদ, দেবতার আতিথ্য যে তাকে বহন করে এনে দিয়েছিল, সেই তরুলতাকে নির্মমভাবে আক্রমণ করলো ইঁট-কাঠের বাসস্থান তৈরি করবার জন্য।.....লুব্ধ মানুষ অরণ্যকে ধ্বংস করে নিজেরই ক্ষতিকে ডেকে এনেছে, বায়ুকে নির্মল করবার ভার যে গাছপালার উপর, যার পাতা ঝরে গিয়ে ভূমির উর্বরতা বাঁচায়, তাকে সে নির্মূল করেছে। বিধাতার যা কিছু কল্যাণের দান, আপনার কল্যাণে বিস্মৃত হয়ে মানুষ তাকেই নষ্ট করছে।" বলা যেতে পারে প্রকৃতিকে সম্পদের উৎস হিসেবে না দেখে যন্ত্রদর্শী মানুষ প্রকৃতিকে আর্বর্জ্জনা ফেলার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করেছে। ফলে অস্বাস্থ্যকর আবাস, দূষিত বায়ুমণ্ডল, নোংরা বস্তি, যন্ত্রের ধোঁয়া, মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসে বিষাক্ত ও ক্ষতিরকর অবস্থা সৃষ্টি করেছে। মানুষকে আজ যন্ত্রসভ্যতার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে পরিবেশ দূষণ থেকে কিভাবে আত্মরক্ষা সম্ভব এ চিন্তা করতে হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা আজ তাই কঠিন প্রযুক্তি (hard technology)-র (যেমন কয়লা-তেল জ্বালিয়ে তৈরি শক্তি কারখানা, আনবিক শক্তির চুল্লি) বদলে নরম প্রযুক্তি ব্যবহারের পক্ষে যুক্তি দিচ্ছেন। নরম প্রযুক্তির যন্ত্র ক্ষয়শীল জীবাশ্ম জ্বালানীর ওপরে ততটা নির্ভরশীল নয় যা প্রাকৃতিক পরিবেশেরও ততটা ক্ষতি করে না।

তাই আধুনিক সম্পদশাস্ত্রে মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নতির সাথে সাথে যন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন ও যন্ত্রের সাহায্যে প্রকৃতিকে জয় করার পুরনো দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করা হয়। মানুষ সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করবে যখন যন্ত্র প্রকৃতির ত্রুটিগুলোকে দূর করে প্রকৃতির উন্নতিসাধনে সহায়ক হবে, অথচ প্রাকৃতিক ভারসাম্যও বজায় থাকবে।

3.5.7 সংস্কৃতি ও কৃষি (Culture and agriculture)

নবপ্রস্তর যুগের কোন এক সময় মানুষ উদ্ভিদের জীবনছন্দ বা life cycle যেমন বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে গাছ, ফুল ও ফল এবং পুনরায় বীজের সৃষ্টিকে কাজে লাগাতে শিখল। উদ্ভিদের জীবনছন্দের কাজে লাগানকে বলে "Domestication of the animal kingdom". বাংলার উদ্ভিদের লালনপালন, সোজাকথায় কৃষিকাজ। সেই থেকে মানুষের অস্থায়ী জীবনযাপনের শেষ, স্থায়ী গ্রামীণ বসতি শুরু। কারণ মানুষ দেখল পশুর সাথে যুদ্ধ না করেও আরও উন্নতিমানের আহার্য সংগ্রহ সম্ভব। পশুকে পোষ মানিয়ে তাকে লালনপালন করে তার থেকে দুধ, মাংস সহজেই পাওয়া যায়, আর যুদ্ধের থেকে পশুপালনের কাজ অনেক কম পরিশ্রমের, শুধু তাই নয়, পশুকে সে তার কৃষিকাজের সাক্ষী করে নিল। যন্ত্র বলতে তখন ছিল লাঙল। জলের জন্য নির্ভর করে থাকতে হত বৃষ্টিপাতের ওপর। মাটির গুণাগুণের ওপর নির্ভর করে

ফসল উৎপাদন করতে হত। মাটির গুণগত মান যে বাড়ানো যায়, তা তার কাছে ছিল অজ্ঞাত। এ ধরণের কৃষিতে উৎপন্ন ফসল না হত পরিমাণে বেশী, না হত সংখ্যায় বৈচিত্র্যপূর্ণ। একে বলা হয় আদিম জীবিকাসত্তা ভিত্তিক (Primitive subsistence) কৃষি। এতে চাষীর নিজের পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে কোন উদ্বৃত্ত থাকত না।

শিল্পবিপ্লবের পর থেকে আধুনিক কৃষির সূত্রপাত হয়। কেন না, শিল্পবিপ্লবের পরে আধুনিক যন্ত্রনির্ভর কৃষির মাধ্যমে ফসল উৎপাদনে ও পশুপালনে ব্যাপক উন্নতি হয়। কৃষি সংস্কৃতির এক উল্লেখযোগ্য প্রভাব হল কৃষি জমির প্রসার, বিশেষ করে পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমিগুলোতে।

বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে কৃষিতেও বৈচিত্র্য এসেছে। আর এ সম্ভবপর হয়েছে উন্নত বীজ ব্যবহারের ফলে। আগে মাঠ ও কৃষিজমিই ছিল মানুষের কাছে পরীক্ষাগার। এখন গবেষণাগারে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় নতুন ধরণের বীজ সৃষ্টি হচ্ছে। ফসলের ব্যবহারে বহুমুখিতা লক্ষণীয়। যেমন পাট থেকে শুধু থলে ও চট-ই তৈরী হচ্ছে না। গালিচা, কার্পেট ও সৌখিন দ্রব্যও তৈরী হচ্ছে। ফলে পাটের উৎপাদনও বেড়েছে। সাংস্কৃতিক উন্নতির ফলে কৃষির মাধ্যমে বন-সৃজন শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে সুপারী চাষ এই রকম এক উদাহরণ। সুপুরী গাছ লাগাবার ফলে তা একদিকে যেমন অরণ্য সৃষ্টি করে, অন্যদিকে তেমনি আয়ের পথ প্রশস্ত করে। এছাড়া অনেক পতিত ও অনুর্বর জমিতে সামাজিক বনসৃজন (social forestry) প্রকল্পের আওতায় আকাশমনি, কুসুম, ইউক্যালিপটাস গাছ লাগান হয়েছে, এতে একদিকে যেমন বনভূমি সৃষ্টি করা গেছে, অন্যদিকে তেমনি গ্রামবাসীদের জ্বালানী কাঠের সমস্যা দূর হয়েছে। এছাড়া পশুজাত দ্রব্যের যথা দুধ, পনীর, ঘি, মাংস, হাড়, চামড়া ইত্যাদির ক্রমবর্ধমান চাহিদার যোগান দিতে যেমন তৃণভূমি সংরক্ষণ করা হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি কৃষির মাধ্যমেও পশুখাদ্য (fodder) উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে।

স্থলভাগের সম্প্রসারণ সীমাবদ্ধ, অন্যদিকে জনসংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। তাই খাদ্যের জোগান দিতে মানুষ সমুদ্রকে বেছে নিয়েছে। সমুদ্রে জলজ উদ্ভিদ (Sea weed)-এর চাষ শুরু হয়েছে। এ থেকে উপাদেয় খাদ্য তৈরী হচ্ছে।

এককালে বুনো রবার সংগ্রহ করা হত নানান প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে। কিন্তু বুনো রবার সংগ্রহে বিপদ ও অসুবিধের জন্য এখন উপযুক্ত পরিবেশে আবাদী রবার চাষ হচ্ছে, যেমন ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া। বুনো রবার সংগ্রহ এখন প্রায় পরিত্যক্ত হয়েছে।

সবশেষে বলা চলে পরিবহন ব্যবস্থা উন্নতির ফলে এক অঞ্চলের উদ্বৃত্ত ফসল সহজেই অন্য অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে। এর ফলে কোনও অঞ্চলের খাদ্য ঘাটতির মোকাবিলা করা সম্ভবপর হয়েছে। শুধু তাই নয়, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এক স্থানের মানুষ অন্য স্থানের কৃষি প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত বীজ, সার সম্পর্কে জ্ঞান সংগ্রহ করছে ও তা নিজের দেশে প্রয়োগ করে কৃষির উন্নতি ঘটাচ্ছে। কৃষির ক্ষেত্রে সংস্কৃতিক এই প্রয়োগ এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে।

3.5.8 সংস্কৃতির স্থানান্তর (Cultural Transfer)

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করছে। কোথাও তারা খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত, কোথাও তারা প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষবাস করত। একটা বিশেষ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ ঐ আদিম জনগোষ্ঠীকে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। আর এই সংস্কৃতিও এক এক গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র ছিল। পরবর্তীতে শক্তি মদমত্ততায় বা অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সুবাদে এক গোষ্ঠীর মানুষ অন্য গোষ্ঠী বা অঞ্চলের ওপর তার প্রভুত্ব খাটাবার চেষ্টা করেছে। আমরা এদেশে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর সভ্যতা (সিন্ধু সভ্যতা)র পর আর্য সভ্যতার বিকাশ লক্ষ্য করেছি। অধিবাসী (immigrant) আর্যরা এদেশে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল ও বৈদিক সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল। এরপরও বহু পরে এদেশে এসেছে শক, হুন, পাঠান, মোগল দল। ধীরে ধীরে তারাও এদেশের সংস্কৃতির সথে মিশে গেছে। কবির ভাষায়, 'শক, হুণ, পাঠান, মোগল এক দেহে হল লীন।' তারাও তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির কিছু কিছু এদেশে চালান করে দিয়েছিল, যার ছাপ রয়েছে ভাষা, শিল্প, সংগীত, স্থাপত্যশিল্পের মধ্যে। শুধু বিদেশী শক্তির কথাই বলি কেন, বহু বিদেশী পর্যটক বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এদেশে এসেছিলেন। কেউ কেউ এসেছিলেন শুধুমাত্র ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে। উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়া অন্যান্য নানাকারণে সংস্কৃতির স্থানান্তর ঘটে। যেমন—

(1) ভারত ও ভূটানের জনসাধারণের জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক কাজকর্মে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দুই দেশের মধ্যে যাতায়াতগত প্রশাসনিক বাধা নেই বলে ভাবধারার পারস্পরিক আদান-প্রদান সহজে হয়েছে অর্থাৎ আঞ্চলিক সৌভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্কের ফলে ভারত ও নেপাল কিংবা ভারত ও ভূটান ভাবধারার পারস্পরিক আদানপ্রদান তথা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে।

(2) উচ্চশিক্ষা, বাণিজ্য তথা দেশের আর্থিক উন্নয়নের জন্য এক দেশের মানুষ অন্য দেশে যান। সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে উন্নত দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার শেষে ফিরে এসে নিজ নিজ দেশের সংস্কৃতির উন্নতি ঘটান। অনেক সময় কারিগরী ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অনগ্রসর দেশ থেকে কারিগরী বিদ্যায় উন্নত দেশে মানুষ শিক্ষানবীশ হিসেবে যান। দীর্ঘকাল বিদেশে থেকে লেখাপড়া বা প্রশিক্ষণ নেবার সময় স্থানীয় জীবনধারা ও অর্থনৈতিক কর্ম দ্বারা প্রভাবিত হন। দেশে ফিরে তারা সংস্কৃতির স্থানান্তর ঘটান।

(3) অনেক সময় প্রধান জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রাধান্যের চাপে কোন দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মূল সংস্কৃতি নষ্ট হয়ে যায়। ভারতের আদিবাসী সমাজে একারণে হিন্দু সমাজের সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটছে। আদিবাসীরা ধীরে ধীরে তাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলেছেন। এ ধরণের সংস্কৃতির স্থানান্তর কোন দেশের পক্ষে হিতকর নাও হতে পারে।

সংস্কৃতির স্থানান্তরের ফলে ক্ষেত্রবিশেষে কোন দেশ উপকৃত হলেও অনেকক্ষেত্রেই সংস্কৃতির স্থানান্তর দেশের পক্ষে মঙ্গল নাও হতে পারে। কারণ একটি বিশেষ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে দিয়েই সে দেশের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। উদাহরণ হিসেবে ভারত ও ইংল্যান্ডের সংস্কৃতির কথা বলা যেতে পারে।

ভারত প্রায় দুশ বছর ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। স্বভাবতই ব্রিটেনের আইন-কানুন, শুল্ক (tax), কর ও শাসন-ব্যবস্থা ভারতে চালু ছিল। ভারতবর্ষের উন্নতিতে ভারতবাসীদের ভূমিকা বড় একটা ছিল না। ছিল ব্রিটেনের কিছু মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে ইংল্যান্ডের বস্তুবাদী সংস্কৃতি ভারতের ভাববাদী সংস্কৃতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভারতের সঠিক পরিবেশের সাথে গ্রেট ব্রিটেনের পরিবেশের কোনই মিল খুঁজে পাওয়া যায় না, বরং এটি ঠিক বিপরীত। নীচের সারণীতে তা পরিষ্কার হবে—

ভারত ও গ্রেট ব্রিটেনের তুলনা

ভারত	গ্রেট ব্রিটেন
1) আয়তন বড়।	1) আয়তন ছোট।
2) কৃষিপ্রধান দেশ।	2) শিল্পপ্রধান দেশ।
3) জনসংখ্যা বেশি।	3) জনসংখ্যা কম।
4) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি।	4) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম।
5) জনবসতির ঘনত্ব মধ্যম রকমের।	5) জনবসতির ঘনত্ব অত্যন্ত বেশি।
6) কৃষি জমির অভাব নেই।	6) কৃষি জমির অভাব আছে।
7) শিল্পে দক্ষ শ্রমিকের অভাব আছে।	7) শিল্পোন্নত এই দেশে দক্ষ শ্রমিকের অভাব নেই।
8) জীবনযাত্রার মান নিম্ন।	8) জীবনযাত্রার মান উন্নত।
9) উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার অভাব আছে।	9) পরিবহন ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত।
10) খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য আছে।	10) খনিজ সম্পদ পর্যাপ্ত নেই।
11) মূলধনের অভাব আছে।	11) মূলধনের অভাব নেই।
12) বৈদেশিক বাণিজ্য উন্নত নয়।	12) বৈদেশিক বাণিজ্য উন্নত।

ওপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে দুটি দেশের পরিবেশ প্রায় বিপরীত। স্বভাবতই ব্রিটেন তার সংস্কৃতি ভারতে চাপিয়ে দেবার ফলে ভারতের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়েছিল। ব্রিটেনে শ্রমিকের অভাব আছে, তাই যন্ত্র ব্যবহার করার দরকার আছে। ভারতে বেকারের সংখ্যা অনেক বেশি। ব্রিটেনে বহুদিন আগে থেকে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানকার শিল্পগুলো শৈশব কাটিয়ে যৌবনে পৌঁছেছে। এজন্য সেখানে যদি অবাধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করে বিদেশী পণ্য আমদানির সুযোগ করে দেওয়া হয়, তবে ঐ দেশের শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত

হবার সম্ভাবনা নেই। বরং প্রতিযোগিতার মুখে দাঁড়িয়ে তাদের উৎপাদন খরচ কম এবং উন্নত প্রয়োগ পদ্ধতির কথা ভাবতে হবে। কিন্তু ভারতের মত দেশে যেখানে শিল্পগুলো এখনও কৈশোর কাটিয়ে উঠতে পারে নি, সেখানে অবাধ বাণিজ্যের অর্থ হল শিশু শিল্পগুলোকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়া। কথায় আছে, "nurse the baby, protect the child and free the adult" (শিশুকে রক্ষণাবেক্ষণ কর, কিশোরকে রক্ষা কর, সাবালককে ছেড়ে দাও।) শুল্কনীতির ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে এই দুই দেশে প্রায় একই রকমের শুল্কনীতি চালু ছিল। কিন্তু ভারত প্রধানত চা ও পাট রপ্তানি করত ও ব্রিটেন ঐ সব দ্রব্য আমদানি করত। তাই এই দুই দেশের শুল্কনীতি কখনই এক হতে পারে না।

এবার একটি ভিন্ন উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা যায়। স্বাধীনতা উত্তর যুগে যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি নদী পরিকল্পনার (T.V.A) অনুকরণে ভারতেও কয়েকটি বহুমুখী নদী পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছিল ও সম্পূর্ণ হয়েছিল যেমন দামোদর উপত্যকা নিগম (Damodar Valley Corporation of D.V.C.)। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতির সাথে ভারতের সংস্কৃতির মৌলিক তফাৎ রয়েছে। যেমন এদেশের জমি টুকরো টুকরো। এদেশের চাষীরা দারিদ্র ও অশিক্ষার শিকার। ফলে তরা ঐ সব বড় বড় পরিকল্পনার পূর্ণ সুবিধেগুলো থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

একথা মনে রাখা দরকার যে, স্থানান্তরিত সংস্কৃতি যত উচ্চমানের হোক না কেন, তা স্থানীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টির পরিপন্থী হলে নিদারুণ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে থাকে। সংস্কৃতির স্থানান্তর দেশের অর্থনীতি তথা সংস্কৃতির ওপর কি ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা মস্তিষ্ক চালান (brain drain) সমস্যা থেকে বোঝা যায়। গত কয়েক দশক ধরে এদেশ থেকে উচ্চ শিক্ষার্থে বহু ব্যক্তি, ছাত্রছাত্রী বিদেশ চলে গেছেন। এদের অনেকেই বিদেশে সুনাম অর্জন করেছেন। বিদেশের অনেক প্রতিষ্ঠানই এদের কর্মপ্রতিভাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। বিদেশে কাজের পরিবেশ ভালো হওয়ায় ও বহু সুযোগ সুবিধা থাকায় তারা বিদেশেই থেকে গেছেন। এর ফলে এতদিন ধরে দেশ তার পেছনে যে খরচ করল, তার সুফল থেকে দেশ বঞ্চিত হল। এক্ষেত্রে সংস্কৃতি স্থানান্তরের সুফল উন্নত দেশগুলো ভোগ করছে। কিন্তু সংস্কৃতি বিনিময় কর্মসূচী (Cultural Exchange Programme)তে উন্নয়নশীল দেশের মানুষজন উন্নত দেশ থেকে উচ্চশিক্ষা তথা কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো লাভবান হয়। স্বাধীনতার পরেই আমাদের দেশে অনেক ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠেছিল, যেমন দুর্গাপুর, বোকারো, ভিলাই ইত্যাদি। এসব কারখানা গড়তে বিদেশী বিশেষজ্ঞরা সাহায্য করেছিলেন। উন্নয়নশীল দেশ ভারত নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে লাভবান হয়েছিল।

সংস্কৃতির স্থানান্তর তখনই মঙ্গলময় হয়ে ওঠে যখন—

1. উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ উভয়েই এর ফলে লাভবান হয়।

2. প্রাকৃতিক পটভূমি ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে।

3. দেশীয় আর্থ-সামাজিক পটভূমি বিদেশী সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জসপূর্ণ ও সহনশীল হয়।

পরিশেষে বলা দরকার যে সাংস্কৃতিক পরিবেশের শেকড় প্রকৃতির মধ্যে নিহিত থাকে ঠিকই। কিন্তু এই পরিবেশের ব্যাপ্তি, ঠিকানা ও বিন্যাস মানুষের অভাববোধ ও দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। মানুষের অভাববোধ ও দক্ষতা যত বদলেছে বা যত উন্নত হয়েছে, তার সাংস্কৃতিক পরিবেশও তত বদলেছে। এমনও দৃষ্টান্ত আছে যে দুই দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ মোটামুটি এক হলেও অভাববোধ ও দক্ষতার হেরফেরের জন্য উভয়ের সাংস্কৃতিক পরিবেশ অনেকটা আলাদা হয়েছে।

3.6 সারাংশ

প্রকৃতির মধ্যে দেখা যায় আপাতবিরোধী স্বভাব— (1) কখনও সে শত্রু, কখনও মিত্র, (2) কখনও স্থির, কখনও পরিবর্তনশীল, (3) কখনও কৃপণ, কখনও মুক্তহস্ত। প্রাকৃতিক সম্পদের বন্টন সবখানে এক নয়। কোথাও প্রচুর খনিজ সম্পদ ও কর্ষনযোগ্য ভূমি দেখা যায়, অন্যত্র কৃষিভূমি দুর্লভ।

সম্পদ সৃষ্টিতে সংস্কৃতি বিশেষ ভূমিকা নেয়। সংস্কৃতির মান উন্নত হলে সম্পদ সৃষ্টির ক্ষমতাও বাড়ে। কৃষি উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে সংস্কৃতির গভীর যোগ রয়েছে। সংস্কৃতির উন্নতি ঘটলে কৃষির উন্নতি প্রশস্ত হয়। উন্নত কৃষিপদ্ধতি, সার, জলসেচ, বীচ, যন্ত্রের ব্যবহার উন্নত কৃষি সংস্কৃতির উপকরণ। অনেক সময় কোন দেশ রাজনৈতিক দিক দিয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকার জন্য তাদের সংস্কৃতিকে অন্য দেশে চালান করে দেয় (যেমন যুক্তরাষ্ট্র)। একে সংস্কৃতির স্থানান্তর বলে। সংস্কৃতির বিবেচনাহীন স্থানান্তর শুভ ফল দেয় না।

3.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1. প্রকৃতির আপাতবিরোধী স্বভাব সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
2. প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।
3. প্রাকৃতিক সম্পদের বন্টন বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

   অথবা,

   সম্পদ বন্টন কিভাবে প্রকৃতির দানের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা আলোচনা করুন।
4. মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও প্রাকৃতিক সম্পদ বন্টনের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন।
5. প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করা কেন দরকার? এজন্য কী কী করা দরকার?
6. প্রাকৃতিক সম্পদের অসম বন্টন মানুষের কার্যাবলীকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে?
7. সংস্কৃতি বলতে কী বোঝেন? মানুষ ও প্রকৃতির যুগ্ম প্রচেষ্টার ফল হল সংস্কৃতি—এ কথা কেন বলা হয়?
8. সংস্কৃতিক কার্যাবলী বিবিধ—সম্পদের সম্প্রসারণ ও বাধার সঙ্কোচন—ব্যাখ্যা করুন।

9. সম্পদ সৃষ্টিতে সংস্কৃতির ভূমিকা আলোচনা করুন।
10. কৃষিকাজের ওপর সংস্কৃতির প্রভাব বিশ্লেষণ করুন।
11. সম্পদ সৃষ্টি ও ধ্বংসের ক্ষেত্রে মানুষের দ্বৈত ভূমিকা আলোচনা করুন।
12. সংস্কৃতির স্থানান্তর বলতে কী বোঝায়? ইংল্যান্ড থেকে ভারতে সংস্কৃতি স্থানান্তরের অসুবিধাগুলি কী কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1. প্রকৃতিকে বন্ধু ও শত্রু বলা হয় কেন?
2. প্রকৃতি একই সাথে উদার ও কৃপণ—একথা কেন বলা হয়েছে?
3. সংস্কৃতির দ্বৈত ভূমিকা বলতে কী বোঝায়?
4. প্রকৃতির মূল ত্রুটিগুলি কী কী?
5. প্রকৃতির অনুকরণ কী সম্ভব?
6. সমতার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়?
7. মানুষ কিভাবে প্রকৃতিকে অনুকরণ করে লাভবান হয়?
8. কাল্পনিক স্তূপ বলতে কী বোঝায়?

3.8 উত্তরমালা

অনুশীলনী - 1

(i) 3.2.1 অংশ দেখুন।

(ii) 3.2.2 অংশ দেখুন।

(iii) 3.3.4 অংশ দেখুন।

অনুশীলনী - 2

(i) 3.5.5 অংশ দেখুন।

2. প্রকৃতিকে অনুকরণ করেই মানুষ অনেক সময় নিজ সংস্কৃতির সাহায্যে নিত্যনতুন সম্পদের সৃষ্টি করে চলেছে। রেশম এক প্রাকৃতিক উপকরণ, কিন্তু মানুষ রেশমকে অনুকরণ করে কৃত্রিম রেশম উৎপন্ন করছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের ফলে। আবার দেখুন, মানুষ প্রাকৃতিক রবারের অনুকরণে কৃত্রিম রবার (Synthetic rubber), কৃষিজাত তন্তুর অনুকরণে কৃত্রিম তন্তু আবিষ্কার করেছে, তাই একদা প্রকৃতির দুর্লভ বা অপ্রতুল বস্তু সাংস্কৃতিক উন্নতির ফলে মানুষের করায়ত্ত। ইদানীং মানুষের বুদ্ধির স্ফুরণ ঘটছে সুপার কম্পিউটার-এর ব্যবহারের মাধ্যমে।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

1) 3.2 অংশ দেখুন।
2) 3.2 অংশ দেখুন।
3) 3.3 অংশ দেখুন।
4) 3.4 অংশ দেখুন।
5) 3.4 অংশ দেখুন।
6) 3.3 অংশ দেখুন।
7) 3.5.1 অংশ দেখুন।
8) 3.5.1 অংশ দেখুন।
9) 3.5.1 অংশ দেখুন।
10) 3.5.1 অংশের (a) দেখুন।
11) 3.5.1 অংশ দেখুন।
12) 3.6 অংশ দেখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1) 3.2.1 অংশ লক্ষ্য করুন।
2) 3.2.2 অংশ লক্ষ্য করুন।
3) 3.5.1 অংশ দেখুন।
4) 3.5.2 অংশ দেখুন।
5) 3.4 অংশ দেখুন।
6) 3.5.5 অংশ দেখুন।
7) 3.5.3 অংশ দেখুন।
8) 3.2.3 অংশ দেখুন।

একক 4 ❑ মানুষ ও সম্পদ

গঠন

4.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

4.2 সম্পদ উন্নয়নে মানুষের ভূমিকা

4.2.1 জনশক্তির পরিমাণগত দিক

4.2.2 জনশক্তির গুণগত দিক

4.3 সম্পদ উৎপাদনে মানুষের ত্রয়ী ভূমিকা

4.3.1 সম্পদ উৎপাদনকারী হিসাবে মানুষ

4.3.2 সম্পদ ভোগকর্তা হিসাবে মানুষ

4.3.3 সম্পদ ধ্বংসকারীরূপে মানুষ

4.4 ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি

4.5 জনসংখ্যার বণ্টন ও ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণকারী কারণসমূহ

4.5.1 প্রাকৃতিক কারণ

4.5.2 জলবায়ু

4.5.3 ভূমিরূপ

4.5.4 মৃত্তিকা

4.5.5 অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণ

4.5.5.1 শক্তিসম্পদ ও খনিজ

4.5.5.2 যোগাযোগ

4.5.5.3 সমাজ ও সংস্কৃতি

4.5.6 জনমিতি উপাদান

4.6 পৃথিবীর জনসংখ্যার বণ্টন

4.6.1 মহাদেশ ভিত্তিক জনসংখ্যা ও ঘনত্ব

4.6.1.1 এশিয়া

4.6.1.2 ইউরোপ

4.6.1.3 উত্তর আমেরিকা

4.6.1.4 আফ্রিকা

4.6.1.5 দক্ষিণ আমেরিকা

4.6.1.6 অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড

4.7 জনসংখ্যার পরিবর্তন তত্ত্ব

4.7.1 প্রাক শিল্পীয় পর্যায়

4.7.2 নবীন পাশ্চাত্য পর্যায়

4.7.3 আধুনিক পাশ্চাত্য পর্যায়

4.8 মানবসম্পদ ঃ শিক্ষা

4.9 মানবসম্পদ ঃ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

4.10 জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

4.10.1 ম্যালথুসীয় তত্ত্ব

4.10.2 কাম্য জংসংখ্যা তত্ত্ব

4.10.3 মানুষ-জমি অনুপাত

4.10.4 জনসংখ্যা—সম্পদ অঞ্চল

4.11 সারাংশ

4.12 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

4.13 উত্তরমালা

4.1 প্রস্তাবনা

সম্পদ সৃষ্টিতে মানুষেরও ভূমিকা আছে, অর্থাৎ মানুষ ও সম্পদ। আগেকার দিনে মানুষকে সম্পদ বলে ভাবা না হলেও বর্তমানে মানুষকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে বিবেচনা করা হয়। মানব সম্পদ (Human Resources) বলতে মানুষকেই বোঝায়। কারণ মানুষের শক্তি ও কায়িক শ্রম (Physical Labour)-ই মানব সম্পদ। মানুষের জন্যই প্রাকৃতিক উপাদানগুলো সম্পদে পরিণত হয়। মানুষের শক্তি ও শ্রমের সাহায্যে উপাদানগুলো সম্পদে পরিণত হয়। মানুষের শক্তি ও শ্রমের সাহায্যে প্রকৃতি থেকে সম্পদ উৎকর্ষতা (Superiority) এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এজন্য জিমারম্যান যথার্থই বলেছেন, "Man plays a unique role in the overall scheme of resource development" অর্থাৎ সম্পদ বিকাশের সামগ্রিক পরিকল্পনায় মানুষ এক অতুলনীয় ভূমিকা নেয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে ধরাপৃষ্ঠের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মানুষ হলেও সব মানুষই কিন্তু সম্পদ নয়। যে মানুষ সংস্কৃতি-মনস্ক এবং জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার দ্বারা প্রকৃতির নানা বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে উঠে অসংখ্য নিরপেক্ষ উপাদান (neutral stuff)-কে অহরহ সম্পদে পরিণত করে চলেছে, সেই মানুষই মানবিক স্তরের মানুষ। পক্ষান্তরে ভোগী ও জ্ঞানচর্চাবিহীন মানুষ পশুপদবাচ্য। সংস্কৃতিকে হাতিয়ার করে এই ধরণের মানুষ উন্নততর সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার সুযোগ তৈরি করে এবং এই পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে তোলে। সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষের এই অনন্য ভূমিকার জন্য সম্পদশাস্ত্রে মানবসম্পদ গুরুত্বসহ আলোচিত হয় (Human resources combine the task of production agent with the end object of the entire process. They constitute the end values to be achieved in this process— Zimmermann).

উপরের আলোচনা থেকে বলা চলে যে সম্পদ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষ এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। Adam Smith-র মতে কোন দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করে সে দেশের মানুষের শ্রম, দক্ষতা, কর্মনিপুণতা এবং বিচার বিবেচনার করার ক্ষমতার ওপরে। আধুনিক অর্থনীতিবিদরা বলেন যে মানুষের পেশাগত দক্ষতা, প্রযুক্তিবিদ্যা ও সংগঠনই তাকে সম্পদ সৃষ্টির উপাদান হিসেবে এতখানি উচ্চে স্থান দিয়েছে। তাই বেরী (Brain J. L. Berry, Ct. at.) বলেছেন "The focus of economic system is man, who plays numerous roles : manager and organizer; labourer in the production and distribution of goods and consumer of those goods" (The Geography of Economic System) অস্ট্রেলিয়ায় প্রচুর খনিজ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও মহাদেশটি জনবিরল হওয়ায় সেখানকার সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভবপর হয় নি। একই কথা খাটে কানাডা দেশ সম্পর্কে।

উদ্দেশ্য ঃ

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- মানুষকে কেন সম্পদ বলে তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- সম্পদের উন্নয়ন কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন দেশের সম্পদ উন্নয়নে এই সম্পদের ভূমিকা কিরূপ তা নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন।
- সম্পদ ভোগকারী ও ধ্বংসকারীরূপে মানুষের ভূমিকা কিরূপ তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- এই সম্পদের বন্টন কোথায় কেমন ও কী কী কারণে জনবন্টনে তারতম্য ঘটে এবং জনবৃদ্ধি সবদেশে সমান হারে ঘটেনি কেন তা আলোচনা করতে পারবেন।
- উন্নয়নশীল ও উন্নতদেশের অধিবাসীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ও জীবনযাত্রার গুণমানে যে পার্থক্য রয়েছে তা নির্ধারণ করতে পারবেন।

4.2 সম্পদ উন্নয়নে মানুষের ভূমিকা

কোন দেশের সম্পদ উন্নয়নে মানুষের ভূমিকা দু'প্রকার—(1) পরিমাণগত ও (2) গুণগত। এই দু'প্রকার ভূমিকায় মানুষ অংশগ্রহণ করে। প্রথমটি হল জনশক্তি (man power) সংখ্যা, দ্বিতীয়টি হল জনসাধারণের শ্রম, বুদ্ধি বিবেচনা, প্রযুক্তিগতদিক, শিক্ষার মান, স্বাস্থ্য, কর্মস্পৃহা ও কর্মদক্ষতা।

4.2.1 জনশক্তির পরিমাণগত দিক (Quantative aspect)

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কি পরিমাণে জনসংখ্যা বন্টিত আছে, কি পরিমাণ শ্রমের যোগান পাওয়া যেতে পারে ইত্যাদি লোকসংখ্যা যত বেশি হবে, ততই সেই দেশের মোট শ্রমের ক্ষমতা (labour power) বাড়বে। এমন অনেক কাজ আছে যেখানে (i) বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের দরকার হয়। অনুন্নত (undeveloped) ও উন্নয়নশীল (developing) দেশগুলোতে শ্রম হল মূলধনের বিকল্প (alternate)। গরীব দেশগুলোতে (অনুন্নত ও উন্নয়নশীল উভয়প্রকার) লোকসংখ্যা বেশী, কিন্তু তাদের পুঁজি কম। একটু উদাহরণ দেওয়া যাক। এশিয়ার মৌসুমী দেশগুলোতে একর প্রতি ধান উৎপাদন বেশী, কারণ এখানকার কোন জমি ফেলে রাখা হয় না। পরিবারের সব সদস্যই চাষে অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের পূর্ণ অভিজ্ঞতা বেশী ফলনে সাহায্য করে। পুঁজির অভাবে তারা যথেষ্ট পরিমাণে সার সরবরাহ বা জলসেচ করতে পারে না। পক্ষান্তরে, যুক্তরাষ্ট্র কিংবা পশ্চিম ইউরোপের মত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে জমি প্রচুর, কিন্তু লোক বল কম। এদের পুঁজিও যথেষ্ট। তাই কৃষির প্রতিটি কাজ যন্ত্রের সাহায্যে করা হয় বলে ফলন প্রচুর।

(ii) অনেক সময় শুধুমাত্র জনসংখ্যা নয়, জনশক্তির বয়সের গঠনও উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

কিশোর (0-14) কিংবা বৃদ্ধরা (59+) যুবা প্রৌঢ়দের (15-59 বয়স) তুলনায় উৎপাদন ব্যবস্থায় বা সম্পদ সৃষ্টিতে কম অংশগ্রহণ করে থাকে। কারণ যুবাদের (youth) তুলনায় কিশোর বা বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়দের কর্মক্ষমতা কম।

এছাড়া তাদের অন্নসংস্থান, শিক্ষা ইত্যাদির পরিষেবার ব্যবস্থাও করতে হয় যুবাদের। বস্তুতপক্ষে, সমাজে কিশোর বা প্রৌঢ়রা এক রকম বোঝাই বলা চলে।

(iii) অনেক সময় শ্রমশক্তির স্থানান্তর (transfer of labour force) ও কোন স্থানের সম্পদের উন্নয়নে সাহায্য করে। এইভাবেই আপ্যালাশিয়ান পার্বত্য অঞ্চলের কয়লা, রাশিয়ার তৈল বনভূমি থেকে কাঠ সংগ্রহ, ষ্টেপ অঞ্চলে কৃষির উন্নতি, দক্ষিণ আফ্রিকার, দুর্গম পার্বত্য এলাকার সোনা, রূপো উত্তোলন কিংবা ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে খনিজ সম্পদ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ঐসব অঞ্চলের উন্নতি তরান্বিত করা হয়েছে। এছাড়া আছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শ্রমশক্তির স্থানান্তর (international labour transfer)। এতে জনবহুল বা অনুন্নত দেশ থেকে জনবিরল বা উন্নত দেশে শ্রমিক পাঠিয়ে সেখানে আরও উন্নয়ন ঘটানো সম্ভবপর হয়েছে। নিগ্রোদের যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীতদাস করে আনা হয়েছিল এবং তারাই এখানকার কৃষি ও খনিজ পদার্থ আহরণে অংশগ্রহণ করত। শুধুমাত্র নিগ্রোরাই নয়, ইউরোপ থেকে বহু জনতা আজ থেকে প্রায় তিন শতাব্দী আগে পরিব্রাজন করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদ উন্নয়নে অংশ নিয়েছেন।

4.2.2 জনশক্তির গুণগত দিক

কোন দেশকে সমৃদ্ধশালী হতে গেলে জাতির স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, সচেতনার মাধ্যমে ও কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে উৎসাহ থাকা দরকার। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে দশজন (i) স্বাস্থ্যহীন, অদক্ষ, দুর্বল ও অনিচ্ছুক ও অশিক্ষিত মানুষ যে পরিমাণ কাজ করতে পারেন, সেই একই পরিমাণ কাজ করতে গেলে একজন শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, কর্মনিপুণ ও ইচ্ছুক মানুষ-ই যথেষ্ট। জনসাধারণের এই গুণগত উৎকর্ষের জন্যই জার্মানি ও জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কিছুদিনের মধ্যেই তাদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পেরেছিল। আবার ৫০ বছরেরও বেশী সময় স্বাধীনতা পেয়েও এবং প্রাকৃতিক আনুকূল্য থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে এই সাফল্য এখনও অর্জিত হয়নি।

(ii) এবার আসা যাক মানুষের বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ও কর্মকুশলতার উৎকর্ষ কিভাবে সম্পদ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। বিনিময় (Exchange) প্রথার যুগে যখন কারিগরী ও প্রযুক্তিবিদ্যা ছিল না বললেই চলে, তখন বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষ নিজেদের দক্ষতা বাড়িয়ে সম্পদ সৃষ্টির সাহায্যে উন্নত জীবনযাত্রা নির্বাহ করত। প্রধানতঃ বুদ্ধি ও দক্ষতার ওপর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নদীমাতৃক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, যেমন সিন্ধু, মিশরীয়, ব্যবলনীয় সভ্যতা। আজও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দক্ষতা ও নৈপুণ্যের (skill) ওপর নির্ভর করে কৃষি, অরণ্য, মৎস্য ও পশুজাত সম্পদ সংগ্রহ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে অঞ্চলে শ্রমশক্তি যত দক্ষ ও নিপুণ, সেই অঞ্চলের সম্পদ সংগ্রহের মাত্রাও তত বেশী। যেমন নীলনদ, গঙ্গা ও হোয়াংহো অববাহিকার সম্পদ সংগ্রহের মাত্রা বেশী।

(iii) এবার আসা যাক জনগণের প্রযুক্তির প্রয়োগ কিভাবে সম্পদ উন্নয়নে সাহায্য করে। আমরা জানি যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি প্রভৃতি দেশগুলো সম্পদ উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষস্থান অধিকার করে। এদের মধ্যে জাপানে তো বিবিধ খনিজসম্পদের অভাব রয়েছে, তবুও বিদেশ থেকে বহুবিধ খনিজ ও অন্যান্য সামগ্রী আমদানী করে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ঘটিয়ে আজ বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আর জার্মানী ও যুক্তরাষ্ট্রে খনিজ সম্পদ যেমন প্রচুর আছে তেমনি আছেন প্রযুক্তিবিজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ। তাই ঐ দেশদুটি এত উন্নতি করেছে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশ থেকে বহু কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ গিয়ে বসবাস করছেন। তারাও ঐ দেশের সম্পদ উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা নেন। এদের মধ্যে বহুসংখ্যক ভারতীয় রয়েছেন। দুঃখের বিষয় ভারতের প্রযুক্তি এখনও যথেষ্ট উন্নত নয়। তাই আমাদের দেশ এইসব প্রযুক্তিবিদ্‌দের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এদেশের আকরিক লোহার কথাই ধরা যাক না কেন। ভারত প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণে আকরিক লোহা উত্তোলন করে, অথচ আমাদের দেশে তার সম্পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয় না। আবার জাপান ঐ আকরিক তথা স্ক্র্যাপ আয়রণ ভারত থেকে আমদানী করে লোহা ও ইস্পাত উৎপাদনে এশিয়ার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। তাই বলা চলে কোন দেশের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে প্রযুক্তির প্রয়োগের ওপর। আর এইখানেই রয়েছে মানবশক্তির যথার্থ পরিচালনার (management) ব্যাপারটি।

মানুষ সম্পদ, কিন্তু সেই সম্পদকে যথাযথ প্রয়োগ করতে পারলেই দেশের উন্নতি সম্ভব। তাই দেশে দেশে মানব সম্পদ উন্নয়নের দিকে জোর দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশে ও নামে কেন্দ্রীয় সরকারে একটি আপলাদা যন্ত্রনীলয় খোলা হয়েছে।

4.3 সম্পদ উৎপাদনে মানুষের ত্রয়ী ভূমিকা (Triple role of man in resource creation)

উৎপাদনকারী, ভোগকারী ও ধ্বংসকারী (producer, consumer and destroyer of resources)—সমাজে মানুষের তিন ধরণের ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়, যথা সম্পদ উৎপাদনকারী, সম্পদভোগী এবং সম্পদ ধ্বংসকারী হিসেবে।

4.3.1 সম্পদ উৎপাদনকারী হিসেবে মানুষ

প্রকৃতির উপকরণকে সম্পদ বলা যায় না। প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরী করে মানুষ নিজের চাহিদার তৃপ্তির জন্য তা ব্যয় করে। সম্পদের কার্যকারিতা মানুষের প্রয়োজনেই : ম্যালথাস-এর মত প্রাচীনপন্থী অর্থনীতিবিদ্‌রা মানুষের ভোগস্পৃহা তথা উদর নামক প্রতঙ্গটির (organ) কথা বললেও বর্তমানে অর্থনীতিবিদ্‌রা মানুষের দুটো হাতকেও সমান গুরুত্ব দেন। অর্থাৎ মানুষ শুধুমাত্র ভোগকারী নয়—সে উৎপাদনকারীও বটে। উৎপাদনকারী হিসেবে মানুষ উৎপাদনের এক উপাদান। উৎপাদনের উপাদান হিসেবে সে তার কায়িক ও মানসিক শ্রম (mental labour) প্রয়োগ করে এবং সভ্যতার বিকাশে নতুন সংস্কৃতি

সৃষ্টি করে সে নিজের শ্রমকে আরও উৎপাদনযোগ্য করে তোলে। প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রম করে নতুন নতুন উৎপাদন পদ্ধতির প্রবর্তন ও প্রসার ঘটাতে সে তার নিজের প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগায়। আর এই একটানা চেষ্টার ফলশ্রুতি হিসেবে সম্পদ সৃষ্টির গতি ও মোট পরিমাণ বাড়তে থাকে "Labour is, in the first place, a process in which both man and nature participate, and in which man of his own accord starts, regulates and controls the natural reactions between himself and nature" (Karl Marx).

সম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে দু'ভাবে কাজে লাগায়—(1) বিপুল জনসংখ্যাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ সম্পদ উৎপাদনে সাহায্য করে। মৌসুমী এশিয়ার দেশগুলোতে বিপুল সংখ্যক শ্রমশক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিবিড় (intensive) প্রথায় ধান চাষ করা হয়। (2) বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তারদের জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সম্পদের উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটানো হচ্ছে।

4.3.2 সম্পদ ভোগকর্তা হিসেবে মানুষ (Man as consumer of resources)

সম্পদের ভোগকর্তা হিসেবেও মানুষের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। উৎপাদনকারী হিসেবে কাজ করতে গেলে যেমন মানুষের দৈহিক তথা মানসিক শ্রম লাগে, তেমনি ভোগকর্তা হিসেবে তাকে সম্পদের প্রকৃতি ও বন্টনের অসাম্যের কথা চিন্তা করে বিবেচনার সঙ্গে সম্পদ ব্যবহার করতে হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানসিক তৃপ্তি যেমন উৎপাদনের সহায়ক শক্তি, তেমনিই বৈজ্ঞানিক ব্যবহার, বিকল্প উদ্ভাবন ও সংরক্ষণ ভোগে সাহায্য করে। একে Zimmermann উৎপাদনের প্রতিনিধি বলেছেন। As an agent of production man contributes his labour, mental and physical, with the aid, "advice and consent of nature he builds culture to render more effective his production efforts, and to lessen the impact of resistances; he discovers new ways and invents new arts; his aspirations furnish him purpose." জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটলে সম্পদ ভোগ ও ব্যবহারের মাত্রা বেড়ে যায়। তাই বলা চলে মানুষ একাধারে সম্পদ উৎপাদনের উপাদান ও অন্যদিকে ভোক্তা। United Nations World Economic Survey-র মতে "human resources are both the ends to which the effort is, directed and the means by which it is carried out" জিমারম্যান কথাটিকে একটু সহজ করে বলেছেন, "Man is predestiued to be the direction, planner and aspirer." নির্দেশনা পরিকল্পনা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক মানুষ নতুন কোন কিছু সৃষ্টিতে যেমন আনন্দ পায়, তেমনি দ্রব্য ব্যবহার ও ভোগ করেও কম আনন্দ পায় না। অবশ্য দেশ-কালের (spatio-temporal) পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের এই দুই ভূমিকার তফাৎ হয়।

এটা ঠিক যে প্রকৃতিদত্ত বস্তুকে মানুষ সম্পদে পরিণত করছে, আর তা সম্ভব হচ্ছে শ্রমের মারফৎ। প্রকৃতিকে পাল্টাবার কল্পনা করলে (যদিও বাস্তবে তা আংশিক সম্ভবপর), চাহিদা মেটাতে হলে শ্রম প্রয়োজন। মানুষ পরিশ্রম করে, আর তা নিজের জন্যই করে। এঙ্গেলস যাকে বলেছেন, "labour created man himself", শ্রমের দ্বারাই মানুষের গঠন ও আকার-অবয়বে হেরফের ঘটে।

সম্পদ ভোগকারীরূপে মানুষের চাহিদা তিন ধরণের—মৌলিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চাহিদা।

মৌলিক চাহিদা ঃ খাদ্য ও পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থানের চাহিদা হল মানুষের প্রাথমিক ও মৌলিক চাহিদা। এগুলো জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন, তাই এদেরকে মৌলিক চাহিদা (basic needs) বলে। এই মৌলিক চাহিদা থেকেই সম্পদের সৃষ্টি।

সাংস্কৃতিক চাহিদা ঃ প্রাথমিক বা মৌলিক চাহিদা পূরণ হলে মানুষের চাহিদার শেষ হয় না। জীবনে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যাচর্চা, শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্পকলার চাহিদার সৃষ্টি হয়। এইভাবে চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে সম্পদও বাড়ে এবং মানুষও সেই সম্পদ দিয়ে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব ও প্রয়োজন মেটায়। অর্থনীতির নিয়ম হল চাহিদা সম্পদ সৃষ্টিতে প্রেরণা যোগায়। চাহিদার ব্যাপ্তি ও গভীরতার হিসেবে সম্পদ সৃষ্টির ব্যাপকতারও হেরফের ঘটে। এইভাবে চাহিদা ক্রমশঃ বাড়ে বলে মানুষকে সমান তালে সম্পদ সৃষ্টি করতে হয়। তাই বলা চলে মানুষ একাধারে সম্পদের স্রষ্টা, অন্যধারে ভোক্তা। মানুষের সৃষ্ট সম্পদ মানুষই ভোগ করছে। মানুষ একাধারে সম্পদ ব্যবহার করে চলেছে অন্যদিকে তেমনি সম্পদ সৃষ্টি করে চলেছে এবং স্বীয় জীবনযাত্রার মান উন্নত করছে। তাই বলা চলে সম্পদের ভোক্তা হিসেবে মানুষ পরোক্ষভাবে সম্পদ সৃষ্টি করে চলেছে।

সামাজিক চাহিদা ঃ সরকার ও পরিষেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাথমিক কর্তব্য হল সমাজবদ্ধ মানুষের সামগ্রিক চাহিদা মেটানো। রিও-ডি-জেনিরোর (1992 জুলাই) বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনে (আর্থ সামিট, Earth summit) গৃহীত ইস্তাহার (charter) সামাজিক চাহিদা পূরণের এক বিশেষ উদাহরণ।

4.3.3 সম্পদ ধ্বংসকারীরূপে মানুষ

(i) চাষযোগ্য জমি সম্প্রসারণের নামে বা বন থেকে কাঠ কাটার নামে অনিয়ন্ত্রিতভাবে মানুষ বন ধ্বংস করে চলেছে। খনি থেকে কয়লা আহরণের নামে যথেচ্ছভাবে কয়লা সংগ্রহ করছে। বস্তুতপক্ষে, চাহিদা, যোগান এবং ভোগের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকার জন্য সম্পদ সৃষ্টির নামে মানুষ সম্পদ ধ্বংস করে চলেছে। (ii) আবার এমনও দেখা গেছে যে কোন সম্পদের প্রচলন বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুণ তার বিনাশ ঘটেছে।

এককালে বুনো রবারের (wild rubber) ব্যাপকভাবে চাষ করা হলেও বর্তমানে সিন্থেটিক রবারের বহুল প্রচলন হওয়ায় বুনো রবার চাষ প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে। অনুরূপভাবে এককালে পাট চাষ পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে চালু থাকলে বর্তমানে তা অনেকটা কমে গেছে। কারণ পাটজাত সামগ্রীর বদলে বর্তমানে পলিথিন ব্যাগ, নাইলন ব্যাগ ব্যবহার হচ্ছে। (iii) যুদ্ধ-বিগ্রহ, শ্রেণী সংঘর্ষ (class struggle) রাষ্ট্র বিপ্লব প্রভৃতির ফলেও সম্পদের ব্যাপকভাবে বিনাশ ঘটে। যেমন ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় ঐ এলাকায় অনেক খনিজ তেলের খনি ধ্বংস হয়েছিল। (iv) সঞ্চিত ও সীমিত সম্পদের বিনাশও অবশ্যম্ভাবী। যেমন খনিজ তেল, আকরিক লোহা, মাঙ্গানীজ, তামা ইত্যাদি। ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে এইসব খনিজ পদার্থ নিঃশেষিত হয়ে যায়।

এতক্ষণ সম্পদ ভোগকারী, সম্পদ উৎপাদনকারী ও সম্পদ ধ্বংসকারী হিসেবে মানুষের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হল। এবার নীচে সেই মানুষের বন্টন জানতে পৃথিবীর জনবৃদ্ধি, জনবন্টন ও তার নিয়ন্ত্রণকারী কারণসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হল।

4.4 ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Population Growth in Historical Perspective)

অতীতে মানুষের সংখ্যা কত ছিল, তারা কোথায় বাস করতো, তারা কি করতো, তাদের আচার-আচরণ কী রকম ছিল, কী কী পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটল, গ্রাম কিভাবে শহরে পরিণত হলো, এসব সম্বন্ধে কৌতূহল থাকা খুবই স্বাভাবিক। কথায় আছে—'Present is the key to the past', অন্যদিকে অতীতের বন্ধ দরজা খুললে পৃথিবীর প্রাচীন জনসংখ্যা বিষয়ক বহু তথ্য জানতে পারবো, যা অনেক সময় আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণেও সাহায্য করবে।

মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি কিভাবে ঘটল, কী কী ধাপের মধ্যে দিয়ে মানুষ বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছল তা নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব।

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের সময় থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর কোথায় কতজন লোক বাস করতেন, জনঘনত্ব বা কত ছিল, তা Deevey-র "Scientific American" পত্রিকায় (Vol 203, 1960) প্রকাশিত "Human Population" নামক প্রবন্ধটি থেকে তুলে দেওয়া হল (সারণি-4.1) কৃষি বিপ্লবের পর থেকেই পৃথিবীর জনসংখ্যা বড় রকমের বাড়-বৃদ্ধি ঘটেছিল তবে এটা ঠিক যে খাদ্যসংগ্রহ থেকে কৃষিকাজে অংশ নিতে কয়েক হাজার বছর কেটে যায় (চিত্র 4.1)।

সারণি 4.1

বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব

বছর আগে	সাংস্কৃতিক অবস্থা	বাসস্থান	মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ান হিসেবে)	অনুমিত জনঘন্তব (প্রতি বর্গকিমিতে)
1.000.000	নিম্ন প্রস্তরযুগ (শিকার ও সংগ্রহ)	আফ্রিকা	0.125	0.004
300.000	আদি প্রস্তরযুগ (শিকার, সংগ্রহ)	আফ্রিকা ইউরেশিয়া	1	0.012
25.000	মধ্য প্রস্তরযুগ (শিকার, সংগ্রহ)	ইউরেশিয়া	3.34	0.04
10.000	নব প্রস্তরযুগ (শিকার সংগ্রহ)	সমস্ত মহাদেশ	5.32	0.04
6.000	গ্রামীণ কৃষি ও নতুন নগরায়ন	পুরানো পৃথিবী নতুন পৃথিবী	86.5	1.0 0.04
2.000	গ্রামীণ কৃষি ও নগরায়ন	সমস্ত মহাদেশ	133	1.0
310(1650)	কৃষি ও শিল্প	ঐ	545	3.7
210(1750)	ঐ	ঐ	728	4.9
160(1800)	ঐ	ঐ	906	6.2
60(1900)	ঐ	ঐ	1.610	11.0
10(1950)	ঐ	ঐ	2.500	16.4
2.000 (খ্রীঃ অঃ) (আনুমানিক)	ঐ	ঐ	6.270	46.0

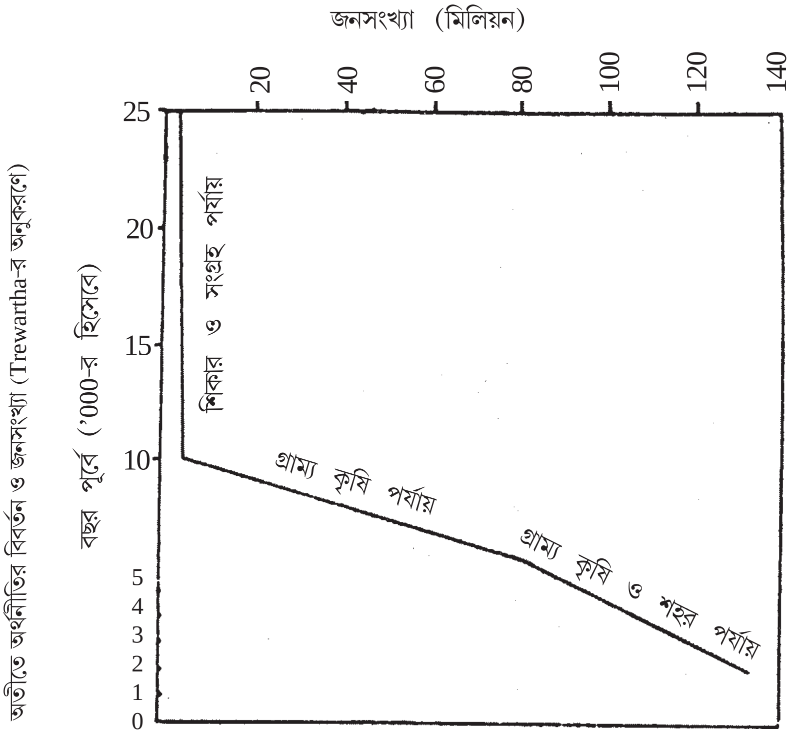

চিত্র — 4.1 অতীতে অর্থনীতির বিবর্তন ও জনসংখ্যা (Trewatha-র অনুকরণে)

চাষবাসের শুরুর সময় থেকে কিছু কিছু এলাকায় ও পরবর্তীকালে বিস্তীর্ণ এলাকায় শস্য চাষ ও পশুপালন শুরু হয়েছিল, এর ফল ছিল ব্যাপক। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে দূরত্ব ছিল, তা আস্তে আস্তে সরে গেল। বিনিময়ের উদ্বৃত্ত পণ্যসামগ্রীর যোগান পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দিল। ব্যবধান স্থান করে দিল সম্পর্কের। ফলে পরিবর্তন ঘটল তাড়াতাড়ি।

প্রাচুর্য আর খাদ্য যোগানের নিরাপত্তা প্রতি বর্গ পরিমাণ জায়গায় আরও বেশি সংখ্যক লোকের বসবাসের সুযোগ করে দিল। আর খাদ্যসমগ্রী উৎপাদন করতে কিছুসংখ্যক লোকের প্রয়োজন হল। ফলতঃ কিছু লোক নতুন নতুন কাজের জন্য পাওয়া গেল। তাই কৃষি আবিষ্কারের পর তাঁত, লাঙল, চাকা, ধাতব জিনিষের প্রয়োজন ঘটল। Zelinsky-র ভাষায় "This was the first decisive step toward 'Control of the environment.' (P. 84) Zelinsky আরও লিখেছেন যে, "Socio economic development was hardly more advanced a that it had been in the farvoured localities among specialised collectors, hunters and fishermen".

বর্তমান যুগ (1650 খ্রীঃ পর) (The modern period after 1650) আমরা আগেই দেখেছি যে একসময় কৃষিবিপ্লব গণবৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। পরবর্তীকালে শিল্প-বিজ্ঞান বিপ্লব এই ব্যাপারে সাহায্য করেছিল। তবে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার একদিকে যেমন চাষবাস বা বিভিন্ন কর্মকাণ্ড চেষ্টায় জোয়ার এনেছিল, তেমনি মৃত্যুহার রোধ করে জনবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক বিপ্লব এনেছিল। 1650 থেকে 1950 অর্থাৎ তিনশ বছরে লোকসংখ্যা বেড়েছিল 5 গুণ। তবে 1850 থেকে 1950 এই এক শতাব্দীর মধ্যে বৃদ্ধির হার ছিল একটু বেশি, শতকরা 100 ভাগ। Dudley Stamp-এর Our Developing World থেকে পৃথিবীর (1650-1950 খ্রীঃর মধ্যে) জনবৃদ্ধির শতকরা হারটি তুলে দেওয়া হল ঃ (সারণি 4.2)

সারণি 4.2

বছর	% বৃদ্ধির হার	বছর	% বৃদ্ধির হার
1650-1700 }	16.8	1800-1850	29.2
1700-1750 }		1850-1900	37.3
1750-1800	24.4	1900-1950	53.9

1900-1950 এই পঞ্চাশ বছরে যদিও বৃদ্ধির হার 53.9 শতাংশ হয়েছে, তবুও বৃদ্ধির হার সব দশকে সমান ছিল না। কারণ, এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দুটি বিশ্বযুদ্ধ (প্রথম 1914-1918 ও দ্বিতীয় 1939-1945) ঘটেছে (চিত্র 4.2)।

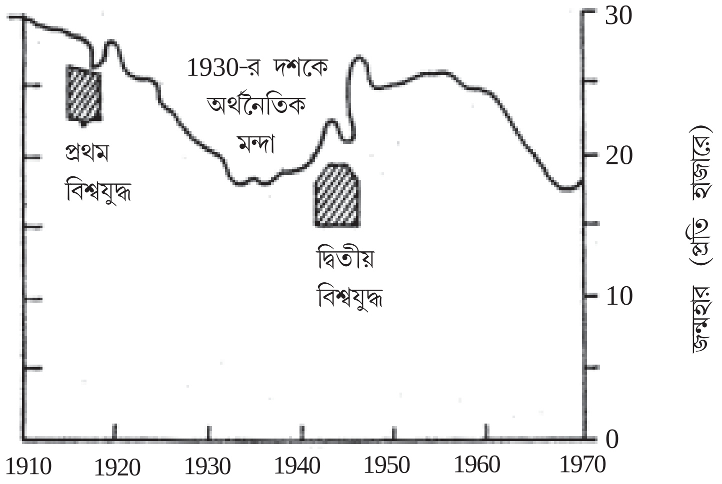

চিত্র — 4.2 বর্তমান শতাব্দীতে (1910-70) পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি-প্রকৃতি

তাতে বহু প্রাণহানি ঘটেছে, বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষদের মৃত্যু। এছাড়া 1930-এর দশকে অর্থনৈতিক মন্দা জনবৃদ্ধিকে প্রতিহত করেছিল। 1950-এর পর থেকে পৃথিবীর জনবৃদ্ধির হার কিছুটা কমে গেছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি ও আধুনিক চিকিৎসার প্রসার এর জন্য দায়ী। 1820 সালের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা 1,000 মিলিয়ান পৌঁছেছিল। 1930 সাল নাগাদ তা হল 2,000 মিলিয়ান, 1960 সালে 3,000 মিলিয়ান, 1975 সালে 4,000 মিলিয়ান 1996 সালে 5,804 মিলিয়ান। বলা যায় যে পৃথিবীর জনসংখ্যা 1,000 মিলিয়ান পৌঁছাতে কয়েক হাজার বছর লেগেছিল, 2,000 মিলিয়ান পৌঁছতে মাত্র 100 বছর, 3,000 মিলিয়ান হতে প্রায় 30 বছর, আর 4,000 মিলিয়ান হতে মাত্র 15 বছর লেগেছে। অনুমান করা যায় যে, 2,000 সাল নাগাদ লোকসংখ্যা 6,000 মিলিয়ান ছাড়িয়ে যাবে (চিত্র 4.3)। সারণি 4.3-তে প্রায় 300 বছরের জনসংখ্যার চিত্রটি তুলে ধরা হল ঃ—

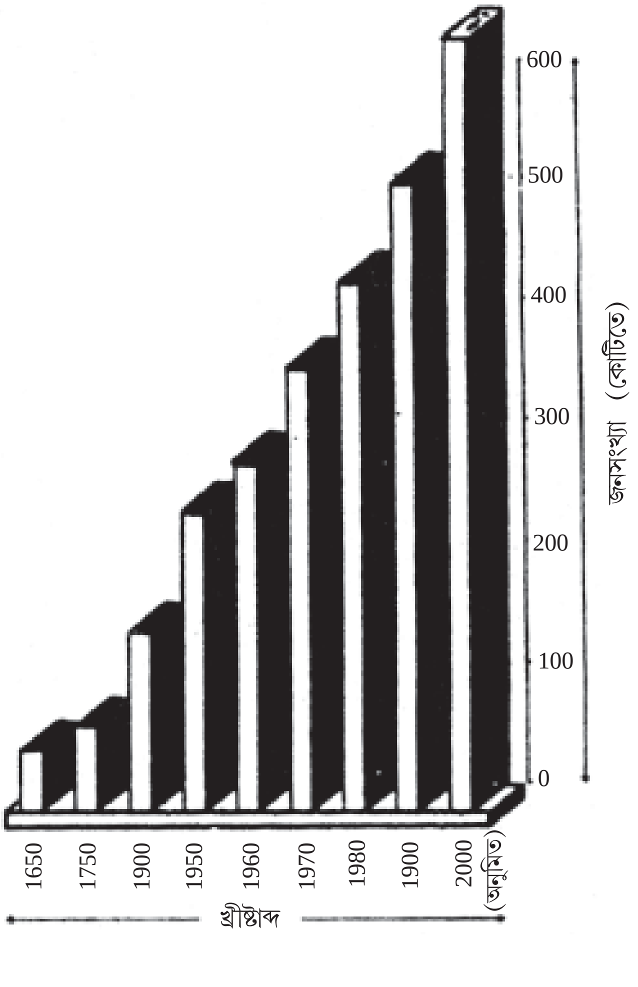

চিত্র — 4.3 পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি-প্রকৃতি

সারণি 4.3

পৃথিবীর জনসংখ্যা (1650 খ্রীঃ থেকে 1996 খ্রীঃ) (In crore)

খ্রীঃ	জনসংখ্যা	খ্রীঃ	জনসংখ্যা
1650	54.5	1950	240.0
1750	72.8	1960	298.6
1800	90.6	1970	361.2
		1980	442.7
1850	100.0	1984	476.3
1900	161.0	1996	580.4

1951 সালে U.N.O থেকে প্রকাশিত "The Future Growth of World Population" পুস্তিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে পৃথিবীর 2,500 মিলিয়ান জনসংখ্যা পূরণ হতে 2,00,000 বছর লেগেছিল। কিন্তু আর 2,000 মিলিয়ান জনসংখ্যা পূরণ হতে মাত্র 30 বছর লাগবে। Trewartha যথার্থই বলেছেন যে পৃথিবীর জনবসতি ও অর্থনৈতিক কার্যাবলীর বড় রকমের পরিবর্তন ছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার বহুদিন ধরে চলতে পারে না। তত্ত্ববিদ্‌রা (Demographers) সকলে একমত যে এই অনিয়ন্ত্রিত জনবৃদ্ধি এক বিলাসিতা এবং ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের (Population Explosion) অবস্থা সৃষ্টি করবে।

এতক্ষণ আমরা পৃথিবীর জনবৃদ্ধির হার নিয়ে আলোচনা করলাম। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত দু'দশকে এই বৃদ্ধির হার পৃথিবীর জনবৃদ্ধির হারকে বেশি নাড়া দিয়েছে। নীচের সারণি (4.4) থেকেই তা পরিষ্কার হবে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়রাও যথেষ্ট সংখ্যায় বেড়েছেন। শুধুমাত্র নিজেদের মহাদেশেই নয়, মহাদেশের বাইরে যেখানে তারা উপনিবেশ গড়েছেন সেখানেই তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটেছে—

সারণি 4.4

মহাদেশ	1650	1750	1800	1900	1950	1960	1970	1980	1995
এশিয়া	33	48	60	94	132	173.7	230	263.5	341.7
আফ্রিকা	10	9.5	9	12	20	24	29	47.5	74.6
উত্তর আমেরিকা	0.1	0.1	0.6	0.1	21.5	24	28	37.5	43.3
দক্ষিণ আমেরিকা	1.2	1.1	1.9	6.3	11	14	22	24.0	32.4
ইউরোপ	10	14	19	40	55	60	65	68.4	74.9
ওশেনিয়া	0.2	0.2	0.2	0.6	1.3	1.6	1.9	2.3	2.6

অবশ্য বর্তমান শতাব্দীতে এই বৃদ্ধির হার বেশ কিছুটা কমে গেছে। বর্তমানে রাশিয়ার (C. I. S.) অংশ বাদে ইউরোপের জনসমষ্টি পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র 12 শতাংশ। কিন্তু 1920 সালে এই ভাগ ছিল 18 শতাংশ। 1800 সালে থেকে শুরু করে আজ অবধি দুই আমেরিকার (উত্তর ও দক্ষিণ) জনসংখ্যা 10 শতাংশেরও বেশি বেড়েছে। নীচের সারণিতে মহাদেশগুলোর অন্তর্বর্তী জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার তুলে ধরা হল ঃ (সারণি 4.5)।

সারণি 4.5

মহাদেশসমূহের অন্তর্বর্তী জনসংখ্যা বৃদ্ধির % হার

মহাদেশ	1750-1800	1800-1850	1850-1900	1900-1950	1950-1980	1980-1995
এশিয়া	0.5	0.5	0.3	2.0	1.8	19.7
আফ্রিকা	0.01	0.1	0.4	2.4	2.9	57.0
উত্তর আমেরিকা	—	2.7	2.3	1.1	0.6	15.5
দক্ষিণ আমেরিকা	0.08	0.9	1.3	2.9	2.7	35.0
ইউরোপ	0.4	0.6	0.7	0.8	0.2	9.5
ওশেনিয়া	—	—	—	1.8	1.3	13.0
পৃথিবী	0.4	0.5	0.5	0.8	1.8	28.6

এর থেকে যা আমাদের চোখে পড়ে, তা হল পৃথিবীর অনুন্নত (আফ্রিকা) ও উন্নয়নশীল (দঃ আমেরিকা ও এশিয়া) মহাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিপুল হার। এই সব কটি মহাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হল আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়া। এর ফলে মৃত্যুহার কমে গেল কিন্তু সেই তুলনায় জন্মহার বেশি থেকে গেল। বিগত দু'শো বছরে এই সব মহাদেশের বিভিন্ন দেশে ইউরোপীয়রা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ঔপনিবেশিকদের দৌলতে বিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুযোগ-সুবিধে বৃদ্ধি পায়। ফলে এখানে মৃত্যুহার কমে যায়। কিন্তু জন্মহার বেশি থাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি থেকে যায়। যেমন বলা চলে ভারতে গড়ে একজন নারী 3 জন সন্তানের জন্ম দেন। অবশ্য এর মধ্যেও কিছুটা পার্থক্য আছে। শহরাঞ্চলে এই হার কিছুটা কম, আবার উত্তর ভারতের চারটে রাজ্যে এই হার 5 জন। আফ্রিকায় গড়ে একজন নারী 6 জন সন্তানের জন্ম দেন। অবশ্য এদের মধ্যে 2/3 জন শিশু সন্তান মারা যায়। পৃথিবীতে মৃত্যুহার কমার একটি বড় কারণ হল শিশুমৃত্যুর সংখ্যা কমে যাওয়া। এশিয়ার মধ্যে একমাত্র জাপানই কঠোরভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করেছে। এখানকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ইউরোপীয় দেশগুলোর সাথে তুলনীয়। এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার মহাদেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফল হল চরম দারিদ্র্য বেকারী, অনাহার ও অপুষ্টি।

4.6 উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশসমূহের জনবৃদ্ধির তুলনা

সারণি 4.6

উন্নয়নশীল দেশ	জনসংখ্যার বৃদ্ধির বাৎসরিক % হার	উন্নত দেশ	জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাৎসরিক % হার
ব্রাজিল	2.0	বেলজিয়াম	0.2
ভারত	2.1	ইটালি	0.2
চীন	1.4	জার্মানি	0.2
থাইল্যান্ড	1.0	জাপান	0.5
জাম্বিয়া	3.9	যুক্তরাজ্য	0.2
ইকুয়েডর	2.2	যুক্তরাষ্ট্র	1.0

ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও ওশেনিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের গতির মধ্যে সংগতি রয়েছে। ইউরোপে কিছু দেশ আছে যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূণ্যের কাছাকাছি। কানাডা ও ওশেনিয়ার এমন কিছু স্থান রয়েছে যেখানে সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। স্বভাবতই সেখানে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে দক্ষিণ আমেরিকার জনবৃদ্ধির একটি কারণ হল সেখানকার আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে মানুষের মনে অতিরিক্ত উচ্চাশা পোষণ, অর্থাৎ আগামী দিনের সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা কম রয়েছে বলে সেখানকার বাসিন্দারা মনে করেন। আশার কথা হল এশিয়া, দঃ আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র দেরীতে হলেও জনাধিক্যের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক হয়েছেন এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে যত্নবান হয়েছেন। এর বিপরীত মেরুতে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপের কিছু দেশ যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেবার জন্য বেশ কিছু সরকারী প্রকল্প চালু রয়েছে।

পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ইতিহাস আলোচনা করলে কয়েকটা জিনিস চোখে পড়ে। প্রথমতঃ পৃথিবীর জনসংখ্যা তিনবার হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়েছে—(i) 8000 খ্রীঃ পূঃ, (ii) 1750 খ্রীঃ, (iii) 1950 খ্রীঃ (Rubenstein, 1990)। প্রতিবারই নতুন নতুন কৌশলের উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। কলাকৌশলের অগ্রগতি মানুষকে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের ওপর আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ করতে শিখিয়েছে। শুধু তাই নয়, কলাকৌশলের এই অগ্রগতি পৃথিবীকে আরও বেশি জনসংখ্যা ধারণ করার ক্ষমতা জাগালো। পৃথিবীতে জনবৃদ্ধি (1) প্রথমবার কৃষিবিপ্লব (2) দ্বিতীয়বার শিল্পবিপ্লব এবং (3) তৃতীয়বার চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সম্ভব হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ যতদিন গেছে, ততই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেড়েছে। মানুষের ইতিহাসের প্রথম অবস্থায় পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বছরে মাত্র 0.0015 শতাংশ। আর বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে 1.7 শতাংশ। অবশ্য

এই বৃদ্ধির হার সর্বত্র সমান হয়নি। উন্নত উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বৃদ্ধির হারে যথেষ্ট ফারাক রয়েছে। পরবর্তী আলোচনায় বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি ও বৃদ্ধিজনিত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হল।

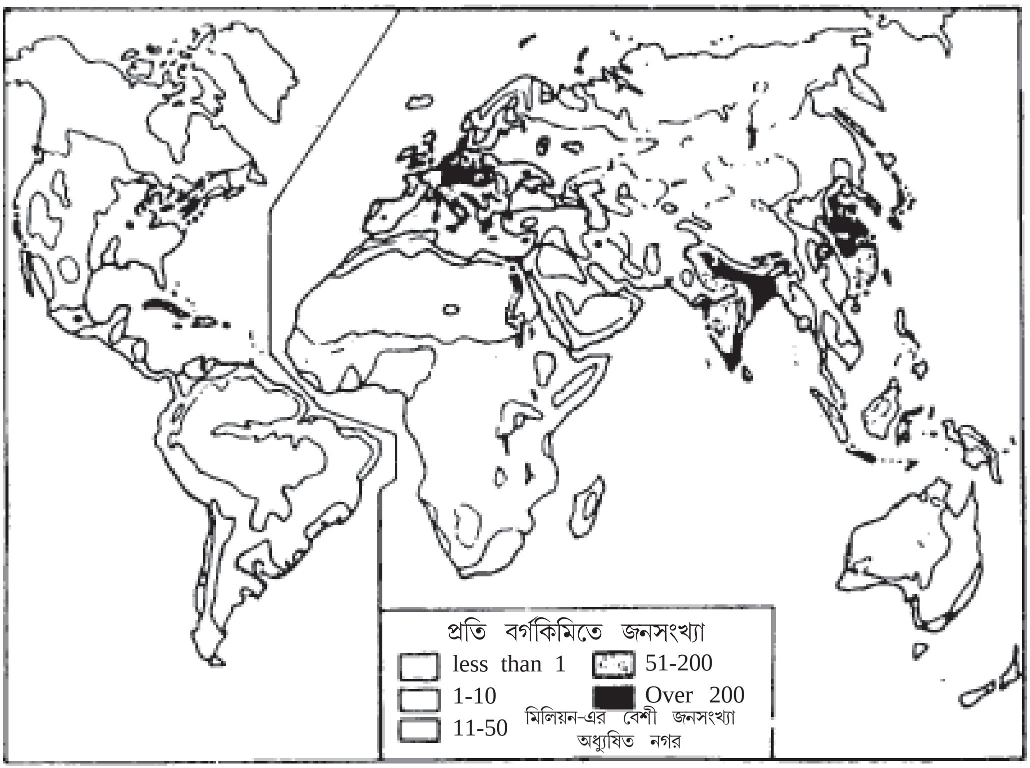

চিত্র — 4.4 পৃথিবীর জনবসতির ঘনত্ব

4.5 জনসংখ্যার বন্টন ও ঘনত্ব নিয়ন্ত্রক কারণসমূহ (Distribution of Population and the factors controlling density of Population)

পৃথিবীর সবখানে জনবসতি দেখা যায় না। তাই অঞ্চল ভেদে জনঘনত্বের বিরাট হেরফের রয়েছে। জাতিপুঞ্জের (U.N.O.) জনসংখ্যা পরিসংখ্যান অনুসারে (1984 সালে) পৃথিবীতে গড়ে প্রতি বর্গকিমিতে 35 জন লোক বাস করে। মহাদেশগুলোর মধ্যে এশিয়া সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ। প্রতি বর্গকিমিতে 101 জনের বাস (সারণি 4.2)। দ্বিতীয় স্থানে আছে ইউরোপ। প্রতি বর্গকিমিতে 99 জন। এর পরের স্থান হলো যথাক্রমে দক্ষিণ আমেরিকা (19), আফ্রিকা (18), উত্তর আমেরিকা (12) এবং ওশিয়ানিয়া (3)।

সারণি 4.7

পৃথিবীর জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব

মহাদেশ	**জনসংখ্যা (কোটি)** 1998	**জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে**
আফ্রিকা	77.9	18
এশিয়া	360.6	101
ইউরোপ	73.9	105
দক্ষিণ আমেরিকা	33.2	19
উত্তর আমেরিকা	43.6	12
ওশিয়ানিয়া	2.9	3

সূত্রা ঃ U. N. Statistical Year Book, 1990-91.

এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে বিস্তৃত বলে C.I.S.-র জনসংখ্যা আলাদা করে দেখানো হয়েছে।

কোন অঞ্চলের জনসংখ্যার চাপকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Trewartha এবং Clarke সেখানকার আয়তন ও জনসংখ্যার অনুপাতকে ভিত্তি হিসাবে ধরেছেন। হিসেব করে দেখা গেছে যে পৃথিবীর 80 শতাংশ জনতা স্থলভাগের মাত্র 20 শতাংশ জায়গায় বসবাস করেন। বিশদভাবে দেখতে গেলে দেখা যায় যে এই জনসংখ্যায় বন্টনে তারতম্য রয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে বলা চলে চীনের পশ্চিমদিক জনহীন, অথচ পূর্বদিক জনবহুল। ভারতেও গঙ্গা সমভূমির জনবহুল এলাকার পাশাপাশি শিবালিক অঞ্চলে কম জনঘনত্ব কিংবা ইন্দোনেশিয়ার ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে পাশাপাশি জাভা দ্বীপের অপেক্ষাকৃত জনবিরল দ্বীপগুলোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

জনসংখ্যার বন্টন ও ঘনত্বে এই আঞ্চলিক বৈষম্যের পেছনে প্রাকৃতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জনমিষিক কারণগুলো দায়ী।

4.5.1 প্রাকৃতিক কারণ (Physical factors)

জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথেষ্ট অগ্রগতি সত্ত্বেও আজ নানারকম প্রাকৃতিক বাধা বসতি বিস্তারে বাধা দান করে। এই কারণে শীতল তুন্দ্রা অঞ্চল, মরুভূমি, বন্ধুর পার্বত্যভূমি, জলভূমি এবং আর্দ্রক্রান্তীয় অঞ্চল আজও বলতে গেলে জনশূন্য রয়ে গেছে।

জনসংখ্যার বন্টন ও জনঘনত্বের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে জলবায়ু (উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত), মরুভূমি, মাটি, শক্তিসম্পদ ও খনিজ কাঁচামাল এবং গম্যতা (accessibility)।

4.5.2 জলবায়ু (Climate)

জনসংখ্যার স্থানিক বন্টন উষ্ণতা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও দীর্ঘকালের শীত ইত্যাদি কারণগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়। এটা খুব লক্ষ্য করা গেছে যে মানুষ জলবায়ুর প্রভাবকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যেতে পারে না। Finch and Trewartha তাঁদের 'Elements of Geography Physical & Cultural' বইতে শীতল মরুভূমি, উষ্ণ মরুভূমি ও আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চলকে বসতিহীন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। শা (Shaw, 1955) দেখিয়েছেন যে উষ্ণতাজনিত প্রতিকূল প্রভাবের দরুণ ভূপৃষ্ঠের প্রায় 12 মিলিয়ন বর্গমাইল এলাকায় খুব কম লোক বাস করে। লাওরির (Lowry) মতে প্রধানত দীর্ঘস্থায়ী শীত ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা স্বল্পকালীন গ্রীষ্মের দরুণ তুন্দ্রা অঞ্চলের জলবায়ু মানুষ ও উদ্ভিদ উভয়ের স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে বাধাস্বরূপ। তাছাড়া স্বল্পকালীন গ্রীষ্মকালে জলনিকাশের অভাবে জলাভূমি সৃষ্টি হওয়ায় শীতল অঞ্চল বসতি বিস্তারের পক্ষে অনুকূল নয়। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু মানুষের বসবাসের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। Huntington-র মতে এই ধরণের জলবায়ু মানুষের স্বাস্থ্য ও মানসিক বিকাশের পক্ষে সবচেয়ে ভাল। "Temperate marine climate with their stimulating and invigorating effects on the physiological and mental framework of men are among the climates par excellence the best area for maximum concentration of human settlement." (P. 392)

অন্যদিকে, উষ্ণমরু অঞ্চলে প্রচণ্ড গরম, কম ও অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত বসতি গড়ে ওঠার পক্ষে অনুকূল নয়। সাধারণভাবে উষ্ণতা বসবাসের পক্ষে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। কারণ তা উদ্ভিদের বিকাশ ও ফসল ফলাবার পক্ষে সহায়ক। উষ্ণ মরু অঞ্চলে উষ্ণতার চেয়েও তীব্র জলাভাব এখানকার বিরল বসতির জন্য দায়ী। কম ও অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত এখানকার কৃষিকাজকে বিপর্যস্ত করে তোলে। বেকারের (Bakar, 1928) মতে ভূপৃষ্ঠের প্রায় 15 মিলিয়ন বর্গমাইল এলাকা হল অনুর্বর জমি যা কৃষিকার্যের পক্ষে অনুপযুক্ত। এর সমাধানে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হলেও প্রচুর ব্যয় (যেমন সমুদ্রের জল লবণমুক্ত করে ব্যবহার করা বা কৃত্রিম বৃষ্টিপাত) ও প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতার দরুণ উষ্ণমরু অঞ্চলের অধিকাংশ জমিতে চাষবাস করা একাট অলীক কল্পনাই রয়ে গেছে।

অন্যদিকে পুরানো পৃথিবীর (Old World) একই ধরণের জলবায়ু অঞ্চল অনেক ঘনবসতিপূর্ণ। সম্ভবত নতুন পৃথিবীতে (আমেরিকা) অপেক্ষাকৃত ভাল জমি মেলাতে ইউরোপীয়রা ক্রান্তীয় অঞ্চলের নীচু জায়গা ছেড়ে সেখানে বসবাস শুরু করেছিলেন। তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার দরুণ এশিয়াবাসীরা প্রতিটি জায়গায় বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ক্রান্তীয় অঞ্চলের একটানা প্রচুর উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত, ঘন জঙ্গল, ধৌত মৃত্তিকা, প্রচণ্ড ভূমিক্ষয় বসতি গড়ে ওঠার পক্ষে প্রতিকূল অবস্থা। মজার ব্যাপার হল এই যে নতুন পৃথিবীর আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চলের অনেক স্থানই এখনও জনবিরল হয়ে আছে।

4.5.3 ভূমিরূপ (Land form)

অনুকূল ভূ-প্রাকৃতিক স্থানে মানুষ বসবাস করে। তুলনামূলকভাবে বন্ধুর ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে সীমিত কৃষিজমি ও চাষের কাজের প্রচুর ব্যয়ের দরুণ সেখানে বসতি খুব একটা গড়ে ওঠে না। মূলত এইসব অসুবিধার জন্য পৃথিবীর জনসংখ্যার মাত্র 20 শতাংশ লোক 500 মিটারের বেশী উচ্চতায় বসবাস করেন। (Stasjewski, 1957)। Semple-র (Influence of Geographic Environment) ভাষায় "Mountain regions are as a rule more sparsely settled than plains". Clarke বলেছেন যে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার 56 শতাংশ লোক সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 200 মিটারেরও কম উচ্চতায় বাস করেন। তাই আমরা বলতে পারি যে উচ্চতা ও জনবসতির মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে। জাপানের কথা ধরা যাক। এখানকার অধিকাংশ বসতি সমতল এলাকায় গড়ে উঠেছে। কারণ চাষবাসের জন্য এখানে প্রচুর উর্বর জমি পাওয়া যায়। এই অংশে শিল্প এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাও যথেষ্ট উন্নত। উচ্চতা ছাড়াও ভূমির ঢাল জনসংখ্যা বন্টনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। খাড়া ঢালযুক্ত এলাকায় চাষের জন্য জমি পাওয়া কষ্টকর। এই সব জায়গায় ধাপ কেটে চাষবাস ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে।

বসতি স্থাপনে উচ্চতা এবং ঢাল ছাড়াও জলনিকাশী ব্যবস্থার একটা ভূমিকা আছে। ত্রুটিপূর্ণ জলনিকাশের ফলে সৃষ্ট জলভূমি ও ঝোপঝাড় ঐ স্থানে জনবসতি গড়ে ওঠার পক্ষে এক বাধাস্বরূপ। Zelinsky (1966) বলেছেন বসতির দিক দিয়ে ভারত ও চীনের ব-দ্বীপ সমভূমির কাছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ব-দ্বীপগুলো (টোংকিন [Tangkin] অঞ্চল বাদে) এক বৈসাদৃশ্য মনে হয়। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত এই অঞ্চলটি জলাভূমি ছিল। অনুরূপভাবে, অনুন্নত জলনিকাশী ব্যবস্থার দরুণ গুজরাট সমভূমির তুলনায় কচ্ছের রণ এলাকায় বিক্ষিপ্ত জনবসতি গড়ে উঠেছে।

ভৌম জলস্তরের গভীরতা গ্রাম্য জনবসতির আকৃতি ও বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। এটা দেখা গেছে যে যেখানে ভৌম জলস্তর ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি রয়েছে, সেখানকার জনবসতির আকৃতি ছোট ও সংঘবদ্ধ হয়। ইরানের উত্তর উপকূলীয় সমভূমিতে ভৌম জলস্তর ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি থাকাতে জনসংখ্যার বিস্তার খুব ছোট হলেও তা ঘনসন্নিবিষ্ট। অন্যদিকে, ইরানের মধ্যভাগে ভৌম জলস্তর খুব গভীর হওয়াতে জলের উৎসের কাছাকাছি জনবসতি বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে উঠেছে। ভারতের পাঞ্জাব ও হরিয়ানাতে দেখা গেছে যে উচ্চ অংশের সমভূমির তুলনায় নিম্ন প্লাবনভূমিতে জনবসতির আকৃতি খুব ছোট।

4.5.4 মৃত্তিকা (Soil)

মাটির গুণাগুণ আংশিকভাবে জনবসতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রায় একই রকম জলবায়ু, ভূমিরূপ, যোগাযোগের সুবিধে, মাটির গঠন এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে হেরফের ঘটায়। এর ফলে জনসংখ্যার বন্টনে তফাৎ চোখে পড়ে। Wolfender (1925) তাঁর World Population Centres in Relation to Soils-এ উল্লেখ করেছেন যে উচ্চ-মধ্য অক্ষাংশের পড্‌সল মাটি ও ক্রান্তীয় অঞ্চলের ল্যাটেরাইট

মাটি সাধারণত নিবিড় কৃষিকার্যের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে সেই সব এলাকায় বিরল জনবসতি দেখা যায়। অন্যদিকে জাপান ও ইন্দোনেশিয়ার আগ্নেয়গিরি অঞ্চলের কালো রঙ-এর মাটি, সিন্ধু ও হোয়াংহো নদীর অববাহিকা অঞ্চলের উর্বর পলিমাটি, মধ্য ও উপক্রান্তীয় অক্ষাংশের তৃণভূমির মাটি উর্বর বলে বিরাট সংখ্যক জনতার ভরণপোষণে সক্ষম।

4.5.5 (2) অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণ

4.5.5.1 শক্তি সম্পদ ও খনিজ (Power Resources & Minerals)

জনসংখ্যা বন্টনের ক্ষেত্রে শক্তিসম্পদ ও খনিজ কাঁচামালের একটা ভূমিকা আছে। তাই দেখা যায় শীতল সাইবেরিয়া কিংবা উষ্ণ সাহারা মরুভূমির মতো প্রতিকূল পরিবেশে খনিজ তেলকে কেন্দ্র করে জনবসতি গড়ে উঠেছে। একই কারণে দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা মরুভূমিতে নাইট্রেটকে কেন্দ্র করে খনিজ শহরের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিকূল পরিবেশ হলেও খনিজ পদার্থকে কেন্দ্র করে আলাস্কার মতো শীতল অঞ্চলে জনবিকাশ সম্ভব হয়েছে। কয়লার মতো খনিজ পদার্থ আবিষ্কারের শুরুতেই গ্রেটবিট্রেন, ফ্রান্স, পোল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার জনবন্টনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চল হলেও ছোটনাগপুর মালভূমির সম্পদ সেখানে প্রচুর জনসমাবেশ ঘটিয়েছে।

4.5.5.2 যোগাযোগ (Accessibility)

কোন জায়গার লোক আকর্ষণ ও ভরনপোষণ করবার ক্ষমতা তার অবস্থান ও প্রধান যোগাযোগের মাধ্যমের ওপর নির্ভর করে। এটা দেখা গেছে যে বিভিন্ন মহাদেশগুলোর মধ্যভাগ অপেক্ষা প্রান্তভাগে লোকবসতি ঘন। বর্তমান শতাব্দীতে ব্যবসাবাণিজ্যের বিকাশ উপকূল ও তার পশ্চাদভূমিতে বসতি বিস্তারের সাহায্য করেছে যা যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য সম্ভব হয়েছে।

4.5.5.3 সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয় কারণসমূহ (Social and Cultural Factors)

বর্তমান দিনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি জনসংখ্যা বন্টনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে Croke (1971) লক্ষ্য করেছেন যে দ্রুত নগরায়ণের ফলে জনসংখ্যা বন্টনের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব কমেছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে জনবসতির ইতিহাস, অর্থনীতির প্রকৃতি, প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, সামাজিক সংগঠন ইত্যাদি।

ঐতিহাসিকভাবে বলতে হয় নতুন ও পুরোনো পৃথিবীতে বর্তমানে জনসংখ্যা বন্টনের যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, তার ব্যাখ্যা তাদের জনবসতির ইতিহাসে পাওয়া যাবে। বসতি বিস্তারে অর্থনৈতিক কারণগুলো অবশ্যই প্রধান। কারণ, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনগ্রসর এলাকায় জনবসতি বিকাশের সুযোগ কম থাকে। কোন স্থানের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আশেপাশের এলাকা থেকে লোকজনকে সেখানে টেনে আনে। একটি বিশেষ

অর্থনৈতিক কাঠামে একটি নির্দিষ্ট জনবন্টনের ধাঁচ (Pattern) দেখা যায়। যেমন, কৃষি বসতি শিল্প বসতির থেকে আলাদা হতে বাধ্য। কারণ, দুটি স্থানের মূল কাঠামো ভিন্ন। এভাবে দেখা যায় যে শিল্পকেন্দ্রিক জনবসতির আয়তন শুধু বড় নয়, কৃষিভিত্তিক সমাজের তুলনায় তার জনঘনত্বের পরিমাণও অনেক বেশি।

বহুবিধ রাজনৈতিক কারণ যা স্থান-কাল ভেদে জনসংখ্যা বন্টনে প্রভাব ফেলেছে, তার মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক সীমারেখা সৃষ্টি, নিরপেক্ষ অঞ্চল (neutral zone), জনসংখ্যার স্থানান্তর ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কিত সরকারী নীতি। স্বাধীন হবার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমারেখা সৃষ্টির ফলে প্রতিবেশী এই দুই রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে নিজ নিজ ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি বাস করার ঝোঁক দেখা যায়। ফলে হিন্দু ও মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

4.5.6 (3) জনমিতি উপাদান (Demographic Elements)

প্রজনন হার, মৃত্যুহার ও পরিমাণের কারণে জনসংখ্যা ও জনঘনত্বের বন্টনে অঞ্চলগত হেরফের দেখা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যখন স্থায়ী রাজনৈতিক সীমারেখা দিয়ে ভাগ হলো, তখন অধিকাংশ দেশই পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে নিজেরাই আইন প্রণয়ন করল। সেই সঙ্গে স্বাভাবিক প্রজনন হারকে নিয়ন্ত্রণে রাখল। কিন্তু এর বিপরীতে জনবহুল পুরোনো পৃথিবী আরও জনাকীর্ণ হয়ে পড়ল।

এইসব কারণগুলো ছাড়াও কতকগুলো প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিপর্যয় অস্থায়ীভাবে জনসংখ্যার মানচিত্রকে পরিবর্তিত করে। Zelinsky-র মতে ভূমিক্ষয়, অগ্ন্যুৎপাত, বন্যা, হিমবাহের প্রসারণ, ঝড়, মহামারী, আগুন, খরা ইত্যাদি হলো প্রাকৃতিক বিপর্যয়। কোন জাতিকে নির্মূলকরণ (হিটলার কর্তৃক ইহুহীদের) বা বিরাট সংখ্যক জনতার জন্মভূমিতে ফিরে আসা এসব হলো সামাজিক বিপর্যয়।

সবশেষে Zelinsky-কে উদ্ধৃতি করে এটুকু আমরা বলতে পারি যে কোন স্থানের বর্তমানের জনসংখ্যার প্রকৃতিকে বুঝতে হলে ঐ স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতি, তার সংস্কৃতি সামাজিক বিন্যাস এবং সর্বোপরি, মানবীয় ভূগোলের সব কয়টি দিকই খতিয়ে দেখতে হবে।

4.6 পৃথিবীর জনসংখ্যার বন্টন (World Population Distribution)

1984 সালের মাঝামাঝি পৃথিবীতে জনসংখ্যা ছিল 4,763 মিলিয়ান। বর্তমানে (1996) অবশ্য 5.8 বিলিয়নের মত অর্থাৎ 580 কোটি। এর মাত্র 25 শতাংশ উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, জাপান, C.I.S., অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের মতো উন্নত দেশগুলোতে বাস করেন। বাকি 75 শতাংশ আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলোতে বাস করেন। মহাদেশগুলোর মধ্যে এশিয়াই পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ। এখানে পৃথিবীর 50 ভাগের বেশী (মোট জনসংখ্যা 2,777 মিলিয়ন) লোক বাস করেন। এর পরের স্থান হলো যথাক্রমে আফ্রিকা, ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা ও ওশিয়ানিয়া। মজার ব্যাপার হল এই যে অনুন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। এইসব দেশগুলোতে জনভিত্তিক পরিবর্তনের দ্বিতীয়

ধাপে থাকার এখানে জনবিস্ফোরণ লক্ষ্য করা যায়। 1950 সালে পৃথিবীর 70 শতাংশ জনতা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বাস করতেন। কিন্তু 1996 সালে তা বেড়ে 80 শতাংশ দাঁড়াল। পক্ষান্তরে, উন্নত দেশগুলোতে জনমিতি পরিবর্তনের শেষ ধাপে পৌঁছানোর দরুণ সেখানে জনবৃদ্ধি খুব কম হচ্ছে। তাই পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ক্ষেত্রে এইসব দেশগুলোর অবদান কমে যাচ্ছে। 1950 সালে পৃথিবীর জনসংখ্যার 30 শতাংশ লোক এসব দেশে বাস করতেন। কিন্তু 1996 সালে তা কমে 20 শতাংশ দাঁড়িয়েছে।

1996 সালে পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশে অর্থাৎ চীনে লোকসংখ্যা ছিল 1,234 মিলিয়ন, যা উন্নয়নশীল সব দেশগুলোর মোট জনসংখ্যার তুলনায় সামান্য কিছু কম ছিল। এর পরের স্থান (1996 সাল) হল ভারতের (953 মিলিয়ন)*। তারপর রয়েছে (1984 সাল) যথাক্রমে রাশিয়া (275), যুক্তরাষ্ট্র (236), ইন্দোনেশিয়া (162), ব্রাজিল (132), জাপান (119)। বলা যেতে পারে এই সাতটি পৃথিবীর প্রধান জনবহুল দেশ। পৃথিবীর বেশীর ভাগ জনবহুল দেশগুলো এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। এমনকি, জনঘনত্বের দিক দিয়ে এশিয়া ইউরোপকে ছাড়িয়ে গেছে। 1970-71 সালে ইউরোপের জনঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গকিমিতে 94 জন। আর 1984 সালে তা হল 99। এই সময়ের মধ্যে এশিয়ার জনঘনত্ব 75 থেকে 101-এ পৌঁছেছে। প্রতি বর্গ কিমিতে এই অতিরিক্ত জনঘনত্ব মহাদেশের পক্ষে সত্যি এক বোঝা, বিশেষ করে যখন এখানের সম্পদ সীমাবদ্ধ এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি খুবই মন্থর। সারণি 7.1 থেকে দেখা যাচ্ছে যে অনুন্নত দেশগুলোতে 1970 থেকে 1984 সালের মধ্যে জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে 34 থেকে 48-এ পৌঁছেছে। কিন্তু একই সময়ে উন্নত দেশগুলোতে এই ঘনত্ব বেড়েছে মাত্র 1 জন, 18 থেকে 19। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় এই ঘনত্ব লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

স্থানিক বন্টনের অসমতা পৃথিবীর জনসংখ্যা বন্টনের আর একটি বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর জনসংখ্যার 90 শতাংশের বেশি লোক উত্তর গোলার্ধে। আবার অক্ষাংশভেদে জনঘনত্বের হেরফের লক্ষ্য করা যায়। যেমন বলা চলে 0°-20° উত্তর অক্ষাংশে 10% লোক বাস করেন।

Trewartha (1969) অনুমান করেছেন যে, পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক তার মোট আয়তনের 5 শতাংশেরও কম স্থান, আর বাকি অর্ধেক 50 থেকে 60 শতাংশ স্থানে বাস করেন। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এই যে প্রতিটি মহাদেশের প্রান্তভাগে জনঘনত্ব বেশী। সেই তুলনায় মহাদেশগুলোর মধ্যভাগ বলতে গেলে জনবিরল। Clarke (1965) বলেছেন যে, বিশ্বের জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ লোক সমুদ্র থেকে 2,000 কিমির মধ্যে বাস করেন, আর দুই তৃতীয়াংশ 500 কিমির মধ্যে বাস করেন। জনবসতি ঘনত্বের এই তারতম্য জলবায়ু ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দরুণ ঘটে থাকে। Trewartha-র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে স্থানিক উচ্চতাভিত্তিক (Spatial height) জনসংখ্যার গড় বন্টনে দক্ষিণ আমেরিকার (644 মিটার) স্থান সবার আগে, আর অস্ট্রেলিয়ার স্থান সবার শেষে (95 মিটার) মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, পৃথিবীর জনসংখ্যার 80 শতাংশ লোক সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 500 মিটার উচ্চতার মধ্যে বাস করেন।

---

* বর্তমানে অর্থাৎ 2000 সনের 11ই মে (বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস) 100 কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার হলো এই যে বেশি ও কম বসতি উভয়ই সনাতন ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অগ্রণী সমাজ, নতুন ও পুরোনো পৃথিবীতে, ক্রান্তীয় ও মধ্য অক্ষাংশের অঞ্চলসমূহে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চলের জাভা সনাতন সমাজের, মধ্য অক্ষাংশের বেলজিয়াম ও হল্যান্ড পশ্চিমী সংস্কৃতির ও নদীকেন্দ্রিক শুষ্ক পরিবেশে গড়ে ওঠা মিশর দেশ। মোটামুটিভাবে বলা হয় ঘনবসতি মূলত পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বে সীমিত।

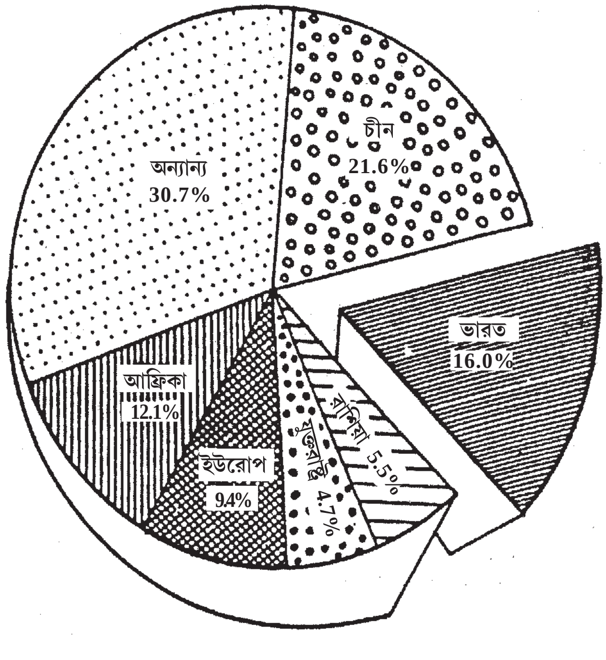

চিত্র — 4.5 পৃথিবীর জনসংখ্যার বন্টন (%)

এই সব অঞ্চলের কোন কোন স্থানে জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে 1,000 থেকে 2,500 জন পর্যন্ত হয়ে থাকে। অপরদিকে, ইউরোপ ও অ্যাংলো-আমেরিকায় জনঘনত্ব নগর ও শিল্পোন্নয়নের মাত্রার ওপর নির্ভর করে। এশিয়ার জনবসতি প্রধানত কৃষিনির্ভর। তাই এখানে পৌর জনঘনত্ব খুবই কমই দেখা যায়।

সাধারণভাবে, পৃথিবীকে দু'ভাগে ভাগ করা হয় ঃ স্থায়ী বসতি অঞ্চল (Ecumene) এবং জনহীন (Non-Ecumene)। যা হোক, এই দুই ধরণের জনবসতির মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। এটা অনুমান করা হয় যে পৃথিবীর মোট ভূ-ভাগের এক-তৃতীয়াংশ শীতলতা বা শুষ্কতার দরুণ অনুর্বর। তাই সে সব অঞ্চল জনবিরল। মহাদেশগুলোর প্রায় 60 শতাংশ ভূমিভাগকে স্থায়ী বসতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সব স্থায়ী বসতিগুলোর জনঘনত্ব সমান নয়। এর মূলে রয়েছে সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণসমূহ। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ চারটি প্রধান বলয়ে সীমাবদ্ধ, যার মধ্যে দুটি রয়েছে এশিয়ায়, একটি ইউরোপ ও অপরটি উত্তর আমেরিকায়। প্রধান বলয়টিতে মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ রয়েছে চীন ও জাপানে। দ্বিতীয়

বলয়টি দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, পকিস্তান ও বাংলাদেশকে নিয়ে গঠিত। এখানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশের বাস। ইউরোপীয় বলয়টির মধ্যে রাশিয়ার জনসংখ্যা দক্ষিণ এশিয়ার বলয়ের মতোই। এখানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ বাস করেন। উত্তর আমেরিকার পূর্বাংশের জনসংখ্যা বলয়টি সবচেয়ে ছোট। এখানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় 5 শতাংশ লোক বাস করেন।

এই চারটি প্রধান বলয়কে আবার জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এশিয়ার দুটি বলয়কে একটি শ্রেণীতে ও ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকার বলয়টি অপর শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এশিয়ার বলয়গুলোর বৈশিষ্ট্য হলো যে এগুলো প্রাক-আধুনিক সভ্যতার পীঠস্থান এখানকার গরীব চাষী নিবিড় পদ্ধতিতে চাষবাস করেন। এখানে জমির ওপর জনসংখ্যার চাপ রয়েছে। সবশেষে বলা যায় যে কৃষিযোগ্য জমি জনসংখ্যা ঘনত্বের প্রধান নিয়ন্ত্রক।

পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা এই দুই বলয়ে বাস করেন। এই বলয় দুটি ইউরোপীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দিক থেকে এরা খুবই উন্নত।

শীতল, শুষ্ক ও আর্দ্র উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চল মানুষের বসবাসের অযোগ্য স্থান হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে উচ্চ অক্ষাংশের শীতল স্থানগুলো বসবাসের অযোগ্য। কুমেরু ও গ্রীণল্যান্ড, উত্তর আমেরিকা ও ইউরেশিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চলে জলবায়ুর প্রতিবন্ধকতা বেশি লক্ষ্য করা যায়। জলবায়ু বিরূপতার জন্য স্বল্পসংখ্যক লোকবসতি দেখা গেলেও অদূর ভবিষ্যতে এখানে জনসংখ্যার বাড়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

শুষ্ক অঞ্চলের প্রধান সমস্যা হল জল। সেজন্য মুষ্টিমেয় কিছু পশুপালক যাযাবর অস্থায়িভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করেন। মরু অঞ্চলের মধ্যে মরুদ্যানে ঘনবসতি লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য যে জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে মরুভূমিতে জনবসতি বিস্তার ঘটেছে এবং এই ব্যবস্থার দ্বারাই অদূর ভবিষ্যতে কার্যকরী জনবসতি গড়ে তোলার সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে রাশিয়ায়।

Pokshishevski-র মত মানুষ তার কারিগরী বিদ্যার উন্নতি ঘটিয়ে জলের পুনর্বন্টন ও জলধারার নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। একটা সময় হয়তো আসবে যখন আমরা বর্তমান দিনের মরুভূমি ও ক্রান্তীয় বনভূমি অঞ্চলগুলোকে আগামীদিনের পৃথিবীর প্রধান শস্যভাণ্ডার হিসেবে দেখতে পাব (Quoted from Chandna, 1972)।

আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চল পূর্বোক্ত জনবিরল অঞ্চলগুলি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পরিবেশের হেরফেরের দরুণ ক্রান্তীয় অঞ্চলের কোন কোন স্থান জনহীন, আবার কোন স্থান ঘনবসতিপূর্ণ। ভবিষ্যতে এই আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চল আরও জনবসতিপূর্ণ হয়ে উঠবে, তবে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট সময় বলা সম্ভব নয়। Kelloss-এর মতে উপযুক্ত ভূমি ব্যবহারের দ্বারা আর্দ্রক্রান্তীয় অঞ্চলের 20 শতাংশ জমি চাষযোগ্য করা যাবে ও ভবিষ্যতে তা জনবসতি বিস্তারে সাহায্য করবে।

পূর্বের আলোচনা ভিত্তিতে এবার আমরা মহাদেশভিত্তিক জনঘনত্ব নিয়ে আলোচনা করব।

4.6.1 মহাদেশভিত্তিক জনসংখ্যা ও ঘনত্ব (Distribution and Density of Population : Continent wise)

4.6.1.1 এশিয়া (Asia)

এশিয়ার জনঘনত্বের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার 50 শতাংশের বেশি লোক এখানে বাস করেন। পৃথিবীর জনঘনত্ব যেখানে প্রতি বর্গকিমিতে 35 জন, এশিয়ায় সেখানে 101 জন। তবে এখানকার জনবন্টনে খুব হেরফের লক্ষ্য করা যায়। মঙ্গোলিয়াতে প্রতি বর্গকিমিতে 1 জন, বাংলাদেশে 657 জন, সিঙ্গাপুরে 4,306 জন বাস করেন। আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এখানে জনাকীর্ণ অঞ্চলের চেয়ে জনহীন অঞ্চল আয়তনে বড়। এশিয়ার বিশাল মধ্যভাগ হল শুষ্ক, নয় শীতল, নয় বন্ধুর। এবার এশিয়ার অঞ্চলভিত্তিক জনবন্টন নিম্নরূপ (মোট জনসংখ্যা 3,417 মিলিয়ান, 1995)।

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া (South-West Asia) ঃ

ইরান, ইরাক, তুরস্ক, সিরিয়া, ইয়েমেন, সৌদি আরব, ওমান সংযুক্ত আরব আমিরশাহী নিয়ে গঠিত এই অঞ্চলের জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে 23 জন। প্রধানত বালিয়াড়ি, লবণাক্ত হ্রদ, লাভা গঠিত অঞ্চল, ক্ষয়জাত পর্বত ও উদ্ভিদের অভাব এখানকার বিরাট এলাকাকে জনহীন করে রেখেছে।

অন্যদিকে তুরস্ক উপকূলের সেচপ্রধান ব-দ্বীপ বা পার্বত্য নদীর জলে পুষ্ট মরুদ্যানে প্রতি বর্গকিমিতে কয়েকজন লোক বাস করেন। কিছু কিছু কৃষি এলাকায় প্রতি বর্গকিমিতে প্রায় 150 জন বাস করেন (Cressey 1963)।

জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে ঃ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া

আফগানিস্থান	—	27	লেবানন	—	253
তুরস্ক	—	61	সিরিয়া	—	52
ইরাক	—	34	ইরান	—	25
জর্ডন	—	33	ইজরায়েল	—	197
ব্রুনেই	—	45	কুয়েত	—	94
সাইপ্রাস	—	71	বাহরিন	—	638
ইয়েমেন	—	32	সংযুক্ত আরব আমিরশাহী	—	14
ওমান	—	5	সৌদি আরব	—	5

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার তিনটি উপকূল অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় ঃ (i) পূর্ব ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল অঞ্চল, (ii) কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল, (iii) কাস্পিয়ান সাগরের লাগোয়া এলবুর্জ (Elburz) পর্বতের পাদদেশ অঞ্চল। এখানকার গ্রামীণ জনঘনত্ব মোটামুটিভাবে ভালো। আবার বর্ষার জলে পুষ্ট উর্বর কৃষি এলাকাগুলির মধ্যে রয়েছে ইয়েমেনের উচ্চাঞ্চল বা তুরস্কের আর্দ্র ভূ-ভাগ।

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার জলসেচের সুবিধের ওপর নির্ভর করে জনবসতি গড়ে উঠেছে। প্রায় প্রতিটি প্রধান নদীর নিম্ন গতিপথে আর পর্বতের পাদদেশে পলিসঞ্চিত ত্রিকোণাকার ভূখণ্ডে লাইনবন্দী বসতির দেখা মেলে। আরবে যেখানে ঝর্ণা বা অন্য কোন জলের উৎসের দেখা পাওয়া যায়, সেখানেই বসতির দেখা মেলে। ইরান বা আফগানিস্তানের অধিকাংশ গ্রামই বরফে ঢাকা পর্বতকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় খনিজ তেল বা খনিজ সম্পদকে কেন্দ্র করে বসতি স্থায়ীরূপে পেয়েছে। মহাদেশের অন্যান্য শহরের মতো এখানকার শহরগুলোতেও দারুণভাবে জনসংখ্যা বেড়েছে, বিশেষ করে খনিজ তেলকে কেন্দ্র করে। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার মোট জনসংখ্যার 65 ভাগ লোক চাষবাস করেন, 8 ভাগ যাযাবর, 12 ভাগ শহরবাসী, 1 ভাগ আশ্রয়হীন প্যালেস্টাইনীয়, বাকি 14 ভাগ গ্রামবাসী।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (South-East Asia) ঃ

থাইল্যান্ড, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, ফিলিপাইনস্, কাম্পুচিয়া, ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশ নিয়ে গঠিত এই অঞ্চলে জনসংখ্যা অসমানভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। কয়েকটি পলিগঠিত সমভূমিতে বেশ ঘনবসতি রয়েছে। এর বিপরীতে উঁচু পার্বত্য এলাকায় লোকবসতি নেই বললেই চলে। এখানকার গড় জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে 86। উত্তর ভিয়েতনামের হং (লাল) নদীর (Red River) ব-দ্বীপ, দক্ষিণ ভিয়েতনামের মেকং নিম্নভূমি, থাইল্যান্ডের থেনাম ও মায়ানমারের (ব্রহ্মদেশের) ইরাবতী ব-দ্বীপ ঘনবসতি এলাকা। দক্ষিণ সেলেবিস, সুমাত্রা উপকূলের কিছু অংশ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের কিছু কিছু স্থানেও ঘনবসতি চোখে পড়ে, যেমন জাভা ও বালি। এখানকার গড় ঘনত্ব হল প্রতি বর্গকিমিতে 84 জন, কোথায় আবার 2,000 জন। কৃষিজমির উর্বরতার হেরফের জনবন্টনে পার্থক্য ঘটিয়েছে। এখানকার 88% লোক হলেন কৃষিজীবী ও 12 শতাংশ শহরবাসী (Cressy, 1963)।

জনঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমিতে) ঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার)	—	55	পূর্ব তাইমের	—	41
সিঙ্গাপুর	—	4,306	ইন্দোনেশিয়া	—	84
ভিয়েতনাম	—	174	থাইল্যান্ড	—	96
ফিলিপাইনস্	—	173			
মালয়েশিয়া	—	45			

দক্ষিণ এশিয়া (South Asia) ঃ

ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নিয়ে হল এই অংশ। এখানে 600 মিলিয়ানেরও বেশি লোক বাস করেন। মোট জমির আয়তন ধরলে গড় জনঘনত্ব দাঁড়ায় প্রতি বর্গকিমিতে 202 জন। আর কৃষিজমির হিসেবে ধরলে এই ঘনত্ব (গ্রাম্য) কোথাও 194, আবার কোথাও 2000। এখানকার অর্ধেক লোক উত্তরের সমভূমিতে বাস করেন, যা আয়তনে দক্ষিণ এশিয়ার 20 শতাংশ জায়গা জুড়ে আছে। Clark (1971) Population Geography and the Developing Countries—এ লিখেছেন "Overall population distributions in South Asia are high......" তিনি আরও লিখেছেন যে, "In South Asia population distribution is nearly as irregular as in south West Asia or South east Asia or East Asia"...কারণ অঞ্চলটি কৃষিপ্রধান। নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি ও সিন্ধুর নিম্ন উপত্যকা অঞ্চলের মাটি উৎকৃষ্ট হলেও এখানকার জলবায়ু খুব শুকনো। অবশ্য কিছু কিছু জায়গায় জলসেচ করা হয়। যেমন রাজস্থানের মরুভূমির জনঘনত্ব বেশী। তবে কিছু কিছু স্থানে খনিজ পদার্থ বা জলের উৎসকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট গ্রাম গড়ে উঠেছে।

জনঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমিতে) ঃ দক্ষিণ এশিয়া

ভারত	—	223	বাংলাদেশ	—	657
ভূটান	—	29	শ্রীলঙ্কা	—	235
নেপাল	—	112	মালদ্বীপ	—	564
পাকিস্তান	—	113			

এখানকার হিমালয় পর্বতমালার অনেক স্থানেই বসতি বিস্তারের পক্ষে প্রতিকূল। খনিজ সম্পদ বা বনজ সম্পদকে কেন্দ্র করে কয়েকটি ছোট ছোট শহর গড়ে উঠেছে। তবে হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে কেন্দ্র করে অনেক শৈল বাস গড়ে উঠেছে।

পূর্ব এশিয়া (East Asia) ঃ

এর মধ্যে আছে জাপান, চীন ও অন্যান্য দেশ। পূর্ব এশিয়ার গড় ঘনত্ব হল প্রতি বর্গকিমিতে 104 জন। জাপানের জনবন্টন ভূপ্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। যেখানেই সমতল জায়গা ও উর্বর মাটি পাওয়া যায় সেখানেই জনবসতি গড়ে উঠেছে। পর্বত সবখানেই বসতি বিস্তারে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্য অধিকাংশ জাপানীরাই সমুদ্রোপকূলে বসবাস করতে চান। জাপানে 400-রও বেশি স্থান আছে, যা জাপানের মোট আয়তনের এক শতাংশ জায়গা জুড়ে থাকলেও সেখানে প্রতি বর্গকিমিতে 25,000-এর বেশি লোক বাস করে। এর বিপরীতে (শহরাঞ্চল বাদে) রয়েছে এখানকার এক-চতুর্থাংশ এলাকা, যার জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে 1 জন। এর কারণ হল এখানকার খাড়া ঢালু ভূমিভাগ।

জনঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমিতে) ঃ পূর্ব এশিয়া

চীন	—	108	জাপান	—	316
কোরিয়া	—	406	ম্যাকাও	—	19,000
হংকং	—	5,048	মঙ্গোলিয়া	—	1
রিপাঃ অফ্ কোরিয়া	—	268	C.I.S. (পূর্বতন রাশিয়া) এশিয়া	—	12

চীনের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করেন, কারণ চাষবাসই এখানকার প্রধান জীবিকা। জনসংখ্যার দিক দিয়ে চীন পৃথিবীতে প্রথম স্থানাধিকারী হলেও দেশের কম অংশই বসবাসের পক্ষে উপযুক্ত।

উত্তর চীন সমভূমি ও ব-দ্বীপ, দক্ষিণের সোয়েল সমভূমি ও সিকিয়ার অববাহিকার সমভূমি চাষের পক্ষে খুবই অনুকূল বলে চীনের প্রায় 85 শতাংশ লোক এখানে বাস করেন। ফলে এইসব স্থানে জনঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। উত্তরের সমভূমির ইয়াংসি অববহিকা, ব-দ্বীপ ও আরও কয়েকটি অনুকূল স্থানে জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে 500 থেকে 600 জন। এর ঠিক বিপরীত চিত্রে রয়েছে মঙ্গোলিয়া (জনঘনত্ব 1 জন)। তিব্বতে পর্বতঘেরা মালভূমি। সেখানকার ভূপ্রকৃতি বন্ধুর ও জলবায়ু শুষ্ক।

কোরিয়া হল ভৌগোলিক বৈপরীত্যের দেশ। উত্তর কোরিয়ার এলাকা বেশি, লোকসংখ্যা কম। এটি আবার খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার এলাকা কম, কিন্তু লোকসংখ্যা বেশি। দেশটি কৃষিসমৃদ্ধ। এখানকার বেশিরভাগ লোক নদী উপত্যকা ও উপকূলের সমভূমিতে বাস করেন। এখানকার প্রায় 75 শতাংশ লোক কৃষিজীবী। কিন্তু যোগাযোগের দিক দিয়ে সবচেয়ে সুবিধাজনক স্থানে লোকজন বেশি বাস করেন। এশিয়ার সবচেয়ে উত্তরের দেশটি হল রাশিয়া (C.I.S.)। এখানকার গড় ঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে 13 জন। কিন্তু এই ঘনত্বের হেরফের আছে। কারণ দেশটি আয়তনে বড় বলে এখানে বিভিন্ন ধরণের জলবায়ু বিরাজ করে।

রাশিয়ার জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব

আয়তন .000 বর্গকিমি		জনসংখ্যা .000	জনঘনত্ব	আয়তন .000 বর্গকিমি		জনসংখ্যা 1000	জনঘনত্ব
আজার বাইজান *	86.6	5,866	64	লিথুনিয়া *	65.2	3,364	52
আর্মেনিয়া	29.8	2,950	99	মালডিভিয়া *	37.7	3,915	104
বাইলোয়াসিয়ান *	207.6	9,451	46	রাশিয়া	17,675.4	1,36,532	7
জর্জিয়া *	67.7	5,041	74	তাদঝিক	14.31	3,689	26
কাজাখ	2,717.3	14,654	5	তুর্কমেন	488.1	2,722	6
লাটভিয়া *	63.7	250	40	ইউক্রেন	603.1	49,481	82
কিরগিজ	198.5	3,512	18	উজবেক	447.4	14,854	33
				* বর্তমানে স্বাধীন রিপাব্লিক			

সবচেয়ে উত্তরে রয়েছে তুন্দ্রা অঞ্চল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও বছরের বেশীরভাগ সময় ভূমিভাগ বরফে ঢাকা থাকায় এখানে লোকজন প্রায় থাকেই না। এখানে জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে 1 জনেরও কম। তুন্দ্রার দক্ষিণে রয়েছে অব-সুমেরু অঞ্চল বা সরলবর্গীয় বনভূমি অঞ্চল। প্রতিকূল জলবায়ু ও বড় বড় শহরের সঙ্গে যোগাযোগের অসুবিধের জন্য এই অঞ্চল মানুষের বসবাসের পক্ষে লোভনীয় নয়। এখানকার গড় ঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে 1 জন। এখানে ভারখয়নস্ক (Verkhaynask), ইরকুটস্ক (Inkutsk), নারিলস্ক, উদ ইত্যাদি শহর রয়েছে, বৈকাল হ্রদের পূর্বে ঘনত্ব বেশি থাকলেও কাস্পিয়ান সাগরের কাছে ঘনত্ব মাত্র 2 জন। শুষ্কপ্রধান এই অঞ্চলের মুখ্য উপজীবিকা হল পশুচারণ।

4.6.1.2 ইউরোপ (Europe)

জনসংখ্যার দিক থেকে ইউরোপের (514.6 মিলিয়ান, 1994) স্থান এশিয়া (3,345 মিলিয়ান) ও আফ্রিকার (722.8 মিলিয়ান) পরেই। ইউরোপের জনবন্টন (সারণি 7.3) সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে এখানকার দুই-তৃতীয়াংশের বেশি লোক একটা জায়গায় এসে জড়ো হয়েছেন। স্বভাবতই ঐ অঞ্চলের জনঘনত্ব বেশি। ইউরোপের জনবন্টন প্রধানত পরিবেশ ও ঐ মহাদেশের সংস্কৃতির ওপর নির্ভরশীল।

এখানকার পরিবেশগত উপাদান হচ্ছে জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, মাটির উর্বরতা ও খনিজ সম্পদ, বিশেষ করে কয়লার বন্টন। অন্যান্য এলাকার মতন এখানকার ব-দ্বীপগুলোতে লোকবসতি ঘন। তবে চীন বা ভারতের

মত অত ঘন নয়। বড় রকমের জনসমাবেশ শিল্পাঞ্চলে দেখা যায়। বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল কয়েকটি শহরের উপকূলীয় অবস্থান চোখে পড়ার মতো।

সারণি 4.8

ইউরোপের জনঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমিতে) ঃ 1983

দেশ		জনঘনত্ব	দেশ		জনঘনত্ব	দেশ		জনঘনত্ব
আলবানিয়া	—	99	আইসল্যান্ড	—	2	সুইজারল্যান্ড	—	158
অস্ট্রিয়া	—	90	আয়ারল্যান্ড	—	50	যুক্তরাজ্য	—	228
বেলজিয়াম	—	323	ইতালি	—	188	যুগোশ্লাভিয়া	—	89
বুলগেরিয়া	—	81	লিকটেনস্টিন	—	166	গ্রীস	—	75
চেকোশ্লোভিয়া	—	121	লুক্সেমবার্গ	—	141	হাঙ্গেরী	—	115
ডেনমার্ক	—	191	মাল্টা	—	1193	পর্তুগাল	—	110
ফিনল্যান্ড	—	14	নেদারল্যান্ড	—	352	রুমানিয়া	—	95
ফ্রান্স	—	100	নরওয়ে	—	13	স্পেন	—	76
জার্মানী	—	200	পোল্যান্ড	—	117	সুইডেন	—	19

ইউরোপের জনবসতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এখানকার প্রায় 80 শতাংশ অধিবাসী শহরের বাসিন্দা।

ইউরোপের ইংলিশ চ্যানেল ও উত্তর সাগর উপকূলের দেশগুলোতে জনঘনত্ব বেশি, কারণ এটি শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানেই ফ্রান্স, জার্মানী ও বেলজিয়ামের মত বড় বড় দেশ রয়েছে। ফ্রান্স ও জার্মানীর কয়লাখনি এলাকায় জনঘনত্ব খুব বেশি। Taylor-এর মতে ইউরোপের জনঘনত্ব সোয়ানসিয়া থেকে সাইলেসিয়া পর্যন্ত কয়লাখনি অঞ্চল লক্ষ্য করা যায়।

অন্য একটি ঘনবসতি অঞ্চল হল জার্মানির রাইন উপত্যকা। Taylor-এর মতে রাইন ও পো (Po) উপত্যকার 180 মিটারের কম উচ্চতায় এবং বোহেমিয়া উচ্চভূমির প্রায় 400 মিটার পর্যন্ত ঢালু অংশে

ইউরোপের সবচেয়ে বেশি জনঘনত্ব লক্ষ্য করা যায়। স্পেন ও বুলগেরিয়ায় 900 মিটারেরও বেশি উচ্চতায় অনেক বসতি দেখা যায়।

এই মহাদেশের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মধ্য ইউরোপের মতো অতো বেশি জনসমাবেশ দেখা যায় না। কারণ এটি প্রধানত পার্বত্য এলাকা।

বলতে গেলে গোটা নরওয়েই পার্বত্য এলাকা। এখানকার জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে 13 জন। এই দেশটিতে চাষের জমি 1,000 বর্গকিমির কম।

ফিনল্যান্ডের বেশির ভাগ জায়গাতেই বসতি খুব কম। দেশটি প্রধানতঃ অরণ্যময় হওয়ায় এখানকার বেশিরভাগ অধিবাসীদের পেশা হল কাষ্ঠাহরণ।

গ্রেট ব্রিটেনের শতকরা 80 ভাগ লোক শহরে বসবাস করে। এখানকার বেশিরভাগ বসতি কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। মধ্য ইংল্যান্ডে পেনাইন পর্বতের তিনদিকে কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে তিনটি ঘনবসতি অঞ্চল গড়ে উঠেছে।

লোকসংখ্যার দিক দিয়ে পূর্বে সাবেকী রাশিয়ার স্থান ছিল পৃথিবীতে তৃতীয় (273 মিলিয়ান, 1984)। এখানকার ইউরোপীয় অংশে সমতল ভূমিভাগে তুলনামূলকভাবে মৃদু জলবায়ু, প্রচুর খনিজ সম্পদ ও উন্নত যোগাযোগের দরুণ বেশি লোক বাস করে (মোট জনসংখ্যার 60 ভাগেরও বেশি)। ইউরোপীয় রাশিয়ার ঘনত্ব হল 18 জন। এই দেশের প্রায় 50 শতাংশ লোক শহরবাসিন্দা।

ইউরোপের প্রধান ভূখণ্ডের সবচেয়ে জনবহুল অঞ্চলগুলো হল ঃ

1) রাইন, সোম (Somme), স্লেড (Scheldt) ও নিম্ন সীনের (Lower Scine) উর্বর অববাহিকা ও কয়েকটি কয়লাখনি অঞ্চল।

2) মধ্য জার্মানীর অধিকাংশ এলাকা যা দক্ষিণ-পূর্বে চেক রিপাবলিক ও পোল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। অঞ্চলটি খনিজ সম্পদে ভরপুর।

3) ইতালীর উত্তরাংশ অর্থাৎ উর্বর পো-উপত্যকা।

4) উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের শিল্পাঞ্চল।

4.6.1.3 উত্তর আমেরিকা (North America)

সারণি 4.9

উত্তর আমেরিকার লোকসংখ্যা ও জনঘনত্ব (বর্গকিমি) ঃ

দেশ	শতকরা ভাগ	জনঘনত্ব	দেশ	শতকরা ভাগ	জনঘনত্ব
কানাডা	6.58	3	জামাইকা	0.58	205
কোস্টারিকা	0.62	48	মেক্সিকো	18.34	38
ডোমিনিকান রিপাব্লিক	1.49	122	নিকারাগুয়া	0.72	24
গ্রীনল্যান্ড	0.01	0	পানামা	0.56	27
গুয়াতেমালা	1.92	73	পোর্টেরিকো	6.84	377
বাহামা	0.05	16	যুক্তরাষ্ট্র	61.22	25
হাইতি	1.36	184	এল সালভাডোর	1.25	249
হন্ডুরাস	1.02	37	কিউবা	2.60	89
			অন্যান্য	0.84	0

এই মহাদেশের মোট জনসংখ্যা হল 43.3 কোটি (1995)। এখানকার প্রায় 85 শতাংশ লোক 100° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ পূর্বে বসবাস করেন। এর কারণ হলো এখানকার ইউরোপীয় বাসিন্দারা পূর্বদিক থেকে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। পশ্চিম দিকের খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ও জলসেচ সেবিত এলাকায় ঘনবসতি দেখা যায়। উত্তর আমেরিকার জনবসতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এই মহাদেশের অধিকাংশ লোক যুক্তরাষ্ট্র (সারণি 7.4) বাস করেন। এর পরের স্থান হলো মেক্সিকো ও কানাডার।

কানাডার জনবন্টন খুব অসম। কানাডার জনবসতি খাদ্য উৎপাদক অঞ্চল ও শিল্পকেন্দ্রকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। দেশের তিনটি প্রধান ঘনবসতি এলাকা হল ঃ

1) পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে ব্রিটিশ কলম্বিয়া ও নদী উপত্যকা। এই দেশের 20 শতাংশ লোক এখানে বাস করেন।

2) পূর্বে অন্টারিও উপদ্বীপ ও সেন্ট লরেন্স উপত্যকা, ম্যারিটাইম প্রদেশের শিল্পপ্রধান অঞ্চল। এখানে কানাডার 60 ভাগ লোক বাস করেন। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যবর্তী এই অঞ্চলটি কৃষি-শিল্প সমৃদ্ধ।

3) কৃষি প্রধান প্রেইরি অঞ্চল। মোট জনসংখ্যার 16 ভাগ লোক এখানে বাস করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা হল 26.58 কোটি (1996), জনঘনত্ব হল প্রতি বর্গকিমিতে 25 জন। এই দেশের বেশির ভাগ লোক 100° পশ্চিম দ্রাঘিমারেখার পূর্বাংশে বাস করেন। এই অংশের গড় ঘনত্ব হল প্রতি বর্গকিমিতে 60 জন। তবে পূর্বে আটলান্টিকের উপকূলস্থ মেরিল্যান্ড থেকে মেইন পর্যন্ত শিল্পপ্রধান অঞ্চল সর্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ। এখানকার শিল্পপ্রধান ঘনবসতি এলাকাগুলো হল ঃ

1) ডেট্রয়েট, ক্লীভল্যান্ড, বাফেলো ও অ্যাক্রন-কে কেন্দ্র করে ইরি হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল।

2) শিকাগো-মিলওয়াকি-কে কেন্দ্র করে মিশিগান হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল।

3) রচেস্টার ও সাইরেকাস্।

4) অন্টারিও ও মহাওক (Mahawak) উপত্যকা অঞ্চল।

5) পেনসিলভেনিয়া ও পূর্বে ওহিও নদীর উপত্যকা অপেক্ষা পিটস্‌বার্গ শিল্পশহর।

100° পশ্চিম দ্রাঘিমারেখার পশ্চিমাংশ যুক্তরাষ্ট্রে মোট আয়তনের 30 ভাগ জায়গা জুড়ে থাকলেও পর্বত ও মালভূমি প্রধান এই শুষ্ক এলাকার জনঘনত্ব মাত্র 3 জন। প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের তিনটি ঘনবসতি এলাকা হল—

1) সানফ্রানসিস্‌কো, আয়ারল্যান্ডকে ঘিরে ক্যালিফোর্নিয়া উপত্যকা।

2) দক্ষিণে লস এঞ্জেলস্-সানডিয়াগোর সমভূমি অঞ্চল।

3) উত্তরের ওয়াশিংটন ও ওরিগন রাজ্যের পোর্টল্যান্ড, সিয়াটেল প্রভৃতি শহর।

এর বিপরীতে রয়েছে আয়হো (8), মন্ট্রিল (4), উইওমিং (3) ও নেভাদা (2) ইত্যাদি জনবিরল এলাকা। এখানকার অনুর্বর মাটি বিরাটসংখ্যক কৃষিজীবী জনতার ভরণপোষণে অক্ষম।

মেক্‌সিকোর জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে 38 জন। কিন্তু দেশের উত্তরাংশ মরুপ্রায় বলে সেখানে খুব কম লোক বাস করেন। অবশ্য এই অঞ্চলে যেখানে খনিজদ্রব্য পাওয়া যায় ও যেখানে পশুচারণের সুবিধে আছে সেখানেই কেবল বিক্ষিপ্তভাবে বসতি গড়ে উঠেছে।

মধ্য আমেরিকার জনবসতি প্রধানত খনিজ ও কৃষিনির্ভরশীল। এখানকার আর্দ্র ও উষ্ণ জলবায়ু চাষবাসের পক্ষে খুব উপযুক্ত। মধ্য আমেরিকার সবচেয়ে বেশি ঘনবসতি এলাকা হল প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী এল-সালভাডোর (249 জন)।

4.6.1.4 আফ্রিকা (Africa)

এই মহাদেশ গোটা পৃথিবীর 22 শতাংশ স্থান জুড়ে থাকলেও এখানে বিশ্বের মাত্র 11 শতাংশ লোক বাস করেন (76.6 কোটি, 1955)।

কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি রেখা যথাক্রমে দেশের উত্তর মধ্যাংশ ও দক্ষিণ মধ্যাংশের ওপর দিয়ে যাওয়ার জন্য দেশে দুটো মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষিসংস্থার (FAO) হিসেব অনুযায়ী আফ্রিকার শতকরা 40 ভাগের বেশি এলাকা খরাপ্রবণ। এছাড়া নিরক্ষরেখা দেশের মাঝখান দিয়ে গেছে বলে এই মহাদেশের বিরাট এলাকা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম কোনটি ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর জন্য বসবাসের পক্ষে আরামদায়ক। অনুরূপভাবে একটি এলাকা হলো ইথিওপিয়ার মালভূমি।

আফ্রিকার গড় ঘনত্বের চেয়ে 6টি বেশি জনঘনত্বের অঞ্চল হল ঃ

1) আইভরি কোস্টের কিছুটা অংশ বাদে পশ্চিম গিনি থেকে পূর্বে ইকোয়েটরিয়াল গিনি পর্যন্ত বিরাট এলাকা।

2) পূর্বে আফ্রিকার মালভূমির বৃহৎ হ্রদ অঞ্চল, বিশেষ করে ভিক্টোরিয়া হ্রদের আশেপাশের এলাকা।

3) পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূল অঞ্চল যা মোসাম্বার কাছ থেকে কেপটাউন পর্যন্ত বিস্তৃত। অবশ্য এই গোটা এলাকাটিতে একই রকম জনঘনত্ব দেখা যায় না।

4) ভূমধ্যসাগরীয় লাগোয়া এলাকা টিউনেশিয়া, আলজিরিয়া ও মরক্কোর উত্তরদিকের কিছু অংশ।

5) পূর্বে ইথিওইপয়ার মালভূমি।

6) এবং, নীল নদ উপত্যকা।

কৃষিপ্রধান এই সব এলাকার জীবনযাত্রা গড় বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের (75 সেমির বেশি) ওপর নির্ভরশীল (Fitzerald, 1967)।

4.6.1.5 দক্ষিণ আমেরিকা (South America)

এই মহাদেশের উত্তরাংশের ওপর দিয়ে নিরক্ষরেখা যাবার দরুণ এখানকার বিরাট এলাকার জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর। আবার মহাদেশের দক্ষিণাংশ কুমেরু অঞ্চলের কাছাকাছি অবস্থিত বলে সেখানে শীতকালে কনকনে মেরু বাতাস বয়। তাই বলা চলে জলবায়ুর জন্যই এই মহাদেশের উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্যাংশে বসতি বিকাশ লাভ করেনি। এই জন্য একমাত্র উপকূল ছাড়া মহাদেশের অন্যান্য অংশে জনবসতি খুব একটা গড়ে ওঠেনি। এই কারণেই আয়তনের দিক দিয়ে এই মহাদেশের স্থান পৃথিবীতে পঞ্চম হলেও (মাত্র 13 শতাংশ) বিশ্বের মাত্র 5 শতাংশ লোক এখানে বাস করেন, যদিও মহাদেশীয় গড় জনঘনত্ব 14 জন।

নীচের সারণি (সারণি 7.5) থেকে দেখা যাচ্ছে যে ব্রাজিলে সবচেয়ে বেশি লোক বাস করেন (52.29 শতাংশ), কিন্তু ইকোয়েডরে জনঘনত্ব সবচেয়ে বেশি (33)। গায়ানার একটা বড় অংশ বিরল বসতি।

এখানকার শতকরা 95 ভাগ লোকই দেশের মাত্র 4 শতাংশ জায়গায় বাস করেন। বাকি লোক পার্বত্য এলাকা, বনাঞ্চল, সাভানা অঞ্চলে বাস করেন।

দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমাংশ (পেরু, ইকোয়েডর, কলম্বিয়ার অংশবিশেষ) পার্বত্যময়।

সারণি 4.10

জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব

দেশ	জনসংখ্যা	শতকরা ভাগ	জনঘনত্ব
ব্রাজিল	1,27,807	52.29	15
আর্জেন্টিনা	27,947	11.43	11
কলম্বিয়া	22,552	9.23	24
পেরু	18,707	7.65	15
ভেনেজুয়েলা	14,517	5.94	18
চিলি	11,682	4.78	15
ইকোয়েডর	850	3.29	33
বলিভিয়া	5,916	2.42	6
প্যারাগুয়ে	3,168	1.30	9
উরুগুয়ে	2,908	1.19	17
গায়ানা	774	0.32	4
সুরিনাম	352	0.14	2
ফক্ আইল্যান্ড	2	0.00	2
ফরাসী গায়ানা	54	0.02	1

4.6.1.6 অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড (Australia & New Zealand)

অস্ট্রেলিয়া হল উত্তর আমেরিকার মতই এক নতুন আবিষ্কৃত মহাদেশ। স্বভাবতই, আগন্তুকরা এখানে এসে উপকূলের দিকে অর্থাৎ মহাদেশের পূর্বভাগে বসবাস শুরু করেছিলেন। পূর্বদিকে বেশি বৃষ্টিপাত হয়, আর এর অভাবে পশ্চিমদিকে বিরাট মরুভূমি সৃষ্টি হয়েছে। আয়তনে সবচেয়ে ছোট এই মহাদেশে

(মাত্র 6%) পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার মাত্র 0.5% বাস করেন। এই মহাদেশে 25 সেমির কম বৃষ্টিপাত এলাকায় কোন বড় জনবসতি গড়ে ওঠেনি। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত বসতি মধ্য কুইন্সল্যান্ড থেকে নদার্ন টেরিটোরির পশুচারণ ক্ষেত্রের দিকে বাড়ছে। ক্রান্তীয় আবহাওয়ার দরুণ উত্তরে বসতি খুব কম। ফ্লাইন্ডার্স পর্বতমালার দক্ষিণে তুলনামূলকভাবে ভালো বৃষ্টিপাতের দরুন দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার কিছু ঘনবসতি দেখা যায়। নিউ সাউথ ওয়েলসের দক্ষিণ-পূর্বের ভূ-প্রকৃতি বন্ধুর। তাই প্রচুর জল থাকা সত্ত্বেও এখানকার বেশ কিছু এলাকা প্রায় জনশূন্য।

সারণি 4.11

জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব ঃ অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ

দেশ	জনসংখ্যা (10 লক্ষ)	মোট আয়তন (বর্গকিমি)	জনঘনত্ব
অস্ট্রেলিয়া	14.62	76,86,848	2
টোঙ্গা	0.10	700	149
নাউরু	0.008	200	318
নিউজিল্যান্ড	3.10	2,68,676	12
সামোয়া	0.10	2,800	57
পাপুয়া নিউগিনি	3.15	4,61,691	7
ফিজি	0.63	18,272	37
সলোমন দ্বীপপুঞ্জ	0.23	28,446	9

জনঘনত্বের বিচারে অস্ট্রেলিয়ার পাঁচটি বড় মাপের ঘনবসতি অঞ্চল রয়েছে (Taylor, 1959)। এগুলো হল—(1) সিডনির পশ্চিমে পর্বতের ঢাল, (2) ভিক্টোরিয়ার একটি বড় অংশ, (3) কুইন্সল্যান্ডের দক্ষিণ পূর্ব দিক, (4) দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার ফ্লাইন্ডার্স, রেঞ্জের দক্ষিণ দিক ও (5) সোয়ানল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক। টাসমানিয়া ও নর্দান টেরিটোরিতে বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র নেই।

নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু ও উর্বর মাটি আর খরামুক্ত বলে নিউজিল্যান্ডে দোহশিল্প (Dairy Industry) গড়ে উঠেছে, ফলে এখানে জনঘনত্ব মধ্যম রকমের।

এতক্ষণ আমরা পৃথিবীর জনবৃদ্ধিও জনবন্টন নিয়ে আলোচনা করলাম। এ থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেছে তা হলো জনবৃদ্ধি সব মহাদেশে সমান হারে ঘটে নি। কোথাও কম, আবার কোথাও তা বেশী। কোন কোন দেশ একদিকে যেমন অতিমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছে, অন্যদিকে সেখানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের

কৌশলে মৃত্যুকে দারুণভাবে ঠেকিয়েছে, ফলে সেইসব দেশে জনবৃদ্ধির হার বলতে গেলে শূন্য। আবার আফ্রিকার মতন মহাদেশে জন্মহার ও মৃত্যুহার দুই-ই বেশী। জনবৃদ্ধির হার অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের সামাজিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এবার আলোচনা করা হল।

অনুশীলনী ঃ 1

(i) জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে কি বোঝেন?

(ii) এশিয়া মহাদেশে জনঘনত্বের পার্থক্যের কারণসমূহ উল্লেখ করুন।

(iii) পৃথিবীর নিবিড় ও বিরল বসতি অঞ্চলগুলি উল্লেখ করুন।

(iv) কাম্য জনসংখ্যা বলতে কি বোঝেন?

4.7 জনসংখ্যার পরিবর্তন তত্ত্ব (Theory of Demographic Transition)

বিভিন্ন দেশের জনবৃদ্ধির প্রকৃতিতে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যা সেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এক একজন সমাজবিজ্ঞানী এই বৃদ্ধির হারকে এক একটি নাম দিয়েছেন। প্রাচীন প্রকৃতির হার (Peterson-এর প্রাক্-শিল্পীয় পর্যায়), প্রাথমিক প্রকৃতির হার (Peterson-এর নবীন পাশ্চাত্য পর্যায়) ও পরিণত হার (Peterson-এর আধুনিক পাশ্চাত্য পর্যায়)।

Peterson-এর Population অবলম্বনে এই তিনটি পর্যায় বা হারের বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে তুলে ধরা হল (সারণি 4.12) ঃ

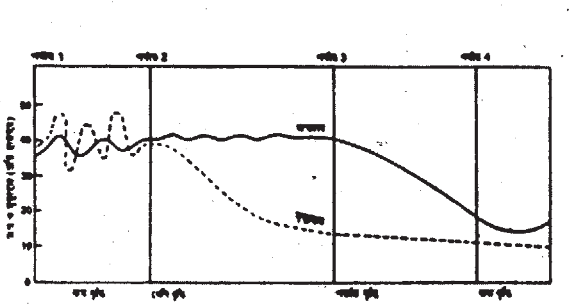

চিত্র — **4.6** পৃথিবীর জনমিতি পরিবৃত্তকালের একটি মডেল (সাধারণ)

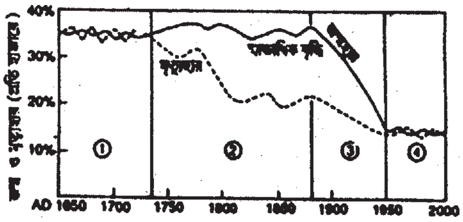

চিত্র — **4.7** 1650 সাল থেকে পৃথিবীর জনমিতি পরিবৃত্তকালের একটি মডেল। চারটি পর্যায়ে এখানে দেখান হয়েছে। (1) জন্ম-মৃত্যুর বেশি হ্রাস-বৃদ্ধি (2) প্রথমদিকে জনবৃদ্ধি (3) শেষদিকের জনবৃদ্ধি (4) জন্ম মৃত্যুর হ্রাস বৃদ্ধি

(1) জন্ম-মৃত্যুর বেশি হ্রাস-বৃদ্ধি (2) প্রথমদিকে জনবৃদ্ধি (3) শেষদিকের জনবৃদ্ধি 4.7 জন্ম-মৃত্যুর হ্রাস-বৃদ্ধি।

সারণি 4.12

জনবৃদ্ধির হার অনুযায়ী তিন ধরণের সামাজিক বৈশিষ্ট্য

পর্যায়/হার	জন্ম	মৃত্যু	জনবৃদ্ধি	অর্থনীতি
1. প্রাক্-শিল্পীয় (Pre-Industrial)	বেশী (High)	বেশী পরিবর্তনশীল	স্থানু থেকে কম	আদিম বা কৃষিভিত্তিক
2. নবীন-পাশ্চাত্য (Early-Western)	বেশী (High)	কমতির দিকে	বেশী	মিশ্র
3. আধুনিক-পাশ্চাত্য (Modern-Western)	নিয়ন্ত্রিত, সাধারণভাবে কম থেকে মাঝারি	কম	কম থেকে মাঝারি	শহর শিল্পাশ্রিত ও মিশ্র

4.7.1 প্রাক্-শিল্পীয় পর্যায় (প্রাচীন প্রকৃতির হার)

সনাতন সংস্কৃতি-সম্পন্ন দেশগুলোতে আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা বিশেষ পরিবর্তন আনতে পারেনি। বরং এই সমস্ত দেশের সংস্কৃতি প্রাক্-শিল্পীয় যুগেই থেমে আছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার ছাপ এইসব দেশে পড়েনি। এই দেশগুলোতে বাৎসরিক জন্মহার ও মৃত্যুহার দুই-ই বেশী (প্রতি হাজারে 30-র বেশী)। জন্মহার যেমন বেশি, শিশুর মৃত্যুহারও তেমনি বেশি। মৃত্যুহার বেশি হওয়ায় স্বাভাবিক বৃদ্ধির (Natural Increase) হার কম। এই সব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মান নিম্নমানের। এরা জন্ম ও মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ করতে অপারগ। এই সব দেশই জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিক দিয়ে প্রাক্-শিল্পীয় পর্যায়ে রয়ে গেছে। প্রাক্-অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রেট ব্রিটেনে এই ধরণের অবস্থা ছিল। প্রায় তিন দশক আগেও কৃষ্ণকায় আফ্রিকা (অর্থাৎ সাহারার দক্ষিণ দিকে) এই ধরণের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। খুব সাম্প্রতিককালে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচলন ও জনস্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়ার ফলে অনেক অঞ্চলেই মৃত্যুহার কমেছে। বর্তমানে জনবৃদ্ধির দিক দিয়ে তুলনা করলে অঞ্চলটি না প্রাক্-শিল্পীয়, না প্রাথমিক পর্যায়ের—অর্থাৎ দু'য়ের মাঝামাঝি। যদিও বর্তমানে আফ্রিকার অনেক রাষ্ট্রে মৃত্যুহার সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নেই, তবুও অনুমান করা হয় যে অধিকাংশ নিগ্রো-অধ্যুষিত দেশে মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে 30-র নীচে।

4.7.2 নবীন পাশ্চাত্য পর্যায় বা প্রাথমিক প্রকৃতির হার

এখানে জন্মহার ও মৃত্যুহারের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মৃত্যুহার কমেছে, আর তা জন্মহারের চেয়ে আরও দ্রুত কমেছে। ফলে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার খুব বেশী। অভাব ও রোগ কমে যাওয়ায় এবং অন্যদিকে জীবনযাত্রা মানের উন্নতি ঘটায় এটা সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই এই পর্যায়ে পড়ে। অনেক দেশই খুব হঠাৎ করে এই অবস্থায় পৌঁছেছে। আর তা ঘটেছে দু'দশকের মধ্যে। হঠাৎ করে মৃত্যুহার কমে গেছে। অথচ জন্মহার সেই অনুপাতে কম না হওয়ায় স্বাভাবিক (জনসংখ্যা) বৃদ্ধির হার বেশী হয়েছে, যেমন কুয়েত-এ (38.1%), কলম্বিয়ায় (35.10%), মেক্সিকোয় (34.1%), ইরাকে (33.8%), প্যারাগুয়ে (33.8%) ও অন্যান্য অনেক দেশ। উপরোক্ত বৃদ্ধির চিত্র থেকে লক্ষ্য করা যায় যে ঐ দেশগুলোতে আগামী 25 বছরের মধ্যে জনসংখ্যা দু'গুণ হবে। উপরোক্ত স্বাভাবিক বৃদ্ধির হারের চেয়ে কিছু কম-বৃদ্ধি সম্পন্ন দেশগুলো হচ্ছে খানা (28.8%), নাইজেরিয়া (28.3%), ব্রাজিল (28.3%), উগাণ্ডা (25.6%) ও টানজানিয়া (25.1%) (চিত্র 4.9)।

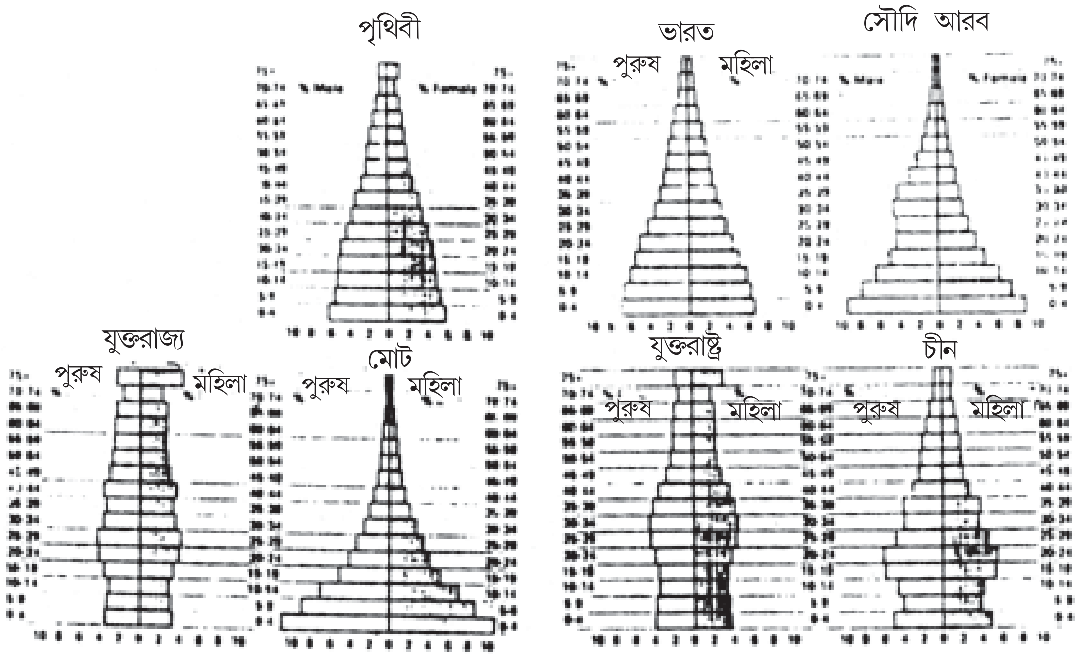

চিত্র — 4.9 বয়স পিরামিড বিভিন্ন দেশের। যুক্তরাজ্যের মত উন্নত দেশের বিভিন্ন বয়ঃপুঞ্জে জনতার সংখ্যা প্রায় একই রকম রয়েছে এবং বৃদ্ধ বয়সের নারী-পুরুষের সংখ্যা লক্ষ্যনীয়। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশের পিরামিডে তরুণ বয়সের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

নবীন পাশ্চাত্য পর্যায় বা প্রাথমিক প্রকৃতির স্বাভাবিক বৃদ্ধি হারের দেশগুলোকে আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের বিচারে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

গুয়েতমালা হার (Guaetmala Type) ঃ

এই ক্ষেত্রে দেখা যায় জন্মহার খুব বেশী, আর মৃত্যুহার কমতির দিকে। গুয়েতমালায় জন্মহার প্রতি হাজারে 43.4, মৃত্যুহার 15.4 অর্থাৎ স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার 28। কোন দেশের স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে 20 থেকে 30-র মধ্যে থাকলে তা গুয়েতমালা হার হিসেবে ধরা হয়। আফ্রিকার প্রায় সমস্ত দেশ, মধ্য-প্রাচ্য, পূর্ব এশিয়া ও অর্থনৈতিক বিচারে লাতিন আমেরিকার মধ্যম মানের দেশগুলো যেমন, কিউবা, হন্ডুরাস, আর্জেন্টিনা এই শ্রেণীতে পড়ে। এই সব দেশগুলোতে নিকট ভবিষ্যতে সবচেয়ে বেশী জনবৃদ্ধি ঘটবে। কারণ মৃত্যুহার ইতিপূর্বেই কমতে আরম্ভ করেছে এবং আরও কমবে। অন্যদিকে, অনেক দেশে স্বাভাবিক (জন) বৃদ্ধি ঘটেছে,কারণ জন্মনিয়ন্ত্রণ করার জন্য এসব দেশে কোন সরকারী ব্যবস্থা নেই। বর্তমানে পৃথিবীর 50 থেকে 60 শতাংশ জনতা এই পর্যায়ে পড়ে। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশও এর অন্তর্ভুক্ত।

থাইল্যান্ড হার (Thailand Type) ঃ

এই হার গুয়েতমালা হারের বিপরীত। জন্মহার খুব বেশী, কিন্তু মৃত্যুহার খুব কম, যথাক্রমে 42.8 ও 10.4 ফলে এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার অধিক প্রতি হাজারে 25 থেকে 35। থাইল্যান্ড ধরণের বৃদ্ধির হার খুব কম দেশেই লক্ষ্য করা যায়। কারণ এতে এক বিশেষ ধরণের অবস্থার দরকার। বিদেশী চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার কল্যাণে এখানে মৃত্যুহার যথেষ্ট কমেছে। এই ধরণের বৃদ্ধি অনেক ছোট ছোট দেশে দেখা যায়, যেমন শ্রীলঙ্কা (যেখানে 1900 থেকে 1960 সালের মধ্যে জনসংখ্যা তিনগুণ বেড়েছে) ও পুর্টোরিকা।

চিলি হার (Chile Type) ঃ

এই ক্ষেত্রে দেখা যায় জন্মহার ইতিমধ্যে কমেছে, আর মৃত্যুহারও দারুণভাবে হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে এ সব দেশে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার কম। চিলি হারে দেখা যায় জন্মহার প্রতি হাজারে 27 জন, মৃত্যুহার 8.4, অর্থাৎ স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার 19 (চিত্র 4.10 ক, খ)।

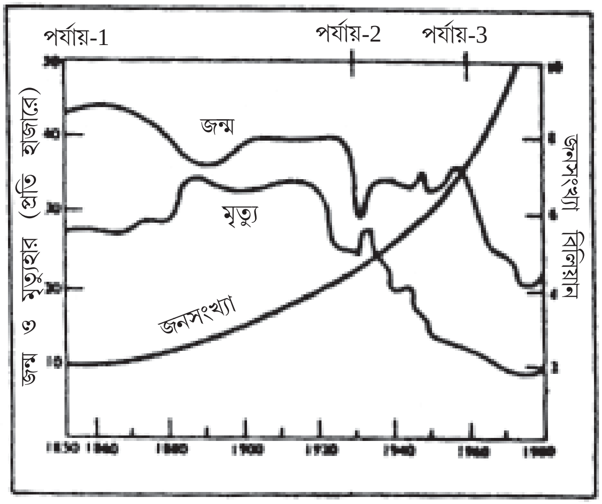

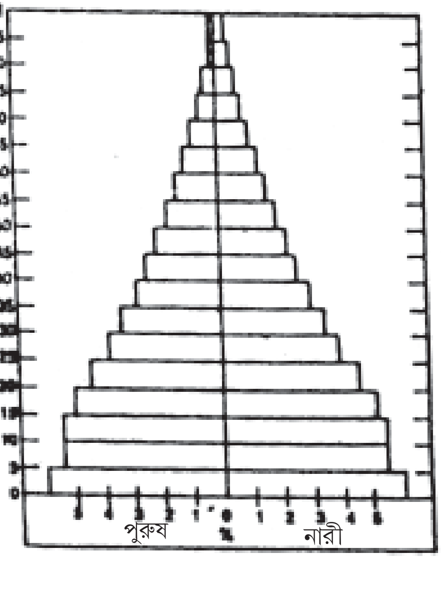

চিত্র — 4.10 (ক) (খ) চিলির জনমিতি পরিবৃত্তকালের মডেল ও জনসংখ্যা পিরামিড। 1930-র দশকে চিলি জনমিতি পরিবৃত্তকালের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। মৃত্যুহার হঠাৎ করে কমে গিয়েছিল। কিন্তু জন্মহার প্রতি হাজারে 30 ছিল। 1960-র দশকে সরকারী জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতির দরুন জন্মহার হঠাৎ করে কমে যায়। অবশ্য 1979 সালে ঐ নীতি বদলের ফলে 1980 দশক থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

4.7.3 আধুনিক পাশ্চাত্য পর্যায় (পরিণত হার)

এই ক্ষেত্রে দেখা যায় জন্মহার মাঝারি মাপের প্রতি হাজারে 20%, মৃত্যুহার কম প্রায় 10%। সামাজিক বিবর্তনের মাপকাঠিতে এগিয়ে থাকা দেশগুলোতে এই অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। সেদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে পৃথিবীর অধিকাংশ শ্বেতকায় অধ্যুষিত দেশগুলো এই পর্যায়ে (চিত্র 4.11) পড়ে। নবীন পাশ্চাত্য পর্যায় বা প্রাথমিক প্রকৃতির হারের মত এক্ষেত্রে ও কয়েকটি উপরিভাগ লক্ষ্য করা যায়—

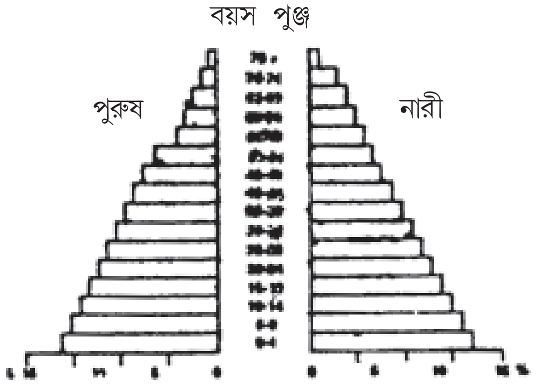

চিত্র — 4.11 (ক) যুক্তরাজ্যের (U.K.) জনসংখ্যা পিরামিড 1891।

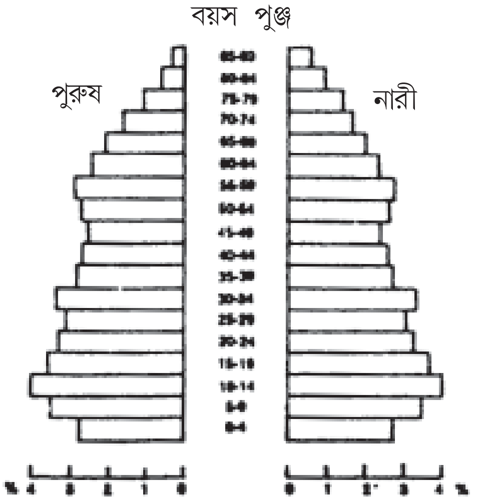

চিত্র — 4.11 (খ) যুক্তরাজ্যের (U.K.) জনসংখ্যা পিরামিড 1878।

পর্যায় 1 (Stage 1) ঃ যেখানে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে 12 জন, দক্ষিণ ইউরোপের অনেকগুলো দেশ এই পর্যায়ে পড়ে। যেমন পর্তুগাল (9%), যুগোশ্লাভিয়া (9.3%), স্পেন (10.7%)। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া (10.4%), নিউজিল্যান্ড (12%), কানাডা প্রভৃতি দেশও এই পর্যায়ে পড়ে।

পর্যায় 2 ঃ এরপরও রয়েছে কিছু কিছু দেশ, যেখানে জন্ম (প্রতি হাজারে প্রায় 12) ও মৃত্যু (প্রায় 10) দুই-ই খুব কম। ফলে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার হাজারে দুই জন। উত্তর ইউরোপের দেশগুলো যেমন অস্ট্রিয়া (0.6%), বেলজিয়াম (1.2%), যুক্তরাজ্য (1.9%) ও সুইডেন (3.0%)-এর মধ্যে পড়ে। সাম্প্রতিককালে (1987) যুক্তরাষ্ট্রে জন্মহার বিগত বছরগুলোর তুলনায় দারুণভাবে কমে গেছে। উচ্চশিক্ষা ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার কামনার দরুণ এদেশের যুবক-যুবতীদের বিয়ে স্থগিত রয়েছে এবং এটাই কম জন্মহারের কারণ বলে

ভাবা হচ্ছে। এর পাশাপাশি কতকগুলো দেশ রয়েছে যেখানে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার নেতিবাচক অর্থাৎ জন্মহারের চেয়ে মৃত্যুহার বেশী। যেমন জার্মানী (2.3%), লাক্সেমবার্গ (2.1%), অস্ট্রিয়া এবং বেলজিয়ামও এইরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি।

ওপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে স্বাভাবিক (জন) বৃদ্ধির হার সব দেশে সমান নয় (চিত্র 4.12)।

চিত্র — 4.12 পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনমিতিক অবস্থা

আর্থিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এগিয়ে থাকা দেশগুলোতে এই হার বেশ কম। অন্যদিকে, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোতে এটা একটা বিকট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জনসংখ্যার প্রভাব অধিবাসীদের আয়ু, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার হারে প্রতিফলিত হয়। উন্নত দেশগুলো উপরোক্ত প্রতিটিক্ষেত্রেই উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। নীচের সারণীগুলোতে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হল—

সারণি 4.13

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের আয়ু, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির তুলনা

উন্নত দেশ	গড় আয়ু বছর (1995-2000)	শিশু মৃত্যু হাজারে	প্রতি 1,00,000 -এ ডাক্তারের সংখ্যা	কলেরা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা (প্রতি লক্ষে)	প্রয়োজনের তুলনায় ক্যালোরির জোগান (%)	কম ওজনের শিশুর সংখ্যা (%)
যুক্তরাষ্ট্র	76.7	10	245	0.01	138	—
জার্মানী	76.7	7	319	—	148	—
যুক্তরাজ্য	77.1	7	167	0.02	130	—
ফ্রান্স	78.8	9	280	0.01	143	—
জাপান	80.8	6	177	0.26	125	—
উন্নয়নশীল দেশ ঃ						
ভারত	62.4	115	48	0.36	101	53
বাংলাদেশ	58.1	115	18	—	8	67
পাকিস্তান	63.9	137	52	—	99	38

(সূত্র ঃ World Resources, 1998-99)

4.8 মানব সম্পদ ঃ শিক্ষা

মানুষকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা দেয় শিক্ষা। শিক্ষা মানুষকে ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা বোঝার ক্ষমতা জোগায়। শিক্ষা সামাজিক ঐক্য সুদৃঢ় করে। মানব সম্পদের বিকাশের জন্য শিক্ষার প্রভাব অপরিসীম।

একথা ঠিক সব দেশেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হলে আজও পৃথিবীতে প্রতি চারজনের একজন নিরক্ষর রয়ে গেছে। World Bank-র তথ্য অনুসারে মাত্র 4 বছরের শিক্ষার সাহায্যে যদিও প্রতিটি কৃষক 10 শতাংশ উৎপাদন করাতে সক্ষম হয়, কিন্তু দ্রারিদ্র ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষা বিস্তারের হার কম। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যেখানে মাথা পিছু বার্ষিক গড় খরচ উচিত প্রায় 250 টাকা, সেখানে আফ্রিকার দেশগুলোতে এই খরচে হার মাত্র 30 টাকা। দ্রুত অক্ষমতার দরুণ বিকাশশীল দেশগুলোতে এই খরচের হার মাত্র 30 টাকা। দ্রুত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও ন্যূনতম শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় খরচ যোগানের অক্ষমতার দরুণ বিকাশশীল দেশগুলোতে মানব সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। এখানে বলা দরকার যে পৃথিবীর মোট নিরক্ষরের 98% তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে আর বাকী 2% উন্নত দেশগুলোতে রয়েছে। নীচের সারণীতে পৃথিবীর কিছু দেশে স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়ের সংখ্যা ও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শিক্ষিতের হারের একটি তুলনামূলক ধারণা সারণি 4.14 ও 4.15-এ তুলে ধরা হল।

সারণী 4.14

6-17 বছর বয়স্ক পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (%)

দেশ	শতাংশ
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আর্জেন্টিনা, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, নরওয়ে	90% ও তার বেশী
চীন, ইতালি, অস্ট্রিয়া, মেক্সিকো	80-89%
তুরস্ক, ইরাক, টিউনিশিয়া	70-79%
ভারত, মায়ানমার, নেপাল, সৌদি আরব	60-69%
পাকিস্তান, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, ইথিওপিয়া, জাইরে	60%-র কম

সূত্র ঃ অনীশ চট্টোপাধ্যায়—অর্থনৈতিক ভূগোল

পূর্ণবয়স্কদের মধ্যে শিক্ষিতের হারের ক্ষেত্রেও উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে তফাৎ রয়েছে। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষতার হার অনুসারে দেখা যায়—

সারণী 4.15

পূর্ণবয়স্ক শিক্ষিতের হার

উন্নত দেশ	পুরুষ %	নারী %	মোট %
যুক্তরাষ্ট্র	99.0	99.0	99.0
জার্মানী	99.0	99.0	99.0
যুক্তরাজ্য	99.0	99.0	99.0
ফ্রান্স	99.0	99.0	99.0
জাপান	99.0	99.0	99.0
ভারত	65.6	37.7	52.0
বাংলাদেশ	49.4	26.1	38.1
পাকিস্তান	50.0	24.4	37.8

(সূত্র ঃ ঐ পূর্বের মত)

যে, পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশে নিরক্ষর মানুষ নেই বললেই চলে, অপরপক্ষে ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে নিরক্ষর মানুষের হার 50 শতাংশ-এর একটু বেশী। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের অবস্থা আরও খারাপ। এ প্রসঙ্গে নারী শিক্ষার হার বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। পাকিস্তান, বাংলাদেশে এই হার যথাক্রমে 24.4% ও 26.1%, ভারতের ক্ষেত্রে এই হার সামান্য বেশী, 37.7%। কিছুটা কুসংস্কার, ধর্মীয় প্রভাব, দারিদ্র, বিদ্যালয়ের অভাব ও বাসস্থান থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব এর জন্য অনেকাংশে দায়ী।

সারণি 4.17

পৃথিবী ঃ জীবনগত পরিসংখ্যান, 1980-85

দেশ/অঞ্চল	স্থূল জন্মহার %	স্থূল মৃত্যুহার %	বৃদ্ধির হার %	শিশু মৃত্যু %	প্রত্যাশিত আয়ু (বছরের হিসেবে)
পৃথিবী	27	11	1.6	81	59
অধিক উন্নত অঞ্চলসমূহ	15	10	0.5	17	23
কম উন্নত অঞ্চলসমূহ	31	11	2.0	92	57
আফ্রিকা	46	16	3.0	114	50
পূর্ব আফ্রিকা	49	17	3.2	110	49
মধ্য আফ্রিকা	45	18	2.7	120	48
উত্তর আফ্রিকা	42	13	2.9	108	56
দক্ষিণ আফ্রিকা	40	14	2.6	94	53
পশ্চিম আফ্রিকা	49	19	3.0	123	47
আমেরিকা	25	9	1.6	50	67
ল্যাটিন আমেরিকা	32	8	2.4	63	64
ক্যারিবীয় দেশসমূহ	27	8	1.5	58	64
মধ্য আমেরিকা	35	7	2.8	57	65
নাতিশীতোষ্ণ দক্ষিণ আমেরিকা	24	9	1.5	37	65
ক্রান্তীয় দক্ষিণ আমেরিকা	32	8	2.4	70	63
উত্তর আমেরিকা16	9	0.7	12	74	
এশিয়া	27	10	1.7	87	58
পূর্ব এশিয়া	18	7	1.1	36	58
দক্ষিণ এশিয়া	35	13	2.2	109	54
পশ্চিম এশিয়া	38	10	2.8	93	61
ইউরোপ	14	11	0.3	16	73
পূর্ব ইউরোপ	16	11	0.5	20	72
উত্তর ইউরোপ	13	12	0.1	11	74
দক্ষিণ ইউরোপ	15	10	0.5	18	73
পশ্চিম ইউরোপ12	11	0.1	11	74	
ওশেয়ানিয়া	21	8	1.3	39	68
অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড	16	8	0.8	11	74
মেলেনেশিয়া	39	11	2.8	84	57
পলিনেশিয়া	36	6	3.0	39	67
পূর্বতন রাশিয়া (C.I.S.)	19	9	1.0	25	71
ভারত (1991)	**31**	**11**	**2.0**	**91**	**58**

সূত্র ঃ United Nations, World Population Chart, 1984.

এক নজরে ভারতবাসীদের জীবনগত পরিসংখ্যান

(Vital Statistics of the Indians at a glance)

প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ঃ 62.8 বছর (1994 সাল)
(প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা)
প্রজনন হার (প্রতি হাজারে) : 3.9 (1990-95)
স্থূল জন্মহার (প্রতি হাজারে) : 21 (1995)
স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে) : 9.8 (1995)
শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে) : 72 (1994)
5 বছরের আগেই শিশুমৃত্যুর সংখ্যা (প্রতি হাজারে) : 3.1 মিলিয়ান (1992)
প্রসূতি মৃত্যু প্রবণতার হার (প্রতি 1 লাখে জীবন্ত শিশু) : 570 (1993)
60 বছরের বেশি জনসংখ্যা : 6.1 (মোট জনসংখ্যার %)
প্রতিদিন যৌতুকের জন্য মৃত্যু : 17জন

সারণি

ভারতে প্রতি হাজারে স্থূল জন্ম ও মৃত্যুহার

(1901-11 থেকে 1981-91)

বৎসর	জন্মহার	মৃত্যুহার
1901-11	49.2	42.6
1911-21	48.1	47.2
1921-31	46.4	36.3
1931-41	45.2	31.2
1941-51	39.9	27.4
1951-61	41.7	22.8
1961-71	41.2	19.0
1971-81	37.2	15.0
1986-91	30.9	10.8

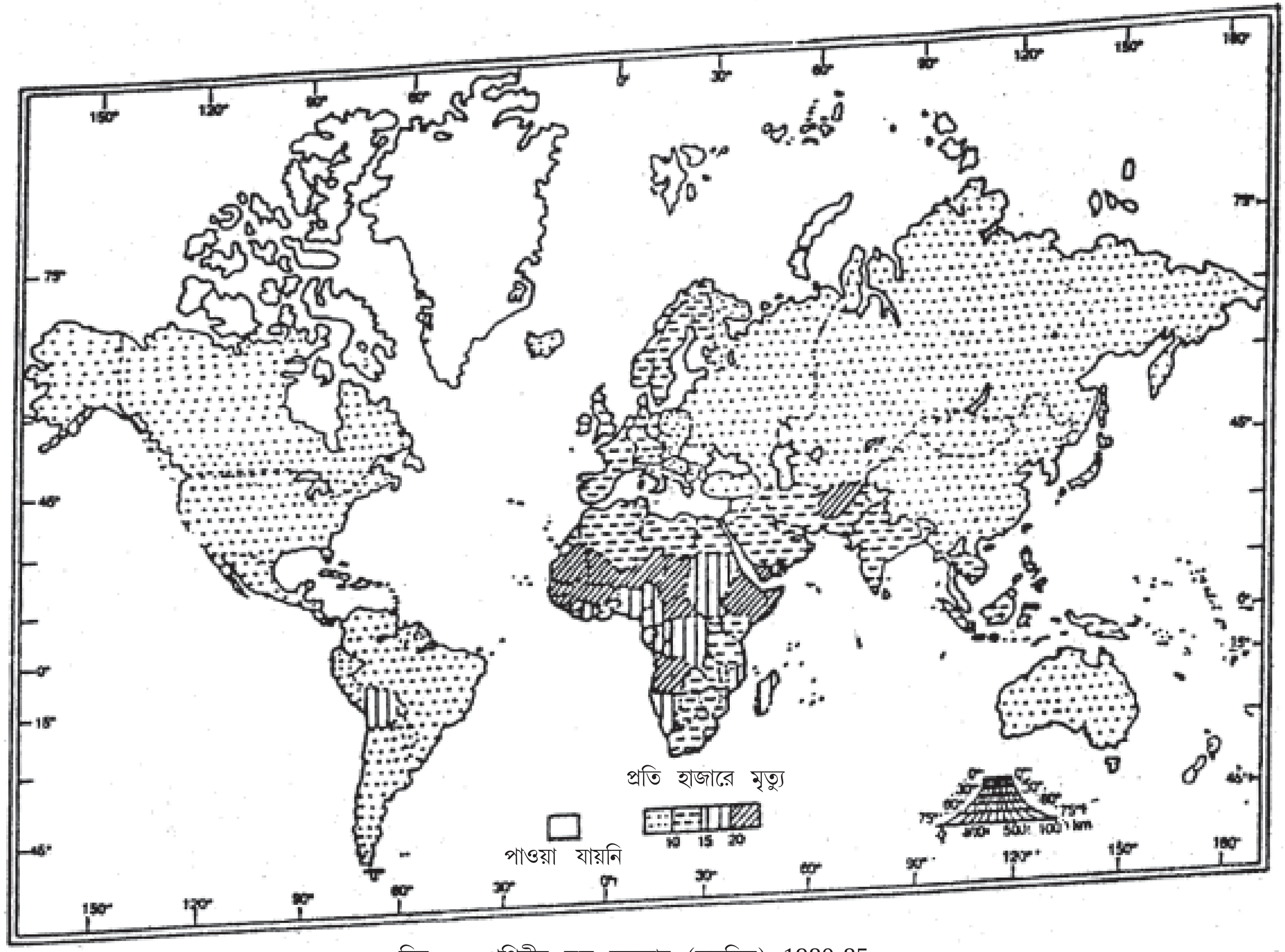

চিত্র পৃথিবীর স্থূল মৃত্যুহার (অনুমিত) 1980-85

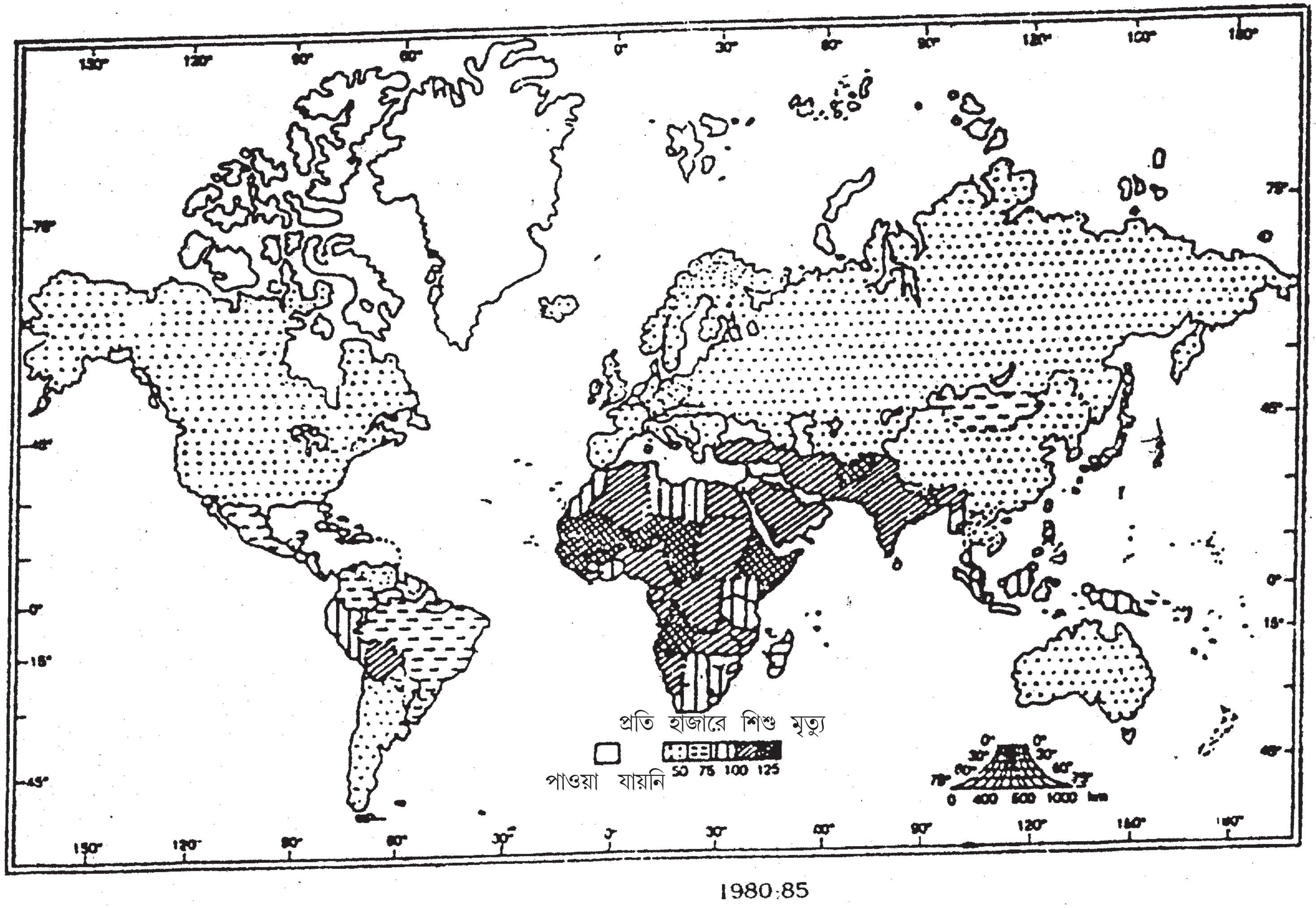

1980-85

চিত্র পৃথিবী ঃ শিশুমৃত্যু হার (অনুমিত) 1980-85

শহরবাসীর সংখ্যানুসারে দেখা যাচ্ছে যে উন্নত দেশের শতকরা 7-3 থেকে 90 জন শহরবাসিন্দা। আবার ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই হার হল 19 থেকে 35 শতাংশ।

4.9 মানব সম্পদ ঃ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

হু (WHO)-র পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ম্যালেরিয়া, হুপিং কাশি, নিউমোনিয়া, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগ বেশী দেখা যায়। ইদানীং আবার এইড্‌স (AIDS) রোগ যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে আগামী দিনে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এই রোগ হতে যথেষ্ট সংখ্যায় জীবনহানির আশঙ্কা আছে। নীচের সারণি থেকে গত পাঁচ বছরে (1987-1992) ভয়াবহ এইড্‌স রোগে আক্রান্তের সংখ্যা কিভাবে বেড়ে চলেছে তা পরিষ্কার হবে।

সারণি 4.16

এইড্‌স রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা

মহাদেশ	রোগীর 1987	সংখ্যা 1992
উত্তর আমেরিকা	23,704	2,08,089
দক্ষিণ আমেরিকা	3,751	44,888
ইউরোপ	6,106	60,195
এশিয়া	92	1,254
ওশানিয়া	383	3,189

সূত্র ঃ WHO, 1992.

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এইড্‌স রোগ থেকে মুক্তির জন্য ব্যবস্থা নিলেও বিভিন্ন দেশে রোগী প্রতি ডাক্তারের সংখ্যা এত কম যে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত প্রকল্পগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে উন্নয়নণশীল দেশগুলোতে। ফ্রান্স, জার্মানীর মত উন্নত দেশগুলোতে যেখানে প্রতি 500 জন এডস্ রোগী প্রতি 1 জন ডাক্তার রয়েছে, আফ্রিকার ইথিয়োপিয়াতে প্রতি 77,000 জন রোগী প্রতি 1 জন চিকিৎসক নিযুক্ত রয়েছেন।

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবের জন্য ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রোগের প্রাদুর্ভাব ও শিশু মৃত্যুর হার বেশি। WHO-র সমীক্ষায় জানা গেছে যে, পৃথিবীতে প্রতি 5 জনে 1 জন পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে মারা যায়। পৃথিবীতে প্রতি বছর পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের সংখ্যা হল 1,10,000 জন। আর এটা ঘটে সুষম খাদ্যের অভাবে।

এজন্য মানব সম্পদের সার্বিক উন্নতির জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রতিষেধক ও চিকিৎসার পরিষেবা জনগণের মধ্যে আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। নীচের সারণি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর গড় আয়ু, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, রোগী প্রতি ডাক্তারের সংখ্যা, ক্যালোরির যোগান, কম ওজনের শিশুর সংখ্যার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হল।

এক নজরে ভারতের জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা
(India' population, health and education at a glance)

জনসংখ্যা	:	953 মিলিয়ান 1996 সাল,
জাতিপুঞ্জ অনুমিত জনসংখ্যা	:	1,022 (2000 সালে, অভিক্ষেপ)
জনসংখ্যা দু'গুণ হবার সাল	:	2031
বাৎসরিক বৃদ্ধির হার	:	1.8 শতাংশ (1995)
পৌর জনসংখ্যা 1994 সাল	:	26 শতাংশ
গ্রামীণ জনসংখ্যা	:	74 শতাংশ
পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতাংশ	:	16
স্বাস্থ্য পরিষেবার আওতার বাইরে জনসংখ্যা (1985-95)	:	135.2 মিলিয়ান
বিশুদ্ধ জল ভোগকারী জনতা (1990-95)	:	171.3 "
পয়ঃ প্রণালী সুবিধা ভোগকারী জনতা	:	640 "
জনসংখ্যা-প্রতি ডাক্তার	:	2.437 (1898-91) জন
" নার্স	:	3.333 জন
ধূমপায়ী জনতা (UNO, 1990) সমীক্ষা	:	পুরুষ 53%
	:	3% নারী
R + D বৈজ্ঞানিক ও কারিগরীবিদ প্রতি হাজার লোকসংখ্যায়	:	0.3% (1985-92)
ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ছাত্রপিছু একজন শিক্ষক	:	প্রাইমারী স্কুল : 48 জন
" "	:	মাধ্যমিক : 33 জন (1992)
শিক্ষার হার (1993)	:	পুরুষ 64%
	:	নারী 36%
প্রতি 100 জনসংখ্যায় সংবাদপত্রের সংখ্যা	:	3টি (1992)
প্রতি 1 লক্ষ জনসংখ্যায় প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা	:	1টি (1990-91)।

সূত্র : Manorama Year Book, 1997.

সারণি
রাজ্যভিত্তিক ডাক্তার-জনসংখ্যার অনুপাত ও জনসংখ্যা-হাসপাতাল শয্যার অনুপাত (1984)

রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	লোকসংখ্যা-পিছু ডাক্তারের অনুপাত	জনসংখ্যার-অনুপাতে হাসপাতাল শয্যা
অরুণাচল প্রদেশ	3,390	627
অন্ধ্রপ্রদেশ	13,266	1,401
অসম a	11,879	1,672
বিহার b	4,746	3,097
গুজরাট	4,885	1,000
হরিয়ানা	6,873	1,714
হিমাচল প্রদেশ c	7,514	1,034
জম্মু ও কাশ্মীর c	6,996	1,518
কর্ণাটক	1,712	1,204
কেরালা	6,451	591
মধ্যপ্রদেশ	3,920	3,026
মহারাষ্ট্র	1,861	730
মণিপুর	2,693	1,140
মেঘালয়	5,849	647
মিজোরাম	4,737	569
নাগাল্যান্ড	3,689	709
ওড়িশা	7,829	2,149
পাঞ্জাব	5,156	1,149
রাজস্থান	11,273	1,734
সিকিম c	3,115	663
তামিলনাড়ু	7,753	1,142
ত্রিপুরা	4,447	1,641
উত্তরপ্রদেশ	4,141	2,350
পশ্চিমবঙ্গ	2,145	1,056
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	2,355	259
চণ্ডীগড়	1,530	353
দাদরা ও নগর হাভেলী	3,630	2,073
দিল্লী	8,301	424
গোয়া, দমন ও দিউ	959	383
লাক্ষাদ্বীপ	2,200	405
পণ্ডিচেরী	1,252	259

a 1979, b 1973, c 1974 সাল

একনজরে আমাদের খাদ্য

ক্যালোরি গ্রহণ (গড়ে প্রতিদিন মাথাপিছু)	:	2,395 (1992)
দুধ প্রতিদিন	:	107 গ্রা
মাংস (বাৎসরিক)	:	2 কেজি (1990)
মাথাপিছু খাদ্য প্রাপ্তি (প্রতিদিন)	:	436 গ্রা (1994)
ডাল	:	38 গ্রা (1994)
ভোজ্য তেল	:	6 কেজি (1992-93)
বনস্পতি	:	1 কেজি (1992-93)
শাকসবজি	:	150 গ্রা প্রতিদিন (1995)
ফল	:	80 গ্রা (1995)
চিনি	:	14 কেজি (1992-93)

সারণি 4.18

মানুষের জীবনযাত্রার গুণমানের পার্থক্য

সূচক	সাল	যুক্তরাষ্ট্র	জার্মানী	যুক্তরাজ্য	ফ্রান্স	জাপান	রাশিয়ান ফেডারেশন	ভারত	বাংলাদেশ	পাকিস্তান
শহরবাসীর সংখ্যা (%)	1997	77	87	89	75	78	77	27	19	35
শহরাঞ্চলে পয়ঃপ্রণালী ও শৌচাগারের সুযোগ (%)	1995	—	100	—	100	—	—	70	77	53
মাথাপিছু ব্যক্তিগত ভোগের বৃদ্ধি	1983-1996	1.8	—	2.6	1.7	2.9	—	2.3	0.0	1.1
শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির প্রাদুর্ভাব (%)	1990-1996	—	—	—	3	—	66	68	40	

(সূত্র ঃ World Development Report : 1998-99)

শহরাঞ্চলে প্রতিটি শিল্পোন্নত দেশের সব মানুষ উন্নত পয়ঃপ্রণালী ও শৌচাগারের সুযোগ ভোগ করেন। পক্ষান্তরে, ভারতে শতকরা 70, বাংলাদেশে 77 এবং পাকিস্তানে 77 জন এই সুযোগ পান। এজন্য খোলা মাঠে মলমূত্র ত্যাগের প্রবণতার মাধ্যমে বিভিন্ন সংক্রামিত রোগ ছড়ায় ও জীবনযাত্রার মানের হানি ঘটে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হল যে, পৃথিবীর বিকাশশীল দেশগুলোতে মানব উন্নয়নের হার খুব কম, আর এজন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও জনসংখ্যা সম্পর্কিত কারণকে দায়ী করা হয়।

4.10 জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Population and Economic Development)

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি কতকগুলো কারণের ওপর নির্ভরশীল। Human beings serve as both ends and means in all economic activities. যে কোন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য জনসংখ্যাই হল একটি সক্রিয় উপাদান। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের

সাথে সাথে বহুদেশে জনসংখ্যা বেশ বেড়েছে। খ্রীষ্টের জন্মের সময় থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা দু’গুণ বেড়েছিল। কিন্তু পরবর্তী মাত্র 150 বছরে সেই জনসংখ্যা দুগুণ হল। এ প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন স্বভাবতই এসে পড়ে। তা হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন কি জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রণোদিত না প্রতিহত করে, অথবা জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিই কি অর্থনৈতিক উন্নতিতে প্রেরণা যোগায়, না তাকে প্রতিহত করে (হক, 1986), এ প্রসঙ্গে আমরা কয়েকজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের চিন্তাধারাকে তুলে ধরলাম। প্রথমেই আসা যাক ম্যালথ্যাসের কথায়।

4.10.1 ম্যালথুসীয় তত্ত্ব

কোন দেশের জনসংখ্যা কিভাবে বৃদ্ধি পায় সে সম্পর্কে রবার্ট ম্যালথাস অষ্টাদশ শতাব্দীতে একটি তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন (চিত্র 4.15)।

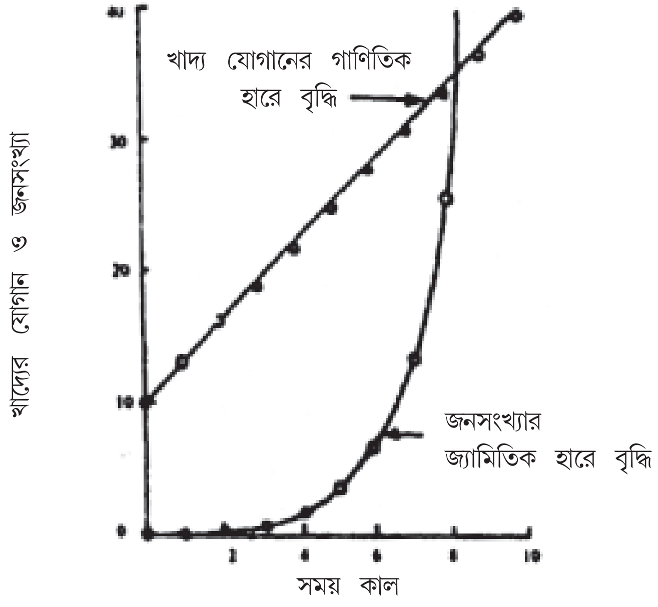

ম্যালথাসের তত্ত্ব

চিত্র — 4.15 ম্যালথাসের তত্ত্ব

যা ‘ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব’ নামে পরিচিত। তাঁর মতে কোন দেশের জনসংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে, কিন্তু কৃষিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন নিয়ম (Law of Diminishing Returns) অনুসারে খাদ্যশস্যের উৎপাদন সেই হারে বাড়ে না। ম্যালথাসের মতে জনসংখ্যা গুণোত্তর প্রগতিতে (Geometrical Progression) যেমন 1, 2, 4, 8, 16, 32 এইভাবে বাড়ে, অর্থাৎ এই প্রগতির বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি রাশিই তার আগের রাশির দু’গুণ। খাদ্যোৎপাদন সমান্তরাল প্রগতিতে (Arithmetical Progression) যেমন 1, 3, 5, 7, 9,

11, ...এইভাবে বাড়ে। ম্যালথাস আরও বলেছেন যে এই হারে জনবৃদ্ধি চলতে থাকলে পঁচিশ বছর পর তা দু'গুণ হবে। ম্যালথাসের মতে দেশে খাদ্যশস্যের যোগানের সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। কিন্তু এমন একটা সময় আসে যখন দেশের খাদ্যোৎপাদন জনগণের চাহিদা মেটাতে পারে না। ফলে দেশের জনাধিক্য দেখা দেয়। জনাধিক্য মানেই খাদ্যের ঘাটতি, আর খাদ্য ঘাটতি মানেই অভাব-অনটন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও যুদ্ধের হাতছানি। ফলস্বরূপ দেশে মৃত্যুহার বাড়ে এবং জনসংখ্যাও কিছু কমে। এইভাবে জনসংখ্যা ও খাদ্যের যোগানের মধ্যে একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ম্যালথাসের মতে এই ভারসাম্য কিন্তু খুবই ক্ষণস্থায়ী, কারণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জনসংখ্যা গুণোত্তর প্রগতিতে বাড়তে থাকে, কিন্তু যেহেতু খাদ্যের যোগান সেই হারে বাড়ে না তাই অল্পদিনের মধ্যেই জনাধিক্য দেখা যায়। এই দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ম্যালথাস জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে দুটি প্রতিরোধমূলক নিয়ন্ত্রণের (Preventive Checks) কথা বলেছেন। যেমন—বেশী বয়সে বিয়ে করা বা চিরকুমার/কুমারী থাকা।

4.10.2 কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব (Theory of Optimum Population)

অধ্যাপক ক্যানান (Cannan) ও সান্ডার্স (Saunders) ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের বদলে "কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব" নামে একটি বিকল্প জনসংখ্যা তত্ত্ব প্রচার করেন। ম্যালথাসের ন্যায় এই তত্ত্বে শুধুমাত্র খাদ্যের যোগানের সাথে জনসংখ্যার সম্পর্ক বিচারের পরিবর্তে দেশের মোট প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার সমস্যাটিকে বিচার করা হয়েছে। এই তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ পূর্ণভাবে ব্যবহার করার জন্য একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যার প্রয়োজন হয় যাকে কাম্য বা সর্বোত্তম জনসংখ্যা বলা হয়ে থাকে। যদি কোন দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা ওই কাম্য জনসংখ্যার তুলনায় কম হয়, তবে সেই দেশটি জনস্বল্পতার (Underpopulation) সমস্যায় ভুগছে বলা হয়ে থাকে। এর বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হলে বলতে হবে দেশটি জনাধিক্য (Overpopulation) সমস্যায় ভুগছে। যদি কোন দেশে বর্তমান জনসংখ্যা ও কাম্য জনসংখ্যা পরস্পর সমান হয়, তবে বলতে হয় ওই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। ব্যাপারটা একটু ঘুরিয়ে বললে বলতে হয় যে সম্পদের উপযুক্ত ও পূর্ণ ব্যবহার করে কোন দেশে যতসংখ্যক জনতার উচ্চমানের জীবনযাত্রা রক্ষা করা সম্ভব হয়, সেই পরিমাণ জনসংখ্যাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে। কোন দেশের কাম্য জনসংখ্যার পরিমাণ কিভাবে নির্ণয় করা যায়, তা ব্যাখ্যা করতে অধ্যাপক থিরল্‌ওয়াল (Thirlwal) 4টি উপায়ের কথা বলেছেন ঃ (1) কাম্য জনসংখ্যা বলতে সেই পরিমাণ জনসংখ্যাকে নির্দেশ করা যেতে পারে যার দ্বারা দেশের মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হবে (চিত্র 4.16)।

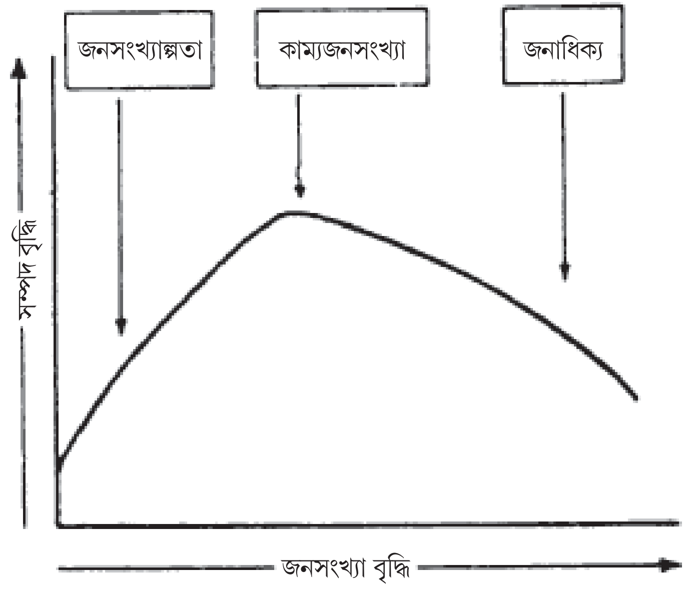

চিত্র — 4.16 কাম্য জনসংখ্যা

বিষয়টি এইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যদি কোন দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা কম হয়, তবে সেক্ষেত্রে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা কম রয়েছে বুঝতে হবে (সরখেল, 1994)। এই অবস্থায় জনসংখ্যা বাড়লে তবে তার সাহায্যে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগানো যাবে। ফলে দেশের মাথাপিছু আয় বাড়বে, অর্থাৎ যে পরিমাণ জনসংখ্যা থাকলে কোন দেশের মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হবে, সেই পরিমাণ জনসংখ্যাই হল ঐ দেশের কাম্য জনসংখ্যা।

(2) কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটি সর্বনিম্ন কল্যাণের স্তরের দ্বারাও সূচিত হতে পারে। এই ধারণানুসারে যতদূর পর্যন্ত জনসংখ্যা বাড়লে প্রান্তিক উৎপাদন (Marginal Production) সর্বনিম্ন কল্যাণ স্তরের (Welfare Level) সঙ্গে সমান হবে, সেইটি হবে কাম্য জনসংখ্যার পরিমাণ।

(3) যদি আমরা ধরি যে মোট উৎপাদন সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া সম্ভব হয়, সেক্ষেত্রে কাম্য জনসংখ্যা হবে যেখানে সর্বনিম্ন কল্যাণস্তর গড় উৎপাদনের সঙ্গে সমান।

(4) কাম্য জনসংখ্যা হল সেই পরিমাণ জনসংখ্যা সেখানে প্রান্তিক উৎপাদন হল শূন্য অর্থাৎ যেখানে মোট উৎপাদন হল সর্বাধিক।

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বাপেক্ষা কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটি অপেক্ষাকৃত উন্নত, কারণ এই মতবাদে জনসংখ্যার সমস্যাটি শুধু খাদ্য সরবরাহের পরিপ্রেক্ষিতে না দেখে দেশের সমগ্র সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়েছে।

(i) তবে মুশকিল হল এই যে কাম্য জনসংখ্যার পরিমাণ কত তা নির্ণয় করা কঠিন। স্বভাবতই, আমরা বলতে পারি না যে সেই দেশটি জনস্বল্পতা না জনাধিক্য সমস্যায় ভুগছে।

(ii) এই তত্ত্বটি স্থিতিশীল (Static)। কারণ কতকগুলো বিষয় এই তত্ত্বে অপরিবর্তিত আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। যেমন এই তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয় দেশের উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদন ব্যবস্থা বা দেশের মোট সম্পদ অপরিবর্তিত আছে বাস্তবে কিন্তু এটা ঘটে না।

এই তত্ত্বে জনসংখ্যা কি হারে বাড়ছে, সে সম্পর্কে কোন রকম আলোকপাত করা হয়নি।

এই মতবাদানুসারে মাথাপিছু আয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই জনসংখ্যার কাম্যতা নির্ণীত হয়। কিন্তু যদি আয়ের বন্টন অসম হয়, তবে মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হলেই জনতার শ্রীবৃদ্ধি যে যথেষ্ট হবে, তা বলা যায় না। তাই এই তত্ত্বটি কোন অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে সাহায্য করে না।

সবশেষে বলতে হয় কাম্য জনসংখ্যার তত্ত্বটি একটি আদর্শ লক্ষ্য মাত্র। দাঁড়িপাল্লার একদিকে ওজন বেশি হলে অন্যদিকে যেমন ভারসাম্য নষ্ট হয়, তেমনি জন্মহার, মৃত্যুহার অপেক্ষা কম/বেশী ঘটলে কাম্য জনসংখ্যার স্থিতিশীলতা নষ্ট হবে। যেহেতু উপরোক্ত উপাদানগুলো গতিশীল, তাই কাম্য জনসংখ্যার পরিমাণ পরিবর্তনশীল।

4.10.2 মানুষ-জমি অনুপাত (Man-Land Ratio)

কোন স্থানের জমির ওপর জনসংখ্যার প্রকৃত চাপ কিরূপ, তা জনবসতির ঘনত্ব দিয়ে বলা যায় না। কোন অঞ্চলের উন্নতির পরিমাপ করতে হলে কার্যকরী জমির হিসেব করতে হবে। কারণ মানুষ ও জমির মধ্যে সুষ্ঠু অনুপাত বজায় রাখতে না পারলে অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভবপর নয়। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নও সম্ভব হবে না, তবে এ কথাও ঠিক যে সমস্ত জমির ও মনুষ্যবসতির অনুপাত নিয়ে উন্নতির হিসেব করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

মানুষ জমির অনুপাত বলতে বোঝায় মানুষ ও কার্যকরী জমির অনুপাত। এটির সূত্র হল ঃ

$$\text{মানুষ-জমির অনুপাত} = \frac{\text{মোট কার্যকরী জমির অনুপাত}}{\text{মোট জনসংখ্যা}} \quad 1$$

কার্যকরী জমি বলতে বোঝায় যে জমি থেকে মানুষ তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য বস্তু উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে ব্রাজিল দেশটির মোট জমির পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রের মোট জমির চেয়ে বেশি। কিন্তু ঐ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বা মানুষের জীবনযাত্রার মান যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেক কম, কারণ হিসেবে বলা হয়ে থাকে ব্রাজিলের বেশির ভাগ জমি অনুর্বর ও কৃষির অনুপযোগী।

কার্যকরী জমির হিসেব করতে সামগ্রিক প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদকে বিশ্লেষণ করতে হবে। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যে জমির কার্যকারিতা বাড়ছে। অতীতে জমি ছিল দ্বিমাত্রিক, বর্তমানে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে জমি ত্রিমাত্রিক সম্পদে পরিণত হয়েছে। স্বভাবতই জমির কার্যকারিতাও বেড়েছে। মানুষ ও জমির অনুপাতের উন্নতি ঘটেছে। যুক্তরাজ্য সম্পর্কে বলা হয় যে দেশটি যদিও আয়তনে ছোট আর জনঘনত্ব বেশী, তথাপি ঐ দেশের জনসাধারণ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপনে সক্ষম হয়েছে, কারণ যুক্তরাজ্য তার অধীনস্থ উপনিবেশগুলি থেকে সস্তায় খাদ্যশস্য ও শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করত। আবার যুক্তরাজ্য তার উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য উপনিবেশগুলোতে চড়া দামে বিক্রী করতে পারে। অর্থাৎ যুক্তরাজ্য তার রাজনৈতিক প্রভুত্ব কায়েম করে তার উপনিবেশের ওপর নিজের প্রভুত্ব কায়েম করতে পেরেছিল। প্রভুত্ব দু'প্রকার হতে পারে—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক অধিকার কায়েম না করেও অনুন্নত দেশগুলোকে ঋণের ফাঁদে বেঁধে ঐ সব দেশের সম্পদের ওপর নিজের প্রভুত্ব কায়েম করেছে। ইংল্যান্ডের জমির কথায় ফিরে আসা যাক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উজ্জ্বল দিনগুলোতে ইংল্যান্ডের কার্যকরী জমি নিজ ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে উপনিবেশের ভূখণ্ডের মধ্যেও ব্যাপ্ত ছিল। ইংল্যান্ডের কার্যকরী জমির হিসেব করতে গিয়ে উপনিবেশের জমির কার্যকারিতাও বিচার করতে হবে। অতএব কার্যকরী জমি হল ঃ

নিজের দেশের কার্যকরী জমি + অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ + উপনিবেশের কার্যকরী জমি ও সম্পদ।

সামগ্রিক বিচারে মানুষ ও জমির অনুপাত বলতে বোঝায়—

$$\frac{\text{কার্যকরী জমি + অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ + উপনিবেশের কার্যকরী জমি ও সম্পদ}}{\text{লোকসংখ্যা + কর্মক্ষমতা}}$$

জমির মোট আয়তন থেকে অনুর্বর ও ব্যবহার অযোগ্য জমির আয়তন বাদ দিলে কার্যকরী জমি পাওয়া যায় (চিত্র 4.17)।

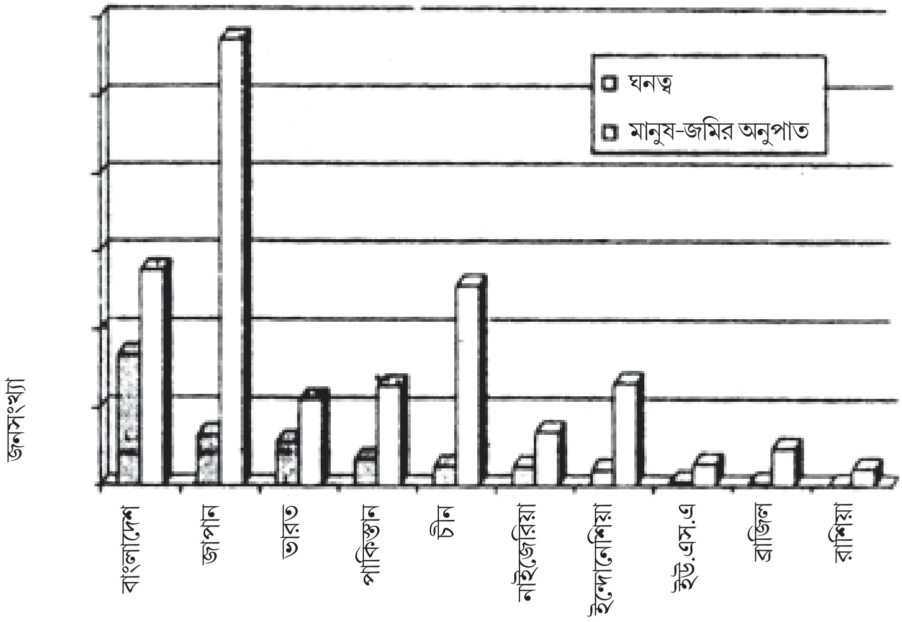

চিত্র — 4.17 প্রধান প্রধান দেশ সমূহের জনঘনত্ব ও মানুষ জমির অনুপাত।

এক নজরে পৃথিবীর প্রধান দশটি ঘনবসতি দেশের জনসংখ্যা, ঘনত্ব ও মানুষ-জমির অনুপাত, 1996

দেশ	জনসংখ্যা (কোটিতে)	আয়তন (হাজার বর্গ কিমি)	কার্যকরী জমির আয়তন (হাজার বর্গ কিমি)	ঘনত্ব (বর্গ কিমি)	মানুষ-জমির অনুপাত (বর্গ কিমি)
চীন	123.21	9596.96	958.43	128	1286
ভারত	94.46	3287.59	1697.00	287	557
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	26.94	9363.52	1877.76	29	143
ইন্দোনেশিয়া	20.05	1904.57	301.80	105	664
ব্রেজিল	16.11	8511.97	665.00	19	246
রাশিয়া	14.81	17075.40	1309.70	9	113
পাকিস্তান	14.00	796.10	216.00	176	648
জাপান	12.54	377.80	43.78	332	2864
বাংলাদেশ	12.01	144.00	87.00	838	1380
নাইজেরিয়া	11.50	923.77	329.09	124	349

ব্যবহারযোগ্য জমি বলতে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ব্যবহৃত জমিকে বোঝায়। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে আছে খনিজ সম্পদ, বনভূমি ইত্যাদি। লোকসংখ্যা বলতে শুধুমাত্র জনতার সংখ্যা নয়, তাদের বুদ্ধি, শিল্প, প্রশিক্ষণ ও কর্মদক্ষতা ইত্যাদি বিষয়গুলো ভাবতে হবে। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে জমির কার্যকারিতা কয়েকটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়, যেমন—(1) জমির অভ্যন্তরীণ কার্যকারিতা যা তার আয়তন, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদানের ওপর নির্ভর করে। (2) জমির বাহ্যিক কার্যকারিতা। এই বিষয়টি সমাজবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থা থেকে সৃষ্টি। উপনিবেশের সম্পদ যে পরিমাণ ব্যবহৃত হবে, জমির বাহ্যিক কার্যকারিতা সে পরিমাণে বাড়বে। উভয়প্রকার কার্যকারিতাই দেশবাসীর সাংস্কৃতিক বিকাশের ওপর নির্ভর করে।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে জন-জমির অনুপাত নির্ণয় করতে যে কোন সম্পদ উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত জমির মোট আয়তনকে বিবেচনা করতে হবে। দ্বিতীয়টি, যেহেতু পৃথিবীর সব দেশের জনসাধারণের সাংস্কৃতিক স্তর, এক নয় তাই জনসংখ্যাকে ও সংস্কৃতির স্তরানুযায়ী পরিবর্তন করে নিয়ে মানুষ জমির অনুপাত স্থির করতে হবে। এইভাবে নির্ণীত মানুষ-জমি অনুপাত থেকে দেশের অর্থনীতির অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীর নানা অংশের মানুষ-জমির অনুপাত পাঁচটি ধাঁচে বিভক্ত। জনসংখ্যা সম্পদের অনুপাতের প্রকৃতি নীচে দেওয়া হল ঃ

অনুশীলনী - 2

(i) মানুষ-জমি অনুপাত বলতে কি বোঝেন?

(ii) জনসংখ্যার সমস্যাগুলি উল্লেখ করুন।

4.10.4 জনসংখ্যা-সম্পদ অঞ্চল (Population Resource Region)

Ackerman পৃথিবীর জনসংখ্যা-সম্পদ অনুপাত অঞ্চল নির্ণয় করতে তিনটি উপাদানের কথা বলেছেন। এগুলো হল—জনসংখ্যা, সম্পদ এবং কারিগরী উপাদান। এদের মধ্যে কারিগরী বিদ্যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যে সব দেশ কারিগরী বিদ্যায় খুব উন্নত এবং যেখানে কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন প্রচুর ব্যক্তি আছেন, সে সব দেশে সম্পদের ব্যবহারও বেশি, যেমন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ। এই ভিত্তিতে Ackerman পৃথিবীকে পাঁচটি জনসংখ্যা-সম্পদ অঞ্চলে ভাগ করেছেন (চিত্র 4.8), যথা—

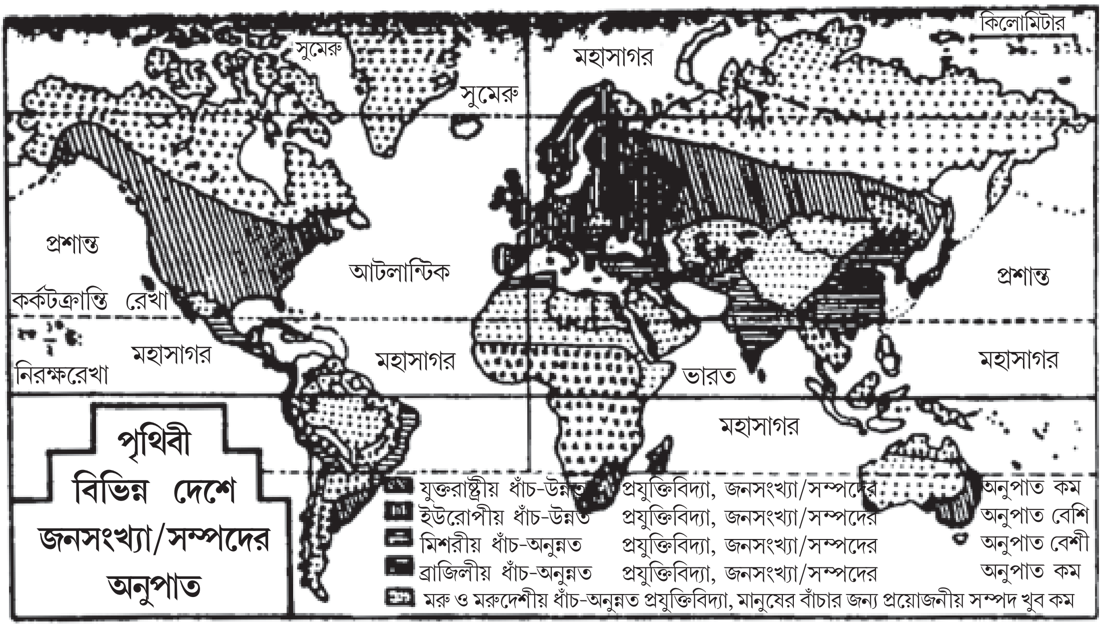

চিত্র — 4.18

(1) **যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচ ঃ** জনসংখ্যা-সম্পদের অনুপাত কম। এই ধাঁচের দেশসমূহ প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নত।

(2) **ইউরোপীয় ধাঁচ ঃ** জনসংখ্যা-সম্পদের অনুপাত বেশি। এই ধরণের ধাঁচের দেশসমূহও প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নত।

(3) **ব্রাজিলীয় ধাঁচ ঃ** জনসংখ্যা-সম্পদের অনুপাত কম। এই ধাঁচের দেশসমূহ প্রযুক্তিবিদ্যায় অনুন্নত।

(4) **মিশরীয় ধাঁচ ঃ** জনসংখ্যা-সম্পদের অনুপাত বেশি। এই ধাঁচের দেশসমূহ প্রযুক্তিবিদ্যায় অনুন্নত।

(5) **মরুভূমি ও মেরুদেশীয় ধাঁচ ঃ** প্রাকৃতিক অসুবিধের জন্য জমির কার্যকারিতা কম। এখানকার অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী অন্য স্থান থেকে সংগ্রহ করতে হয়। মোটের ওপর বলা চলে যে এই অঞ্চল জনবিরল। বর্তমানে এই অঞ্চলের গুরুত্ব হল এই যে এখান থেকে শিল্পের বিভিন্ন কাঁচামাল যেমন খনিজ তেল, বিভিন্ন আকরিক পদার্থ, পশম, সামুদ্রিক প্রাণী ইত্যাদি পাওয়া যায়।

Zelinksy ও জনসংখ্যা-সম্পদের সম্পর্কের ভিত্তিতে পৃথিবীকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করেছেন। তাঁর Type A, Type B, Type C, Type D ও Type E যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্রীয়, ইউরোপীয়, ব্রাজিলীয়, মিশরীয় এবং মরুভূমি ও মেরুদেশীয় ধাঁচের অনুরূপ।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচ ঃ এই ধাঁচের দেশসমূহের বর্তমান বা সম্ভাব্য সম্পদ বেশি। কম জনসংখ্যার এসব দেশ শুধুমাত্র কারিগরী বিদ্যায় উন্নত নয়, দ্রুত বিকাশশীলও বটে। স্বভাবতই কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি এইসব দেশে শুধু বেশিই নয়, কারিগরী দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকা দেশগুলোতে পাঠানোর জন্য যথেষ্ট সংখ্যায় কারিগরী কর্মী পাওয়া যায়। বলা যেতে পারে এ সব দেশে ভোগবিলাসের জন্য কারিগরী জ্ঞানের যথেষ্ট ব্যবহার ঘটেছে। সাধারণভাবে এই সব দেশগুলো আয়তনে বড়। এদের প্রাকৃতিক সম্পদ যথেষ্ট এবং তাদের ব্যবহারও অপরিমিত।

এইসব দেশের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, রুশ ফেডারেশন (রাশিয়া পূর্ব ও মধ্য), আর্জেন্টিনা ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ভবিষ্যতে এই গোষ্ঠীতে অন্যান্য দেশের অন্তর্ভুক্তীকরণের সম্ভাবনা কম, কারণ যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের দেশগুলো ভোগবিলাসের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। আগামী দিনে হয়ত কোন কোন দেশ এই গণ্ডীর বাইরেও চলে যেতে পারে, যেমন রাশিয়ার ক্ষেত্রে হয়েছে। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে পাঁচটি ধাঁচের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচ খুব সাম্প্রতিককালে বিকাশ লাভ করেছে। 100 বছর আগেও এটির অস্তিত্ব ছিল না। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের দেশগুলো তখন ব্রাজিলীয় ধাঁচের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ইউরোপীয় ধাঁচ ঃ কিছু কিছু অঞ্চল আছে যারা এখনও একদিকে জনসংখ্যা ও কারিগরী বিকাশ এবং অপরদিকে সম্পদের বহনক্ষমতার মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রেখেছে। এদের সম্ভ্রান্ত অঞ্চল (Elite-region) ও বলে। এইসব দেশগুলো ছোট। সম্পদও সীমাবদ্ধ। জনসংখ্যাও যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের চেয়ে বেশি। ফলে এইসব দেশগুলো স্থানীয় সম্পদকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করে। এইসব দেশের কারিগরী জ্ঞান যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের দেশগুলোর তুলনায় কোন অংশেই কম নয়।

এইসব অঞ্চলগুলোর সমৃদ্ধি আন্তর্জাতিক স্তরে কারিগরী জ্ঞান ও পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদানের ওপর নির্ভর করে। যে সব দেশে দক্ষ পরিষেবা বা উন্নতমানের শিল্পদ্রব্যাদির অভাব আছে সেইসব দেশে সেগুলো পাঠানো হয়। এইসব দেশে স্থানীয় সম্পদ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চলছে। চিরাচরিত সম্পদ থেকে আরও বেশি উৎপাদন পেতে নতুন নতুন পদ্ধতির আবিষ্কার চলেছে।

বেশি জনসংখ্যা অথচ সীমাবদ্ধ সম্পদের এইসব অঞ্চলে বেঁচে থাকার সংগ্রাম চলছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের তুলনায় এই ধরণের আর্থ-সামাজিক ধাঁচে ভবিষ্যতে নতুন নতুন দেশের অন্তর্ভুক্তি খুব একটা হতাশাব্যঞ্জক হবে না। এই ইউরোপীয় ধাঁচের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো হল পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো (রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, তুরস্ক, চেকশ্লোভিয়া বাদে) যারা গত 200 বছরের মধ্যে ব্রাজিলীয় ধাঁচ থেকে এই ধাঁচে উন্নীত হয়েছে। ইজরায়েল, জাপানও এই ধাঁচের অন্তর্ভুক্ত।

ব্রাজিলীয় ধাঁচ ঃ এই ধাঁচের দেশগুলো কারিগরী বিদ্যায় একটু পিছিয়ে আছে যদিও এখানে সম্পদ যথেষ্ট। জনসংখ্যা কম থাকায় সম্পদের ওপর চাপ কম। কারিগরী বিদ্যায় অনুন্নত অঞ্চলসমূহের মধ্যে ব্রাজিলীয় ধাঁচের দেশসমূহ বর্তমান জনসংখ্যা ও সম্পদের দিক দিয়ে খুব ভাগ্যবান। এই সব এলাকা সাধারণত বড় আয়তনের। ব্রাজিলীয় ধাঁচ হল ইউরোপীয় ধাঁচ ও মিশরীয় ধাঁচের মধ্যেকার এক পরিবর্তিত অবস্থা। সম্পদের

আরও বিকাশ ঘটিয়েও এখানকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে এইসব দেশগুলো ইউরোপীয় ধাঁচে পৌঁছবে। কিন্তু জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে সম্পদের যথেষ্ট বিকাশ না ঘটলে এইসব দেশগুলো ব্রাজিলীয় ধাঁচ থেকে মিশরীয় ধাঁচে অবনমিত হবে।

ব্রাজিলীয় ধাঁচের অধিকাংশ দেশসমূহ তিনটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ—ইন্দোচীন, ক্রান্তীয় আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা। যদিও ইন্দোচীন অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ বর্তমানের তুলনায় আরও উন্নত সমাজজীবনের বিকাশ ঘটাতে পারে, তথাপি এখানকার রাজনৈতিক ও সামাজিক বাধা অগ্রগতির পরিপন্থী। অনুরূপভাবে অধিকাংশ ক্রান্তীয় আফ্রিকার দেশসমূহ ব্রাজিলীয় হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে, কিন্তু এখানকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক বাধা ব্যাপক অর্থনৈতিক বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। লাতিন আমেরিকার দেশসমূহের মধ্যে ব্রাজিল মালভূমি, বলিভিয়া, ভেনিজুয়েলা, আর্জেন্টিনার মধ্যভাগ ও প্যারাগুয়ের নাম করতে হয়। বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত দেশগুলোর মধ্যে কিউবা, মধ্য আমেরিকা উল্লেখযোগ্য। আগামী দিনে তৈলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো এই ধাঁচের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

মিশরীয় ধাঁচ ঃ জনসংখ্যা-সম্পদ অঞ্চলের দিক দিয়ে মিশরীয় ধাঁচের মান খুব নীচে। মিশরীয় ধাঁচের দেশগুলোতে জনসংখ্যা ও সম্পদের মধ্যে বেশ অসাম্য রয়েছে। এই দেশগুলোতে জনঘনত্ব বেশি। এখানে জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। এখানকার বসত এলাকাগুলো উর্বর উপত্যকায় সীমাবদ্ধ। এখানকার অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি হল কৃষি। বেশির ভাগ কৃষিজমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়। কৃষিজমির আওতায় অধিক জমি, আনার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ কম। তাই উৎপাদনও কম। এখানে কারিগরী জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদ সীমাবদ্ধ। মূলধনও সীমাবদ্ধ। উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদও এখানে নেই। সামাজিক উন্নতির স্তরও নীচু। জনসাধারণের একটা বড় অংশ অশিক্ষিত। জনগণও কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশই এক সময় এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করেছে। মিশরীয় ধাঁচের দেশের উদাহরণ মিশর নিজেই। এই দেশটি কারিগরীবিদ্যায় পিছিয়ে আছে। পৃথিবীর প্রায় সব মহাদেশেই এই ধাঁচের দেশ খুঁজে পাওয়া যাবে। যেমন আফ্রিকার মিশর, আলজেরিয়া, টিউনিসিয়া, মরক্কো, দক্ষিণ ইউরোপের গ্রীস, সিসিলি, এশিয়ার চীন, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি। চীন ও ভারত যদি অদূর ভবিষ্যতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ও একই সাথে সম্পদ উন্নয়ন করতে পারে, তবে ঐ দুটি দেশ ইউরোপীয় ধাঁচের (অর্থনীতির) অন্তর্ভুক্ত হবে।

4.11 সারাংশ

সম্পদ সৃষ্টিতে মানুষেরও ভূমিকা আছে, অর্থাৎ মানুষও সম্পদ। মানুষের শক্তি ও কায়িক শ্রম-ই মানব সম্পদ। মানুষ একাধারে সম্পদ সৃষ্টি করে চলেছে ও তাকে ভোগ করছে ও অন্যধারে নিজেই সম্পদ ধ্বংস করে চলেছে, যেমন অরণ্য নিধন। মানুষের এই দ্বৈত ভূমিকা সত্যিই আশ্চর্যজনক।

পৃথিবীতে মানব সম্পদের বন্টন সমান নয়—চীন ও ভারতে জনসংখ্যা বেশী, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় কম। উন্নত অর্থনীতিতে যেমন যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগ কম। উন্নয়নশীল অর্থনীতিতেই জনবিস্ফোরণ দেখা যায়।

জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, পৃথিবীর সম্পদ সেইভাবে বাড়ছে না। ফলে জনসংখ্যার সংকট দেখা দিচ্ছে, যা দূর করতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছে কিনা, তা বিশ্লেষণ করতে মানুষ ও জমির অনুপাত সূত্রটি প্রয়োগ করা হয়। মানুষ ও জমির অনুপাত হল মানুষ ও কার্যকরী জমির অনুপাত। এখানে কার্যকরী জমি বলতে যে জমিতে কৃষিকাজ করা হয় ও বিদেশের যে জমি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে ব্যবহার করা সম্ভব। জনসংখ্যা, সম্পদ এবং কারিগরী উপাদানের ওপর নির্ভর করে পৃথিবীকে 5টি জনসংখ্যা-সম্পদ অঞ্চলে ভাগ করা যায়, যথা—যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচ, ইউরোপীয় ধাঁচ, ব্রাজিলীয় ধাঁচ, মিশরীয় ধাঁচ এবং মরুভূমি ও মেরুদেশীয় ধাঁচ।

4.12 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1) সম্পদ সৃষ্টিতে মানুষের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

2) সম্পদ উন্নয়নে মানবশক্তি ও কায়িক শ্রমের ভূমিকা কী?

3) উৎপাদক ও ভোগকারীরূপে মানুষ সৃষ্টির সীমারেখা নির্ধারণ করে—একথা কেন বলা হয়?

4) সম্পদ উৎপাদনে মানুষের ত্রিবিধ ভূমিকা আলোচনা করুন।

5) জনসংখ্যার আধুনিক গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

6) পৃথিবীর জনসংখ্যা বন্টন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

7) জনসংখ্যা বন্টন কী কী প্রাকৃতিক কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? কারণগুলি ব্যাখ্যা করুন।

8) জনসংখ্যা বন্টনে সাংস্কৃতিক কারণগুলির ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

9) জনসংখ্যা পরিবর্তন তত্ত্ব বলতে কী বুঝায়? জনবৃদ্ধির হার অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়গুলি কী কী? পর্যায়গুলি ব্যাখ্যা করুন।

10) উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও তার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

11) পৃথিবীর জনসংখ্যার সমস্যার প্রকৃতি আলোচনা করুন।

12) জমির বহন ক্ষমতা ও কাম্য জনসংখ্যার সংজ্ঞা দিন।

13) কাম্য জনসংখ্যা কিভাবে মানুষ-জমির অনুপাতকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে, তা লিখুন।

14) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনসংখ্যা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করুন।

15) জনসংখ্যা-সম্পদ অঞ্চল বলতে কী বোঝায়? জনসংখ্যা-সম্পদ অঞ্চল হিসেবে পৃথিবীকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?

সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন ঃ

(1) জনসংখ্যার ঘনত্ব, (2) এশিয়া মহাদেশে জনঘনত্বের পার্থক্য কারণসমূহ, (3) পৃথিবীর নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল, (4) পৃথিবীর বিরল বসতি অঞ্চল, (5) কাম্য জনসংখ্যা, (6) মানুষ-জমি অনুপাত, (7) মানব-সম্পদ ও শিক্ষা, (8) মানব সম্পদ ও স্বাস্থ্য, (9) মানুষের দ্বৈত ভূমিকা, (10) জনসংখ্যার সমস্যা।

4.13 উত্তরমালা

অনুশীলনী - 1

(i) কোন একটি দেশে গড়ে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে যতজন লোক বাস করে সেই সংখ্যাকে জনবসতির ঘনত্ব বলে। অর্থাৎ দেশের মোট জমির পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাই হল জনবসতির ঘনত্ব।

$$\text{সুতরাং, জনবসিতর ঘনত্ব হল} = \frac{\text{মোট জনসংখ্যা}}{\text{মোট জমির পরিমাণ}}$$

(ii) 4.6.1 অংশাঙ্কিত অংশ দেখুন।

(iii) 4.6 অংশাঙ্কিত অংশ লক্ষ্য করুন।

(iv) কোন একটি দেশের যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করে সর্বাধিক সম্পদ উৎপাদন করার জন্য যে জনসংখ্যার প্রয়োজন হয় সেই জনসংখ্যাকে সেই দেশের আদর্শ বা কাম্য জনসংখ্যা (optimum population) বলে।

অনুশীলনী - 2

(v) মানুষ ও জমির অনুপাত বলতে দেশের কার্যকরী জমির সঙ্গে মোট জনসংখ্যার অনুপাতকে বোঝায়।

$$\text{মানুষ ও জমির অনুপাত হল} = \frac{\text{মোট জনসংখ্যা}}{\text{মোট কার্যকরী জমির পরিমাণ}}$$

(vi) 4.9 অংশ দেখুন।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

1) 4.1 অংশ দেখুন।
2) 4.2 অংশ দেখুন।
3) 4.3.1 অংশ ও 4.3.2 অংশ দেখুন।
4) 4.3 অংশ দেখুন।
5) 4.4 অংশ দেখুন।
6) 4.6 অংশ দেখুন।
7) 4.5.1 অংশ দেখুন।
8) 4.5.5 অংশ দেখুন।
9) 4.7 অংশ দেখুন।
10) 4.7 অংশ দেখুন।
11) 4.6 অংশ দেখুন।
12) 4.10.2 অংশ দেখুন।
13) 4.10.2 অংশ দেখুন।
14) 4.10 অংশ দেখুন।
15) 4.10.4 অংশ দেখুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

1) 4.5 অংশ দেখুন।
2) 4.6.1.1 অংশ দেখুন।
3) 4.6 অংশ দেখুন।
4) 4.6 অংশ দেখুন।
5) 4.10.2 অংশ দেখুন।
6) 4.10.3 অংশ দেখুন।
7) 4.8 অংশ দেখুন।
8) 4.9 অংশ দেখুন।
9) 4.3.2 অংশ দেখুন।
10) 4.6 অংশ দেখুন।

একক 5 ❑ অচিরাচরিত শক্তির উৎস (Non-conventional sources of energy)

গঠন

5.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

5.2 সৌরশক্তি

5.2.1 সৌরকোষ

5.2.2 সৌর কুকার

5.2.3 সৌর ওয়াটার হিটার

5.2.4 সৌরশক্তির সাহায্যে জলের পাতন

5.2.5 সোলার ড্রায়ার

5.2.6 সৌর জলাশয়

5.3 ভূ-তাপীয় শক্তি

5.4 জোয়ার-ভাঁটার শক্তি

5.5 বায়ুশক্তি

5.6.1 জৈবপদার্থ বা জৈবভর থেকে শক্তি

5.6.2 রান্না ও ঘর গরম রাখার কাজে কাঠের ব্যবহার

5.6.3 জৈবপদার্থ ও শক্তি উৎপাদন

5.7 জৈবগ্যাস বা বায়োগ্যাস

5.8 উর্জাগ্রাম প্রকল্প

5.9 সারাংশ

5.10 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

5.11 উত্তরমালা

5.1 প্রস্তাবনা

1960 সালে ফ্রান্সে অগস্তাঁ মুশো (Augustin Muchot) এক অভিনব পদ্ধতিতে সৌরশক্তির সাহায্যে পরিচালিত বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। কোন জীবাশ্ম জ্বালানী (Fossil Fuel) ছাড়াই এই ইঞ্জিন চালানো যায়। কয়েকটি অর্ধবৃত্তাকার (Parabolic) আয়না সাজিয়ে সৌর আলোকরশ্মির রেখাগুলো কেন্দ্রমুখী করে অধ্যাপক মুশো সৌরশক্তিকে তাপশক্তিতে পরিবর্তন করেন। এই শক্তির (তাপশক্তি) সাহায্যে জলকে বাষ্পে পরিণত করে সেই বাষ্প দিয়ে ইঞ্জিন চালানো যায়। মুশোর এই আবিষ্কার অপ্রচলিত শক্তির উৎসের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী বিপ্লব আনল। সৌরশক্তি চালিত পাম্প, সৌর কুকার, সৌর রেফ্রিজারেশন প্রভৃতি যন্ত্র অধ্যাপক মুশোর দীর্ঘ গবেষণার ফসল।

যদিও অপ্রচলিত শক্তি কোন নতুন ধারণা নয়, তবুও বর্তমানকালে এর গুরুত্ব দারুণভাবে পড়েছে। বর্তমানে এটা পরিস্কার হয়ে গেছে চিরাচরিত পথে শক্তি উৎপাদন ও তার চাহিদা মেটানো সম্ভবপর নয়। অথচ ঘটনা হল পৃথিবীর সবখানে জ্বালানী শক্তির বিপুল চাহিদা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কোন দেশে অর্থনৈতিক অপ্রজাতি শুধুমাত্র কাঁচামালের যোগানের নির্ভর করে না। শক্তিসম্পদের উপরও তা নির্ভরশীল। দেখা গেছে পৃথিবীর শক্তিসম্পদে অগ্রসর দেশগুলোই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত, কিন্তু ঘটনা হল পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশই শক্তি সংকটে (Energy crisis) ভুগছে। ক্ষয়িষ্ণু অপূর্ণভব সম্পদগুলো ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর অনেক দেশে এদের ভাণ্ডার কমে আসছে। গচ্ছিত সম্পদগুলোর পরিমাণকে কিছুটা প্রসারিত করা চলে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব সম্পদ একদিন না একদিন শেষ হয়ে যাবে। এটা অনুমান করা হয় যে জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার যেভাবে দিন দিন বাড়ছে, তাতে পৃথিবীর বর্তমান সঞ্চয় 2050 সালের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত, জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহারের ফলে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। বস্তুত পক্ষে, জ্বালানী শক্তির ব্যবহার মানবসভ্যতার অস্তিত্বের উপর বিরাট প্রশ্ন জাগিয়েছে। কারণ কয়লা, খনিজ তৈল বা গ্যাস পোড়াবার ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়। এতে গ্রীণহাউস (Green House) গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে বাতাসের তাপশোষণের ক্ষমতা (Heat absorbing capacity) বেড়ে যায় ও তাপমাত্রা বেড়ে যায়। "The fossil fuels that power industrial civilisation have pumped enough carbon-di-oxide and other so called Greenhouse gases into the atmosphere to make climatic change a near certainty. As a result of the combination of these factors, the earth's average temperature has risen by approximately 1°F. Since the beginning of the 20th century, and it is still rising." বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, আজ পর্যন্ত বাতাসে যত কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়েছে, তার 60 শতাংশই বাতাসে মিশেছে। এরকম চলতে থাকলে একদিন মানবসভ্যতা বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই মানবসভ্যতা ও জীবনযাত্রার মান বজায় রেখে এমনভাবে শক্তি নীতি (Energy policy) নির্ণয় করতে হবে যাতে চলতি গচ্ছিত ও দূষণকারী জ্বালানীর বদলে পূর্ণনবীকরণযোগ্য ও দূষণমুক্ত শক্তির উৎসগুলোকে

আরও বেশী করে ব্যবহার করা যায়। কারণ “Global energy use has risen nearly 70 percent since 1971 and is poised to continue its steady increase over the next several decades, fuelled by economic expansion and development. Every demand has risen at just over 2 percent per year for the past 25 years and will continue to climb... (World Resources, 1998-99).

সারণী 5.1

শিল্প থেকে নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইড

বিশ্বের প্রথম 15টি দেশ

দেশ	**মোট নির্গত CO_2 ('000 মেট্রিক টন)**
দক্ষিণ আফ্রিকা	305,805
পোল্যান্ড, রিপা	330,004
ফ্রান্স	340,085
মেক্সিকো	357,834
কোরিয়া, রিপা	373,592
ইতালি	409,983
কানাডা	435,749
ইউক্রেন	438,211
ইউ কে	542,140
জার্মানী	835,099
ভারত	908,734
জাপান	1,126,753
রাশিয়ান ফেডাঃ	1,818,011
চীন	3,192,484
যুক্তরাষ্ট্র	5,468,564

(*Source* : World Resources, 1998-99, P. 175)

উদ্দেশ্য ঃ

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- বিকল্প শক্তির উৎস গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা কোথায় তা আলোচনা করতে পারবেন।

5.2 সৌরশক্তি (Solar Energy) ঃ

পৃথিবীতে যে সৌররশ্মি এসে পড়ে তা অমিত শক্তির ভাণ্ডার। এই শক্তিই বিশ্বে জীবজগতের সৃষ্টি ও রক্ষার মূল। সৌরশক্তির একাংশ ধরাপৃষ্ঠে বিকিরণ হিসেবে এসে পড়ে। এর সামান্য অংশ যদি কাজে লাগাতে পারা যেত, তবে শক্তি (Energy) নিয়ে মানব সভ্যতার সমস্যা দূর হত। কোন দেশে আপাতন (incoming) সৌরশক্তি (Solar radiation) 1 মিনিট কাল ধরে রেখে যদি তা শক্তিতে রূপান্তরিত করা যেত তাহলে সেই দেশে একদিনেরও বেশী প্রয়োজনীয় শক্তি পাওয়া যাবে বলে অনুমিত হয়। বৈজ্ঞানিকরা দেখিয়েছেন যে গোটা পৃথিবীতে প্রতি ঘণ্টায় যে সূর্যকিরণ পাওয়া যায়, তাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে 21,0000,000 লক্ষ টন কয়লার তাপশক্তির (Thermal Power) সমান হবে। যুক্তরাষ্ট্রে যে যে পরিমাণ সূর্যালোক পাওয়া যায় তা দিয়ে ঐ দেশের বর্তমান বছরের (2000 সাল) শক্তির চাহিদা পূরণ করা যেতে পারে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোন প্রযুক্তি বিদ্যা আবিষ্কৃত হয়নি। বলা যেতে পারে সৌরশক্তিকে মানুষ ব্যবহার করতে পারলে ভবিষ্যতে পৃথিবীতে শক্তি সম্পদের আর অভাব থাকবে না। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল—

সারণি 5.2

গড় বাৎসরিক সূর্যালোকের পরিমাণ	**সূর্যালোকের বণ্টন**
< 1,600 ঘণ্টা	কানাডার উত্তরভাগ, পূর্ব গ্রীনল্যান্ড, ব্রিটেন, সাইবেরিয়া
1,600-3,200 ঘন্টা	উপরে ও নীচে উল্লিখিত অঞ্চল ও দেশবাদে গোটা পৃথিবী
> 3,200 ঘন্টা	যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পশ্চিমভাগ, আলজিরিয়া, মালি, নাইজার, চাদ, সুদান, ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, নামিবিয়া, আর্জেন্টিনা, সৌদিআরব, ইরান, ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারতের পশ্চিমাংশ, অস্ট্রেলিয়া।

উৎস ঃ Energy Handbook (1978)

(i) সৌরশক্তি দূষণমুক্ত ও (ii) প্রবাহমান শক্তির উৎস (Flow Energy Souce)। ফলে তা জীবাশ্ম জ্বালানীর মত একদিন শেষ হবে যাবে না। (iii) সৌরশক্তির প্রয়োগে পৃথিবীতে বাড়তি তাপের সৃষ্টি হয় না। তবে অসুবিধে হল—(i) রাতে সূর্যকিরণ পাওয়া যায় না, আর মেঘলা দিনে বিকীর্ণ সূর্যরশ্মি ক্ষীণ। ফলে সব অঞ্চলে সারাক্ষণ অপেক্ষাকৃত কম খরচে সৌরশক্তির সাহায্যে জলকে বিশ্লেষণ করে হাইড্রোজেন উৎপাদন করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এই হাইড্রোজেন গ্যাস মজুত রাখা যায়। অতি উচ্চ চাপে প্রচুর হাইড্রোজেন তরলীভূত করে রাখা যায় এবং অন্যত্র পাঠানো যায়। (ii) সৌরশক্তি আহরণ ও বন্টনের জন্য যে পরিমাণ আর্থিক ও কারিগরী শক্তির দরকার হয় তা আয়ত্ত করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার, (iii) সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ জীবাশ্ম জ্বালানী উৎপাদনের খরচের চেয়ে অনেক বেশী। তাই কম খরচে বেশী ফলপ্রদ (more effective) উপায়ে সৌরশক্তি উৎপাদন করার চেষ্টা চলছে।

সৌরশক্তি ব্যবহারের ধরণ (Patter of Solar Energy use) ঃ

সৌরকিরণের দুটি উপাদান তাপ ও আলো সরাসরি ব্যবহার করা যায়।

5.2.1 সৌরকোষ (Solar Photo Voltaic cell)

এর সাহায্যে সরাসরি সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। সৌর তাপবিদ্যুৎ ব্যবস্থায় (Solar Thermal Electric Conversion) থাকে একটি কাঁচের আধার (Optical Concentrator), সংগৃহীত তাপশক্তির একটি পরিপোষক, একটি তাপ স্থানান্তর ব্যবস্থা (heat transfer system) ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ঘর। এই ধরণের বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে কয়েক kw/h থেকে কয়েক mw/h পর্যন্ত বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে। এর সাহায্যে রাস্তার আলো, রেলগাড়ির সিগন্যাল ছোট পাম্প চালানো, মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গৃহস্থালীর বিভিন্ন কাজ করা যায়।

1982 সালে লস্ এঞ্জেলসের (U.S.A.) উত্তরপূর্বে মোজাভে (Mojave) মরুভূমিতে প্রথম সৌরশক্তি চালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে ইজ্রায়ল, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে এই শক্তিকে বাণিজ্যকরণের কাজে লাগানো হয়েছে। লফটনেস (1978)-এর এনার্জি হ্যান্ড বুক থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ক্রান্তীয় মণ্ডলের উন্নয়নশীল দেশগুলো সৌরশক্তিতে সমৃদ্ধ। তাই প্রচলিত (conventional) জ্বালানীর ক্রমহ্রাসমান ভাণ্ডার ও আকাশ ছোঁয়া দামের পরিপ্রেক্ষিতে এই দেশগুলোতে সৌরশক্তি এক গুরত্বপূর্ণ সম্পদ বলে বিবেচিত হয়। অবশ্য ব্যয়বহুল হওয়ার জন্য আমাদের দেশে ফটোভোল্টাইক সেলের ব্যবহার এখনও পর্যন্ত জনপ্রিয় হয়নি। আশা করা যায় উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে এই সেল তৈরী করা সম্ভবপর হবে এবং গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রে এই সেল আগামীদিনে এক গৌরবময় ভূমিকা পালন করবে।

ভারতে প্রতি বছর প্রায় 5000 kw/h সৌরশক্তি উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশে সৌরশক্তি থেকে বছরে 50,000 kw/h বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যেতে পারে। ভারতের বিভিন্ন গ্রামে সৌরশক্তি থেকে প্রতিদিন 10 থেকে 50 kw/h বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। সুন্দরবন অঞ্চলের সাগরদ্বীপে 200 kw/h বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। চেষ্টা চলছে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত ছোট মোল্লাখালি, বড় মোল্লাখালি অঞ্চলগুলিতে সৌরশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। হরিয়ানার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ফটোভোল্টাইক সেল ব্যবহার করে পাম্পসেটের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা করেছে।

গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ নিগম বা Rural Electrical Corporation (সংক্ষেপে REC) আমাদের দেশের 90,000 প্রত্যন্ত গ্রাম নির্বাচন করেছে যেখানে প্রথাগত পদ্ধতিতে (traditional system) বিদ্যুৎ যোগান দেওয়া যথেষ্ট খরচ সাপেক্ষ ও দুঃসাধ্য। এই সব গ্রামে ফোটোভোল্টাইক সেল ব্যবহার করলে খুব ভালো ফল পাওয়া যাবে। ABE (1985)-র এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ভারতে প্রায় 30,000 গ্রাম আছে, যেখানে বিদ্যুতের চাহিদা প্রায় 75 মেগাওয়াট। এইসব গ্রামেও ফটোভোল্টাইক সেল ব্যবহার খুব ফলপ্রসু হবে। ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান ও গুজরাতের প্রায় 300 গ্রামে এই সেলের সাহায্যে রাস্তা আলোকিত করা হয়েছে।

5.2.2 সোলার কুকার (Solar Cooker) ঃ

এতে তাপশক্তিকে কাজে লাগিয়ে খাবার তৈরী করা হয় (চিত্র 5.1)। সোলার কুকার পরিবেশ দূষিত করে না। এর ব্যবহারে কয়েকটি সুবিধে আছে। যেমন—

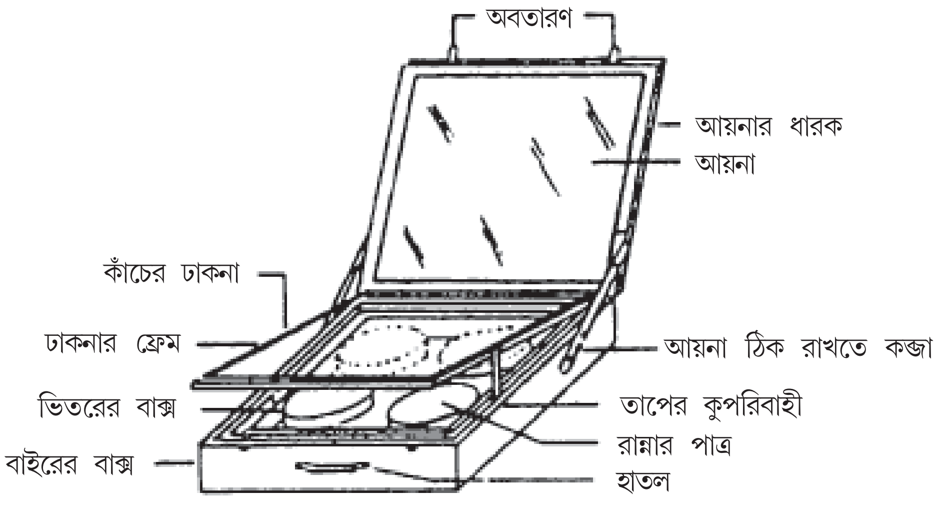

চিত্র — 5.1

(i) সোলার কুকার ব্যবহারে প্রচলিত জ্বালানি অর্থাৎ কয়লা, রান্নার গ্যাস, কেরোসিন ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় না। ফলে জ্বালানীর সাশ্রয় হয় ও পরিবেশ দূষিত হয় না। আবার জ্বালানীর দহন জনিত কোনও রকম ধোঁয়া বা ক্ষতিকর গ্যাসের সৃষ্টি হয় না। এজন্য কোনরকম স্বাস্থ্যহানি হবার সম্ভাবনা থাকে না।

(ii) কোন সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশ নেই বলে একে খুব সহজে ব্যবহার করা যায়। যেহেতু কম তাপমাত্রায় রান্না হয়, তাই সোলার কুকারের তৈরী খাবারে গুণমান বজায় থাকে।

(iii) সোলার কুকারে রান্না করার সময় কাজ করা যায়। এতে মানুষের শ্রমের সাশ্রয় ঘটে।

(iv) সোলার কুকার কেনার খরচ ছাড়া আর কোনও খরচ নেই, ফলে পয়সার সাশ্রয় হয়।

সোলার কুকার ব্যবহারে উপরোক্ত সুবিধাগুলো থাকলেও এর ব্যবহার এখনও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। এর প্রধান কারণ সূর্যের আলো সবসময় পাওয়া যায় না। তাছাড়া সোলার কুকারে ব্যবহারগত কয়েকটি অসুবিধে আছে।

(i) সোলার কুকারে খাবার তৈরী করতে অনেক সময় লাগে।

(ii) সোলার কুকারে সব প্রকার রান্না সম্ভব হয় না।

(iii) এছাড়া এতে রাত্রিবেলা রান্না করা যায় না। মেঘলা দিনে, খুব ভোরবেলায় বা বিকেলে এটি কাজ করে না।

(iv) এছাড়া দাম বেশী হওয়ায় এই কুকারের ব্যবহার তেমন জনপ্রিয় হয়নি।

5.2.3 সৌর ওয়াটার হিটার (Solar Water heater) ঃ

সৌরশক্তির সাহায্যে কম উষ্ণতায় জল গরম করা পৃথিবীতে বহুদিন ধরে চলে আসছে। বর্তমান সময়ে তাকে কিছুটা পরিশোধিত রূপ দেওয়া হয়েছে। এতে একটি সমতল প্লেটের সাহায্যে তরল পদার্থ বা বায়ুর মাধ্যমে তাপ স্থানান্তর ঘটানো হয়। ঘর-বাড়ি গরম রাখা বা বাড়ির প্রয়োজনীয় জলগরম করতে এই হিটার ব্যবহার করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের মতন শীতপ্রধান দেশে এই ধরণের কাজে সরবরাহিত জ্বালানীর শতকরা 20 থেকে 25 ভাগ খরচ হয়। সৌরজল উত্তাপক ব্যবস্থা সৌরশক্তি ঘরের ছাদে রাখা তাপ শোষণকারী ধাতু দ্বারা শোষিত হয়। ধাতুর তাপ দ্বারা উত্তপ্ত গরম জল বাড়ির বিভিন্ন স্থানে পরিবাহিত হয়ে ঘর গরম রাখে বা প্রয়োজনীয় গরম জলের যোগান দেয়। হাসপাতাল বা শিল্পসংস্থায় জল গরম করার কাজেও সৌর জল উত্তাপক ব্যবস্থা চালু আছে। 1982 সালে হরিয়ানার কয়েকটি কারখানায় এই ধরণের হিটার স্থাপন করা হয়েছে। যে সব শীতপ্রধান স্থানে সারা বছর ধরে সূর্যের আলো পাওয়া যায় সে সব স্থানে এই পদ্ধতি চালু হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বর্তমানে সূর্যালোকের সাহায্যে শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Air Conditioning System) চালু হলেও আর্থিক ও প্রযুক্তিগত কারণে এর ব্যবহার তেমন জনপ্রিয় হয়নি।

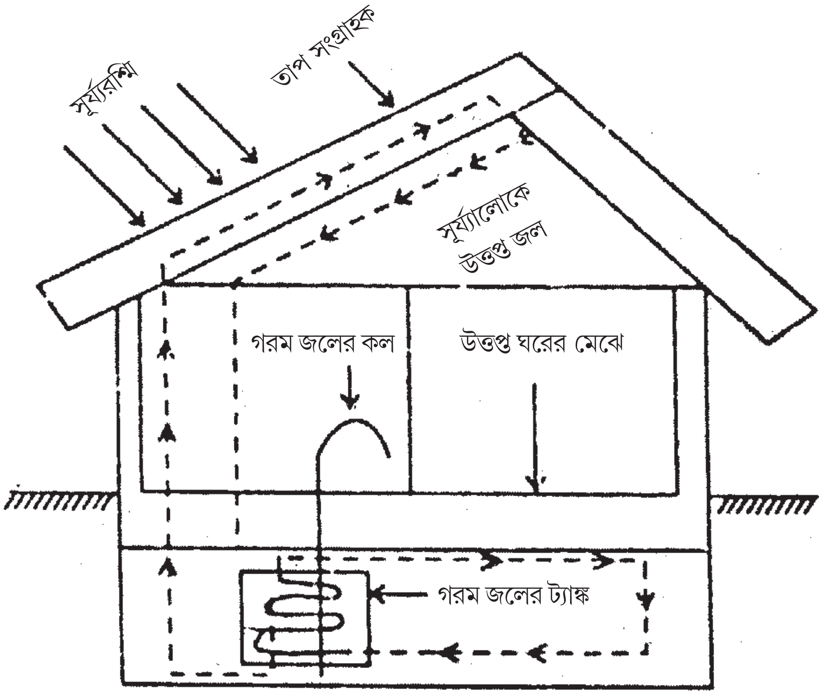

চিত্র — 5.2

5.2.4 সৌরশক্তির সাহায্যে জলের পাতন (Solar Distillation) ঃ

(a) নোংরা জলের পরিশোধনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কার্যকরী। বিশুদ্ধ জল উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

(b) সৌরপাতনের ক্ষেত্রে কোনও জ্বালানী লাগে না। সৌরশক্তিই জলকে বাষ্পে পরিণত করার প্রয়োজনীয় তাপশক্তি সরবরাহ করে। এ কারণে জ্বালানী খরচ বাঁচে। এছাড়া দুর্গম স্থানে জলকে বিশুদ্ধ করতে লবণাক্ত জল থেকে বিশুদ্ধ জল উৎপন্ন করতে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতির প্রয়োগে পরিবেশ দূষিত হয় না।

5.2.5 সোলার ড্রায়ার (Solar Drier) ঃ

বিভিন্ন ধরণের শস্য ও মশলা শুকনোর কাজে এটি ব্যবহার হয়। বর্তমানে কাঠ শুকোতে সোলার ড্রায়ার ব্যবহার হচ্ছে। জল শুকোনোর কাজেও সৌরশক্তির ব্যবহার বহুদিন ধরে হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং তামিলনাড়ুর সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রজলের বাষ্পায়নের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে লবণ তৈরী করা হয় (চিত্র 5.3)।

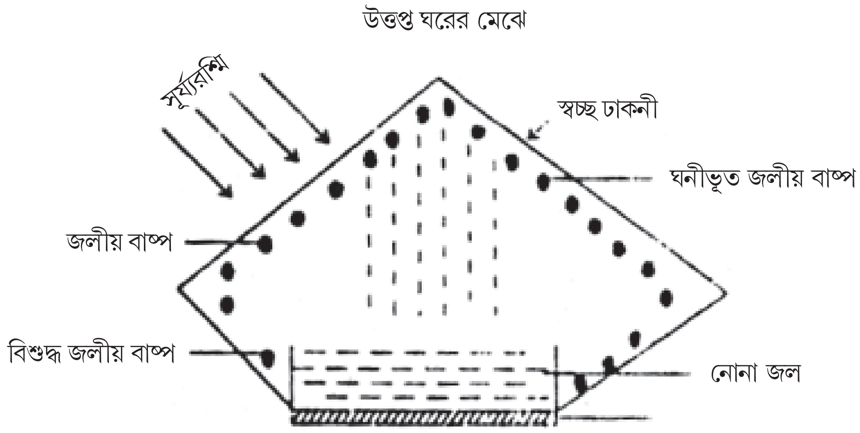

চিত্র — 5.3

5.2.6 সৌর জলাশয় (Solar Pond) ঃ

বেশী পরিমাণে সূর্যালোকের তাপশক্তি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ উদ্দেশ্যে নির্মিত বিশেষ ধরণের জলাশয়কে সৌর জলাশয় বলে। 4 থেকে 1000 বর্গমিটার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট এই জলাশয় জল গরম করার কাজে, ঘর গরম রাখার কাজে বা বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার হয়। সোলার পণ্ডের কর্মদক্ষতা শতকরা 15 ভাগ। সোলার পণ্ড 90° সেন্টিগ্রেড বা তারও বেশী তাপমাত্রায় কাজ করতে পারে। এই ধরণের কৃত্রিম জলাশয়ে লবণ জলের অসম্পৃক্ত দ্রবণ রাখা হয়। সাধারণত সোডিয়াম ক্লোরাইড, অ্যামোনিয়াম সালফেট ও অ্যামোমিয়াম নাইট্রেট, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড জলে মেশানো হয়। সৌর জলাশয়ের সর্ব নিম্নস্তরের তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশী হয়। যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে সৌর জলাশয়ে সৌরশক্তি সংগ্রহ ও সংরক্ষিত হচ্ছে। পণ্ডিচেরীতে দুটো সোলার পণ্ড (500 ও 6000 বর্গমিটারের) সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে।

5.3 ভূতাপীয় শক্তি (Geothermal Energy)

আমরা জানি মাটির নীচে গভীরতা বাড়ার সাথে সাথে তাপমাত্রা বাড়ে। অর্থাৎ ভূগর্ভের মধ্যে তাপ (heat) লুকিয়ে আছে, এই তাপকে কাজে লাগিয়ে যে শক্তি উৎপাদন করা হয়, তাকে ভূতাপ শক্তি বলে। ভূগর্ভে উচ্চ তাপ যুক্ত অঞ্চল সবখানেই কম বেশি আছে। কোথাও এর গভীরতা খুব কম, আবার কোথাও খুব বেশী। বেশীর ভাগ স্থানে যদি 5 কিমি গভীর কুয়ো খোঁড়া যায়, তবে ভূগর্ভস্থ তাপের সন্ধান পাওয়া যাবে। ভূগর্ভের বহু স্থানে উত্তপ্ত শিলা রয়েছে। এই সব জায়গায় যদি একটি কুয়ো খুঁড়ে, জল ঢেলে দেওয়া যায়, তবে ঐ জল গরম হবে। এই গরম জলকে একটি পাম্পের সাহায্যে তোলার পর শক্তি উৎপাদনের কাজে লাগানো যেতে পারে। নিঃসন্দেহে এটি একটি ব্যয়বহুল কাজ। তবে পৃথিবীর যে সব

স্থান ভূতাত্ত্বিক দিক দিয়ে দুর্বল, সেখানে ভূ-অভ্যন্তরের চাপ ও অগ্ন্যুৎপাতের প্রবণতা বেশী। সেজন্য ভৌম জল এই তাপের সংস্পর্শে এসে গরম হয় এবং ভূ-পৃষ্ঠে উষ্ণ প্রস্রবণ সৃষ্টি করে। মনে রাখা দরকার শিলার উষ্ণতা 200°C না হলে তাপশক্তি কাজে লাগানো যায় না। এই শক্তির প্রধান উৎসগুলো হল উষ্ণ প্রস্রবণ

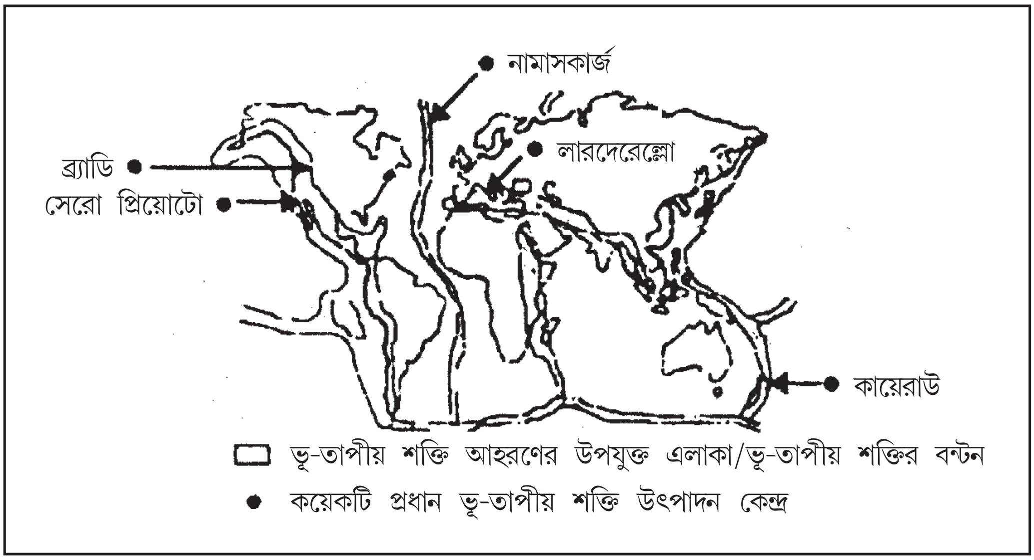

চিত্র — 5.4 ঃ পৃথিবীর ভূ-তাপীয় শক্তির বন্টন ও উৎপাদন কেন্দ্র

ও আগ্নেয়গিরি লাগোয়া এলাকা (চিত্র 5.4)। বিজ্ঞানীদের মতে ভূ-অভ্যন্তরের তাপ যথাযথভাবে ব্যবহার হলে পৃথিবীতে বর্তমান বিদ্যুৎ সংকটের কিছুটা সুরাহা হবে। তবে এখনও পর্যন্ত এই শক্তিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়নি। যে দক্ষতা ও কারিগরী বিদ্যা থাকলে ভূ-তাপীয় শক্তিকে কাজে লাগানো যায় তা পৃথিবীতে বহু দেশেই নেই।

ভূ-তাপীয় শক্তি (i) পূরণশীল, প্রবহমান সম্পদ, তাই এটি নিঃশেষিত হবার সম্ভাবনা নেই; (ii) দূষণমুক্ত শক্তি তবে ব্যাপক এলাকা জুড়ে এটি বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে পারে না।

ভূ-তাপ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের চেষ্টা গোটা পৃথিবী জুড়েই চলছে। উন্নত দেশগুলোতে 1990 সাল পর্যন্ত ভূ-তাপ শক্তির যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল, তার প্রায় সবটাই পূরণ করা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের The Los Alamos Scientific Laboratory, Nuclear Regulatory Commission ভূগর্ভস্থ তাপশক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষামূলক গবেষণা চালাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, নিউজিল্যান্ড ও ফিলিপাইন্স সহ বেশ কিছু দেশ ভূ-তাপ শক্তিকে বিভিন্নভাবে কাজে লাগাচ্ছে। ইতালিতে ভূ-তাপ শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের কাজে লাগানো হচ্ছে। ফ্রান্স ও হাঙ্গেরীতে উষ্ণ প্রস্রবণের গরম জলকে বাড়িঘর

ও কৃষিখামার গরম করার কাজে লাগানো হয়। আইসল্যান্ডের রাজধানী রেকিয়াভিক-এর বাড়ি ঘর এভাবে গরম রাখা হয়। ঐ দেশের কৃষিকাজ উষ্ণ প্রস্রবণের জলে করা হয়। আমাদের দেশের হিমাচল প্রদেশের মণিকরণে পাঁচ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। আজ পর্যন্ত এ দেশের প্রায় সাড়ে তিনশটি উষ্ণ প্রস্রবণের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে বক্রেশ্বর, লাদাখের পুগা, মধ্যপ্রদেশের সরপুজা জেলার তাতাপানি, উত্তরপ্রদেশের অলকানন্দা উপত্যকার কাম্বে বেসিন ও হিমাচল প্রদেশের পার্বতী ভ্যালি উল্লেখযোগ্য।

সারণি 5.3

ভূ-তাপ শক্তির উৎপাদন 1995

দেশ	ভূ-তাপ শক্তি উৎপাদন (মিলিয়ান কিঃ ওঃ ঘন্টা)	% পরিবর্তনের হার (1985 সাল থেকে)
যুক্তরাষ্ট্র	18,076	58
মেক্সিকো	7,406	351
ফিলিপাইনস্	5,950	20
ইটালি	3,450	29
জাপান	3,203	119
নিউজিল্যান্ড	2,095	84
ডেনমার্ক	1,174	(1763)
ভিয়েতনাম	605	×
ফ্রান্স	568	×
এলসালভেডর	550	25
কোস্টারিকা	468	×
জার্মানী	370	×
বিঃ দ্বীপপুঞ্জ	352	×
আইসল্যান্ড	290	53
কেনিয়া	290	14
ভারত		×
পৃথিবী	480,80 মিলিয়ান কি: ও:	

(সূত্র/উৎস ঃ World Resource, 1998-99)

উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে ভূ-তাপশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র, মেকসিকো, ফিলিপাইন্স, ইতালি, জাপান, ও নিউজিল্যান্ড এগিয়ে রয়েছে। এই সব দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ তাপশক্তি উৎপাদনের অনুকূল। এছাড়া কারিগরী ব্যাপারেও এ দেশগুলো এগিয়ে আছে। আরও উল্লেখযোগ্য যে বেশ কয়েকটি দেশে গত 10 বছরে তাপশক্তি উৎপাদনের হার সন্তোষজনক।

ভারতে ভূ-তাপীয় শক্তি আরোহনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অচিরাচরিত শক্তি উন্নয়ন বোর্ড কাজ করছে। বর্তমানে দেশীয় কারিগরীতে 20 kw থেকে 20 mw পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনে ক্ষমতা সম্পন্ন জেনারেটর ভারতে তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চল ভূ-তাপীয় শক্তিতে সমৃদ্ধ।

5.4 জোয়ার ভাঁটার শক্তি (Tidal Power)

প্রাকৃতিক নিয়মে চন্দ্র ও সূর্যের টানে সাগর ও মহাসাগরের জল নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর এক স্থানে ফুলে ওঠে আর এক জায়গায় নেমে যায়। জলের এই ফুলে ওঠাকে বলে জোয়ার (Tide) নেমে যাওয়াকে বলে ভাঁটা।

নদী যেখানে সাগরে মেশে অর্থাৎ নদীর মোহনায় বা খাঁড়িতে জোয়ার ভাঁটার প্রকোপ বেশি লক্ষ্য করা যায়। যেসব নদী মোহনায় জোয়ার ভাঁটা খুব বেশী হয় সেখানে বাঁধ তৈরী করে জোয়ারের জল ধরে রাখা হয়। আর ভাঁটার সময় সেই জল নির্দিষ্ট পথে ছেড়ে তার সাহায্যে টারবাইন* ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

1996 সালের ফ্রান্সের লা-রান্স (La-Rance) খাঁড়িতে পৃথিবীর প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। এখানে 24টি ইউনিট আছে, যার প্রতিটির উৎপাদন ক্ষমতা 10,000 k.w.।

---

*এখানে ব্যবহৃত টারবাইনটি অনেকটা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের টারবাইনের মত। একটু তফাৎ অবশ্য আছে, জোয়ার ভাঁটা বিদ্যুৎ প্রকল্পে ব্যবহৃত টারবাইনের উচ্চতা কম। জলপ্রবাহের গতি পাল্টানোর সাথে সাথে টারবাইনটির ঘোরার অভিমুখ পাল্টে যায়।

পৃথিবীতে যতদিন চন্দ্র, সূর্য, সাগরের জলরাশিকে আকর্ষণ করবে, ততদিন প্রকৃতির আপন খেয়ালে জোয়ার ভাঁটা হবে ও তা বিদ্যুৎ উৎপাদনে সাহায্য করবে। তাই এই শক্তি কোনদিন শেষ হয়ে যাবে না। অর্থাৎ এটি একটি প্রবহমান শক্তি। তবে যোগান অফুরন্ত হলেও আজ পর্যন্ত এই শক্তির ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব হয়নি। কারণ এই শক্তির অসুবিধেগুলো হল—

(1) তরঙ্গের গড় গতিবেগ (wave range) 3 মিটারের কম হলে এই শক্তি ব্যবহার করে যথেষ্ট বিদ্যুৎ শক্তি পাবার সম্ভাবনা থাকে কম। অর্থাৎ প্রকল্পটি লাভজনক হয় না।

(2) আমরা জানি লোকালয় থেকে অনেক দূরে তরঙ্গের গতিবেগ বেশি হয়, তাই বাণিজ্যিক দিক দিয়ে এই ধরণের বিদ্যুৎ প্রকল্প লাভের মুখ দেখে না।

(3) জোয়ার ভাঁটার শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য উন্নতমানের প্রযুক্তির প্রয়োজন হয়। তাই বিকাশশীল দেশগুলোতে এই শক্তি কম উৎপাদিত হয়।

(4) জোয়ার ভাঁটার শক্তির একটা সীমাবদ্ধতা আছে। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে।

Tidal Power বইয়ের লেখক গ্রে ও গ্যাসহাম (1972)-এর মতে গোটা পৃথিবীতে জোয়ার ভাঁটা সম্ভাব্য শক্তির পরিমাণ প্রতিবছর 10^{16} বি.থা.ই.

পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলোতে জোয়ার ভাঁটা থেকে বিদ্যুৎ আহরণের চেষ্টা বহুদিনের। বিকাশশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে এই শক্তি এখনও ততটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি।

---

*সংক্ষেপে B.th.u. ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট হল—1 পাউন্ড জলের উষ্ণতাকে 10^0 ফাঃ বাড়াতে গেলে যে পরিমাণ উষ্ণতার দরকার হয়, সেটাই B.th.u. বা B.T.u.।

সারণি 5.4

জোয়ার ভাঁটা শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও বিদ্যুতের পরিমাণ

বন্টান	সম্ভাব্য গড় বিদ্যুতের পরিমাণ (1000kw/h)
উত্তর আমেরিকা	
কানাডা ঃ নোভাস্কোসিয়া ও নিউবানস্ উইকের মধ্যবর্তী কান্ডি উপসাগর	
1. প্যাসামাকুয়োডি	1,800
2. কোব্‌সকুক	722
3. অ্যানাপোলিস	765
4. মিনাস কোবেকুইড	19,900
5. আমহার্স্ট পয়েন্ট	256
6. সিপোডি	2,520
7. কামবারল্যান্ড	1,680
8. পিউকোডিয়াফ	794
9. মেমর‍্যামকুক	590
	মোট 29,027

দক্ষিণ আমেরিকা	
আর্জেন্টিনা ঃ (1) সানডোস	5,870
	মোট 5,870

ইউরোপ	
ইংল্যান্ড ঃ (1) সেভার্ন	1,680
	মোট 1,680

ফ্রান্স ঃ	
(1) আরোব বোনোয়া	18
(2) আরগুয়েনন	446
(3) লা রান্স	394
(4) হ্রূত্নফ	16
(5) মঁ সোঁ মিশেল	9,700
(6) সম্	466
	মোট 11,149
রাশিয়া ঃ	
(1) কিসলায়া খাঁড়ি	2
(2) লাম বোভেস্কি উপসাগর	227
(3) শ্বেত সাগর	14,400
(4) মোজেন খাড়ি	1,370
	মোট 16,049

উৎস ঃ Energy Handbook : R.L. Loftness

ভারতের পশ্চিম উপকূলে কেম্বে উপসাগর ও তার লাগোয়া কচ্ছ অঞ্চল জোয়ার ভাঁটার শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে উপযোগী। মিশ্র (1991) এ লিখেছেন কোম্বে ও কচ্ছের দুটি উৎপাদন কেন্দ্র থেকে 8,000-9,000 মেগওয়ার্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। এছাড়া দেশের পূর্ব উপকূলে সুন্দরবন অঞ্চলে মিনি হাইডেল প্ল্যান্ট (100-1,000 kw) স্থাপন করে প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপাদন করার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া, লাক্ষাদ্বীপ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এই ধরণের বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের কথা ভাবা হয়েছে।

5.5 বায়ুশক্তি

বাতাসের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে উইন্ডমিল (wind mill) বা হাওয়া কলের সাহায্যে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়, তাকে বায়ুশক্তি বলে।

বহুদিন আগে থেকেই মানুষ বায়ু প্রবাহের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দৈনন্দিন জীবনের বহু কাজ করে আসছে। প্রচলিত শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহারের অনেক আগে থেকে মানুষ জল তোলার কাজে, শস্য

ভাঙ্গানোর কাজে, আখ মাড়াই, কাঠ চেরাই-এর কাজে বায়ুপ্রবাহের শক্তিকে কাজে লাগিয়েছে। এক সময়ে নেদারল্যান্ডের পোল্ডারভূমি অঞ্চলের জলাভূমি থেকে নোনা জল অপসারণ করতে ব্যাপকভাবে হাওয়াকল ব্যবহার করা হত। বর্তমানে শক্তি সংকটের যুগে বায়ু শক্তির সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।

সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে এত জোরে বাতাস বয় যে তা কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। পৃথিবীর সর্বত্র বাতাসের গতিবেগ একই নয়। কানাডার উত্তরাংশ, দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল, উত্তর পশ্চিম ইউরোপের উপকূলভাগ, আফ্রিকার উত্তর পশ্চিমভাগ, জাপান, চীনের পূর্বাংশ, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি অঞ্চলে বাতাসের গতিবেগ খুব বেশি (চিত্র 5.5)। এইসব এলাকাগুলো বায়ুশক্তি আহরণের ক্ষেত্রে আদর্শ স্থান।

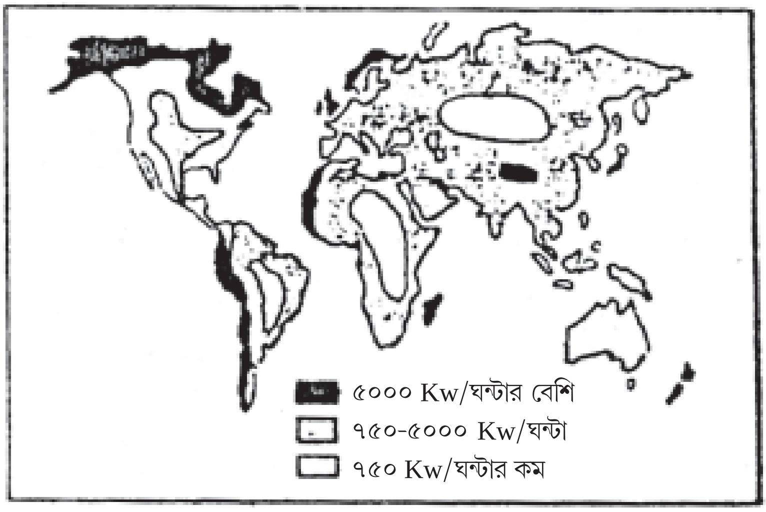

আহরণযোগ্য বাতশক্তির পরিমাণ

চিত্র — 5.5

বৈজ্ঞানিকগণের মতে প্রতি বছর ভূ-পৃষ্ঠে সৌরশক্তির মাধ্যমে প্রায় 25,000 kw/h বাতশক্তির সৃষ্টি হয়। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 100 মিটার উচ্চতার মধ্যে পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। এত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বায়ুশক্তিকে কাজে লাগাবার কতগুলো বড় ধরণের সমস্যা আছে। এর প্রধান কারণ—

(a) দেশ ও কাল ভেদে বায়ুপ্রবাহের শক্তি ও দিক বদলায়।

(b) এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে বায়ুপ্রবাহের শক্তি, গতি ও দিক সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধান হয়নি। ফলে অধিকাংশ বক্তব্যই অনুমানভিত্তিক।

(c) ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বায়ুপ্রবাহের দিক, গতি ও শক্তির বদল ঘটে। ফলে সারা বছর একটানা বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় না।

(d) বায়ুশক্তি উৎপাদনের জন্য বড় উইন্ডমিল ব্যবহার করা হলে তার ব্লেডগুলো স্থানীয় টেলিফোন যোগাযোগ বা টেলিভিশন সম্প্রসারণে ব্যাঘাত ঘটায়। এত অসুবিধে সত্ত্বেও বায়ুশক্তি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কারণ হাওয়া কলের সাহায্যে (a) বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিবেশ সহায়ক, (b) প্রাথমিকভাবে এর খরচ বেশি হলেও রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া একে চালানোর জন্য নিয়মিতভাবে কোন খরচ নেই, (c) স্থানীয়ভাবে বায়ুশক্তির সাহায্যে শক্তির চাহিদা মেটানো সম্ভবপর। যুক্তরাষ্ট্র বায়ুশক্তি ব্যবহারে অগ্রণী দেশ। 1997 সালে এই দেশে বায়ু শক্তির সাহায্যে প্রায় 300 Mw বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল। এর বেশির ভাগই দেশের পশ্চিম ভাগে উৎপাদিত হয়েছিল। ডেনমার্ক বায়ুশক্তি উৎপাদনে আর একটি অগ্রণী দেশ। এছাড়া নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উন্নত দেশগুলোতে বায়ুশক্তির যথেষ্ট ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। চীনে প্রায় 15,000 বায়ুশক্তি চালিত পাম্প আছে, জলতোলার কাজে এগুলো ব্যবহার হয়। এছাড়া চীনের বহু জায়গায় অনেকগুলো বায়ুশক্তি চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে। ভারতের বেশ কয়েকটি জায়গায় যেমন, গুজরাটের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল, পশ্চিমঘাট, মধ্যভারত প্রভৃতি বার্ষিক গড় বায়ুপ্রবাহের ঘনত্ব হল 3 $kw/m^2/day$। কয়েকটি জায়গায় শীতকালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় 10 $kw/m^2/day$। বছরে 5-7 মাস এর পরিমাণ হল 4 $kw/m^2/day$। আমাদের দেশে যে পরিমাণ বায়ু প্রবাহিত হয়, তাকে যদি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, তাহলে উৎপন্ন বিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণ দাঁড়াবে 20,000 মেগাওয়াট। আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি জায়গায় বায়ু থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য বায়ুকল স্থাপন করা হয়েছে যেমন—

1. মান্ডবি (Mandavi)	—	3.3 Mw বিদ্যুৎশক্তি
2. কচ্ছ (Kutch)	—	1.1
3. ওখা (Okha)	—	550 kw
4. দেওঘর (Deoghar)	—	550 kw
5. তুতিকোরিন (Tuticorin)	—	550 kw
6. পুরী (Puri)	—	550 kw

আমাদের দেশে বায়ুশক্তির ব্যবহার জনপ্রিয় করার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রক শুল্ক ছাড়, স্বল্প সুদে REDA থেকে ঋণ, 5 বছর পর্যন্ত কর মুকুব করার কথা ঘোষণা করেছেন।

5.6 জৈব পদার্থ বা জৈবভর থেকে শক্তি (Biomass Energy)

মানুষ বহুদিন ধরেই কাঠ, শুকনো লতা-পাতার জৈব পদার্থ ব্যবহার করে আসছে। যে সব জৈবপদার্থ প্রত্যক্ষভাবে জ্বালানো যায় অথবা সুবিধেজনক পরিবর্তন করে জ্বালানো যায় তাকে জৈব ভর বলে। সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সুদীর্ঘ কাল ধরে মানুষের জ্বালানির প্রধান উৎস ছিল জৈবভর। ইউরোপীয়রা যখন প্রথম উত্তর আমেরিকায় এসে বসবাস শুরু করল তখন তাদের জ্বালানির প্রধান উৎস ছিল কাঠ। আজও ঘরবাড়ি গরম রাখতে কাঠ ব্যবহার করা হয়। যদিও স্বাভাবিক গ্যাস ও তেলের উৎপাদন বাড়াতে কাঠের ব্যবহার খুব কমে গেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আজও কাঠ জ্বালানীর একটি প্রধান উৎস। যেমন সুদান জাম্বিয়া, তানজানিয়া ও থাইল্যান্ড, ভারত প্রভৃতি দেশে (সারণী 5.5) জ্বালানী কাঠের ব্যবহার হয় প্রধানতঃ রান্নার জন্য।

সারণি 5.5

জৈবভর ব্যবহার

দেশ	মাথাপিছু জৈবভর ব্যবহার (টন/বছর)	প্রধানত কাঠ ব্যবহারকারী জনসংখ্যার শতকরা হার
তানজানিয়া	1.8	99
জাম্বিয়া	1.2	99
থাইল্যান্ড	1.1	87

আর রান্নার জন্য কাঠ ব্যবহারের ফলে ঘরে মারাত্মক রকম দূষণ হচ্ছে আর এর শিকার হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলো—"By far the greatest threat of indoor pollution, however, still occurs in the developing countries where some 3.5 billion people mostly in rural areas, but also in many cities—continue to rely on traditional fuels for cooking and heating. "World Resources, 1998-99 আরও উল্লেখ করেছে (P. 66)" Burning such fuels produces large amounts of smoke and other air pollution in the confined space of the home... the World Bank has designated indoor air pollution in developing countries as one of the four most critical global environmental problems." তবুও সম্প্রতি শক্তির উৎস হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কারণ ঃ

(a) খনিজ তেলের সঞ্চয় দিন দিন কমে যাচ্ছে।

(b) সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পে অনেক গাছ লাগানো হয়েছে যা জ্বালানী কাঠ যোগান দেবে। দেশের পতিত জমিকে এ কাজে লাগানো হচ্ছে। এতে একদিকে পরিবেশ দূষণ কমছে অন্যদিকে জ্বালানী কাঠ পাওয়া সুবিধে হয়েছে।

(c) শহরের বর্জ্য পদার্থগুলো যত্রতত্র ফেলার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাচ্ছে। বর্জ্য পদার্থের একটা বড় অংশ জৈবভর আর তাকে জ্বালিয়ে শক্তি উৎপাদন করার সুবিধা থাকে। পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলিতে এই পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে।

(d) জৈবভর থেকে বিভিন্ন ধরণের শক্তি উৎপাদন করা যায়। নীচে কয়েক প্রকার শক্তি নিয়ে আলোচনা করা হল—

5.6.1 রান্না ও ঘর গরম রাখার কাজে কাঠের ব্যবহার ঃ

পৃথিবীর 10 কোটি মানুষ এখনও কাঠ বা কাঠকয়লা রান্না ও ঘরবাড়ি গরম রাখতে ব্যবহার করে। যেসব দেশে কাঠের অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে, সে সব দেশে ঘরবাড়ি গরম রাখতে বাষ্প ও বিদ্যুৎ তৈরী করতে কাঠের ব্যবহার হয়।

এখনও পর্যন্ত আমাদের গ্রামগুলোতে রান্না ও অন্যান্য কাজে প্রয়োজনীয় শতকরা আশি ভাগ শক্তির উৎস হল জ্বালানী কাঠ ও বর্জ্য কৃষিজাত দ্রব্য, যেমন খড়, পাটকাঠি, আখের ছিবড়ে ইত্যাদি। এদেশে বছরে প্রায় চল্লিশ কোটি টন জ্বালানী কাঠ রান্না ও অন্যান্য কাজে লাগে। তবে প্রচলিত উনুনে মাত্র 5%-10% জ্বালানী কাঠের দহন শক্তি কাজে লাগে। বায়ুর অক্সিজেনের অভাবে কাঠ ঠিকমত পুড়তে পারে না বলে কম তাপ সৃষ্টি হয়। এছাড়া উনুনের কাঠের নির্গত ধোঁয়ায় ক্ষতিকর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইডের গ্যাসের প্রভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটে। বাড়ির লোকদেরও ধোঁয়ার প্রভাবে চোখের অসুখ হাঁপানী ব্রঙ্কাইটিস রোগ হতে পারে। এসব কথা চিন্তা করে বিজ্ঞানীরা উন্নত চুলা উদ্ভাবন করেছেন যাতে বছরে আনুমানিক 700 কি.গ্রা. জ্বালানী কাঠ বাঁচে। এতে কিছুটা অরণ্য সংরক্ষিত হবে।

অনুশীলনী ঃ 1

(i) গ্রামীন বৈদ্যুতিকরণে সৌরশক্তির ভূমিকা উল্লেখ করুন।

(ii) গ্রামীন শক্তি বিকাশে বায়ুশক্তির ভূমিকা ও আহরণের অসুবিধার কথা বলুন।

(iii) জৈবভর থেকে শক্তি উৎপাদন কিভাবে হয় ব্যাখ্যা করুন।

5.6.2 কৃষিকাজ ও জ্বালানী ঃ

ধান কেটে নেওয়ার পর ক্ষেতে পড়ে থাকা ধান গাছের গোড়া কিংবা ধান কলে অবশিষ্ট কুঁড়ো এখনও উন্নতশীল দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতে ধানকলগুলোর বয়লারে ধানের তুষ* জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া আখের ছিবড়ে দিয়ে কিংবা আখ মাড়াই-এর পরে অবশিষ্ট ব্যাগাসী (Bagasse) দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। অনেক সময় এগুলোকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা যায়। হাওয়াই দ্বীপে এবং আমাদের দেশে** এভাবে জ্বালানীর কিছুটা সাশ্রয় হয়। ব্রাজিলের চিনি কলগুলোতে প্রচুর পরিমাণে আখের ছিবড়ে পাওয়া যায়। তা থেকে উৎপন্ন ইথানল পরিবহনে ব্যবহৃত হয়।

5.6.3 বর্জ্য পদার্থ ও শক্তি উৎপাদন

পৃথিবীর সব বড় শহরে প্রতিদিন, যে প্রচুর পরিমাণ আবর্জনা সৃষ্টি হয় তার অধিকাংশ উপাদানই হল জৈব পদার্থ। এইসব জৈব বর্জ্য পদার্থকে জৈব রাসায়নিক পদ্ধতিতে দাহ্য গ্যাসে রূপান্তরিত করা যায়। এতে যেমন জঞ্জাল অপসারণ সমস্যার সমাধান হয়, তেমনই পরিবেশ দূষণ রোধ হয়, আবার বিদ্যুৎ উৎপাদনও হয়। বিদেশে অনেক শহরে গরম গ্যাসের সাহায্যে সরাসরিভাবে গ্যাস টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। দিল্লীর তিমারপুরে এই ধরণের একটি কারখানা (3.75 মেগাওয়াট সম্পন্ন) আছে।

বাষ্পীয় জ্বালানী ও জৈবশক্তি ঃ জৈবভরকে বাষ্পীয় বা তরল জ্বালানীতে পরিণত করে তা থেকে শক্তি উৎপাদন করা যায়। জৈব পদার্থকে বিভিন্ন রাসায়নিক পদ্ধতিতে পচিয়ে (decompose) তা থেকে বহুপ্রকার তরল জ্বালানী যেমন মেথানল, এথানল ইত্যাদি তৈরী করা যায়। বিজ্ঞানীরা অবশ্য এই দুই তরল জ্বালানী সম্পর্কে খুব আশাবাদী, কারণ অদূর ভবিষ্যতে গাড়িতে পেট্রোলের বদলে এ জাতীয় তরল পদার্থের ব্যবহার বাড়বে। আগেই বলেছি যে ব্রাজিলে চিনিকলের বর্জ্য (ছিবড়ে) থেকে উৎপন্ন এথানল সে দেশের পরিবহনের কাজে শতকরা 40 ভাগ জ্বালানী সরবরাহ করে। যুক্তরাষ্ট্রে ইদানীং গ্যাসহল (এথানল + গ্যাসোলিন)-এর ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কারণ এতে দূষণ ছড়ায় কম (জৈব জ্বালানী নাইট্রোজেন উৎপন্ন করে না বলে তা দূষণমুক্ত।

*আমাদের দেশে কিছু জায়গায় ধানের তুষ থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করার কয়েকটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। পাতিয়ালা (পাঞ্জাবে)-র কাছে জলখেড়ীতে 10 Mw-এর এইরকম একটি কারখানা আছে।

**ভারতবর্ষে যতগুলো চিনিকল আছে, সেগুলো থেকে যত বর্জ্য বস্তু পাওয়া যায়, তা 2,000 Mw বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে একটি বড় আকারের চিনিকল থেকে যদি 10 Mw শক্তি উৎপাদন করা যায়, তাহলে ঐ কারখানার প্রয়োজন হবে 4 Mw বিদ্যুৎশক্তি। বাকি 6 Mw শক্তিকে অন্যান্য কাজে লাগানো যেতে পারে।

5.7 জৈবগ্যাস বা বায়োগ্যাস

ভারতের অনেক গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছায় নি, এইসব স্থানে গোবর গ্যাস প্রকল্প একটি সম্ভাবনাময় শক্তির আধার (চিত্র 5.6)। আমাদের দেশে প্রতি বছর 100 বিলিয়ন টনের বেশী গোবর উৎপন্ন হয়। এ থেকে বছরে 22,425 মিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস উৎপন্ন করা সম্ভব। কেরোসিনের বিকল্প হিসেবে (i) আলো জ্বালাতে, (ii) রান্নার জন্য এই গ্যাস ব্যবহার করা যেতে পারে।* আসলে গোবর গ্যাসে শতকরা প্রায় 60 ভাগ মিথেন গ্যাস থাকে। একটি গোরু বা মোষের গোবর থেকে প্রতিদিনে গড়ে 200 গ্রাম মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। (iii) গোবর গ্যাস প্রকল্পে উৎপন্ন জৈবসার কৃষিকাজে লাগান যায়। এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে এদেশে বছরে প্রায় 206 মিলিয়ন টন জৈবসার উৎপন্ন হয়। এই বিপুল পরিমান সার একদিকে যেমন রাসায়নিক সারের বিকল্প হিসেবে অর্থনৈতিক সাশ্রয় ঘটায়, অন্যদিকে তেমনই পরিবেশ দূষণমুক্ত হয়। গোবর সার ব্যবহার করলে বছরে 20 মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়বে।

সবচেয়ে বড় কথা হল গোবর গ্যাস একটি পরিচ্ছন্ন জ্বালানী যাতে CO উৎপন্ন হয় না। ভারতে বর্তমানে 3.5 লক্ষ বায়োগ্যাসের কারখানা আছে। এক সমীক্ষায় জানা গেছে 10 লক্ষ বায়োগ্যাসের কারখানা বছরে 4 লক্ষ টন জ্বালানী কাঠের সাশ্রয় করে। নর্দমার নোংরা থেকেও প্রাথমিক পরিশোধনের মাধ্যমে বায়োগ্যাস তৈরী হয়। দিল্লীর কাছে ওখলাতে এই ধরণের একটি গ্যাস কারখানা চালু হয়েছে।

অনুশীলনী ঃ 2

(i) জ্বালানী উৎপাদনে কৃষিকার্যের ভূমিকা কী বলে আপনার ধারণা।

(ii) জৈবগ্যাস দ্বারা গ্রামীণ শক্তি বিকাশ কিভাবে সম্ভব উল্লেখ করুন।

4.8 উর্জা গ্রাম প্রকল্প (Urja gram)

দেশের সুদূর প্রান্তে শক্তির চাহিদা মেটাবার জন্য এই প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বায়োগ্যাস, পোল্ট্রি, বিভিন্ন প্রাণীর বর্জবস্তু ও মানুষের মল থেকে বায়োগ্যাস উৎপাদন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ স্থানীয় সহজলভ্য শক্তির উৎসগুলো থেকে প্রাপ্ত পুণর্ভব শক্তি সরবরাহ ভিত্তি করে এই প্রকল্পটি স্থাপিত হয়েছে। 400টির বেশী গ্রামে এই প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে।

---

* 5-6 জন লোকের পরিবারে গোবর গ্যাস দিয়ে রান্না ও আলোর কাজ মিটে যেতে পারে।

রাষ্ট্রসংঘ ও বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে প্রেরিত ভারতবর্ষের বিকল্প শক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনার একটি চিত্র

সম্ভাবনা	**শক্তি উৎপাদন**
জৈব গ্যাস প্রকল্প	120 লক্ষ
উন্নতমানের চুলা	12 কোটি
জৈব পদার্থ থেকে বিদ্যুৎ	17,000 মেগাওয়াট
সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ	20 মেগাওয়াট, বঃ কিমিঃ
বায়ুশক্তি থেকে বিদ্যুৎ	20,000 মেগাওয়াট
ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ	10,000 মেগাওয়াট
সমুদ্র থেকে বিদ্যুৎ	50,000 মেগাওয়াট

উৎস ঃ পশ্চিমবঙ্গ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়নসংস্থা

5.9 সারাংশ

চিরাচরিত পথে শক্তি উৎপাদন ও তার চাহিদা মেটানো বর্তমানে সম্ভবপর নয়। কারণ অপূর্ণভব সম্পদগুলো ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে অনেক দেশেই এদের ভাণ্ডার ক্রমশঃ কমে আসছে। জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অপ্রচলিত শক্তি হল সৌরশক্তি, ভূতাপীয় শক্তি, জোয়ার ভাঁটার শক্তি, বায়ুশক্তি, জৈবভর শক্তি ইত্যাদি।

পৃথিবীতে যে সৌরশক্তি এসে পড়ে, তা অমিত শক্তির ভাণ্ডার। সৌরশক্তির সামান্য অংশকে যদি কাজে লাগানো যেত, তা দিয়ে শক্তি সংকট দূর হতে পারত। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে তেমন কোন প্রযুক্তিবিদ্যা আবিষ্কৃত হয়নি। এই শক্তির কয়েকটি সুবিধে হল ঃ (i) ইহা পরিবেশদূষণ মুক্ত, (ii) ইহা প্রবহমান শক্তির উৎস, (iii) সৌরশক্তির প্রয়োগে পৃথিবীতে বাড়তি তাপের সৃষ্টি হয় না। তবে এর অসুবিধে হল—(i) রাতে সূর্যকিরণ পাওয়া যায় না। (ii) সৌরশক্তি আহরণ ও বন্টনের জন্য যে পরিমাণ আর্থিক ও কারিগরী শক্তির দরকার হয়, তা আয়ত্ত করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার, (iii) সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ জীবাশ্ম জ্বালানী উৎপাদনের খরচের চেয়ে অনেক বেশী। সৌরশক্তি দিয়ে রান্না করা ছাড়া জল গরম করা, শস্য ও মশলা শুকনো করা ছাড়াও রাতে আলো জ্বালানো হয়।

ভূগর্ভের মধ্যে যে তাপ লুকিয়ে আছে তাকে কাজে লাগিয়ে শক্তি উৎপাদন করা যায়। এই ভূতাপশক্তি হরণশীল, প্রবহমান তথা দূষণমুক্ত শক্তি। ভূতাপ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের চেষ্টা গোটা পৃথিবী জুড়েই চলছে। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইতালি, আইসল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইনস্, ফ্রান্স ও হাঙ্গেরী এ ব্যাপারে বেশ উন্নত।

প্রাকৃতিক নিয়মে চন্দ্র ও সূর্যের টানে জোয়ার ভাঁটা হয়। জোয়ারের সময় জল ধরে রেখে ভাঁটার সময় সেই জল নির্দিষ্ট পথে ছেড়ে তার সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়। ফ্রান্সের লা রান্স খাঁড়িতে এই ধরণের প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ভারতে পশ্চিম উপকূলে জোয়ার ভাঁটার শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

বাতাসের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে হাওয়া কলের (wind mill) সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা পৃথিবীতে বহুদিন আগে থেকেই চলে আসছে। জল তোলা, শস্য ভাঙানো, আখমাড়াই, কাঠ চেরাই-এর কাজে এই শক্তিকে কাজে লাগানো হয়। পৃথিবীতে প্রতি বছর সৌরশক্তির মাধ্যমে প্রায় 25,000 kw/h বাতশক্তি উৎপন্ন হয়। এত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বায়ুশক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে না, কারণ দেশ, কালভেদে ও ঋতুভেদে বায়ুপ্রবাহের শক্তি ও দিক বদলায়। তাছাড়া এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর বেশীরভাগ দেশে বায়ুপ্রবাহের শক্তি, গতি ও দিক সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধান হয়নি।

এছাড়া বর্জ্য পদার্থকে জ্বালিয়ে কিংবা গোবর গ্যাস থেকেও শক্তি উৎপাদন করা যায়।

5.10 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

1. অচিরাচরিত শক্তি উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে দেখা দিয়েছে কেন? এই শক্তি পৃথিবীতে ভবিষ্যৎ শক্তি সংকট কিরূপে সমাধান করতে পারে?
2. সৌরশক্তির সম্ভাবনা ও উৎপাদন প্রক্রিয়া বিবৃত করুন।
3. ভূতাপশক্তি উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা বর্ণনা করুন। পৃথিবীর কোন কোন দেশ এই শক্তি উৎপাদনে অগ্রণী? এই শক্তিকে কী কী কাজে লাগানো যায়?
4. সৌরশক্তি উৎপাদনের সুবিধা কী কী? অসুবিধাই বা কী? পৃথিবীর কোন কোন দেশ সৌরশক্তি উৎপাদনে অগ্রণী?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ টিকা লিখুন

1. সোলার কুকার, 2. সোলার পণ্ড, 3. গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণে সৌরশক্তির ভূমিকা, 4. গ্রামীণ শক্তি বিকাশে বাতশক্তির ভূমিকা, 5. বাতশক্তি আহরণে অসুবিধা, 6. জৈবভর থেকে শক্তি উৎপাদন, 7. জ্বালানী উৎপাদনে কৃষিবর্জের ভূমিকা, 8. জৈবগ্যাস ও গ্রামীণ শক্তি বিকাশ।

5.11 উত্তরমালা ঃ

অনুশীলনী - 1

1. 5.2 অংশ দেখুন।
2. 5.5 অংশ দেখুন।
3. 5.6 অংশ দেখুন।

অনুশীলনী - 2

1. 5.6.2 অংশ দেখুন।
2. 5.7 অংশ দেখুন।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

1. 5.1 অংশ দেখুন।
2. 5.2 অংশ দেখুন।
3. 5.3 অংশ দেখুন।
4. 5.2 অংশ দেখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1. 5.2.2 অংশ দেখুন।
2. 5.2.6 অংশ দেখুন।
3. 5.2 অংশ দেখুন।
4. 5.5 অংশ দেখুন।
5. 5.6 অংশ দেখুন।
6. 5.6.2 অংশ দেখুন।
7. 5.7 অংশ দেখুন।

একক 6 ❑ সম্পদ হ্রাস ও সম্পদ সংরক্ষণ (Depletion of Resources and Resource Conservation)

গঠন

6.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

6.3 সম্পদের বিনাশের কারণ

6.3 ক্রমবর্ধমান সম্পদের অবনমনের পরিপ্রেক্ষিতে মেডোজের উন্নয়নের সীমা শীর্ষক প্রতিবেদন

6.4 মেডোজের প্রতিবেদন ও তার যুক্তি গ্রাহ্যতা

6.5 সম্পদের সম্ভাবনা

6.6 সম্পদ সংরক্ষণ

6.6.1 সম্পদ সংরক্ষণের তাৎপর্য

6.6.2 সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

6.6.3 সম্পদ সংরক্ষণের নীতি ও পদ্ধতি

6.6.4 বিশেষ বিশেষ সম্পদ সংরক্ষণ

6.6.4.1 বনভূমি

6.6.4.2 জলসম্পদ

6.6.4.3 মৎস্য

6.6.4.4 কৃষিভূমি

6.6.4.5 খনিজ

6.7 সম্পদ সংরক্ষণের আধুনিক চিন্তাভাবনা

6.8 সারাংশ

6.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

5.10 উত্তরমালা

6.1 প্রস্তাবনা

হ্রাস বা সংকট বলতে গচ্ছিত বা অপূরণশীল সম্পদের পুনঃ পুনঃ ব্যবহারের ফলে ঐ সব সম্পদের নিঃশেষ হওয়াকে বোঝায়। নিকট ভবিষ্যতে ঐসব সম্পদের পুনঃস্থাপনের সম্ভাবনা ক্ষীণ। আমরা জানি, মাটি থেকে আহরিত খনিজ ও জীবাশ্ম জ্বালানী (fossil fuel) গচ্ছিত বা অপূরণশীল সম্পদ, যা একদিন না একদিন শেষ হয়ে যাবে। আবার, মাছ বা কাঠের মত পূরণশীল সম্পদের পুনঃস্থাপন ব্যবস্থা না করেই যথেচ্ছভাবে সংগ্রহ করায় মাছ ও কাঠের পরিমাণ দারুণভাবে কমে গেছে। চাষবাস ও কাঠের প্রয়োজনে বনভূমি কেটে ফেলা হচ্ছে। মাছের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে, পুনঃসংস্থাপনের ব্যবস্থা না নেওয়ায় কয়েক প্রকার মাছের স্বাভাবিক বাড়বৃদ্ধি ঘটে না। এমনকি নীল তিমি (Blue Whale) লুপ্ত হওয়ার মুখে। মাংসের জন্য পাখী শিকার করায় কয়েক ধরণের পাখীও আজকাল দেখা যায় না। এককালে শীতের দেশ সাইরেরিয়া থেকে আসা বেশ কয়েক প্রকার পরিযায়ী পাখীর আলিপুর চিড়িয়াখানার বা রায়গঞ্জের কুলিক পক্ষীরালয়ে শীতকালে আনাগোনা কমে গেছে প্রধানত পাখীশিকারীদের দৌরাত্ম্যে। অনুরূপভাবে, শস্যক্ষেত্রে কীটনাশক (pesticides) ব্যবহারের ফলে কয়েক ধরণের পাখী আর দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, বহিরাগতদের (Emigrant) আগমনের ফলে অনেক স্থানে স্থানীয় অধিবাসীদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে বা তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ছে, যেমন—যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোপীয়দের আগমনের (immigration) পর থেকে সেখানকার আদিম বাসিন্দা রেডইন্ডিয়ানদের সংখ্যা দারুণভাবে কমে গেছে। অস্ট্রেলিয়ায় তাসমান জাতির মানুষ তো বিলুপ্ত হয়ে গেছে। একদা বনজঙ্গলের ভরা কালাজ্বর প্রবণ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বসবাসের ফলে সেখানকার 'ভূমিপুত্র' রাজবংশীরা নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি পুনঃ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কামতাপুরী নামে পৃথক রাজ্যের জিগির তুলেছেন, অনুরূপভাবে আশির দশকে অসমে বাঙালী খেদাও আন্দোলন ছিল সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের আর্থিক বঞ্চনার প্রতিবাদ। জনসংখ্যার চাপ যত বাড়বে, স্থানীয় মানুষ যত আর্থিক বঞ্চনার শিকার হবে, পরিবেশের ভারসাম্য ততই নষ্ট হবে, যা পরোক্ষভাবে সম্পদের বিকাশে বাধা দেবে।

উদ্দেশ্য ঃ

এই এককটি পাঠ করে আপনি,

- সম্পদ হ্রাস বা সম্পদ সংকট বলতে কি বোঝায় তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- সম্পদের বিনাশ কেন ঘটছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কিভাবে সম্পদকে রক্ষা করা যায় তা নির্ধারণ করতে পারবেন।

5.2 সম্পদ বিনাশের কারণ ঃ

(i) **সম্পদের অতি ব্যবহার (Overexploitation of Resources) ঃ** প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ ব্যবহারের ফলে সম্পদের পরিমাণ কমে যায় এমন এক সময় সম্পদের সংকট দেখা যায়, যেমন অতিরিক্ত গাছ কাটার ফলে উত্তরবঙ্গের বনভূমি ফাঁকা হয়ে গেছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার বনভূমি তো বিলুপ্তির পথে। অনুরূপভাবে জমি থেকে বছরে 3/4টি করে ফসল তোলার ফলে তার উর্বরতা শক্তি কমে যাচ্ছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় উন্নত দেশগুলো কমপক্ষে 50 গুণ বেশী সম্পদ ভোগ করে। U.S. Bureau of Mines (1970)-এর প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে ফি-বছর পৃথিবীতে যে পরিমাণ তামা, নিকেল, রূপা, অ্যালুমিনিয়াম এবং সোনা উত্তোলিত হয়, তার যথাক্রমে 33, 38, 26, 42 এবং 26 শতাংশ যুক্তরাষ্ট্র একাই ভোগ করে।

(ii) **সম্পদের অপচয় (Wastage of Resources) ঃ** অভাবের জন্য হোক বা প্রাচুর্যের জন্য হোক মানুষ বিভিন্নভাবে সম্পদ নষ্ট করে চলেছে। ভারতের মত বিকাশশীল দেশে জ্বালানীর জন্য গরীব মানুষেরা বনভূমি ধ্বংস করে চলেছে। মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, কর্নাটকের মালভূমিতে এবং হিমালয়ের পাদদেশের তরাই অঞ্চলে এইভাবে মূল্যবান বনভূমি নষ্ট হচ্ছে। 1970 সালের এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, প্রাচুর্য্যের দেশ যুক্তরাষ্ট্রে 70 লক্ষ মোটরগাড়ি, 10 কোটি টায়ার, 20 কোটি টন কাগজ, 28 কোটি বোতল ও 4,800 কোটি টিনের কৌটো আবর্জনা হিসেবে পরিত্যক্ত হয়েছিল। 2,000 সালে এই হিসেব আরও বহুগুণ বেড়েছে অনুমান করা যায়।

(iii) **সম্পদের বহুমুখী ব্যবহারজনিত ক্ষয় ঃ** পেট্রোলিয়াম থেকে বহুবিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। এই খনিজ তেলের ব্যবহারও বহুবিধ। স্বভাবতই এর চাহিদা ব্যাপক। এই কারণে তা শীঘ্র শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। কয়লা, তামা, রূপো সম্বন্ধে একই কথা খাটে।

(iv) **কারিগরী জ্ঞানের অভাব ও অনুন্নত অর্থনীতি ঃ** ভারত থেকে প্রতি বছর কোটি কোটি টন আকরিক লোহা জাপানে রপ্তানী হচ্ছে। জাপান এই আকরিক আমদানী করে আজ বিশ্বের দ্বিতীয় প্রধান লোহা ও ইস্পাত উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হয়েছে। অথচ আমরা অনুন্নত অর্থনীতির জন্য এই সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—আগে 1 টন লোহা তৈরী করতে 6 টন আকরিক লোহা লাগত। বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার দরুণ মাত্র 2 টন আকরিক লোহা থেকে ঐ পরিমাণ লোহা পাওয়া যায়। আগে গোবর শুধুমাত্র ক্ষেতে সার দেবার কাজে লাগত, বর্তমানে তাকে জ্বালানীর (Biogas) কাজে লাগানো হচ্ছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত শহরের যে আবর্জনা, জঞ্জাল শহরের প্রান্তভাগে ফেলে দেওয়া হত পরিত্যক্ত পদার্থ হিসেবে, আজ তা থেকে শক্তি উৎপাদন হচ্ছে। তাই বলা চলে কারিগরী জ্ঞানের যত বিকাশ ঘটবে, সম্পদের অপচয় তত কমবে।

(v) **দূষণজনিত কারণে সম্পদের বিনাশ ঃ** অনেক সময় দেখা যায় জাহাজের তলদেশ ফুটো হয়ে গিয়ে তেল সমুদ্রের জলে মিশেছে। উপকূলীয় যুদ্ধের (Gulf War) সময়ও প্রচুর তেলের খনি ধ্বংস হয়েছিল। সেখান থেকে জলে সমুদ্রের তেল মিশেছিল। ফল হয়েছিল সামুদ্রিক প্রাণীর ব্যাপকহারে মৃত্যু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমাতে যে পরিমাণবিক বোমা ফেলা হয়েছিল, তার ফলাফল এখনও ঐ স্থানের বাসিন্দাদের ওপরে লক্ষ্য করা যায়। মধ্যপ্রদেশের ভোপালে ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানীর যে গ্যাস লিক হয়েছিল, তার ফলাফল এখনও স্থানীয় বাসিন্দারা অনুভব করেন। 1990 সালে ভারতের পোখরাতে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে সেখানকার জমি অনুর্বর হয়ে পড়েছে, এইভাবে সম্পদের গুণমান নষ্ট হচ্ছে কিংবা সম্পদের বিনাশ ঘটছে।

এছাড়া (vi) অনুন্নত পরিকাঠামো, (vii) উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাব, (viii) পরিকল্পনা রূপায়ণে অহেতুক দেরী, (ix) প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি প্রকল্প রূপায়ণ, (x) রাজনৈতিক অস্থিরতা, (xi) শ্রমশক্তির অপব্যবহার, (xii) পতিত জমি উদ্ধারে দেরী ইত্যাদি কারণের জন্যও সম্পদের পরিমাণ কমে যায়।

6.3 ক্রমবর্ধমান সম্পদের অবনমনের পরিপ্রেক্ষিতে মেডোজের “The limits to growth” বা “উন্নয়নের সীমা” শীর্ষক প্রতিবেদন (Report on the limits to growth in view of the depleting resources)

Meadows and Meadows (মেডোজ ও মেডোজ)-এর লেখা “The limites to growth” বা “উন্নয়নের সীমা” বইতে যুক্তরাষ্ট্রের Massachusetts Institute of Technology-র Industrial Dynamics (1961), Urban Dynamics (1970), World Dynamics (1971) ও Business Dynamic Model ব্যবহার করে দেখিয়েছেন সারা পৃথিবীতে জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ অবনমন (Environmental degradation) কী দ্রুত তালে বেড়ে চলেছে। “Limits to growth”-এ বলা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ও জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, পৃথিবীর সম্পদের যোগান সে হারে বাড়ছে না। এজন্য শিল্পোন্নত সভ্যতা শীঘ্রই ভেঙে পড়ার আশঙ্কা দেখা গিয়েছে (চিত্র 6.9)।

Meadows and Meadows তাঁদের “Limits to growth”-র ভূমিকায় লিখেছেন যে, ক্রমবর্ধমান শিল্পোন্নয়ন, দ্রুত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, অপুষ্টি, অনাহার ও দারিদ্র্য, অপূর্ণভব ও গচ্ছিত সম্পদের দ্রুত নিঃশেষ এবং পরিবেশের অবনমন সম্পর্কে তাঁরা বিশেষ উদ্বিগ্ন। Meadows and Meadows মনে করেন যে, গোটা পৃথিবীর পটভূমিকায় Jay Forrester-র প্রণালীভিত্তিক মডেলটিই ব্যবহার করা চলে ও এর ভিত্তিতে

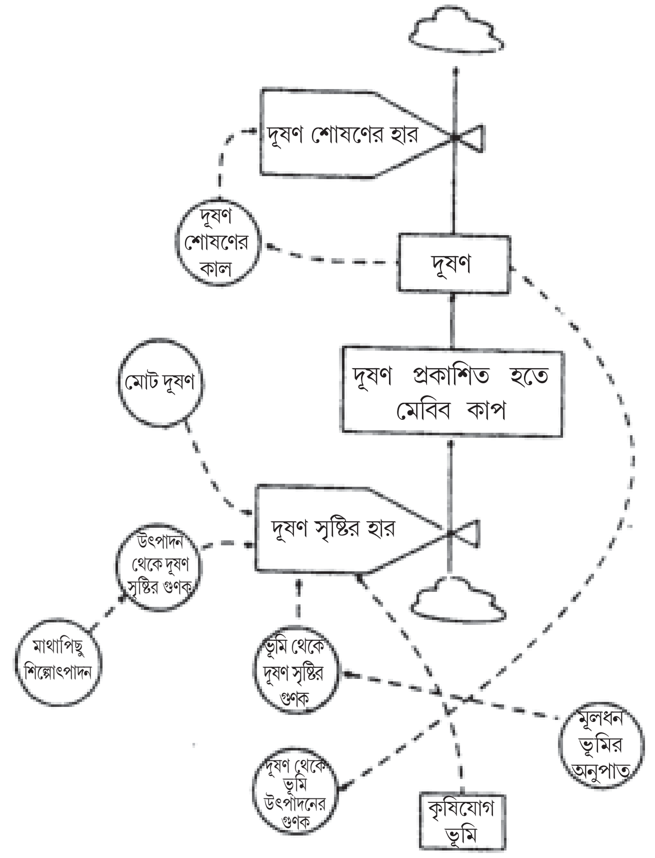

মেডোজ এবং মেডোজ-এর মডেলের একাংশ

চিত্র — 6.1

আগামী 30 বছরের ভবিষ্যদ্বানী (Prediction) করা সম্ভবপর। তাঁরা Model-এর ভিত্তিতে এরকম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, বর্তমান প্রণালীতে কোনও বড় রকমের রদবদল না ঘটলে আগামী শতকের মধ্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও শিল্পোন্নয়ন রুদ্ধ হয়ে যাবে। Meadows and Meadows-এর ভাষায় “We can thus say with some confidence that under the assumption of no major change in the present system, population and industrial growth will certainly stop within the next century, at the latest.” তাঁদের মতে আগামী দিনে মানুষের মূল্যবোধ ও জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতিতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য হেরফের ঘটবে না। লেখকদ্বয় তাঁদের মডেলে 1901 থেকে 2000 সাল অবধি জনবৃদ্ধির হারে পরিবর্তন, মাথাপিছু খাদ্য, শিল্পোৎপাদন, দূষণ গচ্ছিত সম্পদ, জন্মহার, মৃত্যুহার ও পরিষেবা (Service) একটি লেখচিত্রের (Graph) মাধ্যমে তুলে ধরেছেন (চিত্র 6.2)।

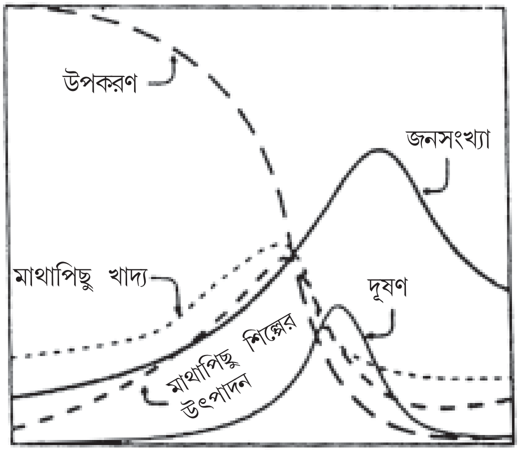

উন্নয়নের সীমা ঃ পৃথিবীর স্টাণ্ডার্ড মডেল

চিত্র — 6.2

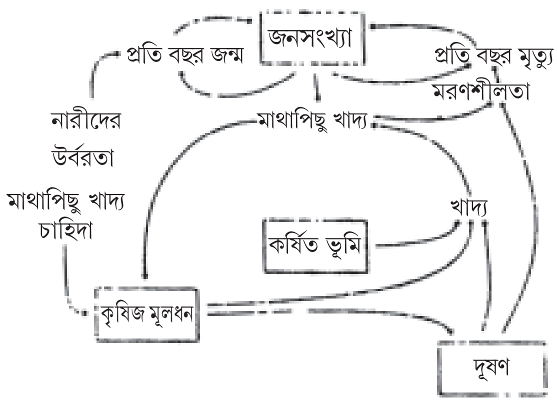

পৃথিবীর মডেলে কয়েকটি ফিডব্যক লুপ

চিত্র — 6.3

এঁদের মডেলে দেখানো হয়েছে পৃথিবীতে জন্মহার আস্তে আস্তে কমছে, পক্ষান্তরে মৃত্যুহার 1940-এর পর থেকে দ্রুত কমেছে। ফলে অবশ্যম্ভাবীভাবে জনবৃদ্ধি ঘটছে। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে মাথাপিছু খাদ্য, শিল্পোৎপাদন ও পরিষেবা দ্রুত বাড়ার সাথে সাথে প্রাকৃতিক সম্পদের ভাঁড়ারে টান পড়ছে। ফলে মাথাপিছু খাদ্য ও শিল্পোৎপাদন কমতে শুরু করে ও তা সম্পদের নিম্নগামী রেখাটির (downward line) অনুগামী হয়। এরপরেও বিশ্বের লোকসংখ্যা কিছুকাল বাড়তে থাকে ও তারপরে হঠাৎই কমতে থাকে (অনেকটা ম্যালথাসের তত্ত্বের মত)। এই মডেল থেকে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে, অপূণর্ভব সম্পদ কমার ফলেই জনসংখ্যার এরূপ অধোগতি ঘটে (Population collapse occurs because of non-renewable resource depletion)। মোট কথা, মানবজাতির ধ্বংসের আশঙ্কার কারণ হিসেবে 'limits to growth'-এ নীচের কারণগুলি উল্লেখ করা হয়েছে—(i) দ্রুত শিল্পায়ন, (ii) দ্রুততর তালে জনবৃদ্ধি, (iii) ব্যাপক অপুষ্টি, (iv) সীমিত ও ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ এবং পরিবেশ দূষণ।

দূষণ সম্বন্ধে Meadows and Meadows-র বক্তব্য হল ঃ

(1) The few kinds of pollution that actually have been measured over time seem to be increasing exponentially.

(2) We have almost no knowledge about where the upper limits to these pollution growth curves might be.

(3) The presence of natural delays in ecological processes, the probablity of underestimating the control measures and therefore inadvertently reaching those upper limits.

(4) Many pollutants are globally distributed : their harmful effects appear long distances from their points of generation.

(5) Man pollutants in the complicated system are influenced in some way by both the population and the industrialization positive feed-back loops.

এই মডেলটি ছাড়াও Meadows and Meadows তাঁদের ''Limits to growth''-তে আরও কয়েকটি মডেল খাড়া করেছেন—

(i) প্রাকৃতিক সম্পদের ভিত্তি দু'গুণ হয়ে যাচ্ছে।

(ii) প্রাকৃতিক সম্পদ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ অসীম (unlimited)।

(iii) অসীম সম্পদ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং বর্ধিত কৃষি উৎপাদন।

(iv) অসীম সম্পদ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বর্ধিত কৃষি উৎপাদন এবং সঠিক জন্মনিয়ন্ত্রণ মডেল।

Limits to growth বা উন্নয়নের সীমা ধারণাটির মূলে আছে একটি তত্ত্ব ঃ লোকসংখ্যা, মূলধন, খাদ্য, গচ্ছিত সম্পদ ও দূষণ—এই উপাদানগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত। একটিতে কোন হেরফের ঘটলে তার প্রভাব অন্য উপাদানগুলোতে পরতে বাধ্য। কিন্তু একই পরিমাণ তফাৎ মডেলের অন্যান্য উপাদানে ঠিক কতখানি হেরফের ঘটবে তা নানাভাবে অঙ্ক করেও আগে থেকে বলা মুশকিল। এটি বোঝাতে তাঁরা কয়েকটি প্রতিক্রিয়া চক্র (feedback Model)-র সাহায্যে নিয়েছেন (লাহিড়ী-দত্ত, কুন্তলা 2000)।

6.4 মেডোজ-এর প্রতিবেদন ও তার যুক্তিগ্রাহ্যতা (Meadows Report and its validity)

নীচে Meadows-র "Limits to growth"-র বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হল। একই সাথে ঐ প্রতিবেদনের যুক্তিগ্রাহ্যতা নিয়েও আলোকপাত করা হল। প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিকগুলো হল—

(i) **জনাধিক্য, সম্পদ হ্রাস ও সম্পদ সঙ্কট** (Over population, Resources Depletion and Resources crisies) ঃ

1900 সালে পৃথিবীর যে জনসংখ্যা ছিল 161 কোটি, 1950-এ তা গিয়ে দাঁড়াল 251.6 কোটি। এই সময়ের মধ্যে ঘটে যাওয়া দুটো বিশ্বযুদ্ধ আর্থ-সামাজিক জীবনে দারুণ পরিবর্তন এনেছে। 1949 সালে চীনে কৃষি বিপ্লব ও জাপানের শিল্পায়নে নতুন জোয়ার আনে। 1950-র পর থেকে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে জনবৃদ্ধি একটি স্থিতিশীল (Static) অবস্থায় আসে, অন্যদিকে আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশ জনজোয়ারে ভাসতে থাকে। নীচের সারণীতে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের তথা গোটা পৃথিবীর জনসংখ্যা গতিপ্রকৃতি দেখানো হল। এই সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশের জনসংখ্যার বর্তমানে ইউরোপের সমান। অন্যদিকে এশিয়া মহাদেশে এই সময় (1950-1995) 2.58 গুণ জনবৃদ্ধি ঘটেছে। 1950-1960, 1960-1970, 1980-1995 সালের মধ্যবর্তী বছরে পৃথিবীর জনবৃদ্ধির হার ও এশিয়ার জনবৃদ্ধির হার প্রায় একইরকম ছিল। যথাক্রমে 1.2, 1.2, 1.28 (উভয়ক্ষেত্রে), আফ্রিকা মহাদেশে অবশ্য 1980-1995 সালে

সারণি 6.1

জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি (কোটিতে) ঃ 1950-1998

মহাদেশ	1950	1960	1970	1980	1995	1998
এশিয়া	136.6	166.6	209.5	259.1	341.7	360.6
আফ্রিকা	22.3	27.8	35.7	77.6	74.6	77.9
উত্তর আমেরিকা	20.8	26.8	31.9	37.4	43.3	43.5
দক্ষিণ আমেরিকা	11.2	14.7	19.1	24.0	32.4	33.2
ইউরোপ	57.2	63.9	79.1	74.9	74.9	73.9
ওশিয়ানিয়া	1.3	1.6	1.9	2.3	2.6	2.9

এই হার পৃথিবীর জনবৃদ্ধির হারের (সারণি 6.1) চেয়ে সামান্য বেশী ছিল অর্থাৎ 1.57 শতাংশ। সেই তুলনায় এই সময়ে (1950-1960, 1960-1970, 1980-1995) ইউরোপে জনবৃদ্ধির হার ছিল 1.09 শতাংশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 1950 থেকে 1995 সালের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়েছে 2.26 গুণ। জনবিস্ফোরনের এই হার বজায় থাকলে মেডোজ আশঙ্কা করেন যে—(i) পৃথিবী জুড়ে কৃষিযোগ্য জমির ঘাটতি দেখা দেবে, (ii) খাদ্য ঘাটতি হবে, (iii) সম্পদের অভাব দেখা দেবে, (iv) প্রযুক্তির উন্নয়নের ধীরগতির দরুন সম্পদের অপচয় বাড়বে, (v) সম্পদের পূর্ণব্যবহারের গতি ধীর হয়ে যাবে, (vi) অপ্রচলিত সম্পদের ব্যবহার সর্বত্র সমান হবে না, একারণে গচ্ছিত সম্পদের ওপর নির্ভরশীল মানুষের অগ্রগতি থমকে যাবে। মেডোজ মনে করেন সম্পদের এই অভাবের ফলে মানুষের সার্বিক উন্নতি তার চরমসীমাকে ছাড়িয়ে যাবে। ফলে সভ্যতার সংকট দেখা দেবে।

মেডোজ-এর আগেও অনেকে জনসংখ্যা সমস্যা ও খাদ্য সংকট নিয়ে তাঁদের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। E. M. East (1923) Mankind at the Crossroads-এ এই বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে আমাদের সভ্যতার উচ্চতম মূল্যবোধ শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যাবে। পল সিয়ার্সের (1935) Deserts on the March, Bennett-র Soil Conservation, Whyte and Jacks-র Vanishing lands, Charles E. Kellog-র The Soil that supports us, Frank A. Pearson and Floyd G. Harper-র The World's Hunger-এ জমি ও খাদ্য সংকট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। Osborn তাঁর Own Plundered Planet-এ আগামী প্রজন্মের মানুষ ও খাদ্য সংকটের কথা তুলে ধরেছেন। এই বইতে আরও বলা হয়েছে যে, মানুষ হল একমাত্র জীব যে জীবনধারণের ভিত্তিকে ধ্বংস করে বেঁচে থাকে ‘‘The only creature that lives by destroying the basis on which life depends’’। এজন্য তাঁরা গবেষণা ও শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণের ওপর জোর দেন। William Vogt-ও তাঁর Road to Survival-এ Osborn-র কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। এঁদের সবার বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার হল, ‘‘Every grain of wheat and rye, every sugar beet, every egg and piece of wheat, every spoonful of olive oil, every glass of wine, depends on an irreducible minimum of earth to produce it. The earth is not made of rubber, it can not be stretched. As the number of human beings increases, the relative amount of productive earth decreases by that amount’’ (Reader's Digest, Jan 1949, P. 141) অর্থাৎ

প্রত্যেক কণা গম বা রাই, বীট, প্রতিটি ডিম, প্রতি চামচ জলপাই তেল ও প্রত্যেক গ্লাস মদ উৎপাদন করতে একটুকরো জমির প্রয়োজন। পৃথিবী রবার দিয়ে তৈরী নয় যে বাড়ানো যাবে। লোকসংখ্যা যতটা বাড়তে থাকবে, উৎপাদনশীলতা ততটাই কমতে থাকবে।

উপরোক্ত লেখকদের আশঙ্কা অমূলক নয়, তবে 1972 (Limits to growth-র প্রকাশকাল)-র পর থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে খাদ্যসংকট খুব একটা প্রকট হয়নি। মানুষ উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে জমি থেকে আরও ফসল ফলাচ্ছে। আশা করা যায় আগামীদিনেও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ তাঁর নিত্যনতুন জ্ঞানের আলোকে চিরাচরিত খাদ্যের বদলে নতুন নতুন খাদ্য উৎপাদন করে খাদ্য সমস্যার মোকাবিলা করবে।

(ii) **কৃষিযোগ্য জমির সীমাবদ্ধতা (Limitation to cultivable land) ঃ** বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে পৃথিবীতে মোট 320 কোটি হেক্টর জমি কৃষির উপযোগী করা যেতে পারে। এর মধ্যে অর্ধেকের মত জমি উর্বর যেখানে ফসল ফলানো লাভজনক বলে বিবেচিত হয় এবং বাস্তবে হচ্ছেও তাই। বাকী অর্ধেক জমিতে ফসল ফলানো লাভজনক হবে বলে মনে করা হয় না। FAO (Food and Agricultural Organisation)-র হিসেব অনুযায়ী 1995 সাল পর্যন্ত মোট 147.64স কোটি হেক্টর জমি চাষবাসের কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। উপরোক্ত সংস্থার সমীক্ষায় বলা হয়েছে খাদ্যের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বনভূমির ক্ষতিসাধন করে নতুন নতুন জমিতে কৃষিকাজের প্রসার ঘটানো বাণিজ্যিক দিক দিয়ে লাভজনক হবে না। এক্ষেত্রে পতিত জমি পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন। ভারত, চীন, ইজরায়েলের মত অগ্রণী উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পতিত জমি উদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছে, অন্যত্র যেমন দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্য এশিয়ার কিছু দেশ, নিকট প্রাচ্যে, উত্তর আফ্রিকায় এবং ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার কিছু কিছু অংশে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়ানোর সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

(iii) **কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সীমা (Limits to Agricultural Production) ঃ** মেডোজের মতানুযায়ী লোকসংখ্যা আগামী 30 বছরে ছ'গুণ আকার ধারণ করবে এইজন্য চক্রহারে জনবৃদ্ধি কখনই পাটিগাণিতিক হারে খাদ্যশস্য বৃদ্ধির সাথে তাল মিলাতে পারবে না। তাই প্রচণ্ড খাদ্যাভাব চলবে। 1950 সাল থেকে 1996 সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বেড়েছে 325.2 কোটি (576.8-251.6 কোটি)। এই সময়ের মধ্যে গোটা পৃথিবী জুড়ে খাদ্যসমস্যার ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায় না, তাই মনে হয় মেডোজের ধারণা অমূলক। অনুমান করা যায় অতীতের মত ভবিষ্যতেও মানুষ যে কোন খাদ্যসমস্যার মোকাবিলা করতে পারবে।

(iv) **খনিজ সম্পদের সীমাবদ্ধতা (Limitation to mineral resources) ঃ** পৃথিবীর অধিকাংশ খনিজ সম্পদ ক্ষয়িষ্ণু অর্থাৎ তারা একদিন না একদিন শেষ হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন খনিজ সম্পদের আয়ুকাল নিয়ে Meadwos and Meadows (1979) যে হিসাব দিয়েছেন তা নিম্নরূপ (সারণি 6.2) ঃ

সারণি 6.2

খনিজ সম্পদ	সঞ্চয়ের মোট পরিমাণ	বর্তমান হারে খরচের ভিত্তিতে খনিজের সম্ভাব্য আয়ুকাল
কয়লা	5×10^{12} টন	2300
আকরিক লোহা	1×10^{11} টন	240
নিকেল	147×10^{9} পাউন্ড	150
বক্সাইট	1.17×10^{9} টন	100
ম্যাঙ্গানীজ	8×18^{8} টন	97
প্রাকৃতিক গ্যাস	1.14×10^{15} ঘন ফুট	38
তামা	308×10^{6} টন	36
পেট্রোলিয়াম	455×10^{9} বি. ব্যারেল	31
দস্তা	123×10^{6} টন	23
টিন	4.3×10^{6} লং টন	17
রূপা	5.5×10^{9} ট্রয় আউন্স	16
সোনা	353×10^{6} ট্রয় আউন্স	11

(Meadows & Meadows, 1979, The limits to growth, 2nd edn.)

উপরোক্ত সারণী থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, পৃথিবীর বেশীরভাগ খনিজ সম্পদই 100 বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। মেডোজের প্রতিবেদন থেকে আমাদের মনে আশঙ্কা জাগে ঠিকই, কিন্তু সম্পদের সম্ভাব্য আয়ুকাল নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যেই বিরোধ আছে। কারণ, পৃথিবীর সর্বত্র খনিজ সম্পদের খোঁজ চলছে, তা সে মহাসাগরের তলদেশ হোক, কি পর্বতশিখর হোক কিংবা শীতল মেরু অঞ্চল হোক, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে ইতিবাচক ফল মিলেছে। তাই Meadows প্রতিবেদন থেকে খুব আশঙ্কার কারণ নেই। বরং বলা চলে এতদিন ধরে ব্যবহার হয়ে আসলেও অনেক খনিজেরই জ্ঞাত সঞ্চয়ের (known reserves) পরিমাণ বেড়েছে, তাই সম্পদ স্থানু (static) নয়, তা গতিশীল।

(v) **প্রযুক্তির ধীর পরিবর্তন (Technology changes slowly) ঃ** Meadows and Meadows মনে করেন, সম্পদ উত্তোলনের সময় তাল মিলিয়ে প্রযুক্তিবিদ্যার সম্ভাব্য অগ্রগতি কখনও ঘটে নি। তুলনামূলকভাবে প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি অনেক ধীর। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রথম বছরে যে প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করে ও শক্তিসম্পদ ব্যায় করে যে পরিমাণ খনিজপদার্থ উত্তোলিত হল, পরবর্তী বছরগুলোতে ঐ একই পরিমাণ উত্তোলন করতে গেলে আরও উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা অবলম্বন ও শক্তিসম্পদ খরচ করতে হবে, নতুবা উত্তোলনের পরিমাণ কমে যেতে বাধ্য। খনিজ সম্পদের সঞ্চয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ কমতে থাকার ফলে তা উত্তোলন করা আরও ব্যয়বহুল হয়ে পড়বে।

স্মরণ করা যেতে পারে, প্রযুক্তিবিদ্যার মান একটি আপেক্ষিক ধারণা। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে আজ পর্যন্ত যে সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঘটেছে, তার ফলে সম্পদের উন্নততর ব্যবহার সম্ভবপর হচ্ছে, যেমন— কম্পিউটারের ব্যবহার বা যোগাযোগ ব্যবস্থায় এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে স্যাটেলাইটের ব্যবহার। প্রযুক্তির উন্নতির ফলেই আজ অনেক কম কাঁচামালে আরও বেশী শিল্পদ্রব্যাদি উৎপন্ন হচ্ছে। একই জমিতে বহু ফসল ফলছে।

(vi) **অপ্রচলিত সম্পদের স্বল্প ব্যবহার (Less use of non-conventional resources) ঃ** আমরা জ্বালানীর জন্য এখনও খনিজ তেল, কয়লা বা প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল। এখনও অপেক্ষাকৃত কম বিরল শক্তিসম্পদের ব্যবহার তেমন বাড়ে নি। কিন্তু এও সত্যি যে, শিল্পসভ্যতার প্রাথমিক স্তরে পরিবর্ত দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা তেমনভাবে অনুভূত না হলেও দিনের পর দিন যেভাবে সম্পদের পরিমাণ কমেছে, জিনিসের দাম বেড়েছে, মানুষ তত পরিবর্ত সামগ্রীর (substitute goods) দিকে ঝুঁকেছে। যেমন, তাম্রের বদলে অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার, রেলের স্লিপারের বদলে কংক্রিটের স্লিপার ব্যবহার, তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার বদলে জলশক্তির ব্যবহার, অ্যালুমিনিয়াম সিট-এর বদলে ইস্পাত সিটের ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়ছে।

(vii) **সম্পদের পুনর্নবীকরণের অসুবিধা (Difficulty in recycling of materials) ঃ** কোন খনিজ আকরিক থেকে ধাতব পদার্থ নিষ্কাশিত করে নেওয়ার পর তাদের ধাতুমলে (slag) কিছুটা ধাতব পদার্থ থেকে যায়। তা যদি সস্তা পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা যায়, তবে ঐ খনিজের ব্যবহারের সময়সীমা কিছু বেড়ে যায়। কিন্তু অনেক সময় ঐসব ধাতব পদার্থ আবর্জনা হিসেবে নষ্ট করা হয়। যেমন লোহার টুকরো, পুরনো ভাঙা টিন, অ্যালুমিনিয়াম বা মোটরগাড়ির খোল (body) ইত্যাদি। সন্দেহ নেই যে এইসব বর্জ্য পদার্থ থেকে ধাতব পদার্থ নিষ্কাশন করা ব্যয়বহুল। কিন্তু খনিজ সম্পদে পিছিয়ে থাকা অথচ কারিগরী বিদ্যায় এগিয়ে থাকা জাপান লোহার টুকরোকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর অন্যতম সেরা লোহা ও ইস্পাত উৎপাদক দেশে পরিণত হয়েছে। শুধুমাত্র লোহা-ইস্পাত অ্যালুমিনিয়াম শিল্পেই নয়, কাগজ, ব্যাগ্যাস, (bagasses, আখের ছিবড়া)

পলিথিন প্রভৃতি বর্জ্য পদার্থও শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন, কাগজ শিল্পে পুরনো কাগজ, কাপড়, আখের ছিবড়ে ব্যবহার করা হচ্ছে। আবার নতুন বাড়ি তৈরীর সময়ও পুরনো বাড়ির ইট, কাঠকে কাজে লাগাই। তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে উড়ে আসা ছাই দিয়ে ইট তৈরী হচ্ছে। শহরের জঞ্জাল থেকে শক্তি উৎপাদনও সম্ভবপর হচ্ছে। তাই বলা চলে সম্পদের পুনর্নবীকরণ যেখানে সম্ভবপর, সেখানেই বর্জ্য পদার্থ বা ফেলে দেওয়া ধাতব পদার্থকে কাজে লাগানো হচ্ছে এবং পুর্নব্যবহারের পরিমাণ ক্রমশই বাড়ছে এবং এই গতিপ্রকৃতি বজায় থাকলেই লাভ। কারণ এতে সম্পদের অপচয় হবে কম।

সবশেষে বলতে হয় পরিবেশবিদ ও অর্থনীতিবিদরা বইটির সমালোচনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে—

(viii) **যেভাবে বইটিতে সাধারণীকরণের (generalised)** ভিত্তিতে মডেল ব্যবহার করা হয়েছে তা ঠিক নয়। মডেল তৈরী করতে তথ্যের বিশদ বিশ্লেষণ না করে কতকগুলো সাধারণ, অর্থহীন সমষ্টি (aggregates) নেওয়া হয়েছে। যেমন দূষণ। এঁদের আরও বক্তব্য হল যেসব তথ্যের ভিত্তিতে মডেলগুলো গড়ে তোলা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অনেক অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতা রয়েছে। এই মডেলের সাহায্যে পৃথিবীর প্রকৃত অবস্থা বোঝানো যায় না। আগেকার বিশদ আলোচনা থেকেই এ সম্বন্ধে আমরা জানতে পেরেছি।

অনুশীলনী-1

(i) দূষণজনিত কারণে সম্পদের বিনাশ হয় কিভাবে বলুন।

(ii) জনাধিক্য ও সম্পদ হ্রাস ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন।

(iii) কৃষিযোগ্য জমির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বলুন।

(iv) খনিজ সম্পদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বলুন।

6.5 সম্পদের সম্ভাবনা (Resource Prospects)

আমরা এতক্ষণ সম্পদ সংরক্ষণ নিয়ে আলোচনা করলাম। এ থেকে স্পষ্ট হয়েছে সম্পদ সংকট নিয়ে আশঙ্কা থাকলেও হতাশ হবার মত কারণ নেই। সম্পদক্ষেত্রে আশাবাদীর সংখ্যাও প্রচুর। অতীতেও দেখা যাচ্ছে যে, মিশরেও খাদ্যের যোগান বাড়ানোর জন্য সেচ, নিকাশীব্যবস্থা ও কৃষিপদ্ধতির উন্নতির জন্য জগৎ সাত বছরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। পরিকল্পনাবিদ্‌রা বলেন যে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে খাদ্যযোগান বাড়াতে হয়। এবং এটা কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Kirtley Mather (কির্টলে ম্যাথার)-র (Enough and to Spare) মতে, ‘‘There is enough for all. The earth is generous mother; she will provide plentiful abundance for all children if they will but cultivate her soil in justice and peace’’ (সকলের জন্য অনেক জিনিস আছে, আর মা বসুন্ধরা

অকৃপণ এবং মুক্তহস্ত। তিনি তাঁর সন্তানদের জন্য প্রভূত সম্পদ দেবেন যদি কেবল তারা শান্তি এবং ন্যায়সংগতভাবে চাষ করে)। মানুষ যদি ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের জন্য সম্পদ ধ্বংস না করে তবে কোনরূপ সম্পদ সংকট হওয়ার কারণ নেই। পরিকল্পনামাফিক ব্যবহার ও যথোপযুক্ত প্রয়োজনের মাধ্যমে সম্পদকে অনেকগুণ বাড়ানো সম্ভব। সম্পদের পরিমাণ ও আয়ুষ্কাল নিম্নলিখিতভাবে বাড়ানো সম্ভবপর হবে—

(a) নিম্নমানের আকরিক ব্যবহার ঃ যেকোন কাঁচামালের গুণগত মান উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে বাড়ানো দরকার। যেমন ধৌত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কয়লার জ্বালানী শক্তি বাড়ানো হয়। খনিজ তেল শোধন করে তা থেকে বহুবিধ উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায়। ধৌতাগার, পরিশোধনাগার গড়ে তোলা হয়েছে, যেমন দুর্গাপুরে কয়লা ধৌতাগার, বারাউনী তেল শোধনাগার, বঙ্গাইগাঁও তেল শোধনাগার ইত্যাদি।

(b) বৈজ্ঞানিক ব্যবহার ঃ সম্পদের যথার্থ ব্যবহার করতে পারলে তা সম্পদের পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করবে। যতটা প্রয়োজন ততটাই ব্যবহার করতে হবে। সম্পদ ব্যবহার করার পর যা বর্জ্য (waste) সামগ্রী তা থেকে সম্ভব হলে উপজাত দ্রব্য (byproduct) সংগ্রহ করতে হবে। দরকার হলে সম্পদ সংরক্ষণ করতে হবে। সংরক্ষণ বলতে কোন জিনিস ব্যবহার না করা বোঝায় না, বোঝায় সম্পদের পরিমিত ব্যবহার (limited use) ও অপব্যবহার রোধ (checking misuse)। এছাড়া গচ্ছিত সম্পদের বিকল্প (alternate) থাকলেও ঐ বিকল্প সম্পদ যদি পুনর্ভব (renewable) সম্পদ হয়, তবে ঐ বিকল্প সম্পদই বেশী করে ব্যবহার করতে হবে। যেমন—চিরাচরিত শক্তি উৎসের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে আসছে বলে সৌরশক্তি, গোবর গ্যাসশক্তি বেশী করে ব্যবহার করার দিকে চেষ্টা চলছে। আমাদের দেশে যে পরিমাণ কয়লা আছে, তা আনুমানিক 100 বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। এজন্য স্টীম ইঞ্জিন, লোহা ও ইস্পাত শিল্প কিংবা রান্নার কাজে তার ব্যবহার কমিয়ে পরিবর্তে জলবিদ্যুৎ শক্তি, সৌরশক্তি ইত্যাদি বেশী করে ব্যবহার হচ্ছে।

(c) সম্পদের পুনর্ব্যবহার ঃ কোন বস্তু কিছুদিন ব্যবহারের পর অকেজো হয়ে পড়তে পারে বা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়তে পারে। তখন ঐসব দ্রব্যকে ফেলে না দিয়ে অন্যান্য কাজে লাগানো যেতে পারে। যেমন—ছেঁড়া কাগজের টুকরো, ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, চটকেও কাগজ তৈরির কাজে লাগানো হয়। যুক্তরাষ্ট্রের এক একটি গাড়ি এক থেকে দুবছর ব্যবহারের পর গাড়ির মালিক রাস্তাতেই গাড়ি ফেলে চলে যান। পরে ঐসব গাড়ি জাপান নিলামে কিনে নিয়ে গিয়ে নিজের দেশে লোহা ও ইস্পাত শিল্পে কাজে লাগায়। এইভাবে কোন অপুনর্ভব সম্পদের (যেমন লৌহ আকরিক) আয়ুষ্কাল কিছুটা বাড়ানো যায়।

(d) উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নত প্রয়োগের মাধ্যমে একদিকে যেমন সম্পদের অভাব মেটানো সম্ভব হয়, তেমনি সম্পদের আয়ুষ্কালও বাড়ানো যায়। আমরা আগেই জেনেছি যে সম্পদ কোন

বস্তু নয়, বস্তুর কার্যকারিতাই সম্পদ। কয়লা আগে মাটির নীচে চাপা পড়ে ছিল। কারিগরী উন্নয়ন ঘটলেই তাকে আমরা ব্যবহার করতে শিখেছি, ও তা সম্পদে পদবাচ্য হয়েছে। একইরকম ভাবে সম্পদের কার্যকারিতা উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে বাড়ানো সম্ভব। আগে 1 টন লোহা তৈরীতে 6 টন লৌহ আকরিক লাগত। এখন মাত্র 2 টন আকরিক লোহা থেকে সমপরিমাণ লোহা তৈরী হয়। আগে নীলের (dye) চাষ হত, এতে অন্য চাষের জমি পাওয়া যেত না। এখন নীলচাষ (indigo cultivation) গল্পকথা মাত্র। বাজারে নানা প্রকার কৃত্রিম নীল কেনা যায়। একই কথা খাটে রবারের (rubber) ক্ষেত্রে। ব্রাজিলের আমাজন অববাহিকায় বুনো রবারের (wild rubber) চাষ হত। সেখানকার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। এখন কারখানাতে কৃত্রিম রবার (synthetic rubber) তৈরী হচ্ছে। নীল ও রবার উভয় ক্ষেত্রেই এখন আগের চেয়ে কম দ্রব্য (stuff) ব্যবহার করে উৎপাদন বেশী পাওয়া যায়। আগে আবাদী প্রথায় নীল ও রবার চাষ করে যতটা উৎপাদন হত, বর্তমানে কারখানায় সমপরিমাণ দ্রব্য ব্যবহার করে বহুগুণ উৎপাদন পাওয় যায়।

(e) নতুন সম্পদ সৃষ্টি ঃ নতুন সম্পদের আবিষ্কার না হলে অপূরণশীল সম্পদের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তাই খনিজপদার্থের নতুন সঞ্চয় ভাণ্ডার আবিষ্কার করে সম্পদের পরিমাণ বাড়াতে হয়। আমাদের দেশে ONGC, GSI, BSI ইত্যাদি সংস্থা নতুন নতুন সম্পদ অনুসন্ধানে নিয়োজিত রয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই বহু সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা সম্পদ আহরণে নিয়োজিত হয়েছে (যদিও সাড়া জাগানোর মত আবিষ্কার এখনও সম্ভব হয়নি)। এর ফলে নতুন নতুন সম্পদ আবিষ্কৃত হচ্ছে, তাই সঞ্চয়ের পরিমাণ সদাপরিবর্তনশীল।

(f) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ঃ জনসংখ্যা দেশের এক বিরাট সম্পদ। জনসংখ্যার দিক দিয়ে চীন বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করলেও তা ঐ দেশের পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়নি। কারণ ঐ বিপুল সংখ্যক জনগণ দেশের বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত আছে। আর 100 কোটির দেশ ভারতে এই মুহূর্তে প্রায় কোটি বেকার, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু (1959) একবার বলেছিলেন ''Population control will not solve all problems, but other problems will not be solved without it''। 1986 সালের 13ই জুন জনসংখ্যা ও উন্নয়ন নিয়ে এক জাতীয় সম্মেলনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বলেছিলেন জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতের সবচেয়ে বড় সমস্যা। আজকের 100 কোটির দেশ ভারতে ফি-বছর জনসংখ্যা বাড়ছে 0.6% হারে, অর্থাৎ 60 লক্ষ করে। UNO-র Human Development-র প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে মাথা পিছু আয়, মৌলিক শিক্ষা ও

''The state of global equilibrium could be designed so that the basic material needs of each person on earth are satisfied and each person has an equal opportunity to realise his individual human potential''

গড় আয়ের সম্মিলিত (aggregate) মাপকাঠিতে (scale) 174টি দেশের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তানের স্থান যথাক্রমে 132 ও 138তম। প্রকৃতপক্ষে, এটাই উন্নয়নশীল দেশের সমস্যা। এই দেশগুলোতে জনসংখ্যা বাড়ছে অথচ সেই তুলনায় অর্থনৈতিক অগ্রগতি কম। আর এজন্যই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। মানুষের সংখ্যা কম হলে প্রাপ্ত সম্পদ অনেকদিন ব্যবহার করা যাবে। কারণ সে ক্ষেত্রে কম সম্পদের ব্যবহার হবে। পক্ষান্তরে জনসংখ্যা যদি ফি বছর দ্রুততালে বাড়ে, তাহলে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সম্পদকে সেই অনুপাতে বাড়ানো প্রয়োজন। অন্যথায় মাথাপিছু সম্পদের ব্যবহার কম হবে ও এক সময় সম্পদ সংকট দেখা দেবে।

উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়াও খনিজ সম্পদ উত্তোলনের সার্বিক পরিকল্পনা, পরিবেশ দূষণ, উৎপাদিত শস্যের সঠিক বন্টন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পদের সম্ভাবনা বাড়ানো যায়।

মেডোজ ও মেডোজের বক্তব্য হল সম্পদ হ্রাসজনিত কারণে মানুষের সম্ভাব্য বিপর্যয়কে ঠেকানো তখনই সম্ভব হবে যখন মানুষ নিজে তার প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের সুস্থিতি সম্বন্ধে সব দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, নীচতা ঝেড়ে ফেলে গোটা বিশ্ব জুড়ে এক সাম্যের অবস্থা (global equilibrium) তৈরী করবে যেখানে পৃথিবীর সব মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় যোগান অব্যাহত থাকবে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশ ঘটবে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ বিপুলা পৃথিবী ও সুন্দরী জন্মভূমি ধরিত্রীমাতার বুক থেকে বিচ্যুত হতে ইচ্ছুক নয়। অতীতেও বাধা এসেছে, ভবিষ্যতেও বাধা আসবে। বিশ্বপ্রকৃতিকে ব্যবহার করেও বাধা পেরিয়ে মানুষ পথ করে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে থাকবে।+

6.6 সম্পদ সংরক্ষণ (Resource of Conservation)

সম্পদ সংকট (Resource Crisis) থেকে সম্পদ সংরক্ষণ ধারণা এসেছে। সংকট থাকলেই মানুষ সংকট থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজবে এবং একসময় সম্পদ সংরক্ষণকে সংকট থেকে মুক্তির পথ হিসাবে বেছে নেবে। আমরা আগেই জেনেছি যে পৃথিবীতে সম্পদের অভাব নেই। হয়ত এ প্রজন্মের জন্য অফুরন্ত সঞ্চয় রয়েছে। কলসীর জল বারবার পান করতে একদিন যেমন শেষ হয়ে যায়, তেমনি খনিজ সম্পদ বারবার ব্যবহার করায় পৃথিবীতে একদিন গচ্ছিত সম্পদের ভাড়ারে টান পড়বে। ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রতি দায়বদ্ধতা (social responsibility) থেকেই সম্পদ সংরক্ষণ আমাদের করতেই হবে।

সংরক্ষণের যথার্থ অর্থ নিয়ে অর্থনীতিবিদ ও সম্পদ বিশারদদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। সংরক্ষণের সংজ্ঞা স্থান, কাল, পাত্র ভেদে ভিন্ন হয়। বড় বড় ব্যবসায়ীরা মুনাফা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। যত বেশী সম্ভব সম্পদ আহরণ করা যাবে ততই তার লাভ হবে। তার কাছে আগামী প্রজন্মের দাম খুব কম। পক্ষান্তরে একজন পরিবেশবিদ ভবিষ্যত নিয়ে মাথা ঘামান। খনি থেকে যথেচ্ছ পরিমানে কয়লা তুলে নিয়ে তা মাটি,

বালি দিয়ে ভরাট না করলে খনির ওপরকার মাটি একদিন ধসে যাবে—এ বিষয়ে খনির মালিকদের চিন্তা থাকে না। কিন্তু পরিবেশবিদ্, রাজনীতিবিদ্, পরিকল্পনাবিদরা এ নিয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামান। পশ্চিমবঙ্গের শহরের আশেপাশের কয়লাখনি থেকে অপরিকল্পিতভাবে কয়লা তুলে নেওয়া হচ্ছে এবং সেই সব খনিগর্ভ বালি, মাটি দিয়ে ভরাট করা হচ্ছে না বলে গোটা শহর ও তার আশেপাশের এলাকা বিপজ্জনক হয়ে পড়ছে।

সংরক্ষণ বিষয়টি দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা চলে। এক সমাজ বিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে, ও দুই প্রকৃতিবিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে। সমাজবিজ্ঞানীরা সম্পদ নিঃশেষ হওয়ার দিক থেকে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে বিশ্লেষণ করেন, আর প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা অপচয়ের দিক থেকে বিষয়টি বিচার করেন। আবার একজন ব্যবসায়ী বা অর্থনীতিবিদ যেভাবে অপচয় নিয়ে ভাবেন, একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানী সেভাবে ভাবেন না। ব্যবসায়ীরা ভাবেন অপচয় হলে উৎপাদন খরচ বেশী পড়বে। আবার উৎপাদন খরচ বেশী হলে ঐ দ্রব্যাদি প্রতিযোগীতার বাজারে টিকবে না। Ely (এলি)-র মতে সংরক্ষণ হল আগামী প্রজন্মের জন্য বর্তমান প্রজন্মের ত্যাগ। ‘‘Conservation means a sacrifice of the present generation for future generation’’ (Ely quoted Lay Zimmermann)। অর্থনীতিবিদ L.C. Gray মনে করেন সংরক্ষণ হল প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের জন্য ছাড়ের সঠিক হার নির্ণয়। (Conservation) ‘‘is the determination of the proper rate of discount on the future with respect to the utilisation of our natural resources’’ কেউ কেউ বলেন সংরক্ষণ হল বিজ্ঞ ব্যবহার (wise use)। তবে কিনা এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। কারো কারো মতে সংরক্ষণ হল অপ্রয়োজনীয় অপচয় নিবারণ (elimination of needless waste)। অনেকে সংরক্ষণ বলতে মিতব্যায়িতা (economisation)-কে বোঝান। কিন্তু সংরক্ষণ ও মিতব্যায়িতা এক নয়, সংরক্ষণ বলতে বোঝায় কম করে ব্যবহার। যার ফলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের শেষে অপেক্ষাকৃত কিছু পরিমাণ সম্পদ সঞ্চয় থাকবে। আর মিতব্যায়িতা হল বিচার বিবেচনার সাথে ব্যবহার। পরিবর্ত দ্রব্য (substitutes) ব্যবহারের ফলেও মিতব্যায়িতা ঘটতে পারে। কিন্তু মিতব্যায়িতার ফলে যদি উৎপাদন ও ভোগ বাড়ে, সেক্ষেত্রে মিতব্যায়িতা সম্পদ সংরক্ষণকে বোঝায় না।

সংরক্ষণের মোদ্দা কথা হল প্রয়োজনের তুলনায় যে জিনিসের যোগান অল্প, ভবিষ্যতের জন্য তার কিছুটা সঞ্চয় করে রাখা। আর তা করতে দরকার তার (ঐ দ্রব্যের) সুপরিকল্পিত, বিচক্ষণ, দক্ষ ব্যবহার, যাতে বর্তমানের অদূরদর্শী কাজ ভবিষ্যকে বঞ্চিত না করতে পারে। আর এজন্য দরকার সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবহারের সঠিক হার বজায় রাখার ব্যবস্থা। আর এই ব্যবস্থা করার জন্য সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে সর্বাধিক মানুষের চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়। এজন্য যা প্রয়োজন তা হল—

1) বিচার বিবেচনা করে ব্যবহার।

2) অপচয় নিবারণ

3) সংযম।

4) ভবিষ্যত প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত থাকা ও ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা।

5) সঞ্চয়ের পরিমাণ সম্বন্ধে জ্ঞান।

6) সম্পদের প্রকৃতি অর্থাৎ তা গচ্ছিত না প্রবহমান এ সম্পর্কে জ্ঞান।

7) বিচ্ছিন্ন ব্যবহার, গচ্ছিত সম্পদের বদলে প্রবহমান সম্পদের ব্যবহার।

জিমারম্যানের মতে Conservation involved a reduction of the rate of disappearance or consumption and corresponding increase in the unused surplus, left at the end of a given period। অর্থাৎ সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবহারের সঠিক হারই সংরক্ষণের প্রধান আলোচ্য। "The fundamental issue of conservation is the proper rate of expolitation and utilisation of resources. In the problem of conservation, the conflict between group and individual, between solid and private interest, finds its most piognant expression"। অর্থাৎ সংরক্ষণ সমস্যায় গোষ্ঠী ও ব্যক্তি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘর্ষের চরম প্রকাশ ঘটে। কারণ ব্যক্তি বেশী ভোগের স্বার্থে নিয়োজিত। উৎপাদন ব্যবস্থায় বেশী সম্পদ ব্যবহার করলে লাভ বাড়বে কিন্তু লাভের জন্য জাতীয় স্বার্থ বা গোষ্ঠী স্বার্থ ত্যাগ করা উচিত নয়। কোন গচ্ছিত সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার করলে ভাণ্ডার একদিন খালি হয়ে যাবে। তখন দেশ ও জাতি অসুবিধেতে পড়বে। "Conservation is any act reducing the rate of consumtion or exhaustion for the avowed purpose of benefiting posterity"। ভাবী প্রজন্মের জন্য নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ। তবে শুধু ত্যাগ স্বীকারের মধ্যেই সম্পদ সংরক্ষণ হয় না। এজন্য দরকার (i) সম্পদ উৎপাদন ও ব্যবহারের উপযুক্ত হার নির্ধারণ করা, (ii) সম্পদের অপচয় বন্ধ করা, (iii) বিবেচনার সাথে সম্পদের ব্যবহার (iv) সম্পদের কার্যকারিতা বাড়ানো, (v) মিতব্যায়িতা ও (vi) সম্পদের চাহিদা, যোগান ও ব্যবহারে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী।

6.6.1 সম্পদ সংরক্ষণের তাৎপর্য (Significance of Conservation)

Odum (E.P. Odum) তার Fundamental of Ecology-তে সম্পদ সংরক্ষণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে এটির দুটি গুণগত তাৎপর্য হয়েছে। যথা (i) পরিবেশের গুণগত মান বজায় রাখা

(To ensure the preservation of a quality environment), (ii) সম্পদের আহরণ ও নবীকরণের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে প্রয়োজনীয় গাছপালা, জীবজন্তু ও পণ্যসামগ্রীর যোগান অটুট রাখা (To ensure a continuous yield of useful plants, animals and materials by establishing a balanced cycle of harvest)। এছাড়া সম্পদের খরচ নিয়ন্ত্রিত করা, আগামী প্রজন্মের জন্য সম্পদ গচ্ছিত রাখা, সম্পদের কার্যকারিতা বাড়ানো এবং এইসব কাজে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারও সম্পদ সংরক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য।

6.6.2 সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (Need for conservation of resources)

আমরা জানি যে অবিরত ব্যবহারের ফলে যে কোন প্রকার সম্পদ (গচ্ছিত বা প্রবহমান) একদিন না একদিন ক্ষয় হবেই। গচ্ছিত সম্পদ আকরিক লোহার কথা ধরা যাক। একদা যুক্তরাষ্ট্রের (লোহা) আকরিক উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ অঞ্চল মেসাবি ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে নিঃশেষিত হয়ে এসেছে। মাছ হল একটি প্রবহমান সম্পদ। কিন্তু যথেচ্ছ শিকারের ফলে জাপানের উপকূল থেকে সার্ডিন মাছের ব্যবহার দারুণভাবে কমে এসেছে। একই কথা নরওয়ে-সুইডেন উপকূলের কর্ড-হেরিং মাছ সম্পর্কে। বনভূমি একটি পুনর্ভব সম্পদ। কিন্তু ভারতবর্ষে অনিয়ন্ত্রিতভাবে গাছ কাটা এবং সেই অনুপাতে বৃক্ষ পুর্নরোপন না করার জন্য অরণ্যের পরিমাণ দারুণভাবে কমে গেছে। হিসেব করে দেখা গেছে যে পৃথিবীর মোট ভূমিভাগের 33 শতাংশ বনভূমি আচ্ছাদিত থাকলে পরিবেশ দূষিত হবার আশঙ্কা কম থাকে। বন্যা, খরা ইত্যাদির আশঙ্কা কম থাকে, পৃথিবীর তাপীয় পরিস্থিতির স্থিতিবস্থা বজায় থাকে। এছাড়া বনভূমি থেকে আমরা বহুবিধ উপকার পাই। তাই বলা চলে সম্পদ সংরক্ষণের ফলে (i) পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে; (ii) জৈব সম্পদের স্বাভাবিক বিকাশ অক্ষুণ্ণ থাকে, (iii) সম্পদ ছাড়া সব উন্নয়ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা, অর্থনৈতিক প্রগতি স্তব্ধ। সম্পদ ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন, (iv) সবচেয়ে বড় কথা হল এর দ্বারা সম্পদের ঘাটতি এড়ানো ও আগামী দিনের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয়।

সংরক্ষণের ঐতিহাসিক পটভূমি (Historical background of conservation) ঃ বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত সংরক্ষণ সম্বন্ধে মানুষের সুস্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। হয়ত তার দরকারও ছিল না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিয়েডার রুজভেল্টের আমলে (1905) মার্কিনীদের জন্য বাইরের দরজা বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করে। তখন থেকেই নেতৃবৃন্দ ভাবতে শুরু করেন কিভাবে দেশের প্রাপ্ত সম্পদের মধ্যেই জনগণকে পালন করা সম্ভব। (কুলিজ) ও (হুভার)-র শাসনকালে (1924-32) শান্তি ও যুদ্ধের ক্ষেত্রে খনিজ তেলের কথা ভেবে মহার্ঘ এই শক্তি সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংযম ও মিতব্যায়িতা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হয়। যদিও এই চিন্তাভাবনা তেলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না।

1930 সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার (economic depression) সময় যুক্তরাষ্ট্র 'New Deal' নামে এক নতুন পরিকল্পনা হাতে নেয়। ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের এই নতুন পরিকল্পনা সংরক্ষণের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করে। এই সময় সংরক্ষণ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করার পর প্রতিটি দেশই সম্পদ সংরক্ষণ নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকে। জাতি সংঘ (UNO) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার গুরুত্ব স্বীকৃতি পেল। সম্পদ হ্রাস বিলম্বিতকরণে বিভিন্ন সংস্থা গড়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রে Fish and Wildlife Service, ফিনল্যান্ডে Finnish League for the protection of Nature, ফ্রান্সে Conseil Nationale de la Protection de la Nature en France, ব্রিটেনে Forestry Conservation, Animal Welfare, সুইডেনে Swedish Society for the protection of Nature ইত্যাদি সংস্থা গড়ে উঠল। 1970 এর দশকে পরিবেশ দূষণ ও সম্পদ ধ্বংস নিয়ে অনেক আলোচনা সভা ও চুক্তি সম্পাদিত হয়। U.N.O.-র The World Health Organisation (WHO) ও The World Meteorological organisation (WMO) প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিভিন্ন দেশকে সতর্ক করে দিল। মানুষ ও প্রাণীজগতের সমস্যা নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রচার চালাতে লাগল। ভারতের গাড়োয়াল হিমালয় অঞ্চলে অরণ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে চিপকো (chipto) আন্দোলন, ইউরোপে গ্রীনপিস সংস্থা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে WMF, পরিবেশ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে 1972 এর 5ই জুন থেকে 10ই জুন স্টকহোমে UN Conference on Human Environment, 1992 সালে 3রা জুন থেকে 14ই জুন রিও-ডি-জেনিরোতে UN Conference on Environment and Development (UNCED) বা The Earth Summit সম্মেলন ইত্যাদি পৃথিবীব্যাপী সংরক্ষণ আন্দোলনের কিছু উদাহরণ। বিভিন্ন গণ মাধ্যমগুলো এ ব্যাপারে যত এগিয়ে আসে, সমাজের পক্ষে ততই মঙ্গল।

6.6.6 সম্পদ সংরক্ষণের নীতি ও পদ্ধতি (Resource Strategy and Principles of Resource Conservation)

সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত পন্থাগুলোর সাহায্য নেওয়া হয় (চিত্র 6.4)। তবে দেশ কাল ভেদে সম্পদ সংরক্ষণের পদ্ধতির কলাকৌশলে হেরফের ঘটতে পারে। সম্পদ সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো নিয়ে এবার আলোচনা করা হল—

(a) ব্যবহার হ্রাস বলতে বোঝায় যতটুকু দরকার ততটুকু ব্যবহার করা আর ততটুকুই উৎপাদন করা। অর্থাৎ অপচয় কমানোর মাধ্যমে ও অতিরিক্ত ব্যবহার কমিয়ে দিয়ে সম্পদ সংরক্ষণে সাহায্য করা। একে মিতব্যয়িতা বলা চলে।

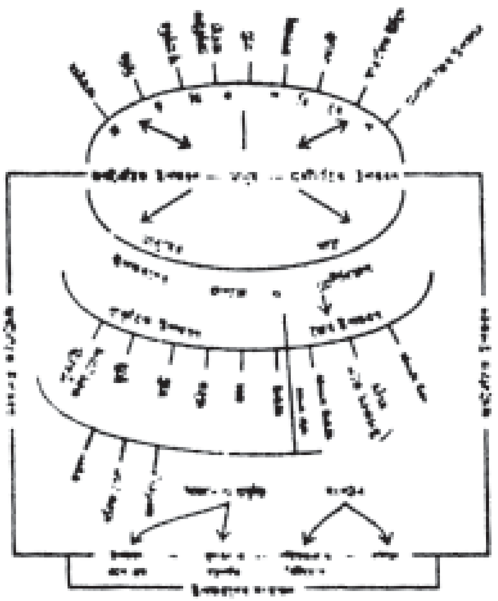

চিত্র 6.4

(b) বিচার-বিবেচনা করে ব্যবহার ঃ মিতব্যয়িতা থেকে আলাদা দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বস্তুটির ব্যবহার যতদূর সম্ভব সীমিত রাখা হয়। পক্ষান্তরে প্রথমটির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ঐ দ্রব্যটির ব্যবহার নয়, তার বিকল্প (substitute) থাকলে ঐ বিকল্প বস্তুটি ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে কিছুটা বিবেচনা করেই এগোতে হয়। কারণ কোন বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বিশেষ সম্পদও প্রয়োজন। একটি বিশেষ অবস্থার মধ্যে বিশেষ ধরণের সম্পদ উৎপাদন ও ব্যয় ও সামাজিক দায়বদ্ধতার দিক থেকে যুক্তিযুক্ত মনে হতে পারে। এক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণের ব্যাপারটাও স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে।

(c) সম্পদের পূনর্ব্যবহার ঃ সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে গচ্ছিত সম্পদের আয়ুষ্কাল আরও কিছুটা বাড়বে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে আয়রণ স্ক্র্যাপ বা লোহার ছাঁট ব্যবহার করে আকরিক লোহার আয়ুষ্কাল কিছটা বাড়ানো সম্ভব। পুরনো প্লাস্টিকের জিনিসপত্র থেকে প্লাস্টিকের নতুন জিনিস তৈরী, কিংবা পুরনো ছেঁড়া কাগজ থেকে নতুন কাগজ তৈরী করেও প্রকৃতিদত্ত কাঁচামালের ওপর চাপ কমানো যায়।

(d) খনি থেকে কয়লা বা লৌহ আকরিক উত্তোলন করতে গিয়ে কয়লা ও আকরিকর বেশ কিছু অংশ গুঁড়ো হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। প্রাচুর্যের দেশ যুক্তরাষ্ট্রে ফি-বছরে কোটি কোটি ডলার মূল্যের দ্রব্য আবর্জনা হিসেবে পরিত্যক্ত হয়। এ সম্বন্ধে আমরা আগেই জেনেছি। পুনঃস্থাপন (Recycling) পদ্ধতিতে ঐ সব পদার্থ থেকে নতুন দ্রব্য উৎপাদন সম্ভবপর। কিন্তু তা করা হয় না। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে গচ্ছিত সম্পদের পুনঃস্থাপন হয় না এবং সম্পদের অপচয় হয়।

কয়লা, খনিজ তেল ইত্যাদি গচ্ছিত সম্পদের ভাণ্ডার খুব সীমিত বলে এগুলোর ব্যবহারের ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকা দরকার। অপচয় রোধ করতে পারলে উৎপাদন খরচ কমবে। গচ্ছিত সম্পদের ভাণ্ডারের ক্ষতি কম হবে।

(e) উপজাত দ্রব্যের ঠিক মত ব্যবহার হলে যেমন দ্রব্যের ব্যবহারের পরিমাণ কমে যাবে, কয়লা থেকে প্রচুর উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায় আর বর্তমান যুগ তো পেট্রো রাসায়নিক যুগ। পেট্রোলিয়াম থেকে এত উপজাত দ্রব্যাদি পাওয়া যায় যে বলে শেষ করা যায় না। কোন বস্তুর উপজাত দ্রব্য ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে দেশ লাভবান হবে।

(f) অধিকারের ভিত্তিতে সম্পদ ব্যবহার করতে পারলে অনেক ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া যায়। কোন বস্তু বেশী ব্যবহার করব, কোন বস্তু কম ব্যবহার করব তা নির্ভর করে চাহিদা ও যোগানের সম্পর্কের ওপর। ঐ সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে অপেক্ষাকৃত বিরল সম্পদের বদলে অধিক প্রাপ্ত সম্পদের ব্যবহার (substitution of less scarce resource for more scarce one)। যেমন বলা চলে সৌরশক্তি ব্যবহার করলে যেখানে কাজ মেটে সেখানে সৌরশক্তি না ব্যবহার করা সঠিক হবে না।

(g) পরিবর্তদ্রব্য বা বিকল্প দ্রব্যের ব্যবহার সম্পদ সংরক্ষণে সাহায্যে করে। দুষ্প্রাপ্য সম্পদের বদলে সহজলভ্য সম্পদ, বা গচ্ছিত সম্পদের বদলে পুনর্ভব সম্পদের ব্যবহার বিকল্প ব্যবহারের মধ্যে পড়ে। যেমন, বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার ব্যবহার কমিয়ে জলশক্তি (hydel power) ব্যবহার করলে কয়লা সংরক্ষণ করা যাবে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার দিকে ঝোঁক ছিল। অতি সম্প্রতি আমাদের দেশের সরকার ছোট ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র (mini hydel plant) তৈরীর দিকে নজর দিয়েছে। উদ্দেশ্য হল ক্ষয়িষ্ণু কয়লা সম্পদকে বাঁচানো।

(h) প্রয়োগ নৈপুণ্য শক্তি সংরক্ষণের তথা সম্পদের উৎকর্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে। সরাসরি ব্যবহার না করে প্রযুক্তিগত সাহায্য নিলে (i) কোন দ্রব্যের উৎকর্ষতা বাড়ানো হয়। এটি সম্পদ সংরক্ষণেও সাহায্য করে। কয়লাকে জ্বালানী হিসেবে সরাসরি ব্যবহার না করে বিদ্যুৎ শক্তির মাধ্যমে ব্যবহার করলে কয়লার উৎকর্ষতা ও কার্যকারিতা বাড়ে। আবার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে (ii) শক্তি ব্যবহার সংক্রান্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে শক্তি সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। (iii) কারিগরী উৎকর্ষতা বাড়লে অপেক্ষাকৃত কম কাঁচামালে বেশী পরিমাণে শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করা সম্ভব। আগে 6 টন আকরিক লোহা থেকে মাত্র 1 টন লৌহ ইস্পাত উৎপন্ন করা হত। বর্তমানে 2 টন আকরিক লোহা থেকে প্রায় সমপরিমাণ ইস্পাত উৎপাদন সম্ভব।

(i) সম্পদের পুনঃস্থাপন সম্পদ সংরক্ষণে সাহায্য করে। কিছু কিছু সম্পদ আছে যেগুলো পুরণশীল। অর্থাৎ ব্যবহারের সাথে সাথে পুনরায় উৎপাদন ব্যবস্থা করা যেতে পারে। গাছ কাটার সাথে সাথে নতুন গাছ লাগালে, মাছ ধরার সাথে সাথে মাছ ছাড়ার ব্যবস্থা করলে, মুক্তা (Pearl) সংগ্রহের সাথে সাথে নতুন শুক্তির চাষ করলে সম্পদের কিছু কিছু সংরক্ষণ সম্ভব হবে।

(j) নানাবিধ সামাজিক প্রকল্প (social projects) একদিকে যেমন বর্তমান ও আগামী দিনের সম্পদ সৃষ্টির পথ সহজ করবে, অপরদিকে তা তেমনি ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানে সম্পদ সংরক্ষণে সাহায্য করবে। সামাজিক বনসৃজন (social forestry) প্রকল্প থেকে একদিকে যেমন কাঠের যোগান পাই, অপরদিকে তা তেমনি ভূমিক্ষয় রোধ করে জমির উর্বরতা বাড়ায়, এতে ফসলের উৎপাদন বাড়ে ও খরা প্রবণতা রোধ সম্ভব হয়। Food for work বা কাজের বদলে খাদ্য ইত্যাদি প্রকল্পে গ্রামে রাস্তাঘাট তৈরী করা হয়। এইভাবে

প্রত্যন্ত এলাকা শহরের সাথে যোগাযোগের সুযোগ পায় যা গ্রাম ও শহর উভয়ের আর্থিক সম্পদ বাড়াতে সাহায্য করে।

(k) উৎপাদন বিশেষীকরণের (specialisation) মাধ্যমে শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ে। আর দক্ষ শ্রমিকের হাতে সম্পদ উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়।

(l) সাধারণভাবে সম্পদ সংরক্ষণের জন্য অভিন্ন নীতি গ্রহণ করা হলেও সম্পদ সংরক্ষণের কার্যকারিতার সার্থক রূপায়ণের জন্য সংরক্ষণ নীতি চালু হওয়া দরকার। ভিন্ন ভিন্ন সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সংরক্ষণ নীতি হওয়া দরকার। পরবর্তী অংশে বিশদ আলোচনায় আমরা দেখব যে অরণ্য, মৎস, খনিজপদার্থ ইত্যাদি ভিন্ন ধর্মী সম্পদের সংরক্ষণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করতে হয়। যেমন, কয়লা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ঐ বস্তুর অপচয় রোধ ও মিতব্যায়িতায় যথেষ্ট ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যেখানে উড়োজাহাজ বা মোটরগাড়ি চালাতে হবে, সেখানে তেলের ব্যবহার কমালে চলবে না। অরণ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বন কাটার পাশাপাশি নতুন বনসৃজন করতে হবে।

(m) সংরক্ষণ বৈচিত্র কেবলমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ প্রয়োজন নয়, শ্রম ও মূলধনের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য, কারণ প্রাকৃতিক সম্পদের বিকল্প হল শ্রম ও মূলধন যাদের স্থানান্তরের (transfer) ওপর কোন রকম নিয়ন্ত্রণ সম্পদ সংরক্ষণের পরিপন্থী (তারকাসূধন ঘোষ : সম্পন্ন অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা)।

(n) রেলপথের ভাড়ার হার কম থাকলে একস্থান থেকে অন্যস্থানে সহজেই পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়। দ্রুত পণ্য পরিবহন সম্পদ সংরক্ষণের সুবিধে করে দেয়। “The reformation of railway rate structure affords a most fertile field for conservation activities” অর্থাৎ রেলশুল্ক হারের গুণবিন্যাস সংরক্ষণের উর্বর ক্ষেত্র (Ely)।

(o) আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্পদ সংরক্ষণের এক বড় ভূমিকা নেয়। উন্নত দেশগুলো কারিগরী ও প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে সংরক্ষণ করার ব্যাপারে বেশ এগিয়ে আছে। উন্নত দেশগুলোর সাহায্য পেলে উন্নয়নশীল দেশগুলো যে এ ব্যাপারে যথেষ্ট লাভবান হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। হয়ত উন্নত দেশগুলো এতে প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে না, তবে পরোক্ষভাবে উপকৃত হতে পারে। কারণ বিকাশশীল দেশগুলো সম্পদশালী হলে তার ফল উন্নত দেশগুলোও ভোগ করবে।

(p) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে স্বভাবতই সম্পদ উদ্বৃত্ত হবে। কারণ জনতার চাপ কমে গেলে সম্পদের চাহিদা কমে যাবে। এতে করে সম্পদ সংরক্ষণ ভালো হবে। তাই সরকারের উচিত জন্ম নিয়ন্ত্রণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যেখানে সম্পদ সীমিত, অথচ জনসংখ্যা সেই তুলনায় অত্যন্ত বেশী।

(q) পৃথিবীতে সম্পদের সর্বাধিক বিনাশ ঘটে যুদ্ধের কারণে, বিশেষ করে আধুনিক সর্বগ্রাসী মহাযুদ্ধ। দুটি বিশ্বযুদ্ধে বহু সম্পদ ধ্বংস হয়েছে। যুদ্ধের ভয়াবহতায় বহু মানুষ পঙ্গু হয়ে গেছে। পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা মানুষের কর্মক্ষমতা নাশ করেছে। যুদ্ধ ছাড়া দাঙ্গা, বন্যা, ধস প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিপর্যয় সম্পদ নষ্ট করে। তাই এগুলির নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

(r) সুসংস্কৃত, উন্নত মানবিক গুণাবলী সম্পদ সংরক্ষণে সাহায্য করে। এ কাজের প্রধান ভূমিকা নিতে পারে শিক্ষার প্রসার। মানুষ যত সংস্কৃতি মনস্ক হবে, ততই সে সম্পদ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

(s) সম্পদ সঠিকভাবে বন্টন করে যেখানে যতটা দরকার, সেখানে প্রয়োজন মত যোগানের ব্যবস্থা করে সংরক্ষণ পদ্ধতিকে দ্রুত করা যায়।

বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য সম্পদ সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন। এজন্য যথোপযুক্ত নীতি নির্ধারণ ও তার প্রয়োগ সুনিশ্চিত করতে হবে।

(t) সম্পদের উপযুক্ত সংরক্ষণের জন্য জনগণকে সংরক্ষণের সুবিধে ও প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝানো প্রয়োজন। জনগণের ঐকান্তিক সহযোগিতা ছাড়া কোন উদ্যোগই ভালোভাবে শেষ করা সম্ভব নয়। সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হলে জনগণই সংরক্ষণের কাজে এগিয়ে আসবে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সংরক্ষণ নীতি কার্যকর অসম্ভব।

ইদানীং পরিবেশ নিয়ে সর্বস্তরে একটা চেতনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই গুরুত্ব পেল সবুজ সংরক্ষণ ও জলাভূমি (wetland) সংরক্ষণ। জলাভূমি সংরক্ষণ থেকে আমরা কিছু কিছু সুবিধে পেতে পারি। যেমন ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডার (underground water storage) বাড়বে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, ভূমিক্ষয় রোধ করা যাবে। ঝড়ের প্রকোপ কমবে, জলপথ সম্প্রসারণ হবে, আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ হবে ও খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য হবে।

পঃ বঃ মৎস্য দপ্তরের হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে পূর্ব কলকাতায় ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় 10,000 জলাশয় ছিল। আজ সেই সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে প্রায় 3,500-এ। পূর্ব কলকাতার এইসব জলাভূমি ভরাট হয়ে যাওয়ায় ফি-বছর কলকাতায় বন্যা নামে। তাছাড়া ভেড়িগুলো বুজে যাওয়ার ফলে পূর্ব কলকাতায় নোংরা জলে মাছ চাষও কমে যাচ্ছে। নোংরায় নদী গর্ভ (বিদ্যাধরী নদী) ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ভেরীর মধ্যে নোংরা জল ঢুকে মাছের রোগ ছড়াচ্ছে।

রাজ্য মৎস্য দফতরের এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে গত এক বছরে (1999-2000) খোদ কলকাতাতেই 32 টি অভিযোগ জমা পড়েছে, হাওড়া থেকে 90 টি, উত্তর 24 পরগণা থেকে 85 টি, দক্ষিণ 24 পরগণা থেকে 43 টি এই ধরণের অভিযোগ জমা পড়েছে। এর থেকে বোঝা যায় পরিবেশ নিয়ে সাধারণ মানুষের সচেতনতা অনেক বেড়েছে। যদিও জলাশয় ও ভেড়ি বোজানোর কাজে সাফল্যের হার নিতান্তই কম।

জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য শুধুমাত্র একদিন (16ই জুন) জলাভূমি দিবস পালন করে কর্তব্য পালন সারলেই চলবে না। চাই মানুষের শুভ চেতনাবোধ। নচেৎ থানায় F.I.R. (First Information Report) হাজার করেও কোন ফল হবে না।

6.6.4 বিশেষ বিশেষ সম্পদ সংরক্ষণ (Conservation of specific resources)

এখানে বিশেষ বিশেষ সম্পদ বলতে আমরা বনভূমি, জল, কৃষিভূমি, মৎস্য ও খনিজের কথা বলছি। পৃথিবীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পদ সরবরাহের ক্ষেত্রে এগুলির সংরক্ষণ খুবই প্রয়োজনীয়। ধরাপৃষ্ঠের আজকের ও আগামী দিনের অগ্রগতির অনেকটাই নির্ভর করছে এদের সম্পদ সৃষ্টির ওপর।

6.6.4.5 বনভূমি সংরক্ষণ

পৃথিবীর মাঝখানে বনভূমির এই যথেচ্ছ ব্যবহার ঘটলেও ইদানীং মানুষ বনভূমির উপকারিতা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। বর্তমানে নতুন নতুন অরণ্য সৃষ্টি ও সংরক্ষণের পরিকল্পনা পৃথিবীর প্রায় সবখানেই নেওয়া হয়েছে। তবুও F.A.O.-এর এক হিসেবে (1998-99) দেখা যাচ্ছে যে, 1976 সালে পৃথিবীতে মোট অরণ্যের

পরিমাণ ছিল 423 কোটি হেক্টর। 1998-99 সালে তা দাঁড়িয়েছে 419.71 হেক্টর। অর্থাৎ বিগত 22 বছরে অরণ্যের পরিমাণ প্রায় 3.3 কোটি হেক্টর কমেছে (চিত্র 6.5)। পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের উপযোগী রাখতে হলে অরণ্যের সবুজকে আবার ফিরিয়ে আনা দরকার। বিভিন্ন দেশে অরণ্য সংরক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। আর এ কাজে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হল (চিত্র 6.5), যেমন—

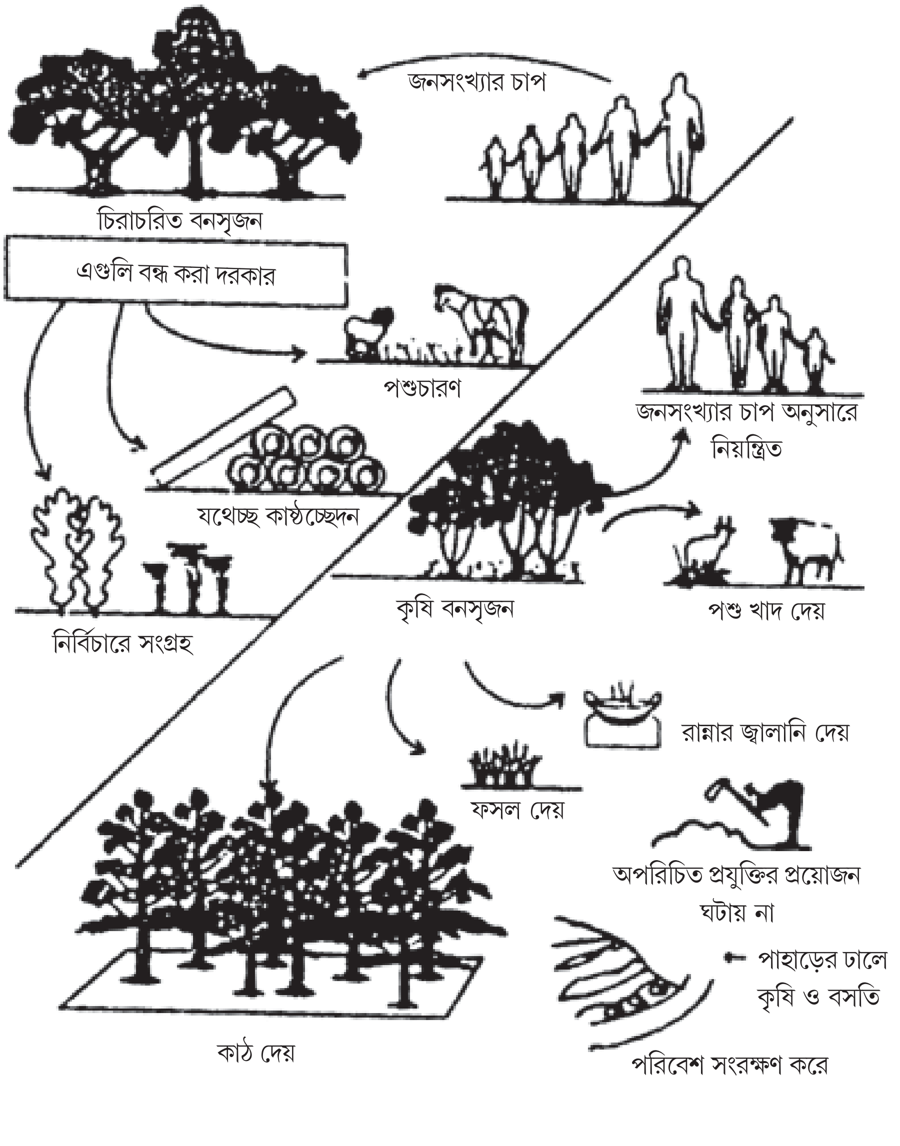

চিত্র 6.5

1. **দাবানল প্রতিরোধ ঃ** রাশিয়া ও কানাডা ফেডারেশনের বনাঞ্চলে মাঝে মাঝেই দাবানল সৃষ্টি হয়। কানাডার বনগুলোতে অল্প দূরত্বের ব্যবধানে দাবানল রোধ করার জন্য প্রহরা কেন্দ্র (watch centre) আছে। এইসব প্রহরাকেন্দ্রে খবরাখবর দেবার আধুনিক ব্যবস্থা, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রাদি রয়েছে।

2. **জীবজন্তু সংরক্ষণ ঃ** জীবজন্তু বাস্তুতন্ত্রের (ecology) খুব প্রয়োজন উপাদান। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার জাতীয় পার্কগুলোতে অরণ্য ও পশু সংরক্ষণ করা হয়। ভারতেও সংরক্ষিত বনভূমি, অভয়ারণ্য, মৃগদার গড়ে তুলে অরণ্য ও পশু সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যদিও এইসব অরণ্যের সংরক্ষণের ব্যবস্থা যথোপযুক্ত নয়।

3. **পতিত জমিতে বৃক্ষরোপণ ঃ** বিভিন্ন কারণে কৃষিজমি চাষের অযোগ্য হয়ে পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে বনসৃজন করে ভালো ফল পাওয়া যায়। এতে একদিকে যেমন ঐ জমির ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়, অন্যদিকে তেমনি বৃক্ষরোপণ করে ভবিষ্যতে কৃষকের লাভ হয়। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়াতে এইভাবে অনেক জমিকে বনভূমিতে পরিণত করা হয়েছে। ভারতের রাজস্থানেও এইভাবে বনভূমি সৃষ্টি করে মরুবিজয়ের চেষ্টা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া সামাজিক বন (social forestry) সৃজন প্রকল্পে ভারতের অনেক স্থানে নতুন বনভূমি সৃষ্টি করে আবহাওয়া নির্মল করার চেষ্টা হয়েছে, এছাড়া পুরনো অরণ্যের বদলে নতুন অরণ্য সৃষ্টি হয়েছে। এইসব অরণ্যের গাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে, তাই বিক্রী করে কৃষকরা লাভবান হয়।

4. **নিয়ন্ত্রিত পশুচারণ ঃ** ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি চরানোর জন্য নির্দিষ্ট পশুচারণ ভূমি থাকা দরকার, অন্যথায় পশুদের খুরে খুরে ভূমিক্ষয় হবেই। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে চারা গাছের বনভূমিতে আইন করে পশুচারণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

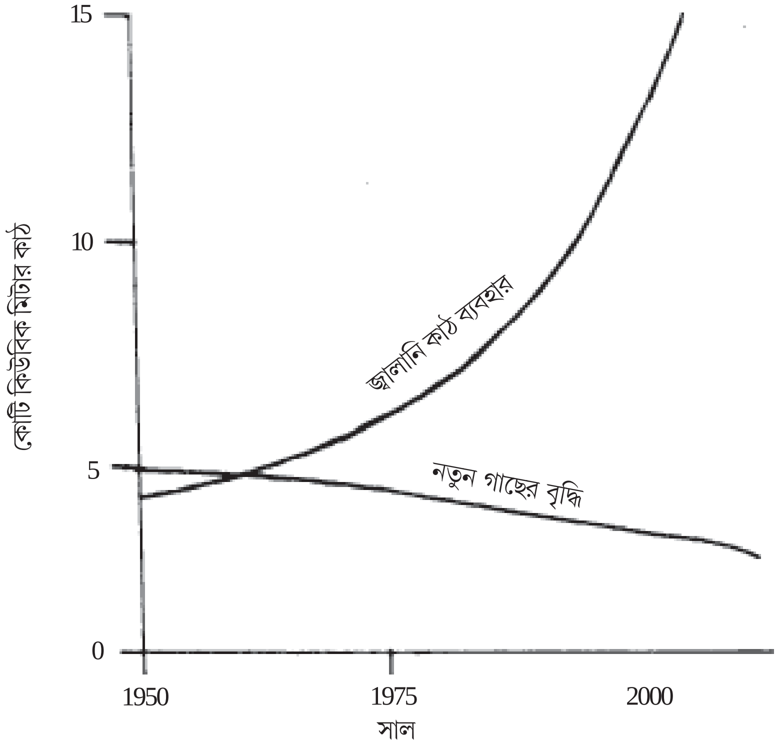

চিত্র 6.6 সুদানের কাঠ ব্যবহার ও উৎপাদন

উদ্ভিদ প্রাণবন্ত, চেতনাময়। একমাত্র উদ্ভিদই পারে দূষণমুক্ত বিশ্ব উপহার দিতে। এই নিয়েই শুরু হয়েছিল কয়েকটি সম্মেলন, আলোচনাসভা, আইন। নীচে সেগুলো তুলে ধরা হল—

- 1967 সাল। প্রথম পরিচ্ছন্ন বাতাস (clear Air) আইন চালু হল যুক্তরাষ্ট্রে।

- 1970 সাল। ওয়াশিংটনে World Watch Institute-এ বিশ্বের পরিবেশ বিজ্ঞানীরা জীবনপালনী পৃথিবীর ভয়াবহ দুর্দশা মোচনের উদ্দেশ্যে পালন করেন প্রথম পৃথিবী দিবস।

- 1972 সাল। পরিবেশ পরিকল্পনায় গড়ে উঠল জাতীয় কমিটি। দেশে দেশে দূষণ দমন, পরিবেশ ভারসাম্য সংরক্ষণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হল।

● 1979 সাল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের 11 টি দেশ পারস্পরিক পরিবেশ রক্ষার্থে চুক্তিবদ্ধ হল। Global Environmental Monitoring System, International Register of potential chemicals-এর প্রচেষ্টা হয়।

● 1990 সাল। পৃথিবীর 120 টিরও বেশী দেশে 'পৃথিবী দিবস-1990' গুরুত্ব সহকারে পালিত হল।

● 1992 সাল। উন্নত ও উন্নয়নশীল পৃথিবীর 166 টি রাষ্ট্রের পরিবেশবিদ, মন্ত্রী, শীর্ষস্থানীয় নেতা এবং প্রতিনিধিদের নিয়ে ব্রাজিলের রাজধানী রিও-ডি-জেনেরিওতে বসুন্ধরা সম্মেলন (Earth Summit) অনুষ্ঠিত হল।

এছাড়া বনভূমি সংরক্ষণে **(5)** পরিত্যক্ত খনি এলাকায় বনভূমি সৃষ্টির কাজে হাত দেওয়া, **(6)** অপরিণত গাছ যাতে না কাটা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা, **(7)** কীটনাশক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যের নিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ, **(8)** আইন প্রণয়ন ও আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও আইন লঙ্ঘনকারীর শাস্তি বিধান, **(9)** আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে বৃক্ষছেদন, যাতে আশেপাশের গাছের কোনরকম ক্ষতি না হয়, **(10)** সামাজিক সচেতনতা বাড়ানো দরকার।

6.6.4.2 জলসম্পদ সংরক্ষণ

জলের আর এক নাম জীবন। শুধু মানুষ নয়, পশুপাখী, জীবজগতের কাছেও জল জীবনধারণের প্রাথমিক শর্ত। দিন শুরু হওয়ার সাথে সাথে সবার আগে জলের খোঁজ পড়ে। কিন্তু কেন্দ্রীয় জলসম্পদ দপ্তরের 1999-2000 সালের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে 1955 সালে মাথাপিছু যে জল পাওয়া যেত এখন তা কমে এক তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়েছে। অতি সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে বর্ষার জলে চাষ শীর্ষক দুদিন ব্যাপী এক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করার সময় প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এই আশঙ্কা করেছেন যে আগামী 25 বছরে গোটা পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে বেশী জলাভাব দেখা দেবে ভারতে। প্রতি তিনজনের মধ্যে একজনকে নির্জলা থাকতে হবে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে ভারতে জলসম্পদ যা মজুত

আছে তা আগামী 25-30 বছরে ভয়াবহ সংকট ডেকে আনতে পারে। স্বাধীনতার 52 বছর পরেও আমাদের দেশে পানীয় ও সেচের খালের সমস্যা তো মেটেই নি বরং হু হু করে বেড়ে চলেছে। জলসম্পদের এই সংকটের কারণ হল একদিকে যেমন জনসংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে তেমনি বাড়ছে নগরায়ণ (urbanisation) ও শিল্পায়ণ (Industrialisation) সেই সঙ্গে বেড়েছে জমির ওপর চাপ। বিশেষ করে বোরো ধানের মরসুমে সেচের জন্য জলের ব্যবস্থা করতে হবে।

আগে শহর (urban) ও গ্রামের প্রতিটি পরিবার নিজের ঘরবাড়ি তৈরীর আগে জলের ব্যবস্থা করত, গ্রামাঞ্চলে উৎসব অনুষ্ঠানে পুকুর বা দিঘী কাটা হত। পুণ্যিপুকুর ব্রত হল এইরকমই এক অনুষ্ঠান। কৃষি জমির মালিকেরা জমির এককোণায় বা মাঝখানে সেচের জন্য পুকুর বা জলাধার তৈরী করতেন। *শহরে কুয়ো বা ইদারা খোঁড়া হত। কিন্তু গত কয়েক দশকে ভারতের জল সম্পদের বাহ্যিক অবস্থা পাল্টে গেছে।** কৃষিজমি ও বাসভূমি সম্প্রসারণের জন্য নির্বিচারে অবণ্য ধ্বংস হয়েছে, ফলে বৃষ্টি কমে গেছে। এর জন্য যোগ হয়েছে সেচ তথা পানীয় জলের (শহরে) জন্য গভীর নলকূপ বসিয়ে যথেচ্ছভাবে জল তোলা। ফলে ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে গেছে।***

আজ ভেবে দেখার সময় এসেছে যে জল সম্পদ সীমিত। জল বিনে পয়সার সম্পদ এই ধারণা দূর করতে হবে। আর এজন্য দরকার জলের অপচয় বন্ধ করা। (i) শহরে কলের মুখ এমনভাবে লাগাতে হবে যাতে, জল নেওয়া হয়ে গেলেই তা বন্ধ হয়ে যায়, (ii) পৌরসভার বাড়ির কলগুলোতে মিটার লাগাতে হবে, (iii) যেখানে সেখানে গভীর নলকূপ খোঁড়া চলবে না। ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডার পরীক্ষা করে তবেই

---

* এখনো পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে অনেক কুয়ো বা জলাধার দেখা যায়।

** আমাদের দেশে অনেক স্থানে পানীয় জল সংগ্রহের জন্য গ্রামের মানুষকে মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয়, অন্যদিকে তেমনি শহরে লক্ষ লক্ষ গ্যালন জল নষ্ট হয়ে যায়।

*** এতে খরা হচ্ছে, গুজরাট, রাজস্থানে সাম্প্রতিক (2000 সন) খরা ভূ-গর্ভস্থ জলস্তর নেমে যাওয়ার ফলে।

পুরসভা এ ব্যাপারে অনুমোদন দেবেন। সবচেয়ে ভালো হবে যদি (iv) পুরসভা প্রতিটি বাড়িতে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা করেন। ব্যাপকভাবে জল তোলার জন্য জলস্তর নেমে যাবে ও আগামী দিনে শহর বসে যেতে পারে, (v) এছাড়া ব্যাপকভাবে বনভূমি সৃষ্টি করতে হবে, ফলে একদিকে যেমন পরিবেশ নির্মল হবে, অপরদিকে তেমনি ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডার বাড়বে। (vi) নদীতে মিষ্টি জলের সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হবে, এজন্য যত্রতত্র বাঁধ দেওয়া চলবে না। (vii) নদীর উৎস মুখে ভেড়ি বানানো চলবে না, (viii) নদীতে কারখানার বর্জ্য পদার্থ ফেলা চলবে না, এজন্য কঠোর আইন বলবৎ করতে হবে।

পঃ বঃ বনদপ্তরের সুন্দরবনের বায়োস্ফিয়ার বিভাগ, রিমোট সেন্সিং বিভাগ, সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প, কেন্দ্রীয় সরকারের বনদপ্তর একযোগে সমীক্ষা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে সুন্দরবনের বনাঞ্চলে আগে যে মিষ্টি জল আসত সেটি বন্ধ হয়ে গেছে। মাতলা নদীর জলের প্রবাহ কমেছে ও গঙ্গার প্রবাহ বাংলাদেশের দিকে সরে যাচ্ছে এবং সেদিকে মিষ্টিজলের যোগান বাড়ছে। মিষ্টি জলপ্রবাহ কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় যত্রতত্র নদীবাঁধ দিয়ে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চিংড়ি চাষের জন্য আটকানো হচ্ছে বৃষ্টির জল, ফলে তৈরী হচ্ছে মারণাত্মক পরিবেশ সমস্যা, ব্যাপকভাবে বাড়ছে ভূমিক্ষয়। নদীর নাব্যতা আরও কমেছে, নদীর চোরা স্রোত ক্ষয় করছে একের পর এক গ্রাম।

মিষ্টি জলের উৎস নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সুন্দরবনের সব থেকে ঘন অংশে ইতিমধ্যেই জঙ্গল কমে গিয়েছে। নদীগুলোর একাংশ মাঝপথেই মজে গিয়েছে, অন্যগুলোতে জলধারণ ক্ষমতা কমে গিয়েছে তাই শুধু সমুদ্রের জলই ভেজাচ্ছে এই অঞ্চলের মাটি আর তাতে মাটিতে নুনের ভাগ বেড়ে গেছে। ফলে জঙ্গলের জীবনচক্রের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। সুন্দরবনের সব থেকে লম্বা সুন্দরী গাছের সংখ্যা এবং বৃদ্ধির হার ভীষণভাবে কমে গিয়েছে। অনেক গাছ মরে গিয়েছে, নতুন গাছের বৃদ্ধি ঘটছে না। জঙ্গলের গভীরতা কমে যাওয়ায় বাঘ সহ অন্যান্য প্রাণী বাংলাদেশের সুন্দরবনের দিকে চলে যাচ্ছে।

— উৎস ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ই জুন, ২০০২।

(ix) কৃষিজমিতে যতদূর সম্ভব কীটনাশক কম ব্যবহার করতে হবে। কারণ বৃষ্টির জল ধুয়ে ঐসব পদার্থ ভূগর্ভস্থ জলে মিশে আর্সেনিকের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে, (x) Watershed Management বা জলবিভাজিকা

> এ প্রসঙ্গে রাজস্থানের থানাগাজি ব্লকের ভাবতাঁ-কোলিয়ালা গ্রামের কথা স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। এখানকার গুজ্জার উপজাতির লোক পশুপালক; অথচ গরু, ভেড়া, ছাগলের চরে খাবার মাঠ ছিল না, ফলে তাঁরা 4-5 মাস ধরে মহারাষ্ট্র, গুজরাটের বিভিন্ন জায়গায় পশুর পাল নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। কিন্তু একশ বছর আগেও আরাবল্লীর গা-ঘেঁষা এই গ্রামে এই অবস্থা ছিল না। আশির দশকে সভা, সমিতি করে কয়েকজন উৎসাহী যুবক বৃদ্ধদের কাছ থেকে জলব্যবস্থার পুরনো রীতিনীতি জেনে জোহড় তৈরী শুরু করলেন। জোহড় হল কাদা আর পাথর দিয়ে গাঁথা ছোট ছোট পাঁচিল, আড়াই তিন হাত উঁচু, লম্বায় দশ হাত থেকে আড়াইশো হাত। মাঠের ঢাল বেয়ে জায়গায় জায়গায় গাঁথা এই ছোট বড় পাঁচিল দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া বৃষ্টির জলকে সাময়িকভাবে বাধা দেওয়া হয়। জলের সাথে ভেসে যাওয়া মাটি জোহড়ে আটকে দ্রুত ঘাস গজাতে সাহায্য করে। এইভাবে মাটির উচ্চতাও বাড়তে থাকল। ভূমিক্ষয় রোধ হল। আর বৃষ্টির জল বছরের পর বছর মাটির নীচে চলে যাওয়ায় ভূ-জলের স্তর উঠে আসে অনেক ওপরে। এছাড়া ছোট ছোট স্রোতস্বিনী, যাতে বছরে 40-50 দিন জল থাকত, এখন সেগুলোতে সারা বছর জল থাকে। নদী জল ব্যবহারের বিধিনিয়ম ও নদীর ভালমন্দ সম্পর্কে গড়ে উঠেছে আরাবলী নদী সংসদ (River Parliament)। সেচের কল্যাণে নদীর দুপাশে ফসলের ক্ষেত জেগে উঠেছে। ভাবতাঁ কোলিয়ালার মানুষকে এখন গ্রাম ছেড়ে বাইরে যেতে হয় না।
>
> সূত্র ঃ মরুভূমিতে সোনার ফসল—জয়া মিত্র, আনন্দবাজার পবিত্রা, ১৯শে এপ্রিল, ২০০০।

পরিকল্পনা আরও জোরদার করতে হবে, যাতে প্রকৃতির সাথে সংঘাতে না গিয়েও প্রকৃতির দান জলকে আরও সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা যায়। বিশ্বের মোট জলের 0.3 শতাংশ ব্যবহারযোগ্য।

6.6.4.3 মৎস্য সংরক্ষণ (Conservation of fish) ঃ

মাছ প্রবহমান পূরণশীল সম্পদ হলেও তার বাড়বৃদ্ধি প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটে থাকে। ফলে প্রজননক্ষমতা লাভ করার আগে ছোট মাছ ধরা হলে, মাছের ঘাটতি দেখা দিতে বাধ্য। মাছ এক সাথে অনেক ডিম পাড়ে, বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, একটি হেরিং মাছ 1 লক্ষ ডিম পাড়ে, কড মাছ 50 থেকে 100 লক্ষ ও শুক্তি 600 লক্ষ ডিম পাড়ে। এই ডিমের কিছু অংশ ছোট ছোট মাছ, প্লাঙ্কটন খেয়ে ফেলে। আবার ডিম পাড়ার আগেই অনেক মাছ ধরা হয়। একসময় মনে করা হত সমুদ্রের মাছ অফুরন্ত। বর্তমানে মাছ ধরার সূক্ষ্ম জাল ও আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহারের ফলে মানুষ যথেচ্ছভাবে মাছ শিকার করছে। আধুনিককালে জলদূষণ ও সমুদ্রবক্ষে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোয় মাছের সংখ্যা কমেছে। ফলে কিছু কিছু অংশে দ্রুতহারে মাছের সংখ্যা কমে আসছে যাকে মৎস্য হ্রাস বা মৎস্য সম্পদের অবক্ষয় বলা হয়। সমুদ্রবিজ্ঞানী David Cushing-র মতে (Fisher's resources of the sea and their management) প্রধানতঃ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সমুদ্রে এই সংকট দেখা দিয়েছে। *লোকালয় থেকে দূরে অবস্থান এবং অত্যাধিক শীতের দরুণ এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় এখনও বহু মৎসক্ষেত্র অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। বিজ্ঞানী (Graham(ed)-র মতে (Sea Fisheries : Their investigation in the United Kingdom) ক্রান্তীয় অঞ্চলও উচ্চাংশের উর্বর সমুদ্রের মত মাছের উৎপাদনে সমান দক্ষ (The greater depth of light penetration and higher temperatures of the tropics may render production there almost as efficient as some areas in high latitudes)। সংরক্ষণের পদ্ধতি হল—

(1) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিবিধ জাতের মাছের অভ্যাস ও জীবনযাত্রা প্রণালীর বিশ্লেষণ।

(2) যথেচ্ছ মাছ শিকার বন্ধ করা অর্থাৎ চাহিদার সাথে তাল রেখে মাছ ধরা।

(3) চারা মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা (Prohibit)।

(4) মিহি জালের বদলে মোটা জালের প্রচলন।

---

* অবশ্য উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল এবং দক্ষিণ আমেরিকার চিলি ও আর্জেন্টিনা উপকূলের মৎস্যকেন্দ্রগুলো অপেক্ষাকৃত নতুন বলে এখানে যথেষ্ট সংখ্যায় মাছ ধরা হচ্ছে।

Cushing-র মতে (1) ব্রিটেনের পূর্ব অ্যাঙ্গোলিয়া (East Angolion) উপকূলে হেরিং মাছ, (2) দঃ পঃ ব্রিটেনে কর্নওয়ালের কাছে ইংলিশ চ্যানেল ও আইরিশ সাগর থেকে পিলচার্ড মাছ, (3) আলাস্কার পশ্চিমে বেরিং প্রণালীতে শীলমাছ, (4) জাপানের পূর্ব উপকূল বরাবর সার্ডিন মাছ এবং (5) নরওয়ে ও সুইডেনের উপকূলবর্তী নরউইজিয়ান সাগর ও বাল্টিক সাগরে কর্ড ও হেরিং মাছের সংখ্যা বিপজ্জনকভাবে কমে গেছে।

(5) কৃত্রিম উপায়ে মাছের উর্বরতা বাড়ানো।

(6) ডিম পাড়ার সময় আইন করে মাছ ধরা বন্ধ করা।

(7) নদীগুলোতে ও জলাশয়ে মাছ ছাড়ার ব্যবস্থা করা।

(8) দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থা ও হিমায়নের মাধ্যমে ধৃত মাছের অপচয় বন্ধ করা।

(9) জল-মাটি-বায়ু দূষণ রোধ করা।

(10) মৎস্য গবেষণায় উন্নতর বন্দোবস্ত করা ও এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানো।

(11) জনসচেতনতা বাড়ানো ইত্যাদি।

সুখের কথা এইসব বিষয়ে ইতিমধ্যেই কিছু কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যেমন—(a) প্রশান্ত মহাসাগরে হ্যালিবাট মাছ—সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক কমিশন গঠিত হয়েছে, (b) 1936, 1943 ও 1946 সালে North Sea Convention (উত্তর সাগর কনভেনশন)-এ ইউরোপের দেশগুলো জালের বুনানি (মোটা জালের ব্যবহার) ও ছোট মাছ না ধরার সম্পর্কে সর্বসিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, (c) নরওয়ে, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, কানাডা ও রাশিয়ান ফেডারেশনে মাছ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে, ভারতে মাছ চাষ সম্পর্কে শিক্ষাদানের জন্য কোচিন, মুম্বাই, ব্যারাকপুর, আগ্রা ও হায়দ্রাবাদে (Central Inland Fisheries Research Institute) স্থাপিত হয়েছে। এবং গভীর সমুদ্রে মৎসক্ষেত্রের অবস্থান, গবেষণা ও সমীক্ষার কাজ করার জন্য The Fishery Survey of India নামে মুম্বাইতে একটি শাখা রয়েছে।

6.6.4.4 কৃষিভূমি সংরক্ষণ (Conservation of agricultural land) ঃ

চাষের জমি মানুষের মৌলিক সম্পদ। এর বৈশিষ্ট্যের ওপর কোন দেশের কৃষিজ সম্পদের গুণাগুণ নির্ভরশীল। তাই এই মৌলিক সম্পদকে রক্ষা করা মানুষের দায়িত্ব। কৃষিক্ষেত্রের গুণাগুণ প্রধানত মাটির ওপর নির্ভরশীল, লক্ষ্য রাখতে হবে জলধারা, বন্যা, ধস, বায়ুপ্রবাহ দ্বারা ভূমিক্ষয় তথা মাটি একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত (driftied) না হয়। এর ফলে মাটির উর্বরতা শক্তি কমে যাবে। এজন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, যেমন—

1) ভূমিক্ষয় নিবারণ। এ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের দরকার।

2) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শস্যাবর্তন (Crop rotations)। একই জমিতে বছরের পর বছর একই ফসল চাষ করলে জমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। সে জন্য মাঝে মাঝে জল, মটরশুটি, বরবটি ইত্যাদি চাষ করলে জমিতে নাইট্রোজেনযুক্তি (Nitrogen Fixation) হয়। এতে জমির উর্বরতা বজায় থাকে।

3) ঢালু জমিতে ধাপ কেটে চাষ করতে হবে (Terrace Cultivation)। এতে অযথা ভূমিক্ষয় হবে না। জমিতে ধাপ কাটলে মাটির কণাগুলো সরাসরি ওপর থেকে ধুয়ে নেমে আসতে পারবে না।

4) ঢালু জমিতে কঠোরভাবে পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কারণ পশুদের পায়ের খুরে খুরে মাটি আলগা হয়ে উপরে উঠে আসে। এছাড়া অল্প জমিতে বেশী পশুচারণ হলে বনভূমি বা তৃণভূমি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে আসবে এবং মৃত্তিকা ক্ষয়ে সাহায্য করবে।

5) দু'তিনবার চাষ করার পর চাষের জমি বছর খানেকের জন্য পতিত (Current fallow) রাখতে পারলে ভালো হয়। এতে জমি তার উর্বরতা কিছুটা ফিরে পায় ও পুনরায় চাষ করলে ভালো ফসল পাওয়া যায়।

6) পর পর জমিতে চাষ করলে জমির উর্বরতা কমে যায়। রাসায়নিক সারের ব্যবহার যতদূর সম্ভব কমিয়ে দেওয়া দরকার। কারণ বছরের পর বছর জমিতে রাসায়নিক সার বেশী প্রয়োগ করলে। একটা সময় আসে যখন মাটি আর মাটি থাকে না, ধূলো হয়ে যায়। এজন্য দরকার বেশী করে জৈবসারের প্রচলন।

7) কেবলমাত্র চাষের অযোগ্য জমিতেই কারখানা, বসতি বা যেকোন বড় প্রতিষ্ঠান তৈরী করতে হবে। এতে দেশের মূল্যবান কৃষিজমি চাষের কাজেই লাগানো যাবে।

8) মরু-প্রান্তিক এলাকায় (Desert Fringe) গাছ লাগাতে হবে। এতে একদিকে যেমন মরুভূমির প্রসার রোধ করা যাবে, অন্যদিকে তেমনি নতুন জমি মরুগ্রাস থেকে মুক্তি পাবে।

9) মৃত্তিকা-জল-বায়ু দূষণ রোধে চেষ্টা করতে হবে।

10) জমির লবণতা নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

11) পুরোনো পতিত (Old Fallow) ও অব্যবহৃত জমি পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন।

12) সুপরিকল্পিতভাবে ভূমি ব্যবহার (Planned land use) করতে হবে ইত্যাদি।

6.6.4.5 খনিজ সংরক্ষণ (Conservation of Mineral Resources) ঃ

কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি অনেকাংশে খনিজ সম্পদের প্রাপ্তি ও ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু খনিজ পদার্থ গচ্ছিত, অপূর্ণভব সম্পদ, তাই একদিন না একদিন খনিজ পদার্থ শেষ হয়ে যাবে। তাই খনিজ পদার্থের সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করলে খনিজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল বহুদেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। এজন্য খনিজ পদার্থ সংরক্ষণে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন—

(1) দুর্লভ খনিজের বদলে অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য বিকল্প খনিজের ব্যবহার। যেমন ধাতব (metal) বস্তুর বদলে প্লাস্টিকের ব্যবহার।

(2) উৎপাদিত পণ্যের কর্মক্ষমতা ফুরিয়ে গেলে বা ঐ বস্তুটি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়লে কাঁচামাল হিসেবে তার পুনর্ব্যবহার। যেমন লোহা ও ইস্পাত শিল্পে ছাট-এর (Scrap) ব্যবহার।

(3) শুধুমাত্র জ্ঞাত (known) খনিজ সম্পদের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে নতুন নতুন খনিজের সন্ধান করা।

(4) নিম্নমানের আকরিককে প্রযুক্তির সাহায্যে উৎকৃষ্ট আকরিকে পরিণত করা। যেমন দুর্গাপুর কোলওয়াশারিতে নিকৃষ্ট মানের কয়লাকে উৎকৃষ্ট মানের কয়লায় পরিণত করা হয়। এতে দেশের উৎকৃষ্ট কয়লার ওপর চাপ পড়ে কম।

(5) প্রযুক্তি ও কারিগরী উৎকর্ষতা বাড়িয়ে অল্প খনিজ কাঁচামাল থেকে আরও বেশী সম্পদ উৎপাদন করা।

(6) অচিরাচরিত (non-conventional) শক্তির ব্যবহার জনপ্রিয় করা।

(7) সমুদ্রতল থেকে সুপরিকল্পিতভাবে খনিজদ্রব্য আহরণের ব্যবস্থা করা।

(8) খনিজদ্রব্য অনুসন্ধানের কাজ জোরদার করা।

(9) অপচয় রোধ করা এবং

(10) জনসচেতনতা বাড়ানো।

6.7 সম্পদ সংরক্ষণে আধুনিক চিন্তাভাবনা (Recent thoughts on resource conservation)

একথা ঠিক যে সম্পদ সম্পর্কে এককালে মানুষের কোন ধ্যানধারণা ছিল না, জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার প্রযুক্তিবিদ্যায় ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েছে। ফলে সম্পদের পরিমাণে ও বৈচিত্রে অহরহ পরিবর্তন ঘটেছে। পাশাপাশি

মানুষ সম্পদ সংরক্ষণ বিষয়ে আগ্রহী। বিগত প্রায় 790 বছরে জিমারম্যানের সম্পদ সম্পর্কিত ধারণায় বহুবিধ পরিবর্তন ঘটেছে। নিম্নে তত্ত্বগত আলোচনা দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিধিগত বিস্তৃতির ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হল—

1) সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সার্বিক পরিকল্পনা (Overall Planning) এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বয়েস (Boyce) ও বেরী (Berry)-র মতে কোন একটি সম্পদের ব্যবহার পদ্ধতির বিচারের সময় যাবতীয় সম্পদের ওপরে তার অর্থনৈতিক তথা সামাজিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন কয়েক বছর আগে গাড়োয়ালে তেহরী বাঁধ তৈরীর সময় পরিবেশবিদরা ঝড় তুলেছিলেন কারণ তাদের বক্তব্য ছিল এতে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে। ধস নামবে, ভূ-কম্প প্রবণতা বাড়বে, অনুরূপভাবে নর্মদা বাঁধ নির্মাণের প্রাক্কালে মেধা পাটেকরের নেতৃত্বে নর্মদা বাঁচাও কমিটি আন্দোলন শুরু করেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে ভারতে পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে মানুষ কত সচেতন, কারণ পরিবেশতন্ত্র (ecology) নষ্ট হলে তার প্রভাব সম্পদের ওপরও পড়বে।

সুইডেন, ফিনল্যান্ড ও নরওয়েতে যথেষ্ট কাঠ সংগ্রহের ফলে বিগত 40 বছরে নরম কাঠমণ্ড (wood pulp)-এর দাম যথেষ্ট বেড়েছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে সেখানে ব্যাপকভাবে পাইন, বার্চ (birch) ও অ্যাশ (ash)-র বনভূমি সৃজন (afforestation) করা হয়েছে। উপগ্রহ থেকে পাঠানো আলোকচিত্রের সাহায্যে উপযুক্ত স্থান স্থির করে এই অরণ্য সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে ভৌগোলিক, উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, আবহবিদ ও মহাকাশবিজ্ঞানী যৌথভাবে অংশ নিয়েছেন। নিঃসন্দেহে সম্পদ প্রকল্পের ক্ষেত্রে এটি একটি সঠিক পদক্ষেপ।

2) 1970-র দশকে মেডোজ-র উন্নয়নের সীমা (Meadows and Meadows, 1972, The Limits of growth) বইটি প্রকাশের সাথে সাথে সম্পদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ইউরোপ ও আমেরিকার শিল্পোন্নত দেশগুলোতে এক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এর ফল হিসেবে অনুন্নত দেশগুলো থেকে কয়লা, আকরিক লোহা প্রভৃতি অপুনর্ভব সম্পদ আনার এক প্রবণতা দেখা যায়। উন্নত দেশসমূহে আজও সেই প্রবণতা রয়েছে। যেহেতু বালি ও নুড়ির মত সম্পদ সস্তা নয় (Resources are neither as cheap nor as ubiquitos as sand and gravel; R. Boyce, The Bases of Economic Geography) তাই বেশী মাত্রায় ফসল ফলানো, বনভূমি সৃজন (afforestation), বেশী মাছ, খনিজ দ্রব্য ও প্রাণী সম্পদ আহরণের দ্বারা পূনর্ভব সম্পদের উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। একাজে প্রযুক্তির ব্যবহার সফলতা আনতে পারে। কিন্তু আমরা জানি যন্ত্রের ব্যবহার ভূমিক্ষয় করছে, পরিবেশ দূষিত করছে। অথচ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা না হলে আগামী দিনের মানব সমাজের সামনে সমূহ বিপদ উপস্থিত হবে।

তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা আজ নতুন করে নির্ধারিত হচ্ছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক 1992 উন্নয়ন প্রতিবেদনে আগামী প্রজন্মের ক্ষতি না করে উন্নয়নের হার বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। উন্নয়নের এই সংজ্ঞা মনে রেখেই সম্পদ পরিকল্পনা করতে হবে। শুধু সংরক্ষণ নয়, পরিবেশের কথাও মাথা রাখতে হবে, পরিবেশ দূষণ না ঘটিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিল্প ও কারিগরীর উন্নতি করতে হবে। প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতার (Physical limitation) মধ্যেই বেশী উৎপাদন সম্ভব করতে হবে। সেজন্য মানুষের মেধাশক্তির ওপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া দরকার, উন্নত কারিগরী ও প্রযুক্তির সাহায্যে সম্পদের কার্যকারিতা বাড়াতে হবে। সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে শুধু মিতব্যয়িতাই যথেষ্ট নয়, তার বিকল্প ব্যবহারও খুব জরুরী।

অনুশীলনী - 2

1) জনসম্পদ ও মৎস সংরক্ষণ সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

2) কৃষিভূমি ও খনিজসম্পদ সংরক্ষণ সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

3) সম্পদ সংরক্ষণ সম্পর্কে আধুনিক চিন্তাভাবনা বুঝিয়ে বলুন।

6.8 সারাংশ

সম্পদ হ্রাস বা সংকট বলতে গচ্ছিত বা অপূরণশীল সম্পদের পুনর্পুনঃ ব্যবহারের ফলে ঐসব সম্পদের নিঃশেষ হওয়াকে বোঝায়। কারণ অদূর ভবিষ্যতে ঐসব সম্পদের পুনঃস্থাপণের সম্ভাবনা ক্ষীণ। অতিরিক্ত শিকারের ফলে কয়েক প্রকার মাছ বা বনভূমির বিলুপ্তি ঘটতে চলেছে। সম্পদের ক্ষয়ের কারণ বহুবিধ। মেডোজ তাঁর "The Limits to growth"-এ সম্পদ সংকটের ভয়াবহ দিকটি তুলে ধরেছেন।

সম্পদ সংকট থেকে সম্পদ সংরক্ষণের ধারণা তৈরী হয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে সম্পদ সংরক্ষণের ব্যাপারটি আজকের মানুষের মনে এসেছে। সম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন হল বিচার বিবেচনা করে ব্যবহার, অপচয় কমানো, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিকে লক্ষ্য রাখা এবং কোন বস্তুর বিকল্প ব্যবহার।

সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে দেশে দেশে বিভিন্ন সংস্থা তৈরী হয়েছে। তাদের কয়েকটি আবার আন্তর্জাতিক স্তরের। এছাড়া The Earth Summit-র মতন কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতে চিপকো, অ্যাপিক্কো, নর্মদা বাঁচাও-র ন্যায় কয়েকটি আন্দোলন পরিবেশ বাঁচাতে গড়ে উঠেছে।

6.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

1. সম্পদ হ্রাস বলতে আপনি কী বোঝেন?
2. বৃদ্ধির সীমা (Limits to growth) সম্পর্কে মিডোজ যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা উল্লেখ করুন। মিডোজ-এর ধারণার যুক্তিযুক্ততা আলোচনা করুন।
3. সম্পদ সংরক্ষণের নীতি ব্যাখ্যা করুন। সকল প্রকার গচ্ছিত সম্পদের সংরক্ষণ জরুরী কেন?
4. সম্পদ সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় ধারণা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করুন।
5. সম্পদ সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
6. সম্পদের সম্ভাবনা বলতে কী বোঝায়? কী কী উপায়ে সম্পদের আয়ুষ্কাল (longivity) বাড়ানো যেতে পারে?
7. সম্পদ হ্রাস বা সংকট কিভাবে মোচন করা যেতে পারে? প্রযুক্তির প্রয়োগ ও দ্রব্যের পুণর্ব্যবহার (recycling) এই লক্ষ্য পূরণে কিভাবে সহায়ক হবে?
8. "সংরক্ষণ হল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বর্তমান প্রজন্মের স্বার্থত্যাগ" কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।
9. বনভূমি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে কেন? কী কী উপায়ে বনভূমি সংরক্ষণ করা যেতে পারে?
10. সম্পদ সংরক্ষণে আধুনিক চিন্তাভাবনা সম্পর্কে কী জানেন?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ টিকা লিখুন

1. দূষণজনিত কারণে সম্পদের বিনাশ
2. জনাধিক্য ও সম্পদ হ্রাস
3. কৃষিযোগ্য জমির সীমাবদ্ধতা
4. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সীমা
5. খনিজ সম্পদের সীমাবদ্ধতা
6. জলসম্পদ সংরক্ষণ
7. মৎস্য সংরক্ষণ

8. কৃষিভূমি সংরক্ষণ

9. খনিজ সংরক্ষণ

10. প্রযুক্তির ধীর পরিবর্তন

6.10 উত্তরমালা ঃ

অনুশীলনী - 1

1. 6.2 (v) অংশাঙ্কিত অংশ দেখুন।
2. 6.4 (i) অংশাঙ্কিত অংশ দেখুন।
3. 6.4 (ii) অংশাঙ্কিত অংশ দেখুন।
4. 6.4 (vi) অংশাঙ্কিত অংশ দেখুন।

অনুশীলনী - 2

1. 6.6.4.2 ও 6.6.4.3 অংশাঙ্কিত অংশ দেখুন।
2. 6.6.4.4 ও 6.6.4.5 অংশাঙ্কিত অংশ দেখুন।
3. 6.7 অংশাঙ্কিত পাঠ্যাংশ দেখুন।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

1. 6.1 অংশ দেখুন।
2. 6.3 অংশ দেখুন।
3. 6.6.3 অংশ দেখুন।
4. 6.6 অংশ দেখুন।
5. 6.5 অংশ দেখুন।
6. 6.5 অংশ দেখুন।
7. 6.5 অংশ দেখুন।

8. 6.6 অংশ দেখুন।

9. 6.6.4.1 অংশ দেখুন।

10. 6.7 অংশ দেখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1. 6.2 অংশের (v) অংশ দেখুন।
2. 6.4 অংশের (i) অংশ দেখুন।
3. 6.4 অংশের (ii) অংশ দেখুন।
4. 6.4 অংশের (iii) অংশ দেখুন।
5. 6.4 অংশের (iv) অংশ দেখুন।
6. 6.6 অংশ দেখুন।
7. 6.6.4.3 অংশ দেখুন।
8. 6.6.4.4 অংশ দেখুন।
9. 6.6.4.5 অংশ দেখুন।
10. 6.4 অংশের (v) অংশ দেখুন।

একক 7 ❑ স্থিতিশীল উন্নয়ণ

গঠন

7.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

7.2 সংজ্ঞা

7.3 স্থিতিশীল উন্নয়ণের পটভূমি

7.4 ধারণা

7.5 নীতিসমূহ

7.6 স্থিতিশীল উন্নয়ণকল্পে নির্দেশিকা

7.7 সম্পদের ব্যবহার এবং পরিবেশের গুণমান

7.8 ভারতের দীর্ঘমেয়াদী বা স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত ক্ষেত্রেসমূহ

7.9 সারাংশ

7.10 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

7.11 উত্তরমালা

7.1 প্রস্তাবনা

UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation)-র প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural Science) বিভাগের পক্ষ থেকে রিচি ক্যালডর (Richi Caldor) উত্তর আফ্রিকা ও উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার মরুভূমিগুলোর পর্যালোচনা ও সেখানকার প্রাচীন সভ্যতাসমূহের উত্থান-পতনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেছিলেন যে এই সমস্ত অঞ্চলে একটি নয়, বিভিন্ন যুগে পনেরোটি মানব সভ্যতা সমৃদ্ধির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। রিচি ক্যালডর-এর ভাষায় "মানুষ প্রকৃতির ওপর করেছে অমানুষিক শোষণ, প্রকৃতি হয়েছে অতি দ্রুত রিক্ত, নিঃশেষিত, ফুরিয়ে গেছে মানুষের খাবার। বেঁচে থাকবার রসদ, সভ্যতাগুলো শেষ পর্যন্ত ধূলায় মিশে গেছে।"

উন্নয়ণ করবার ধারণা থেকে সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট বা স্থিতিশীল উন্নয়ণ কথাটি এসেছে।

বিভিন্ন প্রাচীন ভারতীয় রচনায় মানুষের সকল প্রকার ক্রিয়াকলাপ, এমন কি, অর্থনৈতিক উন্নয়ণের নিয়ন্ত্রক হিসেবে প্রকৃতি (nature) ও পরিবেশকে তুলে ধরা হয়েছে। পরিবেশের বিভিন্ন প্রকার উপাদান যথা, বায়ু, জল, ভূমি, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, প্রাণী ইত্যাদিকে ভগবানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। যদিও তাদের সংরক্ষণের কোন প্রয়োজন ছিল না, তথাপি ভারতের সব ধর্মেই তাদের রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে।

মনে রাখা দরকার প্রকৃতি আমাদের অফুরন্ত সম্পদে ভরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় হল উন্নয়ণের কাজ চালু রাখতে গিয়ে আমরা এই অফুরন্ত সম্পদকে ধ্বংস করে চলেছি। আমাদের যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজকর্ম এই প্রাকৃতিক সম্পদকে লুণ্ঠন করার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চলেছে। শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর এর প্রভাব পড়েছে তা নয়। মানুষের স্বাস্থ্যের (মানষিক ও দৈহিক) ওপরও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, কারণ মানুষ তো পরেবেশেরই অঙ্গ।

উদ্দেশ্য ঃ

- এই এককটি পাঠ করে আপনি,
- স্থিতিশীল উন্নয়ণ বলতে কি বোঝায় তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- কিভাবে ধরিত্রীকে বিপন্ন না করে ও উন্নয়ণ সম্পভপর তা বিশদ করতে পারবেন।
- পরিবেশের গুণাগুণ অক্ষুণ্ণ রাখতে কি নীতি মেনে চলা দরকার ইত্যাদি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

7.2 সংজ্ঞা

অর্থনীতি, সমাজবিদ্যা, পরিবেশ বিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে স্থিতিশীল উন্নয়ণকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

Dictionary of Geography-তে বলা হয়েছে যে স্থিতিশীল উন্নয়ণ হল এমন এক ধরণের উন্নয়ণ, যা সম্পদের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার (management) ওপর নির্ভরশীল, তাই এর সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয়।

Dictionary of Ecology-তে বলা হয়েছে এটি এমন এক অর্থনৈতিক উন্নয়ণ যার মধ্যে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিবেশগত প্রতিক্রিয়াকে খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় ও উন্নয়ণে সেই ধরণের সম্পদই ব্যবহৃত হয় যেগুলো পুণর্ভব প্রকৃতির ও পুণরায় সমপরিমাণে সৃষ্টি করে পার্থিক পরিবেশে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

Sustainability is defined in terms of productivity and management as a production system in which technology manangement inputs do not adversly affect biophysical system (Carpenter and Harper, 1989).

Sustainable development implies the achievement a steady society with a focus on bettering the quality of human life, using energy and resources more efficiently and considering the limits of growth (Daly, 1989).

রবার্ট রিপেটো Global Possible গ্রন্থে স্থিতিশীল উন্নয়ন বলতে সেই জাতীয় উন্নয়ন পদ্ধতির কথা বলেছেন যা বৈদেশিক ঋণের বোঝা থেকে ভবিষ্যত নাগরিকদের মুক্ত করে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দক্ষতা ও মানবিক গুণাবলী বাড়ায় এবং পরিবেশের অবনমন (degradation) ও সম্পদ সংকট রোধ করে।

আর্নেস্ট-মিশেল ইউদো মনে করেন স্থিতিশীল উন্নয়ন প্রকল্প হচ্ছে সেই উন্নয়ন প্রকল্প যার মাধ্যমে বহুকাল ধরে প্রাকৃতিক সম্পদের গুণমান ও কার্যকারিতা বজায় রেখেও সর্বাধিক অর্থনৈতিক সুবিধে আদায় করা যায়।

World Commission on Environment & Development বা (Brutland Commission, 1987) (নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী গ্রো হারলেম ব্রান্টল্যান্ডের নামানুসারে ব্রান্টল্যান্ড কমিশন)র Our Common Future নামক পুস্তকে স্থিতিশীল উন্নয়নের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা হল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন মেটানোর জন্য গৃহীত পরিকল্পনা—"development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs." প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে স্থায়ী উন্নয়ন প্রসঙ্গে ব্রান্টল্যান্ড কমিশনের বক্তব্যটি সরল মনে হলেও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এতে বলা হয়েছে যে পরিবেশ থেকে সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে মানুষের সব ধরনের কাজ-কর্মকেই পরিবেশের স্থায়ী ক্ষতি করা থেকে যতটা সম্ভব বিরত থাকতে হবে। স্থিতিশীল উন্নয়ন ও সাধারণ উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য আছে, কারণ সাধারণ উন্নয়ন বসুন্ধরাকে নানাভাবে ক্ষতি করে, স্থিতিশীল উন্নয়ন তা করে না। স্থিতিশীল উন্নয়নের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য হলঃ

- এটি একটি ধারাবাহিক পদ্ধতি।
- এটি সমতা ও ন্যায় পরায়ণতার ওপর প্রতিষ্ঠিত।
- এর পথ নিয়ন্ত্রিত ও অখণ্ড।
- বসুন্ধরার উৎসকে ব্যবহার করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উন্নয়ন এগিয়ে যায়, অর্থাৎ মানুষের সুখ শান্তি বজায় রাখা ও বসুন্ধরাকে সুস্থ রাখার লক্ষ্যে।

7.3 স্থিতিশীল উন্নয়ণের পটভূমি (Background of sustainable development)

প্রাচীন কাল থেকেই মানুষই প্রকৃতিকে রক্ষা করার কথা বলে আসছে, যাতে করে মানুষ ভালভাবে বাঁচতে পারে।

International Institute for Environment and Development-র প্রতিষ্ঠাতা (এভা বেলফোর) প্রথম স্থিতিশীল উন্নয়ণ কথাটি ব্যবহার করেন। 1967 সাল থেকেই পরিবেশ দূষণ নিয়ে মানুষের মধ্যে ভাবনার শুরু হয়েছে। ঐ সময় যুক্তরাষ্ট্রে পরিচ্ছন্ন বাতাস (clean air) নীতি চালু হয়। 1972 সালে উন্নত দেশগুলো ভাবতে শুরু করে আর অম্লবৃষ্টি (Acid rain) নয়, সূর্যের অতি বেগুণী রশ্মিকে (ultraviolet ray) কে ঠেকাতে হবে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড ও সালফারকে বাড়তে দেওয়া চলবে না। বন কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে, তার বদলে চাই জলাভূমি, অরণ্য। তবে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা যায় যে হোম কনফারেন্স-এ (UNCHE, 1972)। সেখানে উন্নয়ণ ও প্রকৃতির ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। বলা হয় অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নয়ণ হওয়ার ফলে বসুন্ধরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। বিশ্বের উন্নত দেশে জ্বালানী সমস্যা তথা দূষণ দেখা দিচ্ছে। সব দিক বিবেচনা করে তাই এ সিদ্ধান্ত হয় যে উন্নয়ণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, কিন্তু উন্নয়ণ যেন বিজ্ঞানসম্মত তথা স্থিতিশীল হয়।

1972 সালের 5ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালিত হয়। সেই বছরই ভারতে পরিবেশ পরিকল্পনার জন্য গড়ে ওঠে জাতীয় কমিটি NCEPC। 1979 সালে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের 11টি দেশ এক চুক্তি করে, তাতে নিজের নিজের দেশের সমুদ্রমুখী নদীগুলোর যথাসাধ্য দূষণ সংস্কার করায় অঙ্গীকার করা হয়। ভারতে 1985 সালে গড়া হয়েছে পরিবেশ ও অরণ্য মন্ত্রক। এরপর Global Environmental Monitoring System, International Register of potentialy toxic chemicals ইত্যাদি সংস্থা গঠিত হয়। অবশেষে ব্রাজিলের রাজধানী রিও-ডি-জেনিরোতে 3 থেকে 14 জুন Earth Summit নামে এক শীর্ষক সম্মেলন (UNCED) অনুষ্ঠিত হয়। এতে 166 টি দেশের মন্ত্রী, শীর্ষস্থানীয় নেতা ও পরিবেশবিদরা যোগ দেন। এতে বিশ্বের পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে 21 দফা কর্মসূচী গৃহীত হয়।

অনুশীলনী - 1

1) স্থিতিশীল উন্নয়ণ বলতে কী বোঝেন এবং এর গুরুত্ব কী?

2) সম্পদের ব্যবহার এবং পরিবেশের গুণমানের সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করুন।

3) স্থিতিশীল উন্নয়ণের পটভূমিকা আলোচনা করুন।

7.4 ধারণা (Concept)

আগামী প্রজন্মের চাহিদা অক্ষুণ্ন রেখে বর্তমান পৃথিবীর চাহিদা মেটাবার আর এক নাম স্থিতিশীল উন্নয়ণ, অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার কৃষিজ, খনিজ, বনজ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সুষম ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমান জীবনযাত্রার মান উন্নয়ণের সাথে সাথে ঐ সব প্রাকৃতিক সম্পদের ভবিষ্যৎ সম্ভারকে সুরক্ষিত করতে হবে,

বিশেষ আলোচনা

বসুন্ধরা সম্মেলনের 7 দফা পরিকল্পনা (Earth Summit's 7 - point plan)

ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরো-তে বিশ্বের শীর্ষ নেতাদের পরিবেশ সম্পর্কিত এক সম্মেলনে গোটা পৃথিবীর স্থিতিশীল উন্নয়ণের জন্য 7 দফা প্রস্তাব নেওয়া হয়। এই প্রস্তাবগুলো হল—

1. এমন নীতি গ্রহণ করতে হবে যাতে উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উৎপাদিত পণ্যের দ্বারা পরিবেশ ন্যূনতম (minimum) প্রভাবিত হয়।

2. উৎপাদন প্রক্রিয়া ও পণ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যে এটি স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিবেশের উপযোগী।

3. পরিবেশের প্রতি বন্ধুসুলভ প্রযুক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।

4. বিদেশী সংগঠনগুলোকে উৎপাদনের পদ্ধতিগত পরিমার্জনা করতে উৎসাহী করা যাতে স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রের (ecology) ক্ষতি না হয় ও স্থানীয় সরকারের সাথে তারা যেন ভাব বিনিময় করে।

5. ব্যবসায়িক দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোতে অংশীদারী ব্যবসা শুরু করা।

6. স্থিতিশীল উন্নয়ণের জন্য জাতীয় পর্ষদ গঠন করা। এটি যেন ছোট ব্যবসাদার, হস্তশিল্পী, কারিগরী সবাইকে যুক্ত করে।

7. পরিবেশ সম্পর্কিত প্রযুক্তির উন্নতি ও পরিবেশ পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণা বাড়ানো।

উল্লেখ্য যে পরিবেশ চেতনার উন্মেষ ঘটাতে না পারলে এই বিকাশের পরিকল্পনা নেহাতই কথাতে বাঁধা থাকবে। এর বাস্তব রূপায়ণ কখনই সম্ভব হবে না। এজন্য একে কার্যকরী করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার সাথে সাথে পরিবেশ চেতনাকে গণ আন্দোলনে রূপান্বিত করতে হবে। এই আন্দোলনে দেশ, কাল ভেদে পৃথিবীর সব মানুষকে এক মঞ্চে সমস্বরে ঘোষণা করতে হবে।

যাতে ভবিষ্যত প্রজন্ম তাদের উন্নত জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে পারে।

আগামী প্রজন্মের এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার জন্য কতগুলো পদক্ষেপ নেওয়া খুব জরুরী। আজকের পরিকল্পনা এমন হবে না যা ভবিষ্যত প্রজন্মের জীবন ধারণের মানের উন্নতিকে ব্যাহত করবে। যেমন উন্নতিশীল দেশগুলোতে এমনভাবে বৈদেশিক ঋণ নিয়ে বর্তমানের জীবন ধারণের কজায় রাখা চলবে না, যাতে পরবর্তী প্রজন্মকে তার ঋণের গুরুভার বহন করতে হয়। এই ঋণভার এমনকি তাদের শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস করতে বাধ্য করবে। এর ফলস্বরূপ তাদের দক্ষতা ও গুণগত মান কমবে। বর্তমান সমাজ তাদের জীবনধারণের মান বজায় রাখতে গিয়ে ভূমিসম্পদ, অরণ্য সম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও শক্তি সম্পদের পরিমাণ দারুণভাবে হ্রাস করেছে। ফলে, ভবিষ্যৎ উৎপাদন ক্ষমতা যথেষ্টভাবে বিঘ্নিত হবে। এই ব্যাপারে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো এরূপ হওয়া উচিত যাতে বর্তমান প্রজন্ম আমাদের যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ও অন্যান্য সম্পদ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এমনভাবে দিয়ে যেতে পারে যাতে তারা তাদের জীবনধারণের মান বর্তমান অবস্থার মতই বজায় রাখতে পারে।

বিকাশের সাথে সাথে সম্পদের বিবর্তন ঘটে, যেমন যুক্তরাষ্ট্রের মত সম্পদশালী দেশে প্রাথমিক অবস্থায় বন্দর, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ইত্যাদি তৈরী করার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ঔপনিবেশিক শাসনে যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান সম্পদ ছিল জমি। 1900 খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের মোট বস্তুগত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ ছিল জমি। বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে এক-চতুর্থাংশে; অন্যদিকে এই সময়ের মধ্যে দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের সাহায্যে মানব সম্পদ অন্যতম সম্পদে পরিণত হয়েছে।

যদিও এই অস্তিত্ব জনিত বিকাশ সম্পদ পরিকাঠামোকে পরিবর্তনের সাথে দ্রুত খাপ খাইয়ে নেয়, তথাপি এমন কিছু পরিবর্তন আছে যা পাল্টানো মুশকিল, কারণ এতে ভবিষ্যতে নিদারুণ ক্ষতির আশঙ্কা থেকে যায়। যেমন নানা প্রজাতির উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু, বন সম্পদ প্রকৃতি সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বা কৃষিকার্যে ব্যাপক কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা ভবিষ্যতে মুশকিল হবে। (Kinton Miller) ও তাঁর সহকর্মীরা তাঁদের গবেষণা পত্রে দেখিয়েছেন, অচিরে ব্যবস্থা না নিলে লক্ষ লক্ষ প্রজাতির কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু বা উদ্ভিদের বিলোপ সাধন হবে, যা ভবিষ্যত প্রজন্মের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।

স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রধান বাধা হল পশ্চিমী দুনিয়ার ভোগবাদ, ভোগ বিলাসিতায় অভ্যস্ত পশ্চিমীরা তাদের ভোগের পরিমাণ কমাতে ইচ্ছুক নন। পরিবেশের স্বার্থে ভোগের ত্যাগ স্বীকারে তাদের আগ্রহ কম। অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলো পশ্চিমী দুনিয়ার সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টায় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে পরিবেশকে সম্পদ আহরণের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে, এতে পরিবেশের ওপর প্রতিকূল প্রভাব পড়ছে।

ব্রান্ট ল্যান্ড রিপোর্ট (Brundtland Report)এ বলা হয়েছে যে অর্থনৈতিক উন্নতি ও পরিবেশের সুরক্ষা এক সাথে চলতে পারে। কিন্তু পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ধারণা পাল্টাতে হবে। যদি সমাজ

মনে করে গচ্ছিত সম্পদ চিরদিন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাবে, তবে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

7.5 নীতিসমূহ (Principles)

স্থিতিশীল উন্নয়ন ব্যাপারটি তিনটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত :

1) পরিবেশকে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ধরতে হবে। প্রকৃতির মুক্ত দান হিসেবে একে যথেচ্ছ ব্যবহার করলে চলবে না। পরিবেশের উপকরণগুলোকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। প্রয়োজনে গচ্ছিত সম্পদের নূন্যতম ব্যবহার এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রাণী ও উদ্ভিদের ধ্বংস থামানোর জন্য বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ করতে হবে।

2) ন্যায্যিকতার প্রশ্নটি নিয়ে ভাবতে হবে। বর্তমান পৃথিবীর সামনে একটি বড় দুশ্চিন্তার কারণ হল উন্নয়নের খাতিরে উন্নয়নশীল দেশগুলো কর্তৃক পরিবেশের দ্রুত অবনমন ঘটানো। উন্নত দেশগুলো অনেক আগেই এই ধ্বংসের লীলায় মেতে উঠেছিল। কিন্তু এখন উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তা বন্ধ করতে বলা হয়েছে, এখানেও ন্যায্যিকতার প্রশ্নটি বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে মনে রাখা দরকার যে ন্যায্যিকতা শুধুমাত্র উন্নত ও উন্নতিশীল দুনিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, দেশের অভ্যন্তরে এবং জনগণের নিজেদের মধ্যেও এই ন্যায্যিকতার প্রশ্নটি জরুরী। যেমন চাকুরীজীবী ও কর্মহীন বেকারদের মধ্যে একটা বড় অসাম্য থাকে যা পরিবেশের ওপর পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে। কর্মহীনরা যেন তেন প্রকারে উপার্জন করতে চাইবে, ফলে দেশের মঙ্গল ও মঙ্গলের কথা তারা ভাববে না।

3) স্থিতিশীল উন্নয়নের স্বার্থে ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক কার্যকলাপ বর্তমানের থেকে ভিন্ন মাত্রায় হওয়া উচিত। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে তাৎক্ষণিক মুনাফার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিবেশ সংরক্ষণের ভাবনাকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়শই উপেক্ষা করে চলে।

সবুজ বাজার (Green Marketing) তৈরী করার দিকে শিল্পগুলোকে ঝুঁকতে হবে। পিটির (Peattie) মতে সবুজ বাজার বা গ্রীণমার্কেটিং হল লাভজনক, তাঁর যোগ্য পথে ক্রেতা ও সমাজের প্রয়োজন চিহ্নিত করা, আন্দাজ করা ও সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নির্দিষ্ট পরিচালনা প্রক্রিয়া। The manangement process responsible for identifying, acticipating and satisfying the requirements of customers and society in a profitable and sustainable way. এর উদ্দেশ্য হল পরিবেশের প্রতি বন্ধুসুলভ পণ্য (Eco-Friendly Product) বাজারে জাতকারক ও পরিবেশের ক্ষতিকারক পণ্য উৎপাদন বন্ধ করা। অনেক ভোগী যে পরিমাণ পণ্য ভোগ করে তার মাত্রা কমাবে না। কিন্তু পরিবেশের কম ক্ষতি হয় এমন পণ্যের ব্যবহার করা পছন্দ করে। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোকে লক্ষ্য রাখতে হবে কাঁচামাল ব্যবহার থেকে পণ্য উৎপাদন পর্যন্ত প্রক্রিয়াটিতে পরিবেশের কি ক্ষতি হচ্ছে তা দেখা। এই ক্ষতিরোধে তাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও নিতে হবে।

[illegible] স্থিতিশীল উন্নয়নকল্পে নির্দেশিকা (Guidelines for Sustainable Development)

ব্রুন্টল্যান্ড রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, উপরোক্ত তিনটি নীতি যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে না। এ ব্যাপারে [illegible] উন্নত দেশগুলোর কথা প্রথমেই মনে হয়। তারাই প্রাকৃতিক সম্পদকে বেশী রকম ব্যবহার করছে। ব্যাপক [illegible] ফলে পৃথিবীতে সম্পদের পরিমাণ কমে গেছে। শুধু তাই নয়, জল, জমি, মাটি, বায়ুমণ্ডলের মত [illegible] গুণমান কমে যাচ্ছে, তাই পরিবেশগত ও সামাজিক দিক দিয়ে স্থায়ী উন্নয়নভিত্তিক সম্পদ [illegible] বলা হয়েছে।

1) জবাবদিহিতা (Accountability) : একথা ঠিক যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো বাজারের চাহিদা মত [illegible] উৎপাদন করবে, কিন্তু পরিবেশে তার প্রতিক্রিয়া যাতে ন্যূনতম হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। [illegible] ফেলে দেওয়া বর্জ্য পদার্থগুলো সম্বন্ধে [illegible] রাখতে হবে যাতে পরিবেশের ক্ষতি না হয়।

2) সম্পদ আহরণে ন্যায়পরতা (Justice in Resource exploitation) : পৃথিবী জুড়ে সম্পদ ব্যবহার [illegible] মানে যে অতিরিক্ত বৈষম্য রয়েছে তা স্থিতিশীল উন্নয়নের পথে বিরাট বাধা। উন্নত দেশের [illegible] মানের মত জীবনযাত্রা পেতে তৃতীয় বিশ্বের মানুষ আগ্রহী, কিন্তু পরিবেশের ক্ষতি না করে [illegible] সহজ নয়। ইদানীং উন্নত দেশগুলো পরিবেশের ক্ষতি সম্পর্কে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে সতর্ক [illegible] অর্থনীতিতে সমৃদ্ধির পথ খুঁজতে গিয়ে পশ্চিম ইউরোপ বা যুক্তরাষ্ট্র একদা নিজ নিজ দেশের অরণ্য [illegible] ব্যাপক হারে ধ্বংস করেছিল, কিন্তু পৃথিবী জুড়ে পরিবেশ রক্ষার খাতিরে আজ তারাই ব্রাজিলকে [illegible] হাত দিতে বারণ করছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মনে রেখে, উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে [illegible] দেশগুলোকে এ ব্যাপারে [illegible] ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

3) সম্পদ আহরণে সতর্কতা (Alert in Resources Exploitation) : পরিবেশ রক্ষায় বাণিজ্যিক [illegible] দায়িত্ব কম নয়—

a) অপুনর্নবীকরণযোগ্য (non-renewable) সম্পদের বিকল্প দ্রব্যের (substitute) ব্যবহারে প্রযুক্তিগত উন্নতি [illegible]।

b) প্রযুক্তিগত উন্নতির সাহায্যে বর্জ্য পদার্থের দূষণের মাত্রা কমাতে হবে।

c) [illegible] ব্যবহারে কারিগরী কুশলতা বাড়াতে হবে।

d) [illegible] সময় দূষণ ছড়ায় (যেমন মোটরযান) এমন সব বস্তুর উৎপাদনকালে দূষণরোধের ব্যবস্থা [illegible]

7.7 সম্পদের ব্যবহার এবং পরিবেশের গুণমান (Resource utilisation and environmental quality) :

লিন্ডা স্টার্ক (Linda Starke) তাঁর Signs of Hope বই-এ মন্তব্য করেছেন যে, পরিবেশে অনেক আশার চিহ্ন রয়েছে (There are many signs hope on the environment side) যাকে তিনি 'অসমাপ্ত কর্মসূচী' (The unfinished agenda) বলেছেন। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রাজনৈতিক ও সামাজিক সদিচ্ছার ওপরে এই 'কর্মসূচী' নির্ভর করছে, সম্পদ সংগ্রহকালে পরিবেশের যে ক্ষতি হয়, তা পূরণ করা এই কর্মসূচীর লক্ষ্য হওয়া উচিত। কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রেই আহরণের সময় প্রকৃতিকে কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করা হচ্ছে। তাই মানুষের সম্পদ সম্পর্কিত কার্যকলাপ ও পরিবেশের গুণমানের সঙ্গে তার সমন্বয় সাধন, এক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। নীচের সারণীতে সম্পদের কিভাবে ব্যবহার দেখানো হয়েছে—

সম্পদের ব্যবহার

- কৃষি, অরণ্য সম্পদ সংগ্রহ ও পশুচারণের জন্য ভূমির ব্যবহার
- ভূ-প্রকৃতি ও ভূঅভ্যন্তরে খনিজ উত্তোলনের জন্য ভূমির ব্যবহার
- শিল্প সম্পদের ব্যবহার
- শক্তির উৎপাদন
- জল সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার
- পরিবহন ও বাড়ী তৈরী

1) কৃষি, অরণ্য সম্পদ সংগ্রহ ও পশুচারণের জন্য ভূমি ব্যবহার : বনভূমি থেকে কাঠ, মোম, মধু ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়। পশুপালন করে দুধ, মাংস ইত্যাদি পাওয়া যায়, কিন্তু এই সমস্ত সম্পদ সৃষ্টি করতে গিয়ে আমরা কিছু পরিমাণে পরিবেশের ক্ষতি করি। কৃষিজমিতে বর্জ্য পদার্থ পচে হিউমাস (humus) সৃষ্টি করে ও বাতাসে দুর্গন্ধ ছড়ায়। জমিতে নাইট্রোজেন, পটাস সার ব্যবহার করলে জমির উর্বরাশক্তি বাড়ে, কিন্তু বৃষ্টির জলের সাথে সেগুলো ধুয়ে গিয়ে জলাশয়ে পড়লে জলদূষণ হয়। গাছ কাটার ফলে অঞ্চলের খাদ্য সংস্থান নষ্ট হয়। অরণ্যের পাতা পচে বাতাসকে দূষিত করছে, পশুচারণের ফলে ভূমি ক্ষয় হচ্ছে। ইউক্যালিপটাস্ গাছের পাতা মাছের ক্ষতি করে কিন্তু এটি পরিবেশকে মুক্ত রাখে।

বর্জ্য পদার্থকে মাটির তলায় চাপা দিতে পারলে কিছুটা দূষণ রোধ করা সম্ভব। গাছ কাটার পাশাপাশি ভূমি সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

2) ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-অভ্যন্তরে খনিজ উত্তোলনের জন্য ভূমির ব্যবহার :

খনি থেকে কয়লা, তেল ইত্যাদি উত্তোলনের সময় মাটির ভেতরটা ফাঁপা হয়ে পড়ে। এতে খনি অঞ্চলের ভূমিভাগ ধসে বসে যেতে পারে।

3) শিল্প সম্পদের ব্যবহার : শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের সময় কলকারখানা থেকে যে ধোঁয়া বেরোয়, তা বাতাসকে দূষিত করে। এছাড়া কলকারখানা থেকে তরল বর্জ্য পদার্থ নদী ও জলাশয়ে মিশে জলভাগকে দূষিত করছে। অতএব বলা চলে শিল্পদ্রব্য তৈরী করতে গিয়ে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। ধোঁয়ার মাধ্যমে নিঃসরণকারী দূষক পদার্থকে জমাট করা গেলে ও কলকারাখার নোংরা জলকে পরিশোধন করে ছাড়া হলে সমস্যা অনেক কমে যাবে। গ্রীণহাউস এতে কমবে ও ওজনস্তরও কম ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

4) শক্তি উৎপাদন : জলবিদ্যুৎ নয়, তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলে যে ধোঁয়া বেরোয়, তা পরিবেশের ক্ষতিসাধন করে, আবার পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনেও দুর্ঘটনার ঝুঁকি আছে। এজন্য বেশী করে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে হবে। এতে একদিকে সম্পদের চাহিদা মিটবে, আবার পরিবেশের ক্ষতি হবে না।

5) বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধনে জলসম্পদের ব্যবহার : কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ করতে মাছ চাষ করতে ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়। বাঁধ দেওয়ার ফলে এক অংশের মানুষের উপকার হয় ঠিকই, কিন্তু অপর অংশের ক্ষতি হয়, কারণ বাঁধের ওপরের অংশে মানুষের ঘরবাড়ি, চাষের জমি জলের তলায় চলে যায়।

তাই উপযুক্ত সমীক্ষা করে বাঁধের উচ্চতা স্থির করতে হয়। পুণর্বাসনের স্পষ্ট ব্যবস্থা করে তবেই অধিবাসীদের বাস্তু ত্যাগের কথা বলতে হবে।

6) পরিবহন ও বাড়ি তৈরী : পাহাড়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শিলাস্তর সরিয়ে রাস্তাঘাট তৈরী করা হয় বা বাড়িঘর তৈরীর জন্য শিলা সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু পাহাড়ী এলাকার বাস্তু সংস্থান (Ecology) নষ্ট হয়। এছাড়া শিলাচূর্ণ কৃত ধূলিকণা বাতাসকে দূষিত করে।

এসব কাজে উপযুক্ত সতর্কতা গ্রহণ করা খুব জরুরী, যাতে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট না হয়, তাই দেখা যাচ্ছে সম্পদ যেমন মানুষের প্রয়োজন পূরণ করে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে তেমনি সম্পদ সৃষ্টি করতে গিয়ে পরিবেশকে অবনমন হচ্ছে।

7.8 ভারতবর্ষের দীর্ঘমেয়াদী বা স্থিতিশীল উন্নয়ণের জন্য নির্বাচিত উপাদানসমূহ (Factors that can promote sustainable development in India) :

1986 সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 73তম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে বিখ্যাত পরিবেশবিজ্ঞানী ড. টি. এন. খোশু (T. N. Khoshoo) তাঁর 'Environmental Priorities in India and Sustainable Development' বিষয়ক বক্তৃতায় এদেশের স্থিতিশীল উন্নয়ণের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করেন। এই ক্ষেত্রগুলো হল—

1. জনসংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ করা অর্থাৎ একে শূন্য পর্যায়ে নামিয়ে আনা।

2. স্বাস্থ্য সচেতনা বাড়ানো।

3. সুসংহত প্রকৃত ভূমি-সদ্ব্যবহার ও জলাভূমি সংরক্ষণের পরিকল্পনা নেওয়া।

4. কৃষিজমি ও খালজমির স্বাস্থ্যরক্ষা।

5. বনভূমির স্বাস্থ্যরক্ষা ও প্রান্তিক জমির পুর্ণবানায়ন এবং অনাবাদী জমির সবুজায়ন।

6. বায়ুদূষণ সমস্যার প্রতিকার।

7. জল, বিশেষ করে নদীর জলের দূষণ সমস্যার প্রতিকার।

8. দূষণমুক্ত পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

9. জীব-বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ।

10. সমস্ত বর্জ্য পদার্থের পুনশ্চনায়ন ও তার পুনর্ব্যবহার।

11. ঘনবসতির বদলে লঘু বসতি অঞ্চল স্থাপন ও বস্তি এলাকার উন্নয়ণ।

12. পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষা ও গণচেতনা গড়ে তোলা।

13. পরিবেশ সংক্রান্ত আইনের সংশোধন এবং

14. জাতীয় সুরক্ষা সম্পর্কে নতুন করে চিন্তাভাবনা।

স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে অনুসৃত উন্নয়ণের প্রকৃতি-দূভার্গ্যের বিষয় অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের ন্যায় উন্নয়ণের নামে ভারতবর্ষও কেবলমাত্র আয়বৃদ্ধির রাস্তাকেই বেছে নিয়েছিল। প্রকৃত উন্নয়ণের ওপর জোর দেয়নি। উন্নয়নের নামে বড় বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, ভারী শিল্প, বড় বড় সেচ প্রকল্প ইত্যাদি রূপায়িত হয়েছে। এর ফলে ভারতের সামগ্রিক গড় আয় কিছুটা বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু বড়লোক ও গরীবলোকের তফাৎ অনেক বেড়েছে। সর্বোপরি পরিবেশের সঙ্কট আরও ঘনীভূত হয়েছে। একথা মনে রাখা দরকার গ্রামীণ জনসংখ্যার 45 শতাংশেরও বেশী দারিদ্রসীমার নীচে ও পৌর এলাকার ও 7 শতাংশের লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করন। এদের দারিদ্র্য দূর করতে না পারলে পরিবেশ রক্ষা কষ্টসাধ্য।

7.9 সারাংশে

স্থিতিশীল কথাটির মানে হল প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন একটি দীর্ঘমেয়াদী তথা সামগ্রিক ও বাস্তব উন্নয়ণ ব্যবস্থা যাঁর মাধ্যমে মানুষের সঠিক আর্থ-সামাজিক উন্নতি সম্ভবপর হবে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল মানুষকে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অনাহার ইত্যাদি অভিশাপ মুক্ত করা। একমাত্র স্থিতিশীল উন্নয়ণের মাধ্যমেই মানব সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়। এজন্য দরকার একাধারে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা, অন্যদিকে যথার্থ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য দায়িত্বশীল পরিকল্পনা হাতে নেওয়া। আমরা জানি যখনই রাস্তা বা রেলপথ তৈরি করি, তখন একদিকে যেমন জলাভূমি ভরাট করি, অন্যদিকে তেমনি পরিবেশের ক্ষতি করি। এজন্য এই পরিকল্পনায় এমন কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয় যাতে মানুষের উন্নতি করতে গিয়ে পরিবেশের ক্ষতি না হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বসুন্ধরা সম্মেলন বা the Earth Summit-র সাত দফা কর্মসূচী। বস্তুতপক্ষে, উন্নয়ণের সাথে সাথে পরিবেশের ক্ষতি সাধন যাতে হয়, এ ব্যাপারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

7.10 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

প্রশ্নমালা

1. স্থিতিশীল উন্নয়ণ বলতে কি বোঝেন? স্থিতিশীল উন্নয়ণের গুরুত্ব কী?
2. স্থিতিশীল উন্নয়ণের জন্য গ্রহণীয় পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
3. বসুন্ধরা সম্মেলনের সাত দফা কর্মসূচী কী কী? আলোচনা করুন।
4. স্থিতিশীল উন্নয়ণকল্পে নির্দেশিকাসমূহ আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন : (টিকা লিখুন)

1. সম্পদের ব্যবহার এবং পরিবেশের গুণমান
2. ব্রান্টল্যান্ড রিপোর্ট
3. বসুন্ধরা সম্মেলন
4. স্থিতিশীল উন্নয়ণের পটভূমি

7.11 উত্তরমালা

অনুশীলনী - 1

1. 7.2 অংশাঙ্কিত অংশ পড়ুন।
2. 7.7 অংশাঙ্কিত অংশ দেখুন।
3. 7.3 অংশাঙ্কিত অংশ দেখুন।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী :

1. 7.2 অংশে দেখুন।
2. 7.5 অংশে দেখুন।
3. বিশেষ আলোচনা লক্ষ্য করুন।
4. 7.4 অংশে দেখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

1. 7.7 অংশে দেখুন।
2. 7.2 অংশে দেখুন।
3. বিশেষ আলোচনা লক্ষ্য করুন।
4. 7.3 অংশে দেখুন।

গ্রন্থ নির্দেশিকা ঃ

অজিতকুমার শীল, 1998 ঃ সম্পদ সমীক্ষা, শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা।

হরীশ চট্টোপাধ্যায় 2000 ঃ অর্থনৈতিক ভূগোল ও সম্পদ শাস্ত্রের পরিচয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডি. ডি. পাবলিকেশনস, কলকাতা।

আশীষ মুখোপাধ্যায় ও সূর্যপ্রকাশ আগরওয়াল 2000 ঃ আধুনিক পরিবেশবিদ্যা, ভট্টাচার্য ব্রাদার্স, কলকাতা

কুন্তলা লাহিড়ী দত্ত 2000 ঃ উৎকর্ষণ সমীক্ষা, ওয়ার্ল্ড প্রেস, কলকাতা।

জ্যোতির্ময় সেন 1999 ঃ জনসংখ্যা ভূগোল, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, কলকাতা।

তরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 1994 ঃ অর্থনৈতিক সম্পদ সমীক্ষা, ছায়া প্রকাশনী, কলকাতা।

জয়কমল ঘোষ 1994 ঃ সম্পদ অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, কলকাতা।

দুর্গা বসু 1982 ঃ গ্রাম পুনর্গঠন প্রযুক্তি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।

নাগরিক মঞ্চ 2000 ঃ বিপন্ন পরিবেশ, নাগরিক মঞ্চ, কলকাতা।

বিকাশরঞ্জন মিত্র 2000 ঃ পরিবেশবিদ্যা, জে. চৌধুরী এন্ড ব্রাদার্স, মালদহ

ভোলানাথ চক্রবর্তী ও অন্যান্য 2000 ঃ মানুষ ও পরিবেশ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।

সন্তোষকুমার ঘোড়ই 2000 ঃ পরিবেশ, দীপ প্রকাশন, কলকাতা।

সোমনাথ মিশ্র 2000 ঃ পরিবেশ বিজ্ঞান, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা।

R. C. Chanda, 1992	:	**A Geography of Population**, Kalyani Pub, Ludhiana.
Guha, J. L. and P. R. Chattaraj, 1989	:	**Economic Geography** , World Press Kolkata.
Leong, Goh Chang and G. C. Mongon, 1972	:	**Human and Economic Geography** Oxford university Press, Oxford
Mukherjee, Sampat & A. Ghosh, 2002	:	**Environmental Studies**, New Central Book Agency, Kolkata.
Sakena, H. M. 1999	:	**Environmental Geography** Rawat Publications, Joipur.
Singh, Saindra, 1993	:	**Environmental Geography**, Prayag Pustek Bhawan, Allahabad.
Thoman, Richard S. et.al 1968	:	**The Geography of Economic Activity**, Mcgraw-Hill Book Co., New York.
Zimmermann, Erich W,1950	:	**World Resources and Industries**, Harper & Row, New york.

E. G. R. – 06

পর্যায়–2

একক 7A ❑ সম্পদের ব্যবহার — উৎপাদন প্রক্রিয়া, প্রযুক্তি ও পরিবেশের গুণমান

গঠন

7A.0 প্রস্তাবনা

7A.1 উদ্দেশ্য

7A.2 সম্পদের উৎপাদন ও প্রযুক্তি

7A.3 জনাধিক্য, সম্পদহ্রাস ও পরিবেশ দূষণ

7A.4 সম্পদ হ্রাস ও প্রযুক্তির ব্যবহার

7A.5 সম্পদ সংরক্ষণে প্রযুক্তির ব্যবহার

7A.6 সারাংশ

7A.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

7A.8 উত্তরমালা

7A.0 প্রস্তাবনা

সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে যদিও প্রকৃতি সমস্ত সম্পদের ধারক ও বাহক কিন্তু এই সম্পদের উৎপাদন, ব্যবহার বা এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি — সবটাই মানব সম্পদের উপর নির্ভরশীল। মানুষ তার জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তায় সম্পদের ব্যবহার ও তার মূল্যায়ন করে থাকে। সম্পদের ব্যবহারের আধিক্য বা সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার সম্পদের পরিমাণকে ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর করে চলেছে। উদাহরণস্বরূপ D.H. Meadows-এর কথায় বলা যায় যে প্রকৃতিতে যে পরিমাণ কয়লা সঞ্চিত রয়েছে তার উত্তোলনের হার যদি একরূপ থাকে এবং জনসংখ্যা যদি স্থিতাবস্থায় থাকে তা হলে আগামী 2300 বছর পর্যন্ত কয়লা মজুত থাকবে কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ যদি অব্যাহত থাকে তবে সঞ্চিত কয়লার সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল হবে আর মাত্র 2150 বছর।

এইভাবে প্রকৃতির সব গচ্ছিত সম্পদ একসময় নিঃশেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনাকে অনেকটাই পিছিয়ে দিতে পারে সম্পদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার। প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি ঘটিয়ে সম্পদের অবিমৃষ্যতার পরিমাণকে যেমন পিছিয়ে দেওয়া যায় তেমনি আবার ব্যবহৃত সম্পদের পুনর্ব্যবহার দ্বারাও বিভিন্ন সম্পদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করা সম্ভব।

তাই সম্পদের ব্যবহার কিভাবে করলে সম্পদকে সর্বকালের এবং সর্বজনের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব হয় সে বিষয়ে সুষ্ঠু জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। এর কারণ প্রকৃতিতে সম্পদ সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ সম্পদের বৃদ্ধি ঘটানো

কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। তবে মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা, জ্ঞান বিজ্ঞানের সহায়তায় এই প্রাকৃতিক সম্পদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে প্রাকৃতিক সম্পদের আপাত যোগানকে বজায় রাখতে কৃতকার্য হবে।

7A.1 উদ্দেশ্য

- এই এককটি পাঠ করলে আপনি সম্পদের উৎপাদন প্রক্রিয়া কি তা জানতে পারবেন।
- আপনি জানতে পারবেন উৎপাদন ও প্রযুক্তি কিভাবে একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।
- সম্পদ হ্রাসের সময়কে কিভাবে পিছিয়ে দেওয়া যায় সে বিষয়ে আপনি বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- মানুষ কিভাবে উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সম্পদ সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করে চলেছে তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- সম্পদের ব্যবহারের ফলে কিভাবে প্রকৃতির বিনাশ ঘটে চলেছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সর্বশেষ সম্পদের বিনাশকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে মানুষের কার্যকারিতা সম্বন্ধে সকলকে বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

7A.2 সম্পদের উৎপাদন ও প্রযুক্তি (Resource processes and Technology)

সম্পদ হল এমন একটা বস্তু যা প্রকৃতিতে অবস্থান করছে এবং ঐ বস্তু মানুষ তার প্রয়োজনে ব্যবহার করছে। অর্থাৎ প্রকৃতিতে বস্তুটির কেবলমাত্র অবস্থান হলেই চলবে না — ঐ বস্তুটির মধ্যে কার্যকারিতা শক্তি নিহিত থাকতে হবে। বস্তুটির এই কার্যকারিতা শক্তিই হল সম্পদ। সম্পদের এই কার্যকারিতাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ তার অভাব মোচন করে। এর ফলে দেখা যায় যে মানুষ নিজ প্রয়োজনে সম্পদের ব্যবহার করতে করতে তাকে প্রায় নিঃশেষ করে দেয়, এদিকে প্রকৃতিতে প্রাপ্ত এই সব সম্পদের একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সেই সীমাবদ্ধ সম্পদের পরিমাণকে মানুষ নিজ প্রয়োজনে বৃদ্ধি ঘটাতে পারে না বা প্রাপ্ত সম্পদের পরিমাণকে কমিয়ে দিতে পারে না। প্রযুক্তির সহায়তায় মানুষ যেমন নূতন নূতন সম্পদের আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে তেমনি ঐ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সম্পদের ব্যবহারের সময়সীমাকে বর্ধিত করতে পারে। সম্পদ ব্যবহারে প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে নীচে আলোচনা করা হল :—

1. খনিজ সম্পদের উত্তোলনে প্রযুক্তির ব্যবহার বিজ্ঞানসম্মতভাবে করতে পারলে সম্পদের ব্যবহারের সময়কাল বৃদ্ধি করা যায়। অর্থাৎ যে সম্পদ সংগ্রহের ফলে যা 25 বৎসরে নিঃশেষিত হত সেই সময়কাল বৃদ্ধি হয়ে তা 50 বা 100 বছর হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে আগে অভ্রের উত্তোলনের সময় প্রচুর পরিমাণে অভ্র চূর্ণ বিনষ্ট হত কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে উত্তোলনের ফলে অভ্রের অপচয় অনেকাংশে কমে গেছে এবং এর ফলে একদিকে যেমন উত্তোলনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে তেমনি অভ্রচূর্ণ বিভিন্ন শিল্পের কাজে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। পূর্বে লৌহ-ইস্পাতের বস্তু একমাত্র লৌহ আকরিক হতেই প্রস্তুত করা হত কিন্তু বর্তমানে লৌহের সাথে নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ, টাংস্টেন ইত্যাদি আকরিকের মিশ্রণের ফলে লৌহের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও আকরিকের উত্তোলন অনেকাংশে বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

এইভাবে বিভিন্ন খনিজের উত্তোলন ও ব্যবহারের ফলে একদিকে যেমন খনিজের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে অন্যদিকে তেমনি খনিজের কার্যকারিতা শক্তিরও বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

2. ব্যবহৃত খনিজ সম্পদের পুনর্ব্যবহার সম্পদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ব্যবহৃত লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি পুনর্বার শিল্পে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে একদিকে যেমন এইসব আকরিকের উত্তোলন হ্রাস ঘটেছে অন্যদিকে তেমনি শিল্পের অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। এইভাবে শিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন খনিজ সম্পদের পুনর্ব্যবহারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে সম্পদের হ্রাসকে আরও বিলম্বিত করা সম্ভব হবে।

3. খনিজ সম্পদের উত্তোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে যে সকল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হত বর্তমানে তদপেক্ষা অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় ফলে খনিজ দ্রব্যাদি উত্তোলন একদিকে যেমন দ্রুততর হয়েছে তেমনি উত্তোলন-কালীন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও কমেছে। খনিজ উত্তোলনের এই দিকে লক্ষ্য দিয়ে বিভিন্ন খনিজের উত্তোলনের পুনর্বিন্যাস সম্ভব হলে উত্তোলনের পরিমাণ বৃদ্ধি, ক্ষয়ক্ষতি ও ব্যয়ভার কমানোর দিকে বর্তমানে অধিক পরিমাণে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

4. বিভিন্ন খনিজ উত্তোলনের ফলে দেখা যাচ্ছে যে খনিজ সম্পদ ধীরে ধীরে হ্রাসের মুখে যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপেলেশিয়ান অঞ্চল হতে পূর্বে উত্তর আমেরিকার প্রায় 90% তৈল উত্তোলন করলেও বর্তমানে মাত্র 1% সরবরাহ করতে সক্ষম হচ্ছে। ভারতের কোলার স্বর্ণ খনির সঞ্চয় ধীরে ধীরে হ্রাসের দিকে এবং উৎপাদন এতই কমে গেছে যে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার উদ্দেশ্যে সপ্তাহে মাত্র দু দিন খনির কাজ চলছে। তাই শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে এই সকল অঞ্চলগুলি আজ তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। এখানে উত্তোলনের খরচ যেমন বেশি অন্যদিকে তেমনি কাঁচামালের সরবরাহও অনেক কম। এমতাবস্থায় নূতন নূতন খনিজ সম্পদের সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে কম গুরুত্বপূর্ণ খনি অঞ্চলগুলির উৎপাদনকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী করতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন।

5. পুরাতন খনি অঞ্চলের উৎপাদনকে অব্যাহত রেখে নূতন নূতন খনির আবিষ্কার অতি প্রয়োজন। নূতন খনির আবিষ্কার পুরাতন খনিজ সম্পদের ব্যবহারের হারকে কমাতে সাহায্য করে। ভারতে O.N.G.C বা I. O. L সংস্থা দেশের বিভিন্ন অংশে তথা সমুদ্রের তটভূমি হতে তেলের সন্ধানে রত হয়েছে। নূতন তৈল খনির আবিষ্কার হলে ভারতের ক্ষেত্রে তৈল বাজারে এক নূতন দিগন্তের উন্মেষ হবে। এইভাবে ভারতের বম্বে হাই হতে কাবেরী অববাহিকা অঞ্চলে তেলের খনির সন্ধান মিলেছে, মিলেছে সীসা ও দস্তার খনি রাজস্থান ও গুজরাট অঞ্চলে, মধ্যপ্রদেশের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে লৌহখনি। এইভাবে উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নূতন নূতন খনিজ সম্পদ আবিষ্কার করে খনিজ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক বিরাট যুগান্ত সৃষ্টি করেছে।

6. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় নিম্নমানের খনিজ সম্পদগুলিকে বর্তমানে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা সম্ভব হয়েছে। ইতিপূর্বে নিম্নমানের খনিজ উত্তোলনে ব্যয়ভার অধিক ও উৎপাদন কম বলে ঐদিকে নজর দেওয়া হত না কিন্তু বর্তমানে নিম্নমানের খনিজকে বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহারের উপযোগী করতে কারিগরী সহায়তা গ্রহণ করা হচ্ছে কারণ নিম্নমানের খনিজের সদ্ব্যবহার বৃদ্ধি পেলে উচ্চমানের খনিজের সংরক্ষণকে দীর্ঘায়িত করা সম্ভব হবে।

7. নতুন নতুন আবিষ্কারের সহায়তায় পুরাতন চিরাচরিত সম্পদের ব্যবহারের পরিবর্তে নতুন নতুন সম্পদ ব্যবহার করে পুরাতন সম্পদের সংরক্ষণ সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় — একদা বনভূমি হতে সংগৃহীত কাঠ

জ্বালানির প্রধান সহায় ছিল। পরবর্তী সময়ে কয়লার আবিষ্কার বনভূমিকে এবং খনিজ তৈলের আবিষ্কার কয়লার সংরক্ষণে সহায়তা করেছে। এমনিভাবেই বর্তমানে জলবিদ্যুৎ শক্তি কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের ব্যবহারকে সংযত করতে সহায়তা করছে। রেলের কাঠের স্লিপারের পরিবর্তে লোহার স্লিপার ও বর্তমানে কংক্রিটের স্লিপারের ব্যবহার সম্ভব হয়েছে ফলে কাঠ ও লোহার ব্যবহারকে কমাতে সাহায্য করেছে। এইভাবে নতুন নতুন শিল্পজাত দ্রব্যের উদ্ভাবন যেমন সম্ভব হচ্ছে তেমনি এই উদ্ভাবন পুরাতন দ্রব্যাদির ব্যবহারকে কমিয়ে আনতেও সহায়তা করে চলেছে।

এইভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় বিভিন্ন উন্নত দেশগুলি সম্পদের হ্রাসকে নিঃশেষিত হবার হাত হতে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছে। যদিও একথা সত্য যে ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে ধীরে ধীরে সঞ্চিত সম্পদ একদিন নিঃশেষিত হবে কিন্তু একথাও ঠিক যে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি এই নিঃশেষের সময়সীমাকে বর্ধিত করতে পারবে। কিন্তু অনুন্নত দেশগুলি উন্নত দেশগুলির উন্নত প্রযুক্তির অভাবে এই কার্যে ততটা সফলতা লাভ করতে সমর্থ হয়নি। বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলিও বিদেশ হতে উন্নত প্রযুক্তি আমদানি করে নিজ নিজ দেশের সম্পদের ব্যবহারকে বিলম্বিত করতে সচেষ্ট হয়েছে।

7A.3 জনাধিক্য, সম্পদ হ্রাস ও পরিবেশ দূষণ (Over population, Resource Depletion and Environmental Pollution)

জনাধিক্য বলতে এমন একটি অবস্থা বোঝায় যখন দেশের জনসংখ্যার তুলনায় সম্পদের পরিমাণ কম হবে। তবে সাধারণত দেশের কার্যকরী জমির সঙ্গে জনবসতির — অনুপাত দ্বারা জনাধিক্যতাকে বর্ণনা করা সহজ। জনবসতির ঘনত্ব বলতে কোন অঞ্চলের বা কোন দেশের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে তাকে বোঝান হয়। অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যাকে দেশের মোট জমির অনুপাত দিয়ে ভাগ করলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তাই হল জনবসতির ঘনত্ব। অর্থাৎ

$$\text{জনঘনত্ব} = \frac{\text{মোট জনসংখ্যা}}{\text{মোট জনবসতি}}$$

এই জনাধিক্য সম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন আশীর্বাদ অন্য দিকে তেমনি এর মধ্যে অভিশাপও অন্তর্নিহিত রয়েছে কারণ জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহজ হয়, চাহিদার বৃদ্ধি ঘটে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায় আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষিযোগ্য জমির ক্ষেত্রে ঘাটতি পড়ে। এর প্রভাব পড়ে খাদ্য উৎপাদনের উপর এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক সমস্যার সৃষ্টিও করে। একথা সত্য যে কোন অঞ্চলের জনসংখ্যা যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ উৎপাদন করতে ও উৎপাদিত সমস্ত সামগ্রীকে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে পারে অর্থাৎ জনসংখ্যা যতক্ষণ পর্যন্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই অঞ্চলের জনসংখ্যা কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না কিন্তু যখনই জনসংখ্যার পরিমাণ ঐ উন্নতির পরিমাণকে বৃদ্ধি না করে অবনতির দিকে পরিচালিত করে তখনই বিবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। জনাধিক্য ঘটার ফলে —

ক. অধিক জনসংখ্যার ফলে অধিক উৎপাদন ঘটে।

খ. মোট দেশের আয় বৃদ্ধি হলেও জনপ্রতি আয়ের পরিমাণ কম হয়।

গ. সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণের পার্থক্য দেখা যায়।

ঘ. খাদ্যের ঘাটতি পড়ে।

ঙ. খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে।

চ. অধিক ব্যবহারের ফলে সম্পদের হ্রাস ঘটে।

ছ. সর্বোপরি পরিবেশ দূষণ ঘটে।

উন্নত দেশগুলিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সে সকল দেশের উৎপাদন উন্নয়ন জনসংখ্যার অনুকূল কিন্তু উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে জনসংখ্যার পরিমাণ দেশগুলির কার্যকরী সম্পদ ও জমির উৎপাদনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে ফলে মানব সম্পদ ও সম্পদ উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটছে।

Food and Agricultural Organisation-এর সমীক্ষায় দেখা গেছে যে পৃথিবীতে যে পরিমাণ ভূমিভাগ রয়েছে তার মাত্র অর্ধেক জমি কৃষিযোগ্য এবং অবশিষ্ট জমির যে অংশ পতিত রয়েছে তাকে কৃষিযোগ্য করে উৎপাদন করলে সেই জমিতে যে ফসল উৎপাদিত হবে তা লাভজনক হবে না। এমতাবস্থায় দেখা যাচ্ছে যে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা খুবই কম; কাজেই জনসংখ্যার বৃদ্ধির পরিমাণকে যদি কমিয়ে আনা যায় তবেই সমস্যার সমাধানের পথ খোলা যাবে নতুবা কৃষি উৎপাদনও খুব শীঘ্রই সঙ্কট সীমানায় পৌঁছাবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য সমস্যা যেমন প্রকট হবার সম্ভাবনা রয়েছে তেমনি ক্রমবর্ধমান ভোগের চাহিদা মেটাবার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের অধিক ব্যবহারও সম্পদকে এক বিশেষ সঙ্কট সীমানায় পৌঁছে দেবে। এরূপ ক্ষেত্রে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের দ্বারা সম্পদের সঙ্কট হ্রাসে সহায়তা করতে সমর্থ হবে বলে বিজ্ঞানী মহলের ধারণা।

সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার প্রাকৃতিক পরিবেশকে দূষিত করে তুলছে। বর্তমানে গ্রীন হাউজ-এফেক্ট-(Green House Effect) এর প্রভাবে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে বৃষ্টির পরিমাণও কমে গেছে। কম বৃষ্টিপাতের দরুন অরণ্য ও শস্য উৎপাদনের উপরও এর প্রভাব পড়ছে। বিভিন্ন কলকারখানায় ধোঁয়া গ্যাস ইত্যাদির ফলে বাতাস দূষিত হয়ে অ্যাসিড বৃষ্টি ঘটিয়ে বনভূমি, শস্য ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিকাকেও দূষিত করে তুলেছে। জলদূষণের ফলে বা সমুদ্র জলে ভাসমান তেলের আস্তরণ মৎস্য ও নানা জলজ প্রাণীর বংশ বিস্তারে ব্যাঘাত ঘটিয়ে চলেছে। এছাড়া প্রযুক্তির অভাবে উৎপাদিত দ্রব্য এবং উৎপাদন উভয়ই পিছিয়ে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে অনুন্নত প্রথায় চাষ আবাদের ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি পরিকল্পনা সময়মত গ্রহণ না করার জন্যও সম্পদের হ্রাস ঘটছে।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে জনাধিক্য সম্পদ হ্রাস এবং পরিবেশ দূষণ এগুলি একটির সঙ্গে অন্যটি অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। তাই সম্পদের ব্যবহার ও তার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নজর দিতে হলে জনসংখ্যার দিকেও তীক্ষ্ণ নজর রাখার প্রয়োজন রয়েছে। জনসংখ্যার চাপ যত বৃদ্ধি হবে ততই ঐ বাড়তি জনসংখ্যার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ইত্যাদির ব্যাপক আয়োজন করতে হবে যা ভবিষ্যতে সম্পদের অভাব ঘটাবে।

7A.4 সম্পদ হ্রাসে প্রযুক্তির ব্যবহার (Resource Depletion and use of Technology)

সম্পদ অসীম নয়। সম্পদের একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তাই সম্পদের ব্যবহার যদি সংযত ও বৈজ্ঞানিক

প্রথায় না হয় তবে সম্পদের হ্রাস দ্রুত হতে দ্রুততর হবে। সম্পদ হ্রাসের কারণগুলি যদি বিস্তারিত ভাবে জানা থাকে তবে সম্পদ হ্রাসের অগ্রগতিকে রোধ করা সম্ভব হবে। সম্পদ হ্রাসের কারণগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

- প্রয়োজনীয় সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার সম্পদের হ্রাসকে ত্বরান্বিত করে থাকে। যেমন বর্তমানে জনাধিক্যের ফলে কৃষি জমি হতে একাধিক ফসল উৎপন্ন করা হচ্ছে এবং একই জমি হতে বার বার বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের ফলে জমির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য জৈবিক বা রাসায়নিক সারের ব্যবহারের ফলে মৃত্তিকা ধীরে ধীরে তার প্রাকৃতিক উর্বরতা শক্তি হারিয়ে ফেলছে এবং উৎপাদন ব্যাহত হয়ে চলেছে।

- সম্পদের অপচয় অর্থাৎ প্রয়োজনীয় ব্যবহার সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান আহরণ না করে সম্পদ উত্তোলন বা সম্পদের ব্যবহার করার ফলে সম্পদের অপচয় ঘটে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে খোলা পদ্ধতিতে কয়লা আহরণ করার ফলে প্রচুর পরিমাণে কয়লার অপচয় ঘটে। আবার স্থানীয় মানুষের এই অপচয় সম্পর্কে যথোপযুক্ত জ্ঞানের অভাবও এই অপচয়ে সহায়তা করে থাকে। বনভূমির নিকটবর্তী বসবাসকারী মানুষেরা বনভূমির কাঠ কেবলমাত্র জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে ধ্বংস করে চলেছে। এইভাবে সম্পদের অপচয় সম্পদের হ্রাস ঘটাতে সহায়তা করে থাকে।

- বর্তমানে উন্নত কারিগরীর সহায়তায় মানুষ সম্পদের অপচয়কে সম্পূর্ণরূপে রোধ করতে না পারলে বিভিন্ন অব্যবহার্য পদার্থকে বিজ্ঞানের সহায়তায় কার্যকরী করে তুলতে সমর্থ হয়েছে যেমন একসময় গোবর কেবলমাত্র ক্ষেতে সার দেওয়া বা শুকিয়ে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হত কিন্তু বর্তমানে এই গোবর হতে বায়োগ্যাস (Biogas) উৎপাদিত হয় এবং এই গ্যাস গ্রামাঞ্চলে ঘরে বাতি জ্বালাতে বা রান্নার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এইভাবে শহরের বর্জ্য পদার্থ একদা জঞ্জালরূপে শহরের প্রান্তে অব্যবহৃত স্থানে নিক্ষেপ করা হত এখন তা ব্যবহৃত হচ্ছে শক্তি উৎপাদনে। তাই একথা অনস্বীকার্য যে কারিগরী জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অব্যবহৃত বস্তুও সম্পদে পরিণত হচ্ছে এবং সম্পদের অপচয়ও বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে।

- বিভিন্ন সম্পদ উৎপাদিত হয়ে পূর্বে তার একমুখী ব্যবহার ছিল যেমন পেট্রোলিয়াম কেবল মাত্র শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হত কিন্তু বর্তমানে পেট্রোলিয়াম হতে নানা উপজাত দ্রব্য উৎপাদিত হচ্ছে এবং তার ফলে পেট্রোলিয়ামের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে, এরূপ যে সব খনিজ সম্পদের বহু ব্যবহার রয়েছে সেগুলির অতি ব্যবহার সম্পদ হ্রাসের আর একটি অন্যতম কারণ।

- সম্পদের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে পরিবেশের যেমন অবনমন ঘটছে তেমনি অধিক ব্যবহারের ফলে সম্পদের হ্রাস ঘটিয়ে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে চলেছে। যেমন অধিক পরিমাণে বনভূমি ধ্বংস হবার ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশে বৃষ্টির অভাব লক্ষ্য করা গেছে এবং মৃত্তিকাক্ষয় ইত্যাদি নানা ক্ষয়ক্ষতি দেখা দিচ্ছে। আবার খনি অঞ্চল হতে অধিক খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের ফলে ভূমি-ধ্বসের ঘটনা বেড়ে চলেছে।

এইভাবে সম্পদের হ্রাসের ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে চলেছে তাকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতা সাধন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন করতে পারলে সম্পদ সংরক্ষিত হয়ে আবার সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধিত হবে।

7A.5 সম্পদ সংরক্ষণ ও প্রযুক্তি (Resource Conservation and Technology)

সম্পদের ব্যবহারের মত সম্পদের সংরক্ষণেও প্রযুক্তির ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। প্রযুক্তির সহায়তায়

একদিকে যেমন অধিক পরিমাণে সম্পদ সংগ্রহে সহায়তা করে অন্যদিকে তেমনি সম্পদের সংরক্ষণেও সহায়তা করে। সম্পদ সংরক্ষণের জন্য যে সব প্রযুক্তির ব্যবহার প্রয়োজন সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা হল।

- বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সম্পদের ব্যবহার করলে সম্পদের পরিমাণ ও তার আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কয়লার বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার এবং এর বিভিন্ন উপজাত দ্রব্যের আবিষ্কার ইত্যাদি কয়লার অপচয় হ্রাসে সহায়তা করছে এবং স্থায়িত্বও বৃদ্ধি করতে সাহায্য করছে। সুতরাং কয়লার মত অপুনর্ভব সম্পদগুলিকে সংরক্ষণ করতে হবে। সম্পদের সংরক্ষণ মানে সম্পদের ব্যবহার বন্ধ করা নয়, সম্পদের পরিমিত ব্যবহার বা বিকল্প সম্পদের ব্যবহার।

- উচ্চমানের সম্পদকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় নিম্নমানের সম্পদকে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে হবে। যেমন নিম্নমানের কয়লাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তার জ্বালানি শক্তিকে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। ফলে উচ্চমানের কয়লাকে কম ব্যবহার করে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। পূর্বে কেবলমাত্র বিটুমিনাস ও অ্যানথ্রাসাইট কয়লাই শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হত কিন্তু বর্তমানে লিগনাইট ও পিট কয়লারও বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

- কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষিত শ্রমিকের সাহায্যে সম্পদ সংগ্রহ সম্ভব হলে সম্পদের উপযুক্ত আহরণ ও ব্যবহার সম্ভব হয়।

- সম্পদের পুনর্ব্যবহার সম্পদ সংরক্ষণের আর একটি বিশেষ উপায় বললে কিছু ভুল হবে না। বর্তমানে ব্যবহৃত লোহার সরঞ্জাম, অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত সামগ্রী, পুরান ভাঙা টিন ইত্যাদি বর্জ্য পদার্থকে আবার নতুন করে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হচ্ছে। এতে প্রাথমিক ভাবে ব্যয়ভার অধিক হলেও ভবিষ্যতে সম্পদকে বাঁচিয়ে রাখতে এটি একটি বিশেষ পন্থা তাতে কোন সন্দেহ নেই।

- পৃথিবীতে যে হারে সম্পদের ব্যবহার করা আরম্ভ হয়েছে তার ফলে অদূর ভবিষ্যতে যে কোন সঞ্চিত সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই সম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রযুক্তিগত সব ব্যবস্থা গ্রহণ করার দিকে নজর দিতে হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তির উন্নতি করাও প্রয়োজন। এ ছাড়াও প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতি করে অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করার দিকেও নজর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। সৌরশক্তি, ভূতাপীয় শক্তি, জোয়ার ভাঁটার শক্তি, বর্জ্য পদার্থের শক্তি, গোবর গ্যাস ইত্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে পারলে অপুনর্ভব সম্পদের ভাণ্ডারকে সংরক্ষণ করা সম্ভব।

বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে জৈব গ্যাস বা বায়োগ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে তার সাহায্যে প্রত্যন্ত গ্রামে আলো জ্বালানো সম্ভব হচ্ছে। সম্ভব হচ্ছে রান্নার জন্য গ্যাসের ব্যবহার। গোবর গ্যাস প্রকল্পে যে জৈব সার পাওয়া যায় তা কৃষিকাজে লাগান সম্ভব হচ্ছে। এই সার একদিকে যেমন রাসায়নিক সারের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব অন্যদিকে তেমনি পরিবেশ দূষণ মুক্ত হবে।

এইভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় ভবিষ্যতে যদি সৌরশক্তি, ভূ-তাপ শক্তি, জোয়ার-ভাঁটার শক্তি কাজে লাগান সম্ভব হয় তবে ভবিষ্যতে পৃথিবীর জ্বালানি শক্তির সংরক্ষণ অনেকাংশেই সম্ভব হবে এবং পরিবেশকে দূষণমুক্ত করতেও সহায়তা করবে। প্রকৃতি হতে এই সব সংগৃহীত শক্তি প্রকৃতপক্ষে প্রবহমান শক্তি তাই এই শক্তির ব্যবহারে পরিবেশ দূষিত হবার সম্ভাবনা অনেক কম।

- সম্পদ সংরক্ষণের নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পদের ব্যবহার ও উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন সম্পদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। যেমন মৎস্য-সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যে নীতি গ্রহণ

করা হয় কয়লা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সেই সকল নীতি সামগ্রিকভাবে প্রয়োজনীয় হয় না। অতএব সম্পদের ব্যবহার ভিত্তিক নীতি সম্পদ-সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সামগ্রিক ভাবে সহযোগী হবে।

- সম্পদ সংরক্ষণের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতারও বিশেষ। যে সব দেশ উন্নয়নশীল বা অনুন্নত সেই সকল দেশগুলি উন্নত দেশের কারিগরী প্রযুক্তির সহায়তা গ্রহণ করলে নিজেদের দেশের সম্পদকে সঠিকভাবে কাজে লাগান ও সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার দিকেও নজর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন। কারণ জনসংখ্যার চাপ কমলে স্বভাবতই সম্পদের চাহিদা কমবে। ও সম্পদ সংরক্ষণও সম্ভব হবে। এই কারণে উন্নত দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কঠোরভাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন নতুবা ভারত, বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলির চলার গতি অবশ্যই পিছিয়ে পড়বে।

- পৃথিবীর সম্পদ সংকটের সমীক্ষায় দেখা গেছে যে বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে সম্পদের সর্বাপেক্ষা বিনাশ ঘটেছে। 1990-এর ফেব্রুয়ারি মাসে উপসাগরীয় যুদ্ধের কারণে সমুদ্রের যে বিশাল এলাকা জুড়ে দূষণের সৃষ্টি হয়, তার ব্যাপকতা ও তীব্রতার মাত্রা ছিল "এক্সন ভ্যালদেজ" দুর্ঘটনার প্রায় 30 গুণ বেশি। কেমব্রিজের "ওয়ার্লড কনজারভেশন মনিটরিং সেন্টার"-এর মতে (World Conservation Monitoring Centre) উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রায় 20 লক্ষ সামুদ্রিক পাখি, অসংখ্য লেদার ব্যাক (Leather back) প্রজাতির কচ্ছপ (Turtle) ও সামুদ্রিক প্রাণী এই তৈল দূষণের ফলে নিশ্চিহ্ন হয়। শুধু তাই নয়, ইরানের উপকূলে বেড়ে ওঠা ম্যানগ্রোভ (Mangrove) অরণ্য ও চিংড়ি চাষের লবণাক্ত জলাভূমিগুলির অপূরণীয় ক্ষতি হয়। এছাড়া, সৌদি আরবের উপকূলে পানীয় জল শোধনের কেন্দ্রগুলির অর্ধেক অকেজো হয়ে পড়ে।

এই সব যুদ্ধ বিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে বন্যা, ধস, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণগুলিও সম্পদ ধ্বংসের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির সাহায্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ করা বা সময়মত উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া গেলে বিরাট ক্ষতির হাত হতে সম্পদকে অনেকাংশেই রক্ষা করা সম্ভব হবে।

- সম্পদের সুষম বণ্টনও সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থার আর একটি বিশেষ পন্থা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের সরবরাহ সম্পদের অপচয় ঘটায় তাই চাহিদা অনুযায়ী সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থাও অত্যন্ত জরুরি।

7A.6 সারাংশ

সম্পদের ব্যবহার বলতে পৃথিবীর বিভিন্ন গচ্ছিত যা পূর্বভিত্ত সম্পদকে মানুষ কিভাবে তার দৈনন্দিন জীবনে কি কি কার্যে ব্যবহার করে চলেছে তাই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সম্পদের ব্যবহার কিভাবে বিশ্বে সংকট সৃষ্টি করে চলেছে এবং সেই সংকট হতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কিভাবে পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারে সেই দিকটা তুলে ধরা হয়েছে। দেখান হয়েছে যে মিতব্যয়িতার সঙ্গে সম্পদের ব্যবহার কিভাবে সম্পদ সংরক্ষণে সহায়তা করে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন আবিষ্কারের দিকেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কিভাবে সহায়তা করে সেই দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সর্বশেষ, সম্পদের সংকট কিভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে চলেছে এবং কি উপায়ে তা রক্ষা বা রোধ করা সম্ভব হবে সেই সম্পর্কেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

7A.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

1. সম্পদ উৎপাদনে প্রযুক্তির ব্যবহার বর্ণনা করুন।
2. জনাধিক্য কীভাবে সম্পদ হ্রাস ঘটায় এবং এই সম্পদের হ্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ দূষণ সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
3. সম্পদ হ্রাস বলতে কী বোঝায়? সম্পদ হ্রাসে প্রযুক্তির ব্যবহার কীভাবে সহায়তা করে থাকে?
4. সম্পদ সংরক্ষণে প্রযুক্তির ব্যবহার সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :—

1. সম্পদ উত্তোলনে প্রযুক্তির ব্যবহার কীরূপ?
2. সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার কীরূপে সম্ভব?
3. নতুন নতুন আবিষ্কার কীভাবে সম্পদের ব্যবহারকে হ্রাস করতে পারে?
4. জনাধিক্য বলতে কী বোঝ?
5. জনাধিক্য কী কী সমস্যার সৃষ্টি করে?
6. সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার কীভাবে পরিবেশকে দূষিত করে?
7. উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলে সামুদ্রিক সম্পদের কিরূপ ক্ষতিসাধন করেছে।
8. জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ ও সম্পদ সংরক্ষণ কীভাবে একে অপরের সঙ্গে জড়িত লিখুন?
9. অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার কীভাবে সম্পদ সংরক্ষণে সহায়তা করে বর্ণনা করুন।

7A.8 উত্তরমালা

1. 7A.2 অংশ দেখুন।
2. 7A.3 অংশ দেখুন।
3. 7A.4 অংশ দেখুন।
4. 7A.5 অংশ দেখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন

1. 7A.2.1 ও 3 অংশ দেখুন।
2. 7A.2.2 অংশ দেখুন।
3. 7A.2.7 অংশ দেখুন।

4. 7A.3 প্রথম অংশ – জনাধিক্য হতে .... জনঘনত্বের সমীকরণ পর্যন্ত দেখুন।

5. 7A.3 ক হতে ঙ পর্যন্ত অংশ দেখুন।

6. 7A.3 অংশে সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার .... ব্যাঘাত ঘটিয়ে চলেছে পর্যন্ত দেখুন।

7. 7A.4 অংশ দেখুন।

8. 7A.3 প্রথম অংশের জনাধিক্য হতে ..... সমস্যার সৃষ্টি করে এরপর জনসংখ্যা বৃদ্ধি .... বিজ্ঞানী মহলের ধারণা পর্যন্ত দেখুন।

9. 7A.5.10 অংশ দেখুন।

গঠন

৪A.0 প্রস্তাবনা

৪A.1 উদ্দেশ্য

৪A.2 বনভূমির সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও আয়তন

৪A.3 বনভূমির অর্থনৈতিক গুরুত্ব

৪A.4 বনভূমির শ্রেণী বিভাগ

৪A.4.1 ক্রান্তীয় বনভূমি

৪A.4.1.1 ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমি

৪A.4.1.2 ক্রান্তীয় বনভূমির বাণিজ্যিক উপযোগিতা

৪A.4.1.3 ক্রান্তীয় বনভূমির অসুবিধা

৪A.4.2 ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বনভূমি

৪A.4.2.1 ক্রান্তীয় পর্ণমোচী তৃণভূমির ব্যবহার

৪A.4.3 নাতিশীতোষ্ণ বা মধ্য অঞ্চলের বনভূমি

৪A.4.3.1 ভূমধ্যসাগরীয় বনভূমি

৪A.4.3.2 নাতিশীতোষ্ণ মিশ্র বনভূমি

৪A.4.3.3 নাতিশীতোষ্ণ সরলবর্গীয় বনভূমি

৪A.5 বনভূমি হ্রাস

৪A.6 বনভূমি হ্রাসের কারণ ও পরিবেশের উপর প্রভাব

৪A.7 বনভূমি সংরক্ষণ ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ

৪A.8 বনভূমি বা বনমহোৎসব

৪A.9 কৃষি বনায়ন

৪A.10 ভারতে কৃষি বনসৃজন

৪A.11 সামাজিক বনসৃজন

8A.12 পশুপালনের সংজ্ঞা

8A.13 পশুপালনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

8A.14 পশুপালনের শ্রেণী বিভাগ

8A.15 পৃথিবীর বাণিজ্যিক পশুপালন ক্ষেত্র সমূহ

- 8A.15.1 নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমি
- 8A.15.1.1 উত্তর আমেরিকার উত্তরের প্রেইরি অঞ্চল
- 8A.15.1.2 ইউরেশিয়ার স্তেপ অঞ্চল
- 8A.15.1.3 দক্ষিণ আমেরিকার পম্পাস অঞ্চল
- 8A.15.1.4 দক্ষিণ আফ্রিকার ভেল্ড তৃণভূমি
- 8A.15.1.5 অস্ট্রেলিয়ার ডাউন্স অঞ্চল
- 8A.15.2 ক্রান্তীয় অঞ্চলের তৃণভূমি

8A.16 পশু ও পশুজাত দ্রব্য

8A.17 দোহ শিল্প ও শিল্পজাত সামগ্রী

8A.18 দোহ শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী

8A.19 দোহ শিল্পের বন্টন

8A.20 মেষ পালন

8A.21 মেষ উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ

8A.22 বিশ্বের বিভিন্ন প্রকার মেষচারণ ক্ষেত্র সমূহ

- 8A.22.1 মাংস প্রদায়ী চারণ ক্ষেত্র
- 8A.22.2 পশম প্রদায়ী চারণ ক্ষেত্র

8A.23 দক্ষিণ গোলার্ধে মেষ অধিক গুরুত্বের কারণ

8A.24 সারাংশ

8A.25 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

8A.26 উত্তরমালা

৪A.0 প্রস্তাবনা

একদা বনভূমিকে নির্ভর করেই গড়ে উঠেছিল মানুষের সভ্যতার প্রথম পদক্ষেপ। বর্তমানে বনভূমি নির্ভর জীবন যাত্রা কৃষি বা শিল্পের তুলনায় গৌণ হলেও এখনও মানুষের নানা জীবিকা গড়ে উঠেছে বনভূমিকে নির্ভর করে।

বনভূমি হল প্রকৃতির সৃষ্ট স্বাভাবিক জলবায়ু অর্থাৎ উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, সূর্যালোক, মৃত্তিকা, ভূ-প্রকৃতির গঠন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে সৃষ্ট হওয়া বিভিন্ন গাছপালার সমাবেশ। বনজ সম্পদ আমাদের জীবন ধারণের জন্য এক অতি প্রয়োজনীয় প্রকৃতির দান। বিশ্ব সংস্থার হিসেব অনুসারে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সমগ্র স্থলভাগের অন্ততঃ ৩৩% ভাগ বনভূমি থাকা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু হিসাব করে দেখা গেছে যে বিশ্বের স্থল ভাগের শতকরা মাত্র ২৯.৪৮% বনভূমি বর্তমান। ভারতে তার পরিমাণ মাত্র ১৯.৫ ভাগ।

এই বনভূমিকে নির্ভর করে বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গড়ে উঠেছে কাষ্ঠশিল্প, পর্যটন শিল্প এবং বনভূমিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন জাতীয় উদ্যান সমূহ।

পৃথিবীর বিভিন্ন বনভূমির অবস্থানের চিত্র থেকে এটা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে পৃথিবীর মোট বনভূমির অবস্থানের প্রায় অর্ধেকের বেশি রয়েছে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি এবং ৩৫% ভাগ হল সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি।

সারণী ২.৮.১ বিভিন্ন দেশের বনভূমির আয়তন

দেশ	বনভূমির আয়তন (কোটি হেঃ)	মোট আয়তন শতকরা হিসাবে
ভারত	5.68	19.00
বাংলাদেশ	0.19	14.52
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	28.60	31.30
রাশিয়া	76.73	
ব্রিটেন	0.24	9.92
ফ্রান্স	1.48	26.94
জার্মানী	1.08	29.85
চীন	12.65	13.56
জাপান	2.51	66.76
অস্ট্রেলিয়া	10.60	13.87

(Source : World Resource 1998-99)

এই বনভূমিকে নির্ভর করে আবার যে সব অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ গড়ে উঠেছে তার মধ্যে পশুপালন একটি অন্যতম।

পশুপালন মানুষের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রাচীনকালে মানুষ যখন পশু শিকার করতে শিখল তখন বন্য পশু শিকার করে যেমন খাদ্যের অভাব পূরণ করত তেমনি পরিধান ও বাসস্থানের ব্যবস্থাও করত। পরবর্তী সময়ে মানুষ যখন পশুকে বশ মানাতে শিখল তখন হতেই মানব সভ্যতার এক নতুন যুগের সূচনা হয়। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গরু, মেষ প্রভৃতি পালন করতে, দুধ, মাংস প্রভৃতি খাদ্যরূপে এবং চর্ম, পশম, চর্বি প্রভৃতি প্রত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহ করতে শিখল।

যাযাবর অবস্থায় মানুষ পশুপালন আরম্ভ করে জীবিকার উদ্দেশ্যে। বর্তমান সভ্য জগতে এখনও কিছু কিছু অঞ্চলের অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবিকার জন্য পশুপালন প্রচলিত থাকলেও প্রধানত বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে পশুপালন করা হয়। পশু মানুষকে খাদ্য, পরিধেয়, বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল ইত্যাদি যোগান দিয়ে থাকে। পশু সম্পদ বর্তমানে দুগ্ধ, মাংস ও পশম শিল্পের যোগানে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

8A.1 উদ্দেশ্য

এই এক এককটি পাঠ করে আপনি .....

বনভূমি ও পশু সম্পদ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বনভূমি কাকে বলে এবং এর অর্থনৈতিক গুরুত্বকে অনুধাবন করতে পারবেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত বনভূমির অবস্থান ও তার ব্যবহার সম্বন্ধে অবগত হবেন।

এই বনজ সম্পদ বর্তমানে কি ভাবে ধ্বংস হয়ে চলেছে এবং তা রক্ষা করার জন্য মানুষ কি কি উপায় গ্রহণ করেছে তা আপনি বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

কি ভাবে এর সংরক্ষণ করা যায় তা আপনি বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

পশু সম্পদের সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে পারবেন এবং এর গুরুত্ব সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

জানতে পারবেন পৃথিবীর বিভিন্ন পশু পালনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে।

পৃথিবীর পশু পালন ব্যবস্থাগুলি প্রধানত যে তৃণভূমি কেন্দ্রিক সেগুলি সম্পর্কেও জানা সম্ভব হবে।

এর সঙ্গে সঙ্গে তৃণভূমিগুলির অবস্থান এবং ঐ সকল তৃণভূমিগুলিতে পালিত পশু সম্পদ ও তাদের ব্যবহার সম্বন্ধেও জানতে পারবেন।

পশু পালনের সঙ্গে সম্বন্ধীয় বিভিন্ন শিল্প ব্যবস্থা যথা দোহ শিল্প, পশম শিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধেও আপনার জ্ঞানকে আরও উন্মুক্ত করতে পারবেন।

সর্বশেষ বিশ্বে এই পশু শিল্পের অবস্থান মানুষের অর্থনীতিকে কি ভাবে আরও সুগঠিত করে তোলে সে বিষয়ে বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

এই বনজ সম্পদ বর্তমানে কিভাবে ক্ষয় হয়ে চলেছে এবং তা রক্ষা করার জন্য মানুষ কি কি উপায় গ্রহণ করেছে তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

8A.2 বনভূমির সংজ্ঞা প্রকৃতি ও আয়তন

যে সমস্ত গাছ বা উদ্ভিদ প্রকৃতিগত ভাবে নিজে থেকেই জন্ম লাভ করে, স্বতোবিক প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠে তাকেই স্বাভাবিক বনভূমি বলে। কোন অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, মৃত্তিকার গঠন, উষ্ণতা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ইত্যাদির উপর নির্ভর করেই সৃষ্টি হয় সেই সকল স্থানের উদ্ভিদের প্রকৃতি। তাই বনভূমির প্রকৃতি জানতে হলে জানতে হবে যে বনভূমি কেন এবং কোন পরিবেশের উপর নির্ভর করে জন্মায়।

বনভূমির প্রকৃতি প্রধানত নির্ভর করে তার প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর এবং যে সব প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে বনভূমি গড়ে ওঠে তাকে মোটামুটি ভাবে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) তাপমাত্রা :— উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য কমপক্ষে গড়ে 6 সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার প্রয়োজন। এই তাপমাত্রার নিচে কোন উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না বলে তাপমাত্রাকে বলে বিশেষ শূন্যতা বা Specific Zero। আবার তাপমাত্রার তারতম্যের ফলে উদ্ভিদ প্রকৃতির মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়, যেমন— শীতল অঞ্চলে ঝাউপাইন গাছ এবং অতি উষ্ণ অঞ্চলে তাল গাছ ইত্যাদি জন্মায়।

(খ) বৃষ্টিপাত :— বৃষ্টিপাতের তারতম্য বনভূমি সৃষ্টিতে বিভিন্নতা নিয়ে আসে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় অত্যধিক বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলে চিরহরিৎ বনভূমি, মধ্যম বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলে পর্ণমোচী বনভূমি এবং অল্পবৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলে কাঁটা জাতীয় গুল্ম জন্মায়।

(গ) সূর্যালোক :— সূর্যালোক ব্যতিত গাছের খাদ্য তৈরি সম্ভব হয় না। সূর্যালোকের সাহায্যে গাছ তাদের সালোকসংশ্লেষক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে।

(ঘ) বায়ু প্রবাহ :— বায়ুপ্রবাহ গাছের প্রস্বেদন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। আবার বিভিন্ন গাছের পরাগ সংযোগ ঘটে বাতাসের সহায়তায়।

(ঙ) মৃত্তিকা :— মৃত্তিকার প্রকারভেদ গাছেরও প্রকারভেদ ঘটায়। রুক্ষ মরু মৃত্তিকায় কাঁটা গুল্ম ব্যতিত কোন গাছ জন্মাতে পারে না। আবার জৈব মৃত্তিকা যুক্ত অঞ্চলে যেমন ক্রান্তীয় বনভূমিতে শাল, সেগুন ইত্যাদি বৃক্ষ সহজে জন্মায়।

ভূমিভাগের গঠন — ভূমি ভাগের গঠন পার্বত্য হলে পর্বতের উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদেরও গঠনের পরিবর্তন দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে হিমালয়ের পাদদেশে চিরহরিৎ উদ্ভিদ জন্মায় এবং উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বনভূমিরও পরিবর্তন সংগঠিত হয় সরল বর্গীয় গাছ, আল্পীয় বনভূমি এবং তার চেয়ে উঁচুতে শৈবাল জাতীয় বনানী জন্মায়।

এইভাবে প্রকৃতি অনুসারে যে বনভূমির সৃষ্টি হয় পৃথিবীতে এর পরিমাণ বর্তমানে 419.71 কোটি হেঃ। (World Resource – 1998-99) অর্থাৎ ভূভাগের উপর তার পরিমাণ শতাংশের হিসাবে 30। এই পরিমাণ আবার সর্বত্র সমান হয় না। পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই বনভূমির পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। উন্নয়নশীল দেশগুলি অপেক্ষা উন্নত দেশগুলিতে বনভূমির পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে থাকে। পরের পাতায় সারণীতে 1998-99 সালে পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশগুলির বনভূমির পরিমাণ হতে এই সম্বন্ধে ধারণা আরও পরিষ্কার করা সম্ভব হবে।

সারণী 2.2.1

মহাদেশ অনুসারে বনভূমির অবস্থান – 1998-99

মহাদেশ	বনভূমির আয়তন	মহাদেশের মোট বনভূমি	স্থান
	(কোটি হেঃ)	(শতাংশে)	
দঃ আমেরিকা	93.49	53.33	১ম
ইউরোপ	98.78	41.93	২য়
উঃ আমেরিকা	82.38	39.18	৩য়
ওশিয়ানিয়া	22.02	25.94	৪র্থ
আফ্রিকা	71.34	24.07	৫ম
এশিয়া	55.70	18.05	৬ষ্ঠ

(Source : World Resource 1998-99)

এই সারণী হতে দেখা যাচ্ছে যে মোট বনভূমির আয়তন সর্বাধিক (১) ইউরোপে, এরপর (২) দঃ আমেরিকার এবং (৩) উঃ আমেরিকা তৃতীয় স্থানে কিন্তু সমগ্র দেশের মোট জমির পরিমানের তুলনায় প্রথমে রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ দ্বিতীয় স্থানে এবং উত্তর আমেরিকা তৃতীয় স্থানে। এই সমস্ত মহাদেশগুলির অর্থনৈতিক, কারিগরি, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি সর্বদিকে সর্বোন্নত আবার অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলির অবস্থান প্রধানত রয়েছে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা বা ওশিয়ানিয়ার বহু রাজ্যে। ঐ সকল অঞ্চলের বনভূমির পরিমাণ কমের দিকে রয়েছে।

8A.3 বনভূমির অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Significance of Forest)

অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিচারে এর দুটি দিক রয়েছে — একটি এর প্রত্যক্ষ উপযোগিতা এবং অন্যটি পরোক্ষ উপযোগিতা। অধ্যাপক জিমারম্যানের ভাষায় বনভূমিকে সম্পদ আখ্যা দেওয়া খুবই যুক্তিযুক্ত কারণ তাঁর মতে "সম্পদ কোন বস্তুকে নির্দেশ করে না; কোন বস্তু বা পদার্থ যে কার্য সম্পাদন করে তাকেই নির্দেশ করে।"[১] সেই অর্থে বলা যায় যে বনভূমি মানুষের নিকটে একটি অতি প্রয়োজনীয় সম্পদ। অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিচারে এর প্রত্যক্ষ উপযোগিতা এবং পরোক্ষ উপযোগিতা নিয়ে নিচে আলোচনা করা হল —

বনভূমির প্রত্যক্ষ উপযোগিতা :—

(ক) কাষ্ঠ শিল্প (Lumbering Industries)

বনভূমির প্রধান সম্পদ হল কাঠ। বনভূমি হতে বিভিন্ন প্রকারের কাঠ সংগ্রহ করে ঐ সকল কাঠের সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাষ্ঠ শিল্প গড়ে উঠেছে। এই সকল কাঠ দিয়ে গৃহে ব্যবহৃত নানা আসবাব পত্র

১ "Resource does not refer to a thing or substance but to a function which a thing or substance performs" (Zimmermann, E. W. World Resource and Industries. (1951) Page 7)

জাহাজ ও জাহাজের মাস্তুল ও পাটাতন, রেলের কামরা, স্লিপার, নৌকা, মোটর লঞ্চ, ট্রাকের কাঠামো ও নানা প্রকার প্যাকিং বাক্স ইত্যাদি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

(খ) শিল্পের কাঁচামাল (Raw Materials for Industries)

কোন কোন ক্ষেত্রে কাঠ শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন কাগজ শিল্পের জন্য কাঠ মণ্ড, দেশলাই-এর বাক্স, কাঠি ও কৃত্রিম রেশম শিল্পের মণ্ড (গাছের আঁশ) এক অতি প্রয়োজনীয় কাঁচামাল; এর সঙ্গে সঙ্গে বনের গাছ, লতাপাতা, বহু মূল্যবান ঔষধ তৈরি করতেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। আবার বনের নিকৃষ্ট জাতীয় কাঠ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বনের ফলমূল খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে পৃথিবীর অনেক মানুষ এখনও নিজেদের ক্ষুধার নিবৃত্তি করে থাকে।

(গ) উপজাত দ্রব্য (Different By Products)

বনভূমি বহু প্রকারের উপজাত দ্রব্যাদিও সরবরাহ করে থাকে। যেমন জীব জন্তুর মাংস ও চামড়া, মধু, মোম, লাক্ষা, রবার, তার্পিন তেল, রেশমের গুটি, কর্পূর প্রভৃতি। এছাড়া বনের ফল ও পশু শিকার করেও বহু মানুষ জীবনধারণ করে থাকে।

(ঘ) পশুপালন (Animal Husbandry)

বিভিন্ন বনভূমির প্রান্তদেশে যে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি দেখা যায় সে সব অঞ্চল পশুপালন শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ অস্ট্রেলিয়ার ডাউন্স, আফ্রিকার সাভানা বা উত্তর আমেরিকার প্রেইরি অঞ্চলের নাম করা যায়।

বনভূমির পরোক্ষ উপযোগিতা (Indirect Utilities of Forest)

বনভূমির পরোক্ষ প্রভাবগুলি নিচে আলোচনা করা হল —

(ক) জলবায়ুর উপর প্রভাব (Effect on Climate)

কোন দেশের জলবায়ুর উপর বনভূমি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে, বনভূমি বৃষ্টিপাতকে নিয়ন্ত্রণ করে, প্রচণ্ড ঝড়ের গতিবেগ বৃক্ষাদির উপর প্রতিহত হয়ে তা মন্দিভূত হয়।

(খ) জমির উর্বরতা বৃদ্ধি –– (Growth of Soil Fertilities)

বৃষ্টির জল ভূমিভাগের উপরিভাগের উর্বর মৃত্তিকাকে ধুইয়ে বনভূমির বাইরে নিয়ে যেতে পারেনা। কারণ মাটি ধুয়ে গাছের শিকড় ইত্যাদিতে আটকে যায় ও গাছের পাতা ইত্যাদি মাটিতে পড়ে পচে মাটির উর্বরতা শক্তিকে বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করে।

(গ) মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ — (Protect Soil erosion)

বনভূমির বিভিন্ন বৃক্ষের শিকড়ের সহায়তায় মাটি দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ থাকে বলে বৃষ্টিপাত বা অন্যান্য কারণে মাটি সহজে ধুয়ে যেতে পারে না ফলে ভূমি ক্ষয় রোধ হয়ে থাকে।

(ঘ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ — (Flood control)

বনভূমির বৃক্ষের শিকড়ে বৃষ্টির জল প্রতিহত হয় বলে সহসা নিকটস্থ নদীর জল বৃদ্ধি হতে পারে না এবং বন্যার গতিবেগ মন্দিভূত হয়।

(ঙ) তাপমাত্রার উপর প্রভাব — (Effect on Temperature)

বনভূমি অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের আধিক্য থাকে বলে মাটি জলসিক্ত থাকে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পীভবনের ফলে তাপমাত্রা সর্বদাই মাঝামাঝি হয়।

(চ) বনভূমির অন্যান্য গুরুত্ব — (Other Significance of the Forest)

বনভূমি বিভিন্ন পশু ও পাখির আশ্রয়স্থল। বনভূমি বেষ্টিত পার্বত্য ভূমি অঞ্চলের জলবায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী বলে ঐ সব অঞ্চলে ভালো স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ভ্রমণ কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছে। যেমন ভারতের দার্জিলিং, নৈনিতাল ইত্যাদি। এই বনভূমিকে প্রবহমান সম্পদ বলে। এই সম্পদ একেবারে নিঃশেষ হওয়ার সম্ভাবনা কম এবং মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে এই সম্পদকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব।

উপরের এই আলোচনা হতে এটা পরিষ্কার যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে বনভূমি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আপনারা বুঝতে পেরেছেন।

৪A.4 বনভূমির শ্রেণী বিভাগ (Classification of Forest)

বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, উত্তাপ, সূর্যালোক, মৃত্তিকা ইত্যাদির প্রকারভেদে বনভূমির পরিবর্তন ঘটে। কোন বনভূমির গাছগুলি আকারে বড়, আবার কোন বনভূমির গাছগুলি আকারে ছোট। কোন অঞ্চলের গাছের কাঠ শক্ত, আবার কোথাও নরম। কোথাও গাছের পাতাগুলি বড় বড়, কোথাও বা আকারে ছোট। আবার কোথাও কাঁটা গাছের ঝোপ দেখতে পাওয়া যায়। ঋতু ভেদে গাছের পাতা ঝরে যায় কোথাও ঝরে যায় না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে উদ্ভিদের প্রকৃতির তারতম্য প্রধানত নির্ভর করে জলবায়ুর উপর। তাই পৃথিবীর সমগ্র বনভূমিকে তার জলবায়ুর উপর নির্ভর করে প্রধান দুটিভাগে ও তাদের আরো কতকগুলি উপ বিভাগে বিভক্ত করা যায়। নিম্নে বিভাগগুলি সারণী ৪.4.1- এ বর্ণনা করা হল।

সারণী — ৪.4.1

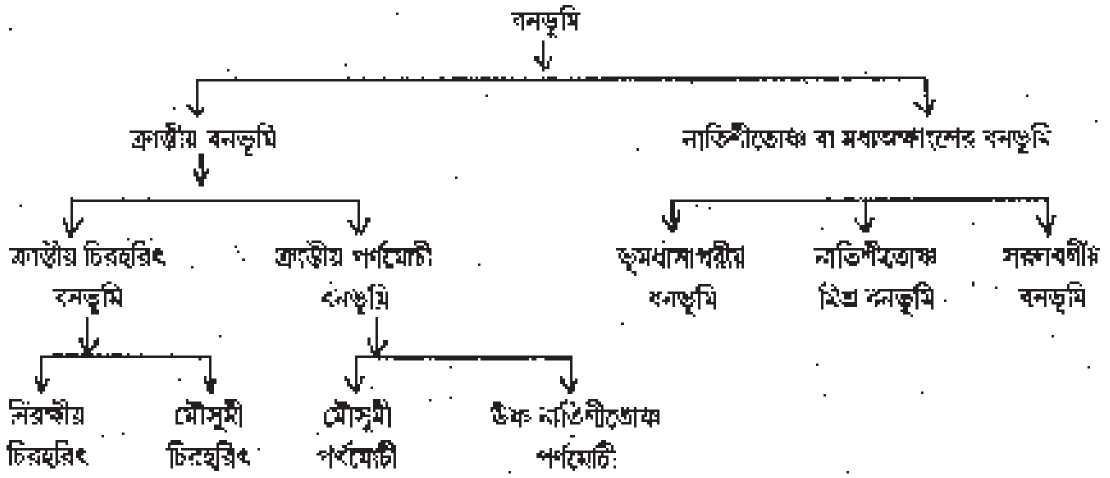

৪A.4.1 ক্রান্তীয় বনভূমি (Equatorial Forest)

ক্রান্তীয় বনভূমি উত্তরে কর্কটক্রান্তি রেখার উত্তর সীমানা হতে দক্ষিণে মকরক্রান্তি রেখার দক্ষিণ সীমানা পর্যন্ত এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে অবস্থান করেছে। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকের বেশি বনভূমি এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই বনভূমিকে তার গঠন ও প্রকৃতি অনুসারে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমি (২) ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি।

৪A.4.1.1 ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমি (Equatorial Evergreen Forest)

নিরক্ষরেখার উত্তর ও দক্ষিণে সারা বছর সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেওয়ার ফলে যেমন প্রচুর উত্তাপ পাওয়া যায় তেমনি প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে। এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত, স্থলভাগ ও জলভাগের অবস্থান ও অক্ষাংশের উপর নির্ভর করে কোথাও দেখা যায় চিরহরিৎ বনভূমি আবার কোথাও দেখা যায় মৌসুমী চিরহরিৎ বনভূমি তাই এই অঞ্চলের বনভূমিকে আবার দুটি উপবিভাগে বিভক্ত করা যায় — (১) নিরক্ষীয় চিরহরিৎ ও (২) মৌসুমী চিরহরিৎ বনভূমি।

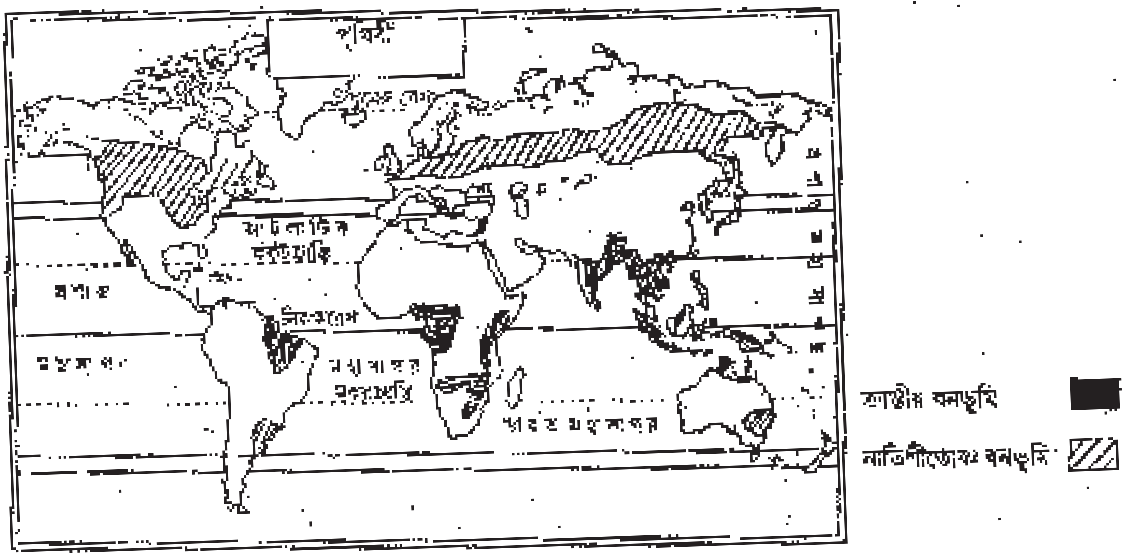

চিত্র - ১ : পৃথিবীর ক্রান্তীয় এবং নাতিশীতোষ্ণ বনভূমির অবস্থান।

১. নিরক্ষীয় চিরহরিৎ বনভূমি —

নিরক্ষরেখার ৫° - ১০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে যে সব অঞ্চলের বৃষ্টিপাত ৪০০-৫০০ সেঃ মিঃ এবং এই বৃষ্টিপাত সারা বছর প্রায় সমানভাবেই হয়ে থাকে ও সারা বছর ধরে উত্তাপ ২৭°-৩২° সেঃ। দিবারাত্রির মধ্যে উত্তাপের প্রসারও খুব কম থাকে (৫° সেঃ) সে সব অঞ্চলে এরূপ বনভূমি দেখা যায়। সারা বছর এরূপ প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে বলে গাছগুলির সব পাতা একসঙ্গে ঝরে যায় না বলেই এই বনভূমিকে নিরক্ষীয় চিরহরিৎ বনভূমি বলে। বলে।

অবস্থান এই বনভূমির অবস্থান প্রধানত নিম্নরূপ :

(ক) দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর পূর্ব পশ্চিমে ঐ নদীর মোহনা হতে আন্দিজ পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত এই বনভূমি সেলভা নামে পরিচিত।

(খ) উত্তর আমেরিকার দক্ষিণে পানামা, নিকারাগুয়া, মেক্সিকো, প্রভৃতি অঞ্চলে এই বনভূমি দেখা যায়।

(গ) আফ্রিকার কঙ্গো নদীর অববাহিকার বাইরে, ক্যামেরুন, উগান্ডা, বুরুন্ডি প্রভৃতি অঞ্চলে এই বনভূমির বিস্তার দেখা যায়।

(ঘ) দঃ পূঃ এশিয়ার থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, মায়ানমার, ভারত, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি অঞ্চলে এই বনভূমির প্রাচুর্য দেখা যায়।

(ঙ) অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চল কুইন্সল্যান্ড ও নর্দান টেরিটরির উত্তরে এই বনভূমির বিস্তার দেখা যায়।

এই অঞ্চলের বৃক্ষাদি ও তার বৈশিষ্ট্য (Principal plant group and their nature)

- সারা বছর ধরে প্রচণ্ড উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের ফলে এই অঞ্চলে কঠিন কাঠযুক্ত দীর্ঘ চিরহরিৎ গাছের নিবিড় বনভূমির সৃষ্টি হয়েছে। এই সকল দীর্ঘ বৃক্ষগুলি এতই ঘন সন্নিবিষ্ট হয় যে ঐ সকল বৃক্ষের ঘনপাতা ভেদ করে বনভূমির নিম্নাঞ্চলে সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে না। তাই এই সকল বনভূমির নিম্নে গুল্ম, দড়ির মত লতা, পরগাছা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

- এই অঞ্চলের বৃক্ষগুলির আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল এক জায়গায় নানা জাতীয় গাছের একত্র সমাবেশ।

- এই অঞ্চলে প্রচুর মূল্যবান বৃক্ষ জন্মায় এবং সেগুলির মধ্যে প্রধান হল মেহগনি (Mehogany) আবলুস (Ebony) সেগুন (Teak) দেবদারু (Cedar) গোলাপ কাঠ (Rose Wood) আয়রন কাঠ (Iron Wood) ইত্যাদি প্রধান।

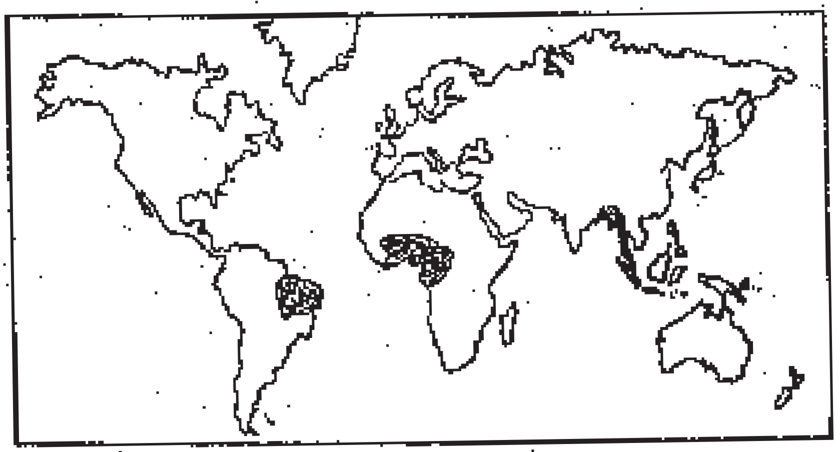

ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য ■

চিত্র - ২ : নিরক্ষীয় চিরহরিৎ বনভূমি ও মৌসুমী চিরহরিৎ বনভূমির অবস্থান।

২. **মৌসুমী চিরহরিৎ বনভূমি (Monsoon Evergreen Forest)**

ক্রান্তীয় বনভূমির যে সব অঞ্চলে বিভিন্ন ঋতুতে বায়ুর দিক পরিবর্তন হয় তাই মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল বলে পরিচিতি এবং এই মৌসুমী অঞ্চলে যে বৃক্ষ জন্মায় তাই মৌসুমী চিরহরিৎ বনভূমি নামে পরিচিত।

এই অঞ্চলের বার্ষিক গড় উত্তাপ প্রায় ২৭° সেঃ এবং বৃষ্টিপাত গড়ে প্রায় ২০০ সেঃ মিঃ। ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের বৃষ্টিবহুল অঞ্চল সমূহ ব্যতীত শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, ভিয়েতনাম, আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের কিছু অংশ ব্রাজিলের উপকূলবর্তী কিছু অঞ্চলে এই জাতীয় বনভূমি দেখতে পাওয়া যায়।

এই বনভূমির প্রধান বৃক্ষগুলি হল শাল, সেগুন, তাল, বাঁশ ইত্যাদি এবং এর সঙ্গে সঙ্গে মৌসুমী অঞ্চলে প্রচুর মিষ্টি ফলের বনভূমি খুব গভীর বা ঘন হয় না।

8A.4.1.2 ক্রান্তীয় বনভূমির বাণিজ্যিক উপযোগিতা (Commercial Utility of Equatorial Forest)

(ক) নিরক্ষীয় চিরহরিৎ বনভূমির মূল্যবান বৃক্ষগুলি হতে প্রাপ্ত কাঠ মূল্যবান আসবাবপত্র ও জাহাজ নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয়। এই কাঠের চাহিদা প্রচুর ও বিদেশে রপ্তানি হয়। এছাড়া খেলার সরঞ্জাম, নৌকা, রেলগাড়ির কামরা ও স্লিপার ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়।

(খ) এই বনভূমির কিছু কাঠ জ্বালানি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

(গ) এ ছাড়া এই বনভূমি কিছু উপজাত দ্রব্যাদিও উৎপাদিত হয়। এদের মধ্যে জাপোটা গাছের রস হতে চিকল উৎপন্ন হয়। চিকল হতে চিউইংগাম প্রস্তুত হয়। এ ছাড়া রবার, আঠা, লাক্ষা, মোম ইত্যাদি নানা সামগ্রী এই বনভূমি হতে সংগ্রহ করা হয়।

(ঘ) এই অঞ্চলে নানা প্রকার মিষ্টি ফল যথা কলা, আনারস, আম, জাম, পেয়ারা, বাদাম ইত্যাদি সংগ্রহ করেও বহু লোক জীবিকা অর্জন করে থাকে।

(ঙ) এই অঞ্চলের কাঠ খুব ভারী হলেও আসবাবপত্র প্রস্তুত করার জন্য এই কাঠের তুলনা হয় না।

8A.4.1.3 ক্রান্তীয় বনভূমির অসুবিধা (Problems of Equatorial Forest)

(ক) এই অঞ্চলে বনভূমি হতে কাঠ সংগ্রহ কষ্টকর বলে এখানে কাঠ শিল্প তেমন ভাবে গড়ে উঠেনি।

(খ) এই বনভূমির কাঠগুলি খুব ভারী বলে বনভূমি হতে কাঠ বহন করে আনা ব্যয়বহুল ও শ্রমসাধ্য।

(গ) এই বনভূমির নিম্নাংশ লতাপাতা ও গুল্মে আবৃত এবং গাছগুলি অত্যন্ত ঘন সন্নিবিষ্ট বলে বনভূমির অভ্যন্তরে প্রবেশ ও কাঠ আহরণ অনেক ক্ষেত্রেই দুঃসাধ্য।

(ঘ) এই অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ, আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে এবং এরূপ জলবায়ুতে বিষাক্ত কীট পতঙ্গের আক্রমণে দক্ষ ও অভিজ্ঞ মানুষেরা এই অঞ্চলে কাজ করতে অনীহা প্রকাশ করে।

(ঙ) এই সকল কারণের সঙ্গে সঙ্গে বাজারের অভাব, শক্ত কাঠের সীমাবদ্ধতা ও আন্তর্জাতিক চাহিদার অভাব এখানে কাঠ শিল্পের গড়ে ওঠার পক্ষে বাধাস্বরূপ।

8A.4.2 ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বনভূমি (Tropical Deciduous Forest)

ক্রান্তীয় অঞ্চলের যে স্থানে বার্ষিক বৃষ্টিপাত গড়ে ১০০-২০০ সেঃ মিঃ এবং উত্তাপ ২৭°-৩২° সেঃ ও বৃষ্টিপাত ঋতু নির্ভর সে সব অঞ্চলে পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত নিরক্ষীয় মৌসুমী বনভূমি অঞ্চলে এ জাতীয় বৃক্ষ জন্মায়। বছরের এক বিশেষ ঋতুতে প্রধানত শীত ঋতুতে বৃষ্টির অভাবে গাছের

পাতা ঝরে যায় আর সেই কারণে এই বনভূমি পর্ণমোচী বনভূমি নামে পরিচিত। গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষগুলিতে আবার নূতন পাতা জন্মায়। পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমিকে আবার এদের গঠন অনুসারে দুভাগে বিভক্ত করা যায় (ক) মৌসুমী পর্ণমোচী ও (খ) উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী।

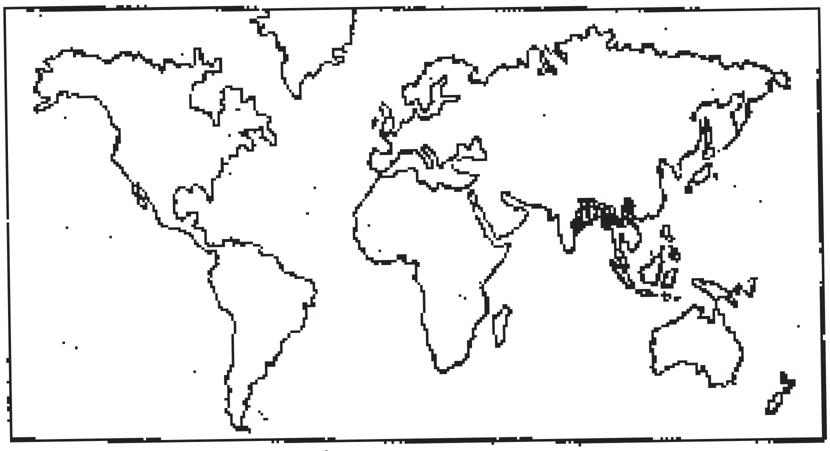

চিত্র - ঝ : ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বনভূমির অবস্থান।

(ক) **মৌসুমী পর্ণমোচী** — এরূপ বনভূমির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সারা বছর তাপমাত্রার আধিক্য। গ্রীষ্মকালে ব্যাপক বৃষ্টিপাত এবং শীতকালে প্রায় বৃষ্টিহীন হয়ে থাকে। এরূপ উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত উদ্ভিদ জন্মাবার ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার এক বিশেষ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

শীতকাল বৃষ্টিহীন বলে এই সময় গাছগুলি জলের অভাব পূরণ করার জন্য পত্রমোচন করে। এই কারণে এই অঞ্চলের পর্ণমোচী বনভূমি মৌসুমী পর্ণমোচী নামে পরিচিত।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভারত, বাংলাদেশ, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, পশ্চিম ভারতের দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন অংশে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল, সুদানের দক্ষিণাংশে, উত্তর অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড উপকূল অঞ্চলে মৌসুমী পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি দেখতে পাওয়া যায়।

(খ) **উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি** — প্রধানত গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলগুলিতে এধরনের বৃক্ষাদি জন্মাতে দেখা যায়। এই সকল অঞ্চলে প্রধানত বসন্ত ঋতুতে বৃক্ষগুলি পত্র মোচন করে। তবে উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত ও ভূমির উচ্চতার দরুন এই অঞ্চলে কোথাও চিরহরিৎ আবার কোথাও সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি জন্মাতে দেখা যায়।

জাপান, চীন, উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপের কিছু অংশ, কানাডার দঃ পশ্চিমাংশ, যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পশ্চিমাংশে, দক্ষিণ পূর্ব অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ চিলি প্রভৃতি স্থানে এ জাতীয় বনভূমি দেখা যায়।

8A.4.2.1 ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বনভূমির ব্যবহার (Uses of Tropical Deciduous Forest)

(ক) এই বনভূমি নিরক্ষীয় বনভূমির মত নিবিড় নয়। ফলে এখানে কাঠ আহরণ অনেকটা সহজ।

(খ) এই অঞ্চলের শক্ত কাঠ হতে নানা প্রকার আসবাব পত্র, রেলের কামরা ও স্লিপার, জাহাজ, নৌকা, গাড়ির চাকা, ইত্যাদি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

(গ) এই অঞ্চলের বৃক্ষগুলির মধ্যে শাল, সেগুন, শিশু, পলাশ, মহুয়া, অশ্বত্থ, বট ইত্যাদি প্রধান।

(ঘ) ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলে খাদ্যগুণ সম্পন্ন নানা ফল যথা আম, জাম; কাঁঠাল, লিচু, কলা, আনারস ইত্যাদি ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

(ঙ) এছাড়া এই অঞ্চলের গৌণ উৎপাদনগুলির মধ্যে প্রধান হল বাঁশ কাগজ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। পলাশ গাছে লাক্ষা কীট প্রতিপালন করা হয়। মহুয়া গাছের ফুল হতে মদ প্রস্তুত করা হয়। তুঁত গাছে রেশমের চাষ হয়। ইহা ব্যতীত বাঁশ, বেত প্রভৃতি দিয়ে নানা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র তৈরি হয়ে থাকে। তাছাড়া জ্বালানি হিসাবে এই বনভূমির কাঠের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়।

(চ) পৃথিবীর মোট কাঠের প্রায় ২০% এই বনভূমি হতে পাওয়া যায়।

অতএব দেখা যাচ্ছে পর্ণমোচী বনভূমির গুরুত্ব ও ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। তবে এই বনভূমির প্রধান সমস্যা হল জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বনভূমির এক বিশাল অংশ কৃষিকাজ ও বসবাসের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ছাড়াও প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক নানা কারণে এই বনভূমির পরিসর ক্রমান্বয়ে সীমিত হয়ে চলেছে।

8A.4.4.3 নাতিশীতোষ্ণ বা মধ্য অঞ্চলের বনভূমি (Temperate Forest)

নিরক্ষরেখার উভয়দিকে ৩০°- ৬৬$\frac{1}{2}$° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যবর্তী অঞ্চল সমূহে সূর্যকিরণ তির্যক ভাবে পড়ার দরুন তাপমাত্রা ১৫° – ২৫° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে থাকে এবং বৃষ্টিপাত ৩০ - ১০০ সেঃ মিঃ এর মধ্যে থাকে। এরূপ নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে যে সকল বৃক্ষ জন্মায় তা নাতিশীতোষ্ণ বনভূমি বলে পরিচিত। এই বনভূমিকে তার বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলি যথাক্রমে (ক) ভূমধ্যসাগরীয় বনভূমি অঞ্চল (খ) নাতিশীতোষ্ণ মিশ্র বনভূমি এবং (গ) নাতিশীতোষ্ণ সরলবর্গীয় বনভূমি।

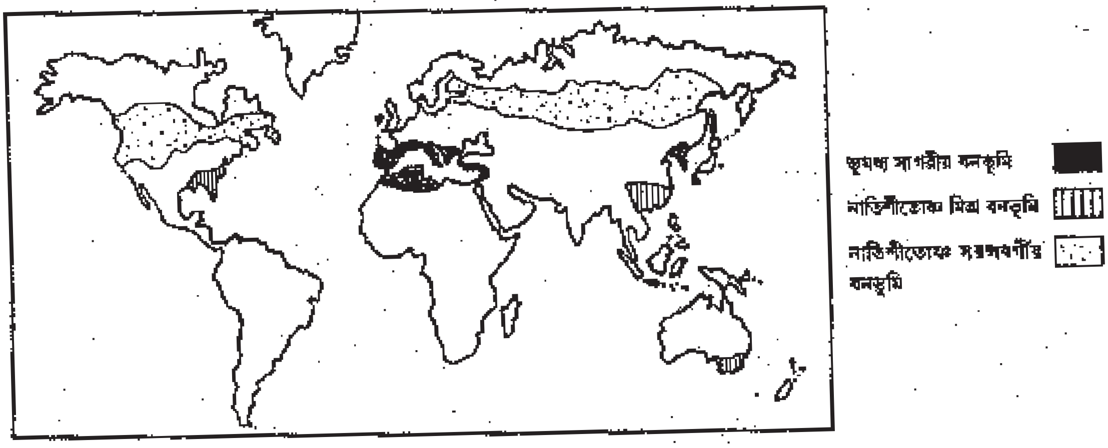

চিত্র - ৪ : নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বনভূমি।

8A.4.3.1 ভূমধ্যসাগরীয় বনভূমি (Mediterranean Forest)

ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে এক বিশেষ ধরনের জলবায়ু দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত নিরক্ষরেখার ৩০-৪৫ উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত দেশগুলি যথা — ইউরোপের পর্তুগাল, স্পেন,

দক্ষিণ ফ্রান্স, ইতালি, যুগোশ্লাভিয়া, আফ্রিকার আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া, মরক্কো প্রভৃতি অঞ্চল। এছাড়াও ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী কিছু অঞ্চলেও এই জলবায়ু দেখা যায়। এই অঞ্চলগুলি হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া, মধ্যচিলি, দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন ও অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ পূর্ব ও দক্ষিণ পশ্চিমের কিছু অংশ।

এই সকল অঞ্চলের গড় উত্তাপ ১৮°-২৫° সেঃ এর মধ্যে থাকে এবং বৃষ্টিপাত ৫০-১০০ সেঃ মিঃ। তবে এখানকার জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শীতকালীন বৃষ্টিপাত ও শুষ্ক গ্রীষ্মকাল।

* ভূমধ্যসাগরীয় অরণ্যের বৈশিষ্ট্য

● গাছগুলি খর্বাকৃতি ও বৃহৎ পত্রযুক্ত

● শুষ্ক গ্রীষ্মকালের হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য পত্রমোচন না করে বিশেষ প্রকৃতি পন্থা গ্রহণ করে থাকে। যেমন কোন কোন পাতায় রেশমী রোঁয়ার আবরণ থাকে, আবার কোন কোন গাছের পাতা চামড়ার মত। কোন গাছের ছাল পুরু আবার কোন গাছ দীর্ঘ শিকড় মৃত্তিকার অভ্যন্তরে বহু দূর প্রসারিত করে জলের খোঁজে। ভূমধ্যসাগরীয় চিরহরিৎ অরণ্যে বৃক্ষসমূহের এই ধরনের বৈশিষ্ট্যের জন্য এদের স্কেলরোফিল (Sclerophil) বলে।[২]

● এখানকার বৃক্ষগুলির মধ্যে অলিভ, ওক, পাইন, ফার, জুনিপার, সাইপ্রেস, সিডার ইত্যাদি প্রধান।

* বনভূমির ব্যবহার —

● এই বনভূমির গাছগুলি কাঠ শিল্পের উন্নতিকল্পে বিশেষ সহায়তা না করলেও স্থানীয় প্রয়োজনে বেশ কিছু কাঠ ব্যবহৃত হয়।

● এই অঞ্চলের কর্ক, ওক গাছের ছাল হতে বাণিজ্যিক ভাবে কর্ক প্রস্তুত করা হয়। বোতলের ছিপি হিসাবে কর্কের ব্যবহার ব্যাপক। এছাড়া কর্ক থেকে জুতো ও টুপির লাইনিং, গদি, রেফ্রিজারেটরে অপরিবাহী আস্তরণ ইত্যাদি তৈরি হয়।

● জলপাই গাছ থেকে জলপাই তেল তৈরি হয়।

এই সকল দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে রেশম, ধুনা, রঞ্জন, তার্পিন তেল, আঠা ইত্যাদি নানা উপজাত দ্রব্যও পাওয়া যায়।

সমস্যা

কৃষি ও জনবসতির প্রসারে এই অঞ্চলের বনভূমি ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে।

8A.4.3.2 নাতিশীতোষ্ণ মিশ্র বনভূমি (Tropical Mixed Forest)

নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে বৃহৎ পত্রযুক্ত চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের মিশ্রণে যে বনভূমি দেখা যায় তা নাতিশীতোষ্ণ মিশ্র বনভূমি নামে পরিচিত। এই মিশ্র বনভূমি ৩০°-৫০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে যেখানে গড় উষ্ণতা ১৫°-১৭° সেঃ এবং বৃষ্টিপাত ৫০-৬০ সেঃ মিঃ অর্থাৎ মৃদু শীতল আবহাওয়ায় মধ্যম বৃষ্টিপাত

[২] Fince, v. c এবং Trewartha E.T : Elements of Geography - Page - 421

যুক্ত অঞ্চলে এরূপ বনভূমি ভাল জন্মায়। বেশী বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলে চিরহরিৎ বৃক্ষ দেখা যায় এবং যে সব অঞ্চলের বৃষ্টিপাত তুলনামূলক ভাবে কম সেখানে পর্ণমোচী শ্রেণীর বৃক্ষ দেখা যায় এবং শীতকালে এরা পত্রমোচন করে। এই বনভূমির প্রধান সুবিধা হল যে এখানে একই প্রকার প্রজাতির বৃক্ষের পাশাপাশি অবস্থান দেখা যায়।

সাধারণত উত্তর পশ্চিম ও মধ্য চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ কানাডা, মেক্সিকো দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি রাজ্যে মিশ্র নাতিশীতোষ্ণ বনভূমি দেখা যায়। তবে বৃহৎ পত্রযুক্ত চিরহরিৎ বনভূমি প্রধানত দেখা যায় দক্ষিণ পূর্ব চীন, দক্ষিণ জাপান, দঃ পূঃ অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে।

মিশ্র তৃণভূমি অঞ্চলে পপলার ওক, বার্চ, চেস্টনাট, ম্যাপল, উইলো, বীচ, পাইন, ফার, ওয়ালনাট, অ্যাশ ইত্যাদি নরম ও মধ্য উভয় প্রকার বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

* অর্থনৈতিক গুরুত্ব

১. এই অঞ্চলের কাঠ হতে নানা প্রকার আসবাব পত্র, রেলগাড়ির কামরা, জাহাজ, বাড়িঘর প্রভৃতি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

২. এই অঞ্চলের ম্যাপল গাছের রস থেকে সিরাপ, চেস্টনাট, ওয়ালনাট গাছের ছাল থেকে ট্যানিন, ওক গাছ থেকে কর্ক, পাইন, ফার, পপলার গাছের রস থেকে আঠা, তার্পিন, রজন, ধুনা প্রভৃতি নানা উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায়।

৩. পৃথিবীর মোট চেরাই কাঠের ২৫% এই বনভূমি হতে পাওয়া যায়।

* সমস্যা

জনবসতির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্য, পরিবহন ব্যবস্থা, নগরায়ন, শিল্পায়নের প্রয়োজনে এই বনভূমির আয়তন ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

8A.4.3.3 নাতিশীতোষ্ণ সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি (Temperate Coniferous Forest)

সরলবর্গীয় বনভূমি প্রধানত উত্তর গোলার্ধের শীতল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ৫০°-৭০° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে দেখা যায়। এই বনভূমির গাছগুলি খুবই লম্বা এবং সোজা হয় আর এর পাতাগুলি খুবই সরু তাই এদের সরলবর্গীয় বনভূমি বলে। এই বনভূমির জলবায়ু অত্যন্ত শীতল এবং শীতকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়। এখানকার গড় উষ্ণতা ১০° সেঃ। এই বনভূমির উত্তর সীমানাকে গ্রীষ্মকালীন ৫০° সেঃ সমোষ্ণরেখা সীমাবদ্ধ করে রাখে এবং ১০° সেঃ সমোষ্ণরেখা দক্ষিণ সীমাকে নির্ধারণ করে থাকে। এখানে শীতকালে প্রচুর তুষারপাত হয় এবং এরূপ শীতল পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে এখানকার গাছগুলির আকৃতি শঙ্কুর মত, গাছের পাতাগুলি খুবই সরু ও ছুঁচালো হয়।

এই বনভূমি প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপের দেশসমূহ ও রাশিয়াতে দেখা যায়।

ক. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র — : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে এই বনভূমি যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এ ছাড়া পশ্চিমের কাসকেড রেঞ্জ, সিয়েরা নেভেদা, আলাস্কার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ও দেশের উত্তর পূর্ব বনভূমিতেও বিক্ষিপ্তভাবে এই সরলবর্গীয় বনভূমি দেখা যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট কাঠ উৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগ আসে এই মার্কিন বনাঞ্চল হতে।

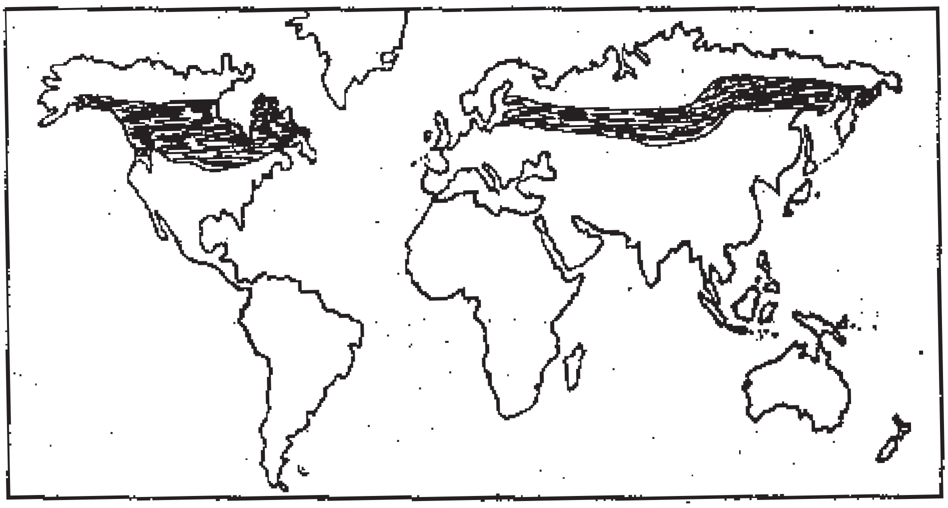

চিত্র - ৫ : সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি।

খ. কানাডা ও রকি পার্বত্য অঞ্চল — : কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রকি পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় বলে এই অঞ্চলের কুইবেক, অন্টারিয়ো, ম্যানিটোবা, এবং বৃটিশ কলম্বিয়া প্রদেশে এই বনভূমি প্রসার লাভ করেছে। কানাডার প্রায় ৪০ শতাংশ অঞ্চল এই বনভূমির অন্তর্গত। এই বনভূমি প্রচুর নরম কাঠ সরবরাহ করে বলে এই দেশকে নরম কাঠের গুদাম বলে।

গ. ইউরোপের দেশ সমূহ এই মহাদেশের সুইডেন, ফিনল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইতালিতে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি বিস্তৃত। তবে বর্তমানে চাষ আবাদ ও বসবাসের প্রয়োজনে জমির বৃক্ষচ্ছেদন করা হয়েছে।

ঘ. রাশিয়া পৃথিবীর মোট বনভূমির প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ এরূপ বনভূমি রাশিয়াতেই অবস্থিত। এই বনভূমি ইউরোপের পূর্বাংশে প্রশান্ত মহাসাগর হতে পশ্চিমে নরওয়ে সুইডেন পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার বনভূমিকে রাশিয়ান ভাষায় বলে তৈগা। তৈগা কথার অর্থ পাইন। এই বনভূমিতে প্রচুর পরিমাণ পাইন জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায় বলেই এই বনভূমিকে তৈগা বলা হয়। এই বনভূমির আয়তন প্রায় ৫০ কোটি হেক্টর। আরকানজেল, ওনেগা, পার্ম, চেলিয়াবিনক্স, পূর্ব ও পশ্চিম সাইবেরিয়ার ইর্থুস্ক, ইগার্কা প্রভৃতি অঞ্চল কাঠ শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

ঙ. উপরে বর্ণিত প্রধান উৎপাদক দেশ ব্যতীত দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলের দক্ষিণাংশে, আর্জেন্টিনা, ও চিলির দক্ষিণে আন্দিজ পর্বতমালা পর্যন্ত এই বনভূমির বিস্তার দেখা যায়। এ ছাড়া নিউজিল্যান্ডের দক্ষিণেও এইরূপ বৃক্ষ জন্মাতে দেখা যায়।

চ. এখানকার বৃক্ষগুলির মধ্যে পাইন, স্প্রুস, ফার্ন, বার্চ, সাইপ্রেস, হেমলক, ডগলাস, জুনিপার প্রভৃতি প্রধান। এই বৃক্ষগুলির কাঠ নরম ও হালকা বলে সহজেই ছেদন ও বহন করা সম্ভব।

* অর্থনৈতিক গুরুত্ব

১. এই বনভূমি শিল্প ও জ্বালানির জন্য প্রচুর কাঠ সরবরাহ করে থাকে।

২. আসবাব পত্র, জাহাজের মাস্তুল ও পাটাতন, রেলগাড়ির কামরা, দিয়াশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স, কাগজের মণ্ড, কৃত্রিম রেশম, প্লাইউড, নিউজ প্রিন্ট প্রভৃতি নির্মাণে এই অঞ্চলের বিভিন্ন নরম কাঠের বহুল ব্যবহার প্রচলিত।

৩. এই বনভূমি হতে বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য — যথা মধু, মোম, লাক্ষা ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

৪. এই বনভূমির পরিমাণ পৃথিবীর মোট বনভূমির প্রায় ৩০ হলেও মোট ব্যবহৃত কাঠের পরিমাণ শতকরা ৭৫ ভাগ।

* সমস্যা

সরলবর্গীয় বনভূমির পরিমাণও বর্তমান জনসংখ্যার চাপে নগরায়নের ফলে ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে চলেছে।

8A.5 বনভূমি হ্রাস (Depletion of Forest)

বনভূমি প্রকৃতির দান। বনভূমি গঠনের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক অতি নিবিড়। এক সময় পৃথিবীর স্থল ভাগের শতকরা ৫০ ভাগই আবৃত ছিল বনভূমিতে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার প্রয়োজনে নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংস করে। তার ফলে বনভূমি কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৯%। যেখানে পৃথিবীর স্থলভাগের অন্তত শতকরা ৩৩ ভাগ অঞ্চলে বনভূমি থাকা প্রয়োজন। এই বনভূমির পরিমাণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিমাণ।

বনভূমির প্রয়োজনীয়তা মানুষের জীবনে অপরিসীম। কিন্তু এই বনভূমির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে চলেছে। এই হ্রাসের কারণগুলিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয় একটি (১) প্রাকৃতিক ও অন্যটি (২) আর্থসামাজিক। বিভিন্ন মহাদেশে বনভূমি হ্রাসের প্রাকৃতিক কারণগুলির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন আর্থ সামাজিক কারণগুলিও ব্যাপকভাবে জড়িয়ে রয়েছে। বনভূমি হ্রাসের কারণগুলি নিম্নে একটি ছকের সাহায্যে দেখান হল।

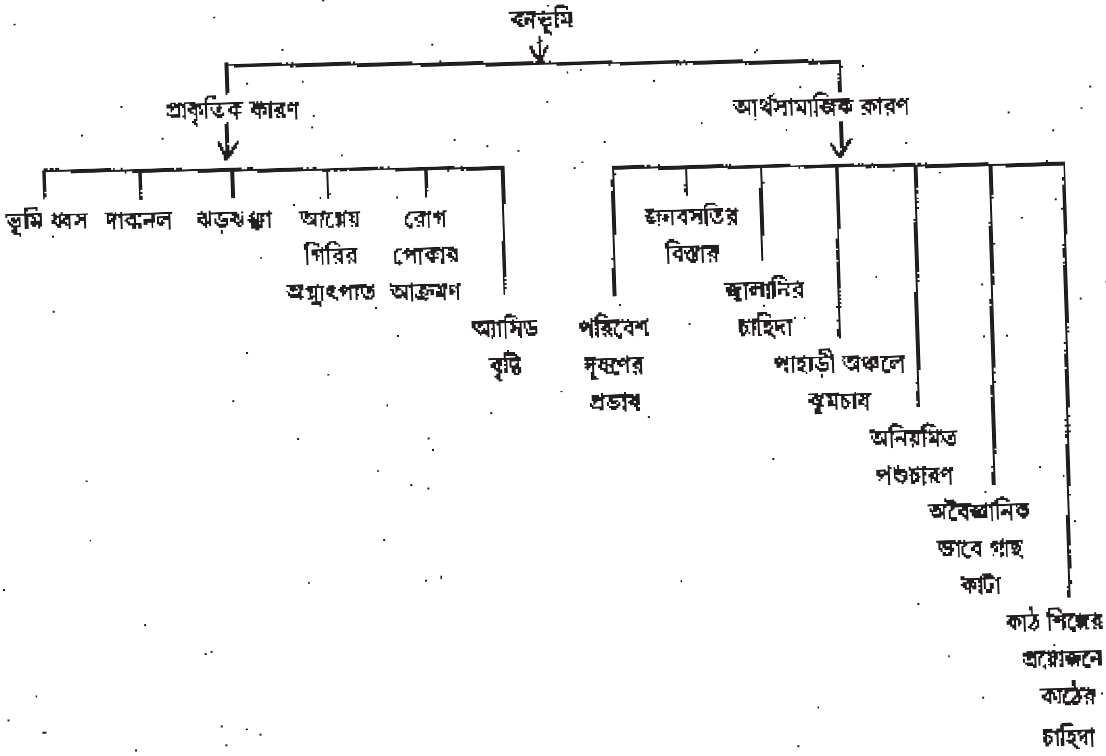

8A.6 বনভূমি হ্রাসের কারণ ও পরিবেশের উপর প্রভাব (Depletion of Forest and its Effect on Environment)

বনভূমি হ্রাসের প্রাকৃতিক কারণগুলিকে নিম্ন রূপে ব্যাখ্যা করলে এই সম্বন্ধে ধারণা আরও পরিষ্কার হবে।[৩]

- ভূমি ধস —

পার্বত্য অঞ্চলে ভূমি ধসের ফলে প্রায়ই বনভূমির বিনাশ ঘটছে। ভূমি ধস অঞ্চলের বনভূমি সমূলে উৎপাটিত হয়।

- দাবানল —

বনভূমি অঞ্চলে গাছের সঙ্গে গাছের ঘর্ষণের ফলে যে আগুনের সৃষ্টি হয় তাকে বলে দাবানল। এই দাবানলের আগুনে মাইলের পর মাইলের বনভূমি ধ্বংস হয়ে যায়।

- ঝড় ঝঞ্ঝা —

প্রবল ঝড়ে বনভূমির ব্যাপক ক্ষয় হয়। বনভূমির বিভিন্ন বনানী উৎপাটিত হয়। ভূমি ধ্বস নামে। এই ভাবে ঝড়ের ফলে বনভূমির ক্ষতি হয়।

- আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত —

আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে বনভূমি ধ্বংস হয়।

- রোগ পোকার আক্রমণ —

বনভূমি অঞ্চলে নানা প্রকারের রোগ পোকার আক্রমণ বা পঙ্গপালের আক্রমণে বনভূমির ক্ষতি হয়ে থাকে।

- অ্যাসিড বৃষ্টি —

সাধারণত শিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিতে যানবাহন চলাচল, কারখানা ও বিভিন্ন প্রকার ধাতব চুল্লির গ্যাস ও অগ্নি ইত্যাদি দহনের ফলে যে ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় তার সাহায্যে সৃষ্ট সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থগুলি বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। এই গ্যাসগুলি পরবর্তী সময়ে বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হয়ে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। এই অ্যাসিড মিশ্রিত বৃষ্টির জল পৃথিবীর গাছপালা, জল ও স্থলজ প্রাণীর প্রভৃত ক্ষতিসাধন করে।

* বনভূমি হ্রাসের আর্থ সামাজিক কারণগুলিকেও নিম্ন রূপে ব্যাখ্যা করা হল।

- জনবসতির বিস্তার —

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বসবাসের জমি ও চাষের জমির প্রয়োজনে প্রথমে বনভূমি ধ্বংস করা হয়। পরবর্তী সময়ে গ্রামের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাঘাটের উন্নতির জন্য বনভূমির উচ্ছেদ করা হয়।

---

৩ মিত্র ও সেনগুপ্ত : ফলিত ভূবিদ্যা পৃঃ ৭৫

● জ্বালানির চাহিদা —

উন্নয়নশীল দেশগুলির অধিকাংশ গ্রাম অঞ্চলে জ্বালানির প্রয়োজনে বহু গাছপালা কেটে বনভূমি ধ্বংস করা হয়।

● পাহাড়ী অঞ্চলের ঝুমচাষ —

পাহাড়ী অঞ্চলের মানুষেরা তাদের প্রয়োজনে বনের কিছু অঞ্চলে আগুনে পুড়িয়ে পরিষ্কার করে কয়েক বছর চাষ আবাদ করে। জমির উর্বরতা হ্রাস পেলে ঐ জমি পতিত রেখে আবার নতুন জমির সৃষ্টি করে। এই ভাবে ঝুম চাষের ফলে যে বনভূমি ধ্বংস করা হয় সেখানে নতুন করে বনভূমি প্রায়ই গড়ে ওঠে না। এই রূপে ব্যাপক ভাবে বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে।

● অনিয়মিত পশুচারণ —

পশুজাত দ্রব্যের চাহিদার জন্য এবং পাহাড়ী অঞ্চলকে মানুষের জীবিকা অর্জনের জন্য পশুচারণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পশুচারণের বা অসংরক্ষিত ভাবে পশুচারণের ফলে বনাঞ্চলের চারাগাছগুলি ধ্বংস হচ্ছে এবং উচ্চ পাহাড়ী অঞ্চলে পশুদের চলাচলের ফলে ভূমি ক্ষয় ও বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে।

● অবৈজ্ঞানিক ভাবে গাছ কাটা —

কাঠ ব্যবসায়ীরা অনেক সময়েই বনভূমি থেকে কাঠ আহরণের সময় সাবধানতা অবলম্বন করে না। ফলে বহু চারাগাছ ও অপরিণত গাছের ক্ষতি হয়।

● কাঠ শিল্পের প্রয়োজনে কাঠ আহরণ —

কাঠ শিল্পের প্রয়োজনে মানুষ নির্বিচারে কাঠ কেটে চলেছে। কাগজ তৈরির কাষ্ঠ মণ্ড, কৃত্রিম তন্তু, প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র ইত্যাদি নানা কাজে কাঠের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

● পরিবেশ দূষণের প্রভাব —

পরিবেশের দূষণের প্রভাবও বনভূমিকে প্রভাবিত করছে। শিল্পায়নের মাত্রা বৃদ্ধির ফলে শিল্পোদ্ভব বিভিন্ন গ্যাসের প্রভাবে প্রকৃতির গ্রীনহাউস প্রভাবিত হচ্ছে, এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে অ্যাসিড বৃষ্টি। এর ফলে বনভূমির গাছপালা প্রভাবিত হয় এবং বনভূমির ক্ষতি হয়।

এই সব বিভিন্ন কারণে বনভূমি হ্রাস পেয়ে চলেছে। ফলস্বরূপ পরিবেশের উপর যে সমস্যাগুলি অনিবার্য ভাবে কার্যকরী হয়ে চলেছে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা হল।

* সমস্যা

● জমির উর্বরতা হ্রাস —

ভূমিক্ষয়ের ফলে জমির উপরিস্থ খনিজ ও জৈব পদার্থগুলি যা জমিকে উর্বর করে রাখতে সহায়তা করে সেগুলি ধুয়ে চলে যায় ফলে মৃত্তিকার উর্বরতা ক্রমশ হ্রাস প্রাপ্ত হয়ে চলেছে।

● বন্যা ও খরার প্রকোপ —

বনভূমি হ্রাসের ফলে ক্ষয়িত ভূমিভাগ নদীগর্ভে পতিত হয়ে নদীর বহন ক্ষমতা হ্রাস করে নদীতে বন্যা সৃষ্টিতে সহায়তা করছে আবার বনভূমি কমে যাওয়ায় বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হয়ে বৃষ্টির পরিমাণও কমে যায় ও খরার সৃষ্টি হয়।

● মরুভূমির প্রসারে সহায়তা —

গাছপালার অভাবে মরুসংলগ্ন অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ আরও কমে যায় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে বলে শুষ্ক বায়ু সহজেই মরুভূমির বালুকারাশিকে বয়ে নিয়ে মরুভূমির প্রসারে সহায়তা করে।

● পৃথিবীর তাপের পরিমাণ বৃদ্ধি —

বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছেন যে বনভূমি হ্রাসের ফলে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের (CO_2) পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটছে।

এছাড়া আরও যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সেগুলি হল —

- পাহাড়ি অঞ্চলে ধ্বসের পরিমাণ বৃদ্ধি।
- পতিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি।
- কাঠের যোগান কমে যাওয়ায় অসার কাঠের ব্যবহার বৃদ্ধি।

* এই সমগ্র কারণের পরিণাম পরিবেশ দূষণের পরিমাণের বৃদ্ধি।

8A.7 বনভূমি সংরক্ষণ ও বন্য প্রাণীর সংরক্ষন (Forest Conservation and Management of Wild Life)

বন সম্পদ বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নতিতে কোন দেশের এক অতি প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক দান। বিভিন্ন কাজে বৃক্ষের কাঠ, পাতা ও বাকল ব্যবহার করা হয়। উন্নত এবং উন্নতিশীল দেশসমূহে বন সম্পদের উপর নির্ভর করে পর্যটন শিল্প (Tourist Industry) গড়ে ওঠে এবং এই শিল্পের মাধ্যমে দেশ বহুলাংশে বৈদেশিক মুদ্রা বর্জন করতে সক্ষম হয়। বনভূমি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে "জাতীয় উদ্যান" (National park) গড়ে ওঠে। ভারতবর্ষে প্রায় কুড়িটি জাতীয় উদ্যান আছে। কিন্তু এই বনভূমিকে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন আছে। যথেচ্ছ বৃক্ষ ব্যবহার করলে বনভূমি নষ্ট হয় এবং যে প্রাকৃতিক দান মানুষের কাজে লাগে সেই দান যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে দেশের কোন কাজে ব্যবহৃত হতে পারে না। সমস্ত দেশের সরকার এই বনসম্পদ সংরক্ষণের জন্য যথেষ্ট সচেতন। বিভিন্ন আইনসম্মত নিয়মবিধি এই সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বনজ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সরকারি নিয়মগুলি হল —

- বনজ সম্পদ রক্ষণের জন্য আইন পাশ।
- বনজ সম্পদের জন্য জরিপ কার্য (Survey) সম্পূর্ণরূপে করা।
- সংরক্ষিত বনভূমি ও অরণ্য ভূমিকে পৃথকভাবে শ্রেণী বিভক্ত করা।
- বনভূমির পুনর্গঠন (Reforestation) এর সঠিকঅঞ্চল বিভাগ করা।
- বনজ সম্পদকে সঠিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নতিতে কাজে লাগান।
- প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা দাবানল, ভূমি খনন প্রভৃতির হাত থেকে বনজ সম্পদকে রক্ষা করা।
- জাতীয় উদ্যানের প্রভূত বিস্তার।
- বনসম্পদ উন্নতির দিকে বিশেষ নজর দেবার প্রয়োজন। সামাজিক বনসৃজন (Social Forestry) এবং কৃষি বনসৃজনের (Agro Forestry) দিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন আছে।

- দীর্ঘ মেয়াদি (Long term) এবং স্বল্প মেয়াদি (Short term) পরিকল্পনার মাধ্যমে Master Plan এর প্রয়োজন এবং

- পরিশেষে বনজীবনকে বৈজ্ঞানিক প্রথায় ব্যবহার করা প্রয়োজন ও বনভূমি ছেদনের উপর বিধি নিষেধ আরোপ প্রয়োজন।

বৃক্ষছেদনের ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যায় এবং চারদিকে খরা দেখা দেয়। যার ফলে ভূ-গর্ভের যে স্তরে জল পাওয়া যায় সেই স্তরের সীমা অনেক নিচে নেমে যায় ও জলাভাব দেখা দেয়। গাছ কাটার ফলে বায়ু মণ্ডলে আর্দ্রতার পরিমাণ কমে যায় এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণও সেই সঙ্গে কমে যায়। তাই জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বায়ুমণ্ডলে ঠিক রক্ষার জন্য বৃক্ষছেদন বৈজ্ঞানিক প্রথায় করা উচিৎ।

অরণ্য জীবন পরিচালনা পদ্ধতি (Forest Management)-এর মাধ্যমে অরণ্য সম্পদকে সঠিক ভাবে ব্যবহার এবং সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানো যায়। এর জন্য অরণ্য জীবন পরিচালনা সুষ্ঠু হওয়া দরকার Forest Management-এর জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন ঃ

- অরণ্য ভূমির সঠিক জরিপ কার্য করা।
- বনভূমির সঠিক শ্রেণীবিভাগ করা।
- বনভূমিকে সঠিকভাবে অর্থনৈতিক কাজে লাগানো।
- বনভূমি পরিচালনার জন্য সঠিক পরিচালক মণ্ডলী গঠন।
- অরণ্য সংরক্ষণের জন্য বনভূমির কাজে নিযুক্ত কর্মীদের সঠিক প্রশিক্ষণ।
- অরণ্যাঞ্চলে পর্যটন কেন্দ্র তৈরির মাধ্যমে দেশি, বিদেশি মুদ্রা অর্জনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া।
- সামাজিক এবং কৃষি ভিত্তিক অরণ্যাঞ্চল তৈরি করা।
- নতুন নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে বনসংরক্ষণের উপায় সন্ধান করা।
- বনভূমি পরিচালনার জন্য গবেষণার কাজ শুরু করা এবং
- নীতি নির্ধারণ এবং সঠিক কাজে লাগানো।

সংক্ষেপে বলা যায় বনভূমি সংরক্ষণ এবং উন্নতমানের পরিচালনার মাধ্যমে বনসম্পদকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক কাজে সুন্দর ভাবে কাজে লাগানোর প্রয়োজন আছে। সরকারিকরণের মাধ্যমে এই কাজ করা সম্ভব।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ : (Conservation of wild life)

অরণ্য সম্পদের মত বন্যপ্রাণীও একটি জাতীয় সম্পদ। এই জাতীয় সম্পদ প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে। বন্যপ্রাণী সম্পদ দেশের অর্থনৈতিক, আমোদ প্রমোদ এবং নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। এমন একটা সময় ছিল যখন প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্য অনেক কম ছিল এবং সেই কারণে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বা এর সঠিক পরিচালনার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দিনে দিনে কৃষি মানুষের বসতি বিস্তার শিল্পায়নের বিস্তারের জন্য ও মানুষের আগ্রাসী লোভের জন্য এই সমস্ত বন্য প্রাণী আজ ধ্বংসের পথে। কিছু কিছু অতীতের বন্যপ্রাণী আজও বর্তমান। বনভূমি ধ্বংসের ফলে বর্তমানে বহু বন্যপ্রাণী আজ বিলুপ্তির পথে। বহুল পরিমাণে বন্যপ্রাণীর মাংস, হাড়, গায়ের লোম, দাঁত, শিং এবং চামড়া ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে সমগ্র বিশ্বেই আজ এই সমস্ত বন্যপ্রাণী ধ্বংস করা হচ্ছে। সেই কারণে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজন বর্তমানে অনেক বেশি।[8]

---

৪ ডঃ মিত্র ও ডঃ সেনগুপ্ত — ফলিত ভূ-বিদ্যা - ৮১ পাতা

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দ্রুত হারে কৃষি বিস্তার, গৃহপালিত পশুর জন্য চারণ ভূমির ব্যবহার বৃদ্ধি, ক্রমাগত নগরায়নের বিস্তারের ফলে মানুষের প্রয়োজনে যাতায়াতের পথের বহুল বিস্তার, পরিশেষে দ্রুতহারে বায়ুদূষণের জন্য এই সমস্ত প্রাণী তাদের নিজস্ব গুণাগুণ হারাচ্ছে। এই সকল কারণের জন্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের নিয়মগুলি নিম্নরূপ ঃ—

- বন্যপ্রাণীর সঠিক খবর সংগ্রহ।
- অরণ্য জীবন রক্ষা করে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজন।
- বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক চলাফেরার জন্য বনাঞ্চলের বিস্তার বৃদ্ধি।
- বিভিন্ন প্রকার দূষণ থেকে বন্যপ্রাণীকে রক্ষা করার প্রয়োজন।
- সম্পূর্ণভাবে বন্যপ্রাণী শিকার বন্ধ করা দরকার।
- বন্যপ্রাণী আমদানি রপ্তানি বিধিনিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন।
- যারা এই সমস্ত বন্যপ্রাণী আমদানি রপ্তানি কার্যে নিয়োজিত তাদের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।
- বিশেষ বিশেষ বন্যপ্রাণীর জন্য "Game Sanctuaries"-এর প্রয়োজন আছে।
- যে সমস্ত বন্যপ্রাণী সংখ্যায় খুব কম তাদের বিশেষ ভাবে রক্ষা করা দরকার।
- দেশ বিদেশে প্রত্যেকের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের দিকে সজাগ থাকা দরকার।
- শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে বন্যপ্রাণী পরিচালনার দক্ষ পরিচালক বৃদ্ধির প্রয়োজন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বলা যায় বন্যপ্রাণী রক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ দিবস প্রতি বছর ৭ই অক্টোবর পালন করা হয়। এবং শুধুমাত্র এই সমস্ত প্রাণী সংরক্ষণের জন্য নয়, বছরের এই দিনটি এই প্রাণী সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যও পালন করা হয়।

8A.8 অরণ্য বা বনমহোৎসব (Afforestation)

প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে নূতন নূতন বনভূমি সৃষ্টি করতে মানুষ সচেষ্ট হচ্ছে। এর জন্য নূতন নূতন জমিতে যে গাছপালা লাগানো হয় তাকেই বনমহোৎসব বলে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে বিশেষত বর্ষাকালে সরকারি প্রচেষ্টায় এই বনমহোৎসব পালন করা হয়। সরকার নিজ খরচে বেশ কিছু চারা গাছ গ্রামীণ জনগণের গাছ লাগাবার উৎসাহকে বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে বিলি ব্যবস্থা করে থাকে। অরণ্য মহোৎসব প্রধানত দুটি উপায়ে করা হয় —(১) কৃষি বনসৃজন ও (২) সামাজিক বনসৃজন।

বনমহোৎসব ব্যতীত বনভূমির আয়তন ও উৎপাদন বজায় রাখার উদ্দেশ্যে যে দুটি প্রধান উপায় অবলম্বন করা হয়েছে - সে দুটি হল কৃষি বনসৃজন ও সামাজিক বনসৃজন।

8.9 কৃষি বনসৃজন (Agro forestry)

গ্রামে কৃষকের নিজের আশেপাশে পতিত জমির অথবা নিজের অধিকার ভুক্ত জমিতে ও বাড়ির সীমানা বরাবর ফসল উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে যে বনভূমির সৃষ্টি করা হয় তাকে বলে কৃষি বনসৃজন।

Folay ও Barmard এর মতে "From Forests is the name commonly given to programmes which promote commercial tree growing by farmers on their own land".*

কৃষি বনসৃজনের ফলে যে সকল সুবিধাগুলি পাওয়া যায় সেগুলি প্রাকৃতিক এবং আর্থসামাজিক এই দুটি দিককেই উন্নতিতে সহায়তা করে থাকে।

- পতিত জমির সংব্যবহার করা সম্ভব হয়।
- ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়।
- কৃষকের কৃষি ফসল ব্যতীত বাড়তি আয়ের সুযোগ হয়।
- জমিতে জৈব সারের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।
- বিভিন্ন বাগিচা কৃষির ক্ষেত্রে এরূপ বনায়ন চারা গাছগুলিকে প্রখর সূর্য কিরণ হতে রক্ষা করে। তেমনি জমির মালিক ও শ্রমিক উভয়েরই জ্বালানি কাঠের সমস্যার সমাধান হয়।
- গৃহপালিত পশুদের খাদ্যের যোগান দেওয়া সম্ভব হয়।
- প্রয়োজনীয় অন্যান্য ভেষজ গাছ হিসাবে কালমেঘ, বাসক, নয়নতারা, হলুদ, কলাই, তরিতরকারি ইত্যাদি চাষ করে কৃষকের অতিরিক্ত আয়ের বন্দোবস্ত করা সম্ভব।
- পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করা, প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়।

সর্বশেষ কৃষি বনসৃজনের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে একান্তভাবে নজর দিতে হবে। এমন গাছ লাগান উচিৎ নয় যা মাটির উৎপাদন ক্ষমতাকে নষ্ট করে (ইউক্যালিপটাস) বা এমন ঘন ভাবেও লাগান উচিত হবে না যার ফলে জমি ছায়াঘন হয়ে উৎপাদন ব্যাহত হবে।

8.10 ভারতের কৃষি বনসৃজন (Agro-forestry in India)

কৃষি বনসৃজন এর সরকারি নীতি সর্বপ্রথম ১৮৫২ সালে ঘোষণা করা হলেও ১৯৮৮ সালে এর কিছুটা বদল করা হয়। ভারতের কৃষি বনসৃজনকে তার ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি অনুসারে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলি যথাক্রমে — (১) কৃষি বনায়ন (Agri/.Silviculture) (২) বনায়ন পশুচারণ ব্যবস্থা (Silvi-Pustoral System) (৩) কৃষি বনায়ন পশুচারণ ব্যবস্থা (Agro-Silvi-Pustoral System) (৪) বহু উদ্দেশ্যে বনসৃজন ব্যবস্থা (Multipurpose Forest Production System)

কৃষি বনায়নের ক্ষেত্রে সরকার বনভূমির যে অংশের গাছ কাটা হয়ে যায় সেই অঞ্চলকে চাষ আবাদ করার জন্য বিশেষ কিছু লোককে কাজ করার স্বত্ব দেওয়া হয় এই শর্তে যে প্রথম বছর চাষ করে সমস্ত ফসল নিজেরা নেবে এবং দ্বিতীয় বছর বনবিভাগের পরিকল্পনামত চারা গাছ লাগাবে ও গাছের সারির মধ্যবর্তী অঞ্চলে চাষ করবে। এবং পরবর্তী তৃতীয় বর্ষে তারা ঐ জমির স্বত্ব ত্যাগ করে চলে যাবে। এই প্রথাকে এশিয়ার মায়ানমার অঞ্চলে "টাঙ্গিয়া" প্রথা বলে। এর ফলে বনবিভাগ ও কৃষক উভয়েরই লাভ হয় কারণ বনবিভাগ বিনা খরচে বনসৃজন করতে পারে এবং কৃষকও বিনা খরচায় প্রচুর ফসল পেয়ে যায়।

* "অনীশ চট্টোপাধ্যায় — অর্থনৈতিক ভূগোল" ৪৮০ পাতা

● যে সব জমিতে বনসৃজন ও পশুপালন একত্রে করা হয় তাকে বনায়ন পশুচারণ ব্যবস্থা বলে।

● এরূপ ক্ষেত্রে পশুচারণ বনায়ন ও কৃষি ব্যবস্থা এই তিন স্তরে কাজ একত্রে করা হয় বলে একে কৃষি বনায়ন পশুচারণ বন্দোবস্ত বলে।

● কৃষি বনায়ন পশুচারণের সঙ্গে সঙ্গে যদি নানারূপ ফল যথা আম, কাঁঠাল, জাম ইত্যাদির চাষ করা যায় তবে একই সঙ্গে প্রয়োজন মত অনেক ফলেরও যোগান সম্ভব হয়।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে কৃষি বন সৃজন সঠিক ভাবে করা গেলে একদিকে যেমন কাঠ ও পশুখাদ্য পাওয়া যায় আবার অন্যদিকে নানা প্রয়োজনীয় শস্যও পাওয়া যায়। এর সঙ্গে সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে যে মরশুমী বেকারত্ব দেখা যায় তা দূর করাও সম্ভব হয়।

8A.11 সামাজিক বনসৃজন (Social Forestry)

মানুষের ব্যবহৃত সকল প্রকার জমির বাইরেও কিছু জমি পতিত অবস্থায় থাকে। এই পতিত জমিতে বৃক্ষ রোপন করে যে বনভূমির সৃষ্টি করা হয় তাকে সামাজিক বনসৃজন বলে। সাধারণত সড়কপথে, রেলপথে, নদীর খালে, মন্দির মসজিদ, গির্জা, বিদ্যালয়ে, অফিস আদালত ইত্যাদি সব কিছুর পাশেই কিছু না কিছু পতিত জমি থাকে। ঐ সকল পতিত জমিতে বৃক্ষ রোপণ করে সামাজিক বনসৃজন করা হয়ে থাকে। এর ফলে পরিবেশ, মানুষ এবং অর্থনীতি এই সকল দিকেরই উন্নয়ন সম্ভব। এই ভাবে বনসৃজনের ফলে যে সকল সুবিধাগুলি পাওয়া যায় সেগুলি নিচে আলোচনা করা হল।

● অব্যবহৃত জমিকে কাজে লাগান সম্ভব।

● ভূমিক্ষয় রক্ষা করা যায়।

● জ্বালানি ও পশুখাদ্যের যোগান বাড়ান যায়।

● জমির জৈব সারের যোগান বাড়ে।

● কাঠ ও অন্যান্য বনজ সম্পদের পরিমাণ বাড়ে।

● পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করতে সহায়তা করে।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে একদা অরণ্যবাসী মানুষের জীবন ও জীবিকা ছিল অরণ্য নির্ভর কিন্তু বর্তমানে হয়ত আমরা সেরূপভাবে জীবিকার জন্য অরণ্যের উপর নির্ভর করি না। কিন্তু আমাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে এবং পরোক্ষভাবে জীবিকার জন্য অরণ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

8A.12 পশুপালনের সংজ্ঞা (Definition of Animal Husbandry)

অধ্যাপক জিমারম্যানের মতে (১৯৫১) পশুপালন কৃষিকার্যের অন্তর্গত। সেইদিক থেকে বিচার করলে পশুপালনকে অর্থনৈতিক কার্যের প্রাথমিক কার্যাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।[৮]

৮ অনীশ চট্টোপাধ্যায় — অর্থনৈতিক ভূগোল - ৪১৫ পাতা।

প্রাথমিক অর্থনৈতিক কার্যাবলী বলতে বোঝায় সেইসব কার্যাবলী যার সহায়তায় মানুষ ক্ষুধা নিবারণের জন্য সম্পদ আহরণ করে অর্থাৎ খাদ্য উৎপাদনের জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বন করা যায়, তাই হল প্রাথমিক অর্থনৈতিক কার্যাবলী। কৃষির সঙ্গে সঙ্গে মৎস্য সংগ্রহ, বনজ সম্পদ সংগ্রহ এবং পশুশিকার ও পশুপালনও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

8A.13 পশুপালনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Importance of Animal Husbandry)

পৃথিবীর বহু দেশে পশুপালন একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প হিসাবে গড়ে উঠেছে। পশুপালন ও পশুজাত সম্পদের উপর নির্ভর করে বহু মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহ করে চলেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের প্রাকৃতিক পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের পশু প্রতিপালিত হলেও ঐ সকল পশুজাত দ্রব্যাদি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। তাই পশুপালনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নিম্নে পশুপালনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হল —

১। **খাদ্যের যোগান** — গৃহপালিত পশু হিসাবে গরু, ছাগল, মেষ, শুকরের মাংস এবং গবাদি পশুর দুগ্ধ উপযুক্ত প্রোটিন খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। দুগ্ধ হতে উৎপন্ন মাখন, ঘি, পনির, গুঁড়ো দুধ ইত্যাদির বাণিজ্যিক উৎপাদন ও ব্যবহার একদিকে খাদ্যের পুষ্টি যোগান দেয়, অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে সহায়তা করে। আবার হাঁস, মুরগীর মাংস ও ডিম খাদ্য হিসেবে বহুল প্রচলিত।

২। **পরিবহনের ক্ষেত্র** — প্রাচীন যুগ হতে পশু পরিবহনের অঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতিতে পশু পরিবহন অনেকাংশে প্রায় বন্ধ হয়ে গেলেও দুর্গম অঞ্চলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জ্ঞান পৌঁছাতে প্রাকৃতিক গঠন বা পরিবেশ কোন ভাবেই তাকে সহায়তা করে না সেখানে এখনও পশু যথা ঘোড়া, উট, হাতি ইত্যাদি পরিবহনের প্রধান সহায় স্বরূপ বিবেচিত হয়। তুন্দ্রা অঞ্চলে বল্গা হরিণ ও কুকুরের শ্লেজ গাড়ি টানা পরিবহনের এক সুন্দর উদাহরণ।

৩। **কৃষিকার্য** — পশুপালন কৃষিকার্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। নিবিড় জীবিকা ভিত্তিক কৃষি অঞ্চলগুলি যথা দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে জমি চাষ করা, ধান মাড়াই করা, মাটি হতে ফসল তোলা প্রভৃতি নানা কাজে গরু, ঘোড়া, মহিষ প্রভৃতি জীবজন্তু ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকের বেশি অংশে এখনও কৃষি পশুশক্তির উপর নির্ভরশীল।

৪। **বিভিন্ন শিল্পের কাজে** — ভারত, বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চলে তেলের ঘানিতে বা আখের রস বার করতে বা বন হতে কাঠের গুঁড়ি বহন করে আনতে প্রচুর পরিমাণে পশু শক্তির ব্যবহার দেখা যায়। আবার এর সঙ্গে সঙ্গে পশম শিল্প, চর্ম শিল্প ইত্যাদি নানা শিল্পগুলি প্রধানত পশু নির্ভর।

৫। **বিভিন্ন গবেষণার কাজ** — বিভিন্ন ঔষধের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা হয় গিনিপিগ, বানর, মেষ ইত্যাদি প্রাণীদের।

এই ভাবে দেখা যাচ্ছে মানুষের জীবনের একটি অন্যতম প্রধান সম্পদ হল এই পশু সম্পদ। বন সম্পদের মত পশু সম্পদও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করতে সহায়তা করে থাকে।

8A.14 পশুপালনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Animal Husbandry)

প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতা পশুপালনের মধ্যেও বিভিন্নতা নিয়ে আসে। এই বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে পশুপালন ব্যবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। (১) যাযাবরী পশুপালন (২) মিশ্র পশুপালন ও (৩) বাণিজ্যিক পশুপালন।

১। **যাযাবরী পশুপালন** — অতি প্রাচীন কাল হতে যে সব অঞ্চলের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন এবং খাদ্য ও জলের অভাব প্রকট সে সব অঞ্চলে যাযাবরী পশুপালন ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। এই পশুপালন মুখ্যত জীবিকা ভিত্তিক। ইউরেশিয়া অঞ্চলের কিরঘিস, কাজাক বা তুন্দ্রা অঞ্চলের ল্যাপ, সামোয়েদ ইত্যাদি উপজাতিরা এখনও পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এদের পশুপালনের জন্য কোন নির্দিষ্ট জমি থাকে না। এরা পশুদের খাদ্যের সন্ধানে স্থান হতে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়ায়।

২। **মিশ্র পশুপালন** — এরূপ ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন ও পশুপালন একত্রে চলে এই মিশ্র পশুপালনের ক্ষেত্রে বেশি মূলধন, দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এরূপ পশুপালন যুক্তরাষ্ট্রের ভুট্টা বলয়ে, আর্জেন্টিনার পম্পাস তৃণভূমিতে, ইউরোপের মধ্য ও পূর্বাংশের তৃণভূমি অঞ্চল প্রধান। এই সকল মিশ্র পশুপালন ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এখানে জীবিকা ভিত্তিক ও বাণিজ্যিক উভয় প্রকার কৃষির মিশ্রণ এবং এইরূপ কৃষি প্রগাঢ় চাষের অন্তর্গত। এছাড়া এরূপ ক্ষেত্রে শস্যাবর্তন ব্যবস্থা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকে কৃষকেরও সারাবছর কাজের কোন অভাব ঘটেনা।

৩। **বাণিজ্যিক পশুপালন** — এরূপ পশুপালনের ক্ষেত্রে মানুষ নিজের জন্য পশুপালন করে না, খামারের বাইরের বৃহত্তর অঞ্চলে পশু পালন করা হয় এবং উৎপাদিত দ্রব্যাদি যথা দুধ, পনির, মাংস, পশম, চর্ম ইত্যাদি বিক্রি করে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে। সাধারণত নাতিশীতোষ্ণ ক্রান্তীয় তৃণভূমিগুলিতে এরূপ পশুচারণ দেখা যায়। এই ধরনের কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এগুলি বৃহদায়তন এবং সুসংহত হয়। পশুপালনই এই অঞ্চলের প্রধান উপজীবিকা ও কৃষি দ্বিতীয় উপজীবিকা। এখানে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পশুপালন করা হয়। এই কাজে প্রচুর পুঁজি ও দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এই অঞ্চলের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এখানে একটি অঞ্চলে এক ধরনের পশুই পালিত হয়। যেমন দোহ শিল্পের জন্য গবাদি পশু ও পশমের জন্য মেষ ইত্যাদি।

8A.15 পৃথিবীর বাণিজ্যিক পশুপালন ক্ষেত্র সমূহ (Commercial Live stock rearing Area in the World)

পৃথিবীর যে সব অঞ্চলে তৃণভূমির অবস্থান রয়েছে, সে সকল অঞ্চলেই পশুপালন ব্যাপক ভাবে হয়ে থাকে। পৃথিবীর প্রধান দুটি অঞ্চলে (ক) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল ও (খ) ক্রান্তীয় অঞ্চলে তৃণভূমি দেখা যায়। ফলে এই দুটি অঞ্চল পশুচারণ শিল্পে উন্নতি লাভ করেছে।

8A.15.1 নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমি (Temperate grasslands)

পৃথিবীর যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম এবং দীর্ঘ সময় ধরে শুষ্ক ঋতু চলে সে সকল অঞ্চলে স্বাভাবিক ভাবেই বড় বড় বৃক্ষের পরিবর্তে তৃণ জন্মায়। এই তৃণ পশুদের অতি উপাদেয় খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয়।

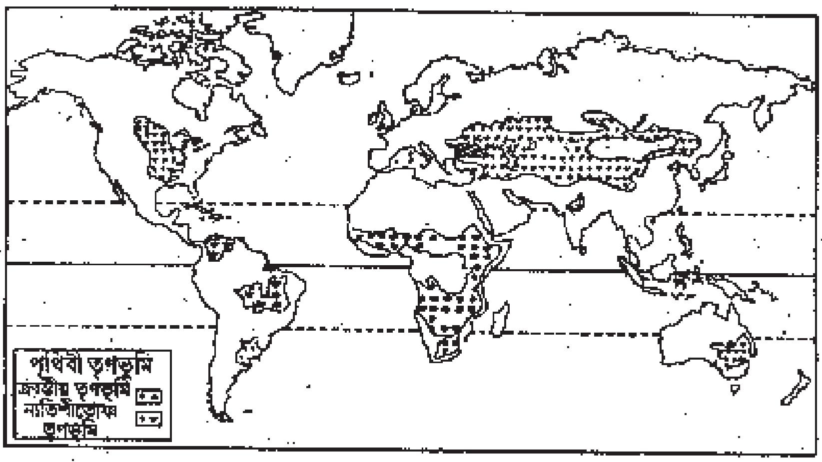

চিত্র - ৬ : পৃথিবীর বাণিজ্যিক পশুপালক ক্ষেত্র।

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলগুলি উভয় গোলার্ধে প্রধানত ৩০° - ৫০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। এই তৃণভূমি অঞ্চলগুলি উত্তর গোলার্ধের ঃ—

ক. উত্তর আমেরিকার উত্তরের প্রেইরি অঞ্চল

খ. উত্তর পশ্চিম ইউরোপ ও পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়ার স্তেপস্ অঞ্চল এবং দক্ষিণ গোলার্ধের -

গ. দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বাংশের পম্পাস ও উরুগুয়ের দক্ষিণাংশের চাকো

ঘ. দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণের ভেল্ড মালভূমি।

ঙ. অস্ট্রেলিয়ার মারে ডার্লিং অববাহিকার ডাউনস্ অঞ্চল।

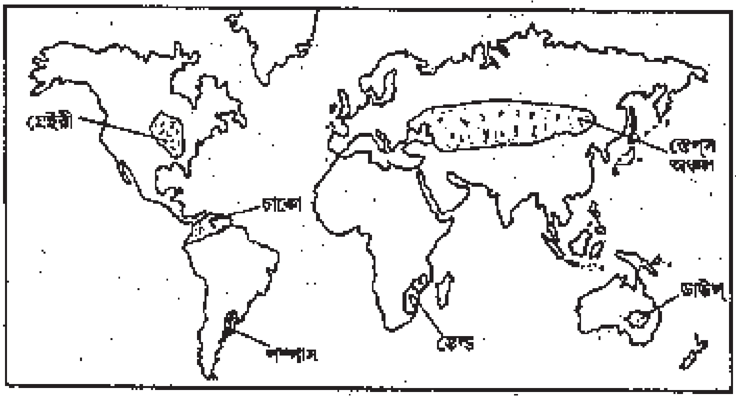

চিত্র - ৭ : পৃথিবীর বিভিন্ন পশুচারণ ক্ষেত্র গুচ্ছ।

8A.15.1.1 উত্তর আমেরিকার উত্তরের প্রেইরি অঞ্চল (Prairies of North America)

উত্তরে কানাডা থেকে দক্ষিণে মেক্সিকো পর্যন্ত বিস্তৃত তৃণভূমি প্রেইরি তৃণভূমি নামে পরিচিতি। এই তৃণভূমির পূর্বসীমা ১০০° পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা এবং পশ্চিম সীমা সিয়েরা নেভেদা ও সেলকার্ক পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। এই প্রেইরি অঞ্চলভুক্ত রাজ্যগুলি যথাক্রমে কানাডার আলবার্টা ও সামকাচুয়ান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন, মিনেসোটা, আইওয়া, ডাকোটা ও কলাহোমা, টে সাস ইত্যাদি এবং মেক্সিকোর উত্তরে চিহুয়াহুয়া ও কোয়াহুইলা প্রদেশগুলি প্রেইরি তৃণভূমির অন্তর্গত।

এই সকল তৃণভূমিতে প্রধানত বাণিজ্যিক ভিত্তিক পশুপালন আরম্ভ হয় তবে এই পশুপালন প্রেইরি অঞ্চল ছাড়িয়ে মার্কিন যুক্তরাজ্যের ভুট্টা বলয়ের বিরাট অংশে ছড়িয়ে পড়েছে। অন্যদিকে প্রেইরির পশ্চিমাংশের ইন্টারমন্টের মালভূমিতেও প্রচুর পশুপালন করা হয়ে থাকে।

এই তৃণভূমি অঞ্চলে প্রধানত গবাদি পশু ও মেষ পালন করা হয়। টেকশাস অঞ্চলে অ্যাঙ্গোরা ছাগল প্রতিপালিত হয়ে থাকে। পশু খাদ্য হিসাবে প্রাকৃতিক তৃণের সঙ্গে সঙ্গে পৃথক ভাবে এখানে বিভিন্ন পশু খাদ্য চাষ করা হয়ে থাকে। এগুলির মধ্যে প্রধান হল আলফা আলফা, হে, ক্লোভার, টিমোথি ইত্যাদি নানা জাতের তৃণ ও ভুট্টা, শালগম, আলু ইত্যাদি এবং নানা শাক সব্জির চাষ হয়ে থাকে। প্রেইরির বিস্তৃত অঞ্চলের মাংসপ্রদায়ী গবাদি পশুগুলিকে তৃণভূমিতে এবং ভুট্টা বলয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঐ ভুট্টা বলয়ের পুষ্টিকর খাদ্যের প্রভাবে এদের দেহে মাংসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং এর পর প্রয়োজন মত উপযুক্ত সময়ে কসাইখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যদিকে দুগ্ধ প্রদায়ী গবাদি পশুগুলিকে প্রতিদিন দুগ্ধ সংগ্রহের জন্য খামারে আনা প্রয়োজন হয় বলে জলসেচ যুক্ত স্বল্প পরিসর স্থানে যেখানে তৃণ ও শস্যাদি জন্মায় সেই সকল অঞ্চলে দুগ্ধ প্রদায়ী গবাদি পশুপালন করা হয়।

উর্বর প্রেইরি অঞ্চলের প্রায় ৪০% জমিতেই পশুপালন করা হয়ে থাকে। এরূপ পশুপালনের প্রধান কারণগুলি নিম্নরূপ —

১. রকি পর্বতের পাদদেশে বিশাল চারণ ক্ষেত্র বর্তমান।

২. রকি পর্বতের উপর দিয়ে উষ্ণ চিনুক বায়ুপ্রবাহের ফলে শীতকালেও এই অঞ্চলের বরফ গলে গিয়ে পশুখাদ্য তৃণ জন্মে থাকে।

৩. পশুখাদ্যের নিয়মিত যোগানের ব্যবস্থা।

৪. প্রাণীজাত খাদ্যের ব্যাপক চাহিদা।

৫. উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা।

৬. বিজ্ঞানসম্মতভাবে পশুখাদ্য প্রক্রিয়াকরণের সুবিধা।

৭. বাজারের নিকটবর্তীতা ইত্যাদি কারণগুলি প্রধান।

8A.15.1.2 ইউরেশিয়ার স্তেপ অঞ্চল (Steppes of Eurasia)

ইউরেশিয়া মহাদেশের অভ্যন্তরভাগে পশ্চিমে ইউক্রেন ও কাস্পিয়ান সাগর হতে পূর্বে উত্তর পশ্চিম চীনের মঙ্গোলিয়ার উচ্চভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল যে তৃণপ্রান্তর দেখা যায় তাই স্তেপ অঞ্চল নামে পরিচিত।

বর্তমানে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। উন্নত কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন। সেচ ব্যবস্থা ও বাজারের সুবিধা থাকার দরুন এখানে উন্নত পশুচারণক্ষেত্র গড়ে উঠেছে।

এই তৃণভূমিকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায় একটি ইউরোপীয় অংশে অন্যটি রাশিয়ার (পূর্বতন) অংশ। ইউরোপের তৃণভূমিগুলি ফ্রান্স, জার্মানী, ডেনমার্ক, সুইডেন ইউরোপীয় রাশিয়া, ইউক্রেন প্রভৃতি উত্তর পশ্চিম দেশগুলি নিয়ে গঠিত। সমুদ্র হতে বহুদূরে মহাদেশগুলির মধ্যে অবস্থানের ফলে এই অঞ্চলের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। এই সব অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা ১৫° সেঃ এর মধ্যে থাকে তবে কোথাও কোথাও তাপমাত্রা শীতকালে ০ সেন্টিগ্রেডে নেমে যায়। শীতকালে রকি পর্বতের পূর্বঢালে উষ্ণ চিনুক বাতাসের প্রভাবে ঐ অঞ্চলের বরফ গলে যায়, এর ফলে

প্রচুর তৃণ জন্মায় ও কৃষিকার্যের সুবিধা হয়। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম ২৫-৫০ সেঃ মিঃ। তবে মেরু সীমান্ত অঞ্চলে উত্তাপ কম থাকে বলে তৃণ জন্মাতে পারে।

ইউরোপের স্তেপ অঞ্চলগুলি বাণিজ্যিকভাবে গবাদি পশুচারণের জন্য বিখ্যাত। ঘন বসতির জন্য এখানকার পশুচারণ ক্ষেত্রগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট মাপের বলে এখানে একই জমিতে কৃষি ও পশুচারণ একত্রে গড়ে উঠতে দেখা যায় অর্থাৎ এখানে মিশ্র পশুচারণ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

রাশিয়ার (এশিয়াংশে) স্তেপ অঞ্চলে পশুপালনের সঙ্গে কৃষির প্রবর্তন করেছে। এখন এই সব অঞ্চলে প্রচুর গম ও অন্যান্য ফসল উৎপন্ন হয়। প্রতিটি কৃষকই গরু, ঘোড়া ও হাঁস মুরগী পালন করে। এ ছাড়া এখানে বৃহদায়তন পশুচারণ ক্ষেত্রও রয়েছে।

8A.15.1.3 দক্ষিণ আমেরিকার পম্পাস অঞ্চল (Pompas of South America)

পূর্বাংশে ব্রাজিল প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়ের দক্ষিণাংশে দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তীর্ণ তৃণভূমি অঞ্চলটি পম্পাস নামে পরিচিত। আর্জেন্টিনার নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি চাকো নামে পরিচিত। এই তৃণভূমি অঞ্চলটি আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ের মধ্য দিয়ে দক্ষিণে ব্রাজিল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই তৃণভূমি অঞ্চলে বাণিজ্যিক ভাবে পশুপালনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ফসল যথা গম, ভুট্টা ও তিসির চাষ হয়। পশু খাদ্য হিসেবে আলফা আলফা ঘাস জন্মায়। এখানকার পশুগুলির মধ্যে মেষ, ছাগল ও গরু প্রধান। কিছু কিছু ঘোড়াও প্রতিপালিত হয়।

এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত পশ্চিম হতে পূর্বদিকে ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। পূর্বদিকে প্রায় ১০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হয় এবং এর পরিমাণ কমে পশ্চিমে প্রায় ৪৫ সেন্টিমিটারে পরিণত হয়। এই অঞ্চলের মৃদু জলবায়ু পশুচারণের পক্ষে খুবই উপযোগী। পূর্বদিকে বৃষ্টিপাতের আধিক্যের ফলে তৃণগুলি অনেক বড় বড় হয় ফলে এই অঞ্চলে প্রচুর গবাদি পশু প্রতিপালিত হয়।

আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ও প্যারাগুয়ের আর্দ্র অঞ্চলে গবাদি পশুচারণ করা হয়। অন্যদিকে দক্ষিণ চিলি, পশ্চিম আর্জেন্টিনা ও দক্ষিণ প্যাটাগোনিয়া অঞ্চলের শুষ্ক মরু অঞ্চলের মেষ পালন করা হয়। আর্জেন্টিনার রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে মাংস রপ্তানিতে প্রথম ও পশম রপ্তানিতে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। এখানে মেরিনো জাতীয় মেষ পালিত হয়। আর্জেন্টিনার পম্পাস অঞ্চলের বৃহদায়তন খামারগুলিকে বলে এস্টানসিয়া (Estancia) এবং অপেক্ষাকৃত ছোট খামারগুলিকে বলে চাকরাস (Chacras)। এখানকার মাংস রান্না করার কেন্দ্রগুলিকে বলে ফ্রিগোরিফিকেস (Frigorificas)। পম্পাস অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এত উন্নত যে এখানকার কোন পশুকেন্দ্রই রেলপথ হতে ৪০ কিঃ মিঃ এর বেশি দূরে নয়। এখানে পশুপালনের দুটি সমস্যা দেখা যায় ঃ— (১) মাঝে মাঝে গ্রীষ্মকালে খরা দেখা দেয় এর ফলে (২) প্রায়ই পশুরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

8A.15.1.4 দক্ষিণ আফ্রিকার ভেল্ড তৃণভূমি (Veld of South Africa)

দক্ষিণ আফ্রিকার সর্ব দক্ষিণে নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলকে বলে ভেল্ড। এই তৃণভূমির ঢাল বরাবর প্রায় ২৫০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০-৮০ সেঃ মিঃ। ফলে এরূপ শুষ্ক আবহাওয়ার জন্য খুব উৎকৃষ্ট মানের তৃণ জন্মাতে পারে না। তাই এখানে গবাদি পশু বিশেষ পালন করা হয় না। এখনে প্রধানত মেরিনো জাতের মেষ চারণ করা হয় তবে এর সঙ্গে সঙ্গে উটপাখি পালনেরও ব্যবস্থা রয়েছে। উটপাখির পালক খুবই মূল্যবান। এখানে হটেনটন নামে এক শ্রেণীর পশুপালক যাযাবর উপজাতি বসবাস করে।

এরা পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করে। দক্ষিণ আফ্রিকার ভেল্ড অঞ্চল থেকে মেষ চর্ম ও পশম রপ্তানি করা হয়। দেশের মোট রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা ৪০ ভাগ আসে এই প্রাণী জাত বিভিন্ন সম্পদ হতে।

8A.15.1.5 অস্ট্রেলিয়ার ডাউন্স অঞ্চল (Downs of Australia)

অস্ট্রেলিয়ার নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি ডাউন্স নামে পরিচিত, এছাড়া নিউজিল্যান্ডের এরূপ তৃণভূমি তুসোক নামে পরিচিত।

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া, নিউসাউথওয়েলস্ এবং দক্ষিণ পূর্ব কুইন্সল্যান্ডের বিস্তীর্ণ তৃণভূমি অঞ্চলে প্রচুর গবাদি পশু পালন করা হয়। এখানকার পশুদের মধ্যে মেষ প্রধান। এখানে এত বেশি সংখ্যক মেষ পালন করা হয় যে হিসাব করে দেখা গেছে যে এখানে বসবাসকারী মানুষদের তুলনায় পশুর সংখ্যা প্রায় ১০গুণ। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার অপেক্ষাকৃত মরুপ্রায় অঞ্চলে বাণিজ্যিক ভাবে পশুপালন করা হয়। অস্ট্রেলিয়া থেকে ৪৫ % পশম ও ২০% মাংস রপ্তানি করা হয়। পশম রপ্তানিতে অস্ট্রেলিয়া প্রথম স্থানে।

নিউজিল্যান্ডের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু পশুপালনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই অঞ্চলের উর্বর দ্বীপ অঞ্চল, অকল্যান্ড অঞ্চল, তারানকি সমভূমি, দক্ষিণ দ্বীপের ক্যান্টারবেরী সমভূমি ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলগুলি বাণিজ্যিক ভাবে পশুপালনের জন্য বিখ্যাত। এখানে সারা বছরই বৃষ্টিপাত হয় বলে এখানকার পশুচারণ অঞ্চলে তৃণের কখনও অভাব হয় না। এই অঞ্চলে প্রধানত গবাদি পশু ও মেষ পালন করা হয়। নিউজিল্যান্ডের ৯০% রপ্তানি পণ্যই হল পশুজাত দ্রব্য। এই সব অঞ্চল হতে মাংস, পশম, পনির, মাখন, চামড়া প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়।

8A.15.2 ক্রান্তীয় অঞ্চলের তৃণভূমি (Grass lands of Tropical Region)

ক্রান্তীয় অঞ্চলে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির জল উষ্ণতার জন্য শীঘ্রই বাষ্পে পরিণত হয়। এরূপ উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর জন্য এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ তৃণভূমির সঙ্গে সঙ্গে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বড় বড় গাছ ও ছোট ছোট ঝোপ দেখা যায়। ক্রান্তীয় অঞ্চলে ৭° হতে ২০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে যে তৃণভূমি জন্মায় তা সাভানা নামে পরিচিত। গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা ২২°-৩৭° সেঃ মিঃ ও বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২৫ - ১৫০ সেঃ মিঃ এর মধ্যে হয়ে থাকে। ক্রান্তীয় অঞ্চলের যে সকল অঞ্চলে পশুপালন বিশেষ ভাবে উন্নতি লাভ করেছে সেগুলি যথাক্রমে —

১. আফ্রিকার সাভানা তৃণভূমি অঞ্চলগুলির মধ্যে সুদান, সেনেগাল, মালি, নাইজেরিয়া, তানজানিয়া, জিম্বাবোয়ে প্রভৃতি দেশগুলি প্রধান। এখানে প্রচুর লম্বা লম্বা ঘাস জন্মে এবং গরু এরূপ তাপ সহ্য করতে পারে বলে গোপালনই এখানে বিশেষ উন্নতি লাভ করেছে। এ অঞ্চলে মাংস প্রদায়ী গরুর সংখ্যাই বেশি।

২. দক্ষিণ আমেরিকার পশুপালন কেন্দ্রগুলির মধ্যে কলম্বিয়া ও বলিভিয়ার সাভানা, ভেনেজুয়েলার লানোস, ব্রাজিলের ক্যাম্পোস, উত্তর আর্জেন্টিনা ও পশ্চিম প্যারাগুয়ের চাকো তৃণভূমি প্রধান। এই সব অঞ্চলে প্রধানত গবাদি পশু পালন করা হয়। মাংস ও পশু চর্ম উৎপাদনের জন্য দক্ষিণ আমেরিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩. অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের উত্তর ও উত্তর পশ্চিম অংশের ক্রান্তীয় জলবায়ুতে প্রচুর গবাদি পশু প্রতিপালিত হয়। এই অঞ্চলগুলি যেখানে বছরে বৃষ্টিপাত ৪০ - ১০০ সেঃ মিঃ এর মধ্যে হয়ে থাকে এবং সে সব অঞ্চলে লম্বা ঘাস জন্মায় তা গবাদি পশুপালনের জন্য বিশেষ ভাবে অনুকূল। এখানে জলের অভাব মোচনের জন্য আর্টেজীয় কূপ খনন করা হয়ে থাকে। এই অঞ্চলে স্থানীয় চাহিদা কম থাকায় এবং পশুচারণ ক্ষেত্রগুলি সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হবার ফলে এই অঞ্চল পশুজাত দ্রব্যের রপ্তানি বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করেছে।

৪. ভারতের ক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রচুর গবাদি পশুপালন করা হয়। এই উপজীবিকা ভারতের ক্ষেত্রে গৌণ উপজীবিকা। ভারতের গুজরাট, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু প্রভৃতি অঞ্চলের ক্রান্তীয় তৃণভূমিতে গবাদি পশু, মেষ, ছাগল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পালন করা হয়। ভারতে প্রধানত দুধ ও দুগ্ধজাতীয় দ্রব্যাদি, পশুচামড়া, পশম ইত্যাদি উৎপন্ন করে থাকে। পশুচর্ম রপ্তানিতে পৃথিবীতে ভারতের স্থান প্রথম।

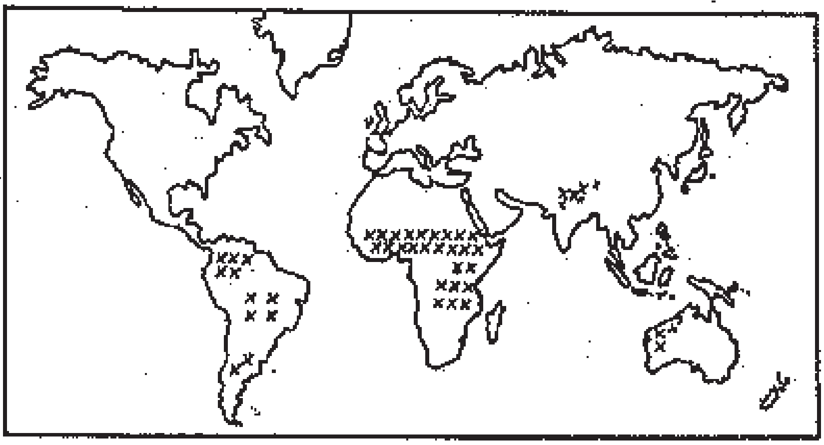

চিত্র - ৮ : ক্রান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চল সমূহ।

8A.16 পশু ও পশুজাত দ্রব্য (Animal and Animal Products)

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে সকল পশুপালন করা হয় সেগুলির মধ্যে গবাদি পশু, মেষ ও শুকর প্রধান। এই পশুগুলি যে সব দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রতিপালিত হয় তা নিম্নে দেওয়া হল।

গবাদি পশু পালন করা হয় — (১) দুগ্ধ, (২) মাংস, (৩) ভারবহন, (৪) চামড়া ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য

মেষ প্রধানত পালন করা হয় — (১) পশম ও (২) মাংসের জন্য

শুকর পালন করা হয় — (১) মাংস ও (২) চর্বির জন্য।

8A.17 দোহ শিল্প ও শিল্পজাত সামগ্রী (Dairy Farming)

দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রী যথা — জমান দুগ্ধ, ছানা, মাখন, ঘি, চিজ, পনির, গুঁড়ো দুধ ইত্যাদি বিজ্ঞান সম্মত ভাবে উৎপাদন করাই ডেয়ারী শিল্প বা দোহ শিল্প নামে পরিচিত। দোহ শিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজন উন্নত সংকর শ্রেণীর দুগ্ধ প্রদায়ী গরু। এরূপ দুগ্ধ প্রদায়ী গো-পালন ও দোহ শিল্পের জন্য যে সব অনুকূল ভৌগোলিক ও আর্থসামাজিক পরিবেশের প্রয়োজন সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল—

ক. গো-পালনের জন্য দীর্ঘ তৃণযুক্ত সমৃদ্ধ চারণভূমির প্রয়োজন।

খ. তৃণ ও পশু খাদ্য উৎপাদনের জন্য পডসল, প্রেইরি, পার্বত্য মৃত্তিকা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের হালকা থেকে মাঝারি ধরনের উর্বর মৃত্তিকা প্রয়োজন।

গ. স্বল্প বৃষ্টিপাত তৃণ জন্মাতে সহায়তা করে। বার্ষিক গড়ে ৫০-৭০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত দীর্ঘ পুষ্টিকর তৃণ উৎপাদনে সহায়তা করে।

ঘ. দুগ্ধ প্রদায়ী গো-পালনের জন্য গড়ে ১৫°-২০° সেঃ উত্তাপ অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী মৃদু উষ্ণতার প্রয়োজন।

ঙ. কৃষিকার্যের অনুপযোগী সমভূমি বা মালভূমি গবাদি পশুপালনের উপযোগী।

চ. স্বচ্ছ জলযুক্ত হ্রদ, নদী বা নলকূপ হতে প্রাপ্ত জলের ব্যবস্থা অঞ্চলে পালিত গরুর দুধ প্রদান ক্ষমতা বেশি হয়।

ছ. গো-পালন, দোহন, সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজে প্রচুর সুদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন।

জ. বর্তমানে দোহন হতে আরম্ভ করে দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি করা ও তাদের হিমায়িত করা ইত্যাদি কাজে উন্নত প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমিকের প্রয়োজন।

ঝ. দুগ্ধ প্রদায়ী গো-পালন বা শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও সংরক্ষণ ইত্যাদি সকল কাজে প্রচুর পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন।

ঞ. দোহ শিল্প কেন্দ্রগুলি বিক্রয় কেন্দ্রের সান্নিধ্যে অবস্থিত হওয়া প্রয়োজন। কেননা দুধ শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যায়। পৃথিবীর অধিকাংশ দুধই টাটকা অবস্থায় বিক্রয় হয়।

ট. দুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রীকে শীঘ্র পচনের হাত হতে রক্ষা করতে উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজন।

ঠ. দোহ শিল্প গড়ে ওঠে চাহিদা অনুসারে, তাই এই শিল্প জনবহুল এলাকার নিকটে গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক।

ড. সর্বশেষে বলা যায় সর্বদেশে ও সর্বকালে এই সকল ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনুকূল প্রশাসনিক ব্যবস্থা এই শিল্প সম্পদকে প্রভাবিত করে।

8A.18 পৃথিবীতে দোহ শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন (Production of Dairy Items in the World)

দোহ শিল্পজাত প্রধান উৎপাদিত সামগ্রীগুলির মধ্যে প্রধান হল দুধ, ঘি, মাখন, চিজ ও গুঁড়ো দুধ ইত্যাদি।

এই সকল দ্রব্য উৎপাদনকারী দেশগুলি নিম্নরূপ :

১. সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে দুধ উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম। এরপর যথাক্রমে ভারত ও রাশিয়ার স্থান। জার্মানি ও ফ্রান্সে যথেষ্ট দুধ উৎপাদিত হয়।

২. রাশিয়ান ফেডারেশন বা C.I.S. মাখন উৎপাদনে সর্বপ্রথম স্থানে রয়েছে। এরপর যথাক্রমে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও জার্মানির স্থান।

৩. চিজ উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম এবং এরপর C.I.S. ফ্রান্স ও জার্মানির স্থান পর পর রয়েছে।

৪. গুঁড়ো দুধ উৎপাদনে ফ্রান্স প্রথম। এরপর যথাক্রমে নিউজিল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, ব্রাজিল ও ডেনমার্কের স্থান।

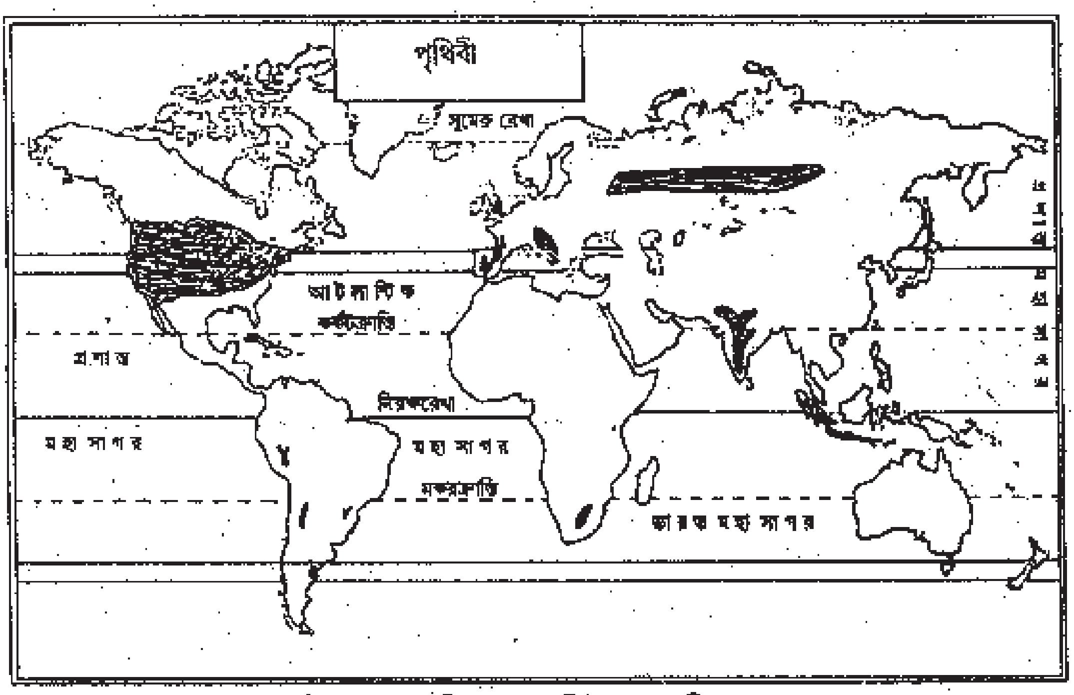

চিত্র - ৯ : দোহ শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনকারী অঞ্চল।

8A.19 দোহ শিল্পের বণ্টন (Dairy Industry Distribution)

দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন পৃথিবীর সর্বত্র সমান নয়। পৃথিবীর দোহ শিল্পে উন্নত দেশগুলিকে নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল।

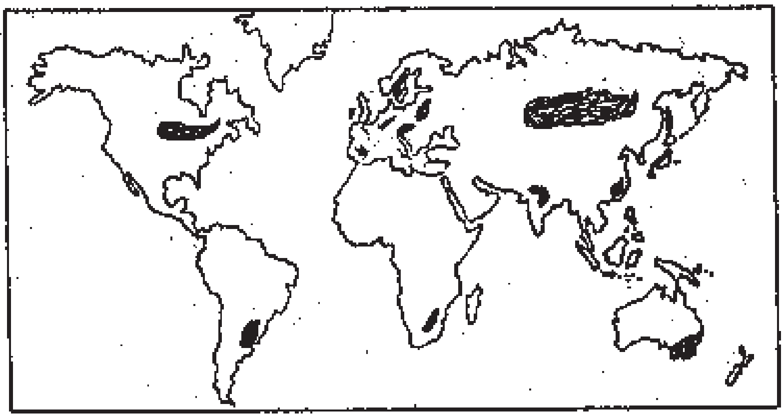

চিত্র - ১০ : পৃথিবীর দোহ শিল্পের বণ্টন।

১. C.I.S. অন্তর্ভূক্ত রাশিয়া, ইউক্রেন ও তৎসংলগ্ন স্তেপ তৃণভূমি অঞ্চল গবাদি পশুচারণের জন্য প্রসিদ্ধ। দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির প্রচুর চাহিদা, পরিবহনের সর্বপ্রকার সুবিধা, পশুখাদ্যের প্রচুর যোগান, এবং নিকটবর্তী বৃহৎ জনবসতিপূর্ণ ডনেৎস্, ক্রাসনোভর, কিয়েভ, বাকু, গোর্কি গারকভ প্রভৃতি শহরের অবস্থান এই অঞ্চলে দোহ শিল্প বিস্তারে সহায়তা করেছে।

যৌথ খামারে উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এখানে গবাদি পশু পালন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে দুধ উৎপাদনে এই দেশ তৃতীয় হলেও মাখন ও ঘি উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম.এ ছাড়া এখান প্রচুর পরিমাণে চিজও উৎপাদিত হয়ে থাকে।

২. অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড দোহ শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু এই অঞ্চলের শিল্পের উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। অস্ট্রেলিয়ার দোহ শিল্প অঞ্চলগুলি প্রধানত নিউসাউথওয়েলস্ এবং ভিক্টোরিয়া অঞ্চলে এবং নিউজিল্যান্ডের প্রায় সর্বত্র গবাদি পশু পালিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উন্নত মানের মাখন তৈরি হয় নিউজিল্যান্ডে এবং গুঁড়ো দুধ উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয়। স্থানীয় চাহিদা কম থাকায় অধিকাংশ গুঁড়ো দুধ, মাখন, পনির ইত্যাদি দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

৩. এশিয়া মহাদেশের জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চিন ও ভারত গবাদি পশুপালনে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে।

৩.১ ভারতের গুজরাট দুগ্ধ উৎপাদনে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য। এ ছাড়া পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যগুলিও এই শিল্পে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে। গুজরাটে আনন্দ নামে সংস্থার পরিচালিত সমবায় প্রথায় উৎপন্ন 'আমূল' সারা ভারতে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

৪. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার প্রেইরি অঞ্চল গবাদি পশুপালনের জন্য বিখ্যাত। মাখন ও চিজ উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করলেও দুধ উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম। হ্রদ অঞ্চলের পূর্বদিকে কানাডার বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে দুগ্ধ সংক্রান্ত শিল্পগুলি সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে।

৫. উত্তর পশ্চিম ইউরোপে অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ ও অন্যান্য আর্থ সামাজিক কারণগুলির প্রভাবে দোহ শিল্পের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে। এখানকার ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশগুলি দুগ্ধজাত শিল্পের জন্য বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

নেদারল্যান্ডের গুঁড়ো দুধ উৎপাদনে পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান এবং চিজ উৎপাদনে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। সুইজারল্যান্ডের চিজ, মাখন, দুধ, চকোলেট পৃথিবী বিখ্যাত। মাখন ও দুধ উৎপাদনে জার্মানি যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে।

৬. দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল, কলম্বিয়া, আর্জেন্টিনা দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষ উন্নতি লাভ করেছে। আর্জেন্টিনার লাপ্লাটা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে দুগ্ধ শিল্প প্রসার লাভ করেছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে মাখন বিদেশে রপ্তানি করা হয়ে থাকে।

৭. এই সকল দেশ ব্যতীত দক্ষিণ আফ্রিকা এবং জিম্বাবোয়েতেও বর্তমানে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত শিল্প গড়ে উঠেছে।

8A.20 মেষ পালন (Sheep Rearing)

পশম ও মাংসের জন্য প্রধানত মেষ পালন করা হয়। ৩০° - ৪০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত স্থানগুলিতে স্বল্প বৃষ্টিপাতের জন্য যে তৃণভূমি অঞ্চল গড়ে উঠেছে সেই সব অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে মেষ

বাণিজ্যিক ভাবে প্রতিপালিত হয়। যেহেতু একই খামার হতে মাংস ও পশম উভয়ই প্রয়োজন মত সংগ্রহ করা সম্ভব তাই মেষ পালন দ্বৈত পালন (Dual purpose) ব্যবস্থা নামেও পরিচিত।

এই সমস্ত মেষগুলির মধ্যে কিছু মেষ কেবলমাত্র মাংস উৎপাদনের জন্য পালন করা হয় যেমন, রোমান মেষ। আবার কিছু মেষ কেবলমাত্র পশম উৎপাদনের জন্য পালন করা হয় যেমন, মেরিনো মেষ আবার কিছু কিছু মেষ রয়েছে পশম ও মাংস উভয় প্রকার উৎপাদন করার জন্য যেমন, রোমনি মার্শ, ব্লাকওয়েলস্ ইত্যাদি।

মেষ উৎপাদন অঞ্চলগুলিতে মাংস ও পশম ব্যতীত দুধ, মেষচর্ম, চর্বি ইত্যাদি নানা উপজাত সামগ্রীও উৎপাদিত হয়ে থাকে।

8A.21 মেষ পালনের অনুকূল পরিবেশ (Favourable Conditions for Sheep Rearing)

শীতল বা উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে স্বল্প বৃষ্টিপাতের ফলে ক্ষুদ্রাকার তৃণভূমির সৃষ্টি হয় এবং তৃণভূমি পশুচারণের জন্য উৎকৃষ্ট স্থান। এই সকল অঞ্চলে মেষ পালনের উপযুক্ত ভৌগোলিক ও আর্থসামাজিক পরিবেশগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

১. মোটামুটিভাবে ২০ - ২৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত ও ১০° - ২০° সেঃ উষ্ণতা এবং পাহাড়ের উঁচু নীচু জমি মেষ পালনের জন্য বিশেষ উপযোগী। তবে অতিরিক্ত উষ্ণ বা আর্দ্র আবহাওয়া পশম প্রদায়ী মেষ পালনের পক্ষে অনুকূল নয়।

২. পশম প্রদায়ী মেষের জন্য ক্ষুদ্র তৃণভূমি অধিক প্রচলিত। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ পরিবেশে ঐরূপ চাষ অধিক জন্মায়।

৩. মেষ প্রধানত দুধ সরবরাহ করার জন্য ব্যবহৃত হয় না এং জনবিরল বিস্তীর্ণ চারণক্ষেত্র এদের পালন করা সম্ভব।

৪. পশমের চাহিদা প্রধানত শীতপ্রধান অঞ্চলে। তাই নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমিগুলিতে মেষ চারনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে রপ্তানি বাণিজ্যের দিকে লক্ষ রেখে।

৫. ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা, জলের সুবিধা, ও সুলভ শ্রমিক এবং পশুপালনে নিরাপত্তারও প্রয়োজন। যা এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

৬. পশম শিল্প ও মাংস সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজে যেমন অর্থের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন উন্নত ধরনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তা। এই সকল কারণে নিউজিল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ধনী ও বিজ্ঞান প্রযুক্তিসম্পন্ন দেশগুলিতে মেষ পালন ও পশম শিল্প বা মাংস শিল্পগুলি গড়ে উঠতে দেখা যায়।

8A.22 বিশ্বের বিভিন্ন প্রকার মেষ চারণ সমূহ (Distribution of World Sheep Rearing Fields)

বিশ্বের মেষ চারণ ক্ষেত্রগুলি উৎপাদনের বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে এদের দুভাগে ভাগ করা হয়—

(১) মাংস প্রদায়ী মেষ ও (২) পশম প্রদায়ী মেষ চারণ ক্ষেত্র।

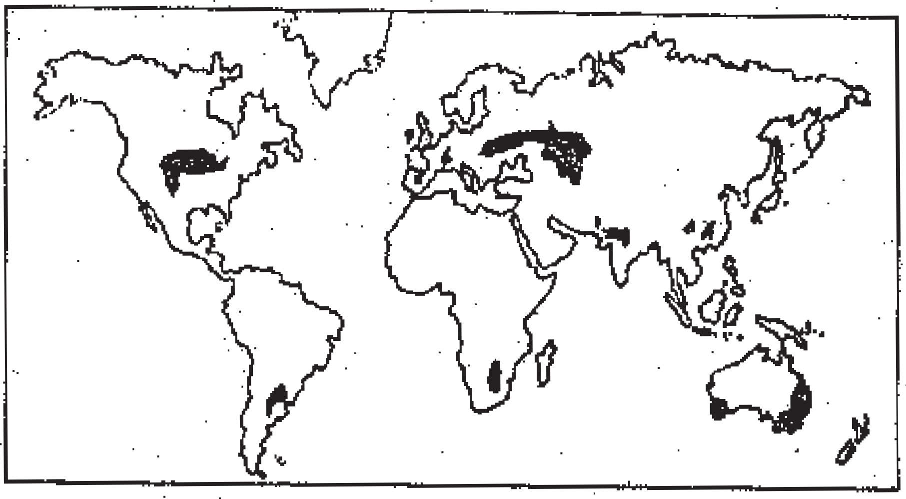

চিত্র - ১১ : বিশ্বের মেষ চারণ ক্ষেত্র সমূহ।

8A.22.1 মাংস প্রদায়ী চারণ ক্ষেত্র (Distribution of World Mutton Cattle)

মাংস প্রদায়ী মেষ পালনের জন্য বিস্তীর্ণ তৃণভূমির প্রয়োজন। তৃণভূমির উৎকৃষ্ট তৃণ মেষগুলির মাংস বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এই কারণে মেষগুলিকে তৃণভূমি ও সংলগ্ন পশুখাদ্য উৎপাদনকারী শস্য ক্ষেত্রগুলিতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এভাবে পুষ্টিকর খাদ্যের যোগানের ফলে পশুগুলি হৃষ্টপুষ্ট হয় এবং উপযুক্ত সময়ে এগুলি বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয় মাংসের প্রয়োজনে। এরূপ বাণিজ্যিক ভাবে মাংস সংগ্রহের জন্য তৃণভূমিগুলির আয়তন বৃহৎ হওয়া প্রয়োজন এবং এরূপ মুক্ত অঞ্চল জনবসতি অঞ্চলের বাইরে যেখানে কৃষিকার্য বিশেষভাবে সম্ভব হয় না। সেই সব জনবিরল অঞ্চলগুলিতে মেষ পালনের জন্য খামার গড়ে তোলা সহজ এবং এরূপ বাণিজ্যিক ভাবে মাংস সংগ্রহ করা হয় প্রধানত নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলি হতে —

১. অস্ট্রেলিয়ার ডাউনস্ তৃণভূমি অঞ্চলে প্রধানত পশম উৎপাদনের দিকে নজর দিলেও মাংস উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীর তৃতীয় স্থানে রয়েছে। আবার আভ্যন্তরীণ চাহিদা কম থাকার দরুন মাংস প্রধানত রপ্তানি করা হয়। মাংস রপ্তানিতে অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীর বাজারে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

২. অঞ্চলে আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাবার জন্য প্রচুর পরিমাণে মেষ পালন করা হয়। মেষ মাংস উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম হলেও এই দেশের উৎপাদন কমই রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। আবার এই অঞ্চলের পশমের মানও উৎকৃষ্ট নয় বলে মেষ প্রধানত মাংসের প্রয়োজনই পালন করা হয়।

৩. চিনের সমবায় খামার এবং কৃষির অযোগ্য ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে মেষ পালন করা হলেও আভ্যন্তরীণ চাহিদার ফলে রপ্তানি বাণিজ্যে এই দেশের মাংস ব্যবহৃত বিশেষ হয় না এবং পশমের মানও খুব উন্নত নয় বলে মাংস প্রদায়ী মেষই এখানে পালন করা হয়ে থাকে।

৪. নিউজিল্যান্ডের মাংস প্রদায়ী মেষের পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে কম হলেও এখানে জনসংখ্যা অনেক কম বলে চাহিদাও কম এর ফলে মেষ মাংস রপ্তানিতে এই দেশ শীর্ষে অবস্থান করছে।

৫. উপরে আলোচিত অঞ্চলগুলি ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য মাংস উৎপাদনকারী দেশগুলি হল — পাকিস্তান, ভারত, ইরান, আর্জেন্টিনা, তুরস্ক, গ্রিস ইত্যাদি। এই সকল অঞ্চলে প্রধানত আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাবার জন্যই মাংস প্রদায়ী মেষ পালন করা হয়।

8A.22.2 পশম প্রদায়ী মেষ পালন অঞ্চল (Distribution of World Wool Producing Sheep Rearing Fields)

যে সব কাঁচামাল হতে শীতবস্ত্র তৈরি হয় তাদের মধ্যে পশম অন্যতম এবং যে সব প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক অবস্থা মেষ পালনের বিশেষ উপযোগী তা পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ অপেক্ষা দক্ষিণ গোলার্ধে অধিক প্রযোজ্য বলেই দক্ষিণ গোলার্ধে পশম উৎপাদনকারী মেষ বেশি প্রতিপালিত হতে দেখা যায়। এখানে অত্যধিক শীতল জলবায়ু থাকে না বলে মেষের পশম নষ্ট হয় না। তবে উত্তর গোলার্ধেও বেশ কিছু অঞ্চলে পশম উৎপাদক মেষ পালন করা হয়।

- দক্ষিণ গোলার্ধের পশম উৎপাদন অঞ্চলগুলি সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল —

অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ ও পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার তৃণভূমি অঞ্চলগুলিতে অধিকাংশে মেষ পালন করা হয়। মেষ পালনে অস্ট্রেলিয়া বিশ্বে প্রথম স্থানে রয়েছে। এই অঞ্চলে পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত রয়েছে সঙ্গে মেষের লোম কাটার যান্ত্রিক ব্যবস্থা, ডিঙ্গো ইত্যাদি বন্য জন্তু হতে প্রাণীদের রক্ষা করার বন্দোবস্ত করে উন্নত প্রজনন ব্যবস্থার প্রচলন করে সুসংহত ব্যবস্থার দ্বারা অস্ট্রেলিয়ার পশম উৎপাদন ও উৎপাদনের গুণগত মান প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এ দেশের অধিকাংশ (৭৫%) মেষই উৎকৃষ্ট মেরিনো শ্রেণীর। এখানকার নিউ সাউথ ওয়েলস প্রদেশে সব চেয়ে বেশি মেষ পালন করা হয়।

- নিউজিল্যান্ডের দক্ষিণের পার্বত্য তৃণভূমিতে প্রচুর পরিমাণে মেরিনো মেষ ও উত্তর অংশে রোমান মেষ পালন করা হয়। পশম উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে।

- দক্ষিণ আফ্রিকার ভেল্ড তৃণভূমিতেই প্রধানত মেষ প্রতিপালিত করা হয়। প্রধানত পশম প্রদায়ী মেরিনো শ্রেণীর মেষের সংখ্যাই বেশি। পশম উৎপাদনে এই দেশ বিশ্বে ষষ্ঠ। এই দেশের অধিকাংশ পশম বিদেশে রপ্তানী করা হয়। রপ্তানী বাণিজ্যে এই দেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয়।

- দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণাংশে অবস্থিত পম্পাস তৃণভূমির ও প্যাটাগোনিয়ার অধিকাংশ মেষ মেরিনো শ্রেণীর। এই দেশে পশম প্রধানত রপ্তানির পরিপ্রেক্ষিতেই উৎপন্ন করা হয়।

উত্তর গোলার্ধের পশম উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলি সম্বন্ধে নিম্নে আলোচিত হল —

- C.I.S অঞ্চল মেষ পালন ও পশম উৎপাদনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানে থাকলেও অত্যধিক শীতলতার জন্য পশমের মান ততটা উন্নত নয় এবং স্থানীয় চাহিদা প্রচুর তাই স্তেপ অঞ্চলে প্রচুর পশম প্রদায়ী মেষ পালন করা হয়।

- চিন দেশের তিব্বতে প্রচুর পরিমাণে মেষ পালন করা হয়। চিন দেশ মেষ পালনে পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় স্থানে হলেও পশম উৎপাদনে চতুর্থ। তবে এই অঞ্চলের পশম C.I.S এর মতই নিম্ন মানের।

- ভারতের শীতপ্রধান শুষ্ক পশ্চিমাঞ্চলের রাজস্থান, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে স্থানীয় চাহিদা মেটাবার জন্য প্রধানত পশম প্রদায়ী মেষ পালন করা হয়।

এছাড়াও পাকিস্তান, ইরাক, তুরস্ক, রোমানিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন, গ্রিস প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রচুর পরিমাণে মেষ পালন করা হয়।

উপরের এই আলোচনা হতে এটা পরিষ্কার যে উত্তর গোলার্ধ হতে দক্ষিণ গোলার্ধে অধিক পরিমাণে পশম উৎপাদিত হয়।

8A.23 দক্ষিণ গোলার্ধে মেষ পালনের অধিক গুরুত্বের কারণ (Causes of More Importance of Sheep Rearing in Southern Hemisphere)

পৃথিবীর উভয় গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ বনভূমিতে মেষপালন করা হলেও দেখা গেছে যে দক্ষিণ গোলার্ধে অধিক পরিমাণে মেষ পালন করা হয় এবং পশম উৎপাদনে দক্ষিণ গোলার্ধে অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। দক্ষিণ গোলার্ধের প্রধান মেষ চারণ ক্ষেত্রগুলি রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ে অঞ্চলে। এই সব অঞ্চলগুলিতে মেষ পালনের প্রধান কারণগুলি নিম্নরূপ।

১. ● মৃদু নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু মেষের লোম বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

২ ● স্বল্প বৃষ্টিপাতের উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রথায় জলসেচের সহায়তায় উৎকৃষ্ট তৃণ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

৩. ● দক্ষিণ গোলার্ধে জনবসতি কম হওয়ায় খাদ্য শস্যের চাহিদাও কম ফলে তৃণভূমিগুলিতে অধিক পরিমাণে মেষ পালন করা সম্ভব হয়েছে।

৪. ● মেষের প্রয়োজনীয় জলের চাহিদা স্থানীয় কূপ, নলকূপ এবং আর্টেজীয় কূপ হতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

৫. ● দক্ষিণ গোলার্ধের তৃণভূমিগুলিতে উত্তর গোলার্ধের মত হিংস্র জন্তু জানোয়ারের আক্রমণ প্রায় হয় না বললেই চলে। ফলে মেষ সুরক্ষার জন্য ব্যয় খুব কম হয়।

৬. ● এর সঙ্গে সঙ্গে উন্নত প্রযুক্তি, বাজারের চাহিদার উন্নত কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমিক পাওয়া যায়।

এইসব কারণে দক্ষিণ গোলার্ধে অধিক পরিমাণে পশম প্রদায়ী মেষ পালন করা সম্ভব হয়েছে এবং তাই অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীর মধ্যে পশম উৎপাদনে প্রথম স্থানে রয়েছে এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য পশম উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলি হল নিউজিল্যান্ড, আর্জেন্টিনা এবং উরুগুয়ে।

8A.24 সারাংশ

বনভূমি মানুষের জীবন ধারণের এক অপরিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে এর গভীর সংযোগ রয়েছে। বনভূমি একদিকে যেমন বন্য প্রাণী, পাখি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির আশ্রয়স্থল তেমনি মানুষকে কাঠ, বিভিন্ন বনজ সম্পদ ইত্যাদি সরবরাহ করে জীবিকার সন্ধান দেয়। মুক্ত বাতাস বা পরিবেশকে শোধিত করতে সহায়তা করে তা পাওয়া যায় বনভূমি হতে। বনভূমি বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণ করে দেশকে অনাবৃষ্টির হাত হতে রক্ষা করতে সহায়তা করে। জলচক্রকে সুরক্ষিত রাখে এবং বাষ্পমোচন করে বনভূমি বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পের যোগান অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে। এই সব কারণে বনভূমিকে সম্পদ বললে কোন ভুল হবে না। অধ্যাপক জিমার ম্যানের ভাষায় যে কোন নির্জীব বা সজীব বস্তুর কার্যকরী শক্তিই যা মানুষের অভাব মোচন করে এবং মানুষকে তার

সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যে পৌছাতে সাহায্য করে তাই সম্পদ। সেই অর্থে অরণ্য মানুষের কাছে অতি মূল্যবান সম্পদ। এই সম্পদ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষ ও জীবকুলের জীবন ধারণে সহায়তা করে।

বনভূমিই পৃথিবীর সমগ্র পশুদের আদি বাসস্থান। সেই আদি বাসভূমি হতে এদের গৃহপালিত করতে সক্ষম হয়ে মানুষ প্রাথমিক পর্যায় তাদের খাদ্য যথা মাংস, দুধ ও ভারবহনের কাজে ব্যবহার করলেও পরবর্তী সময়ে ওই পশু সম্পদ ধীরে ধীরে মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মের অঙ্গ হিসাবে পরিণত হয়েছে। মানুষ নানা বৈজ্ঞানিক প্রথায় অধিকতর উন্নত মানের গৃহপালিত পশুর সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

পশু পালন ও পশুজাত দ্রব্যাদির ব্যবসা পৃথিবীর বহু মানুষ আজ তাদের অর্থনৈতিক কাজকর্মের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছে। কৃষিকাজের সঙ্গে সঙ্গে পশুপালনও আজ জীবিকার একটি বিশেষ অংশ। পৃথিবীতে এই জীবিকার উন্নয়নের ফলে গড়ে উঠেছে দোহ শিল্প, চর্ম শিল্প বা পশম উৎপাদন ও পশম জাত শিল্প।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে কৃষি উৎপাদন ভিত্তিক শিল্পের মধ্যে পশুজাত উৎপাদনও আজ এক শিল্পের স্থানে উন্নীত হয়েছে।

8A.25 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

---

(১) বনভূমির সংজ্ঞা দিন এবং বনভূমির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

(২) পৃথিবীর প্রধান প্রধান বনভূমিগুলির নাম লিখুন। এদের যে কোন একটির ভৌগোলিক বন্টন এবং বনভূমির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

(৩) পৃথিবীর সরলবর্গীয় বনভূমির বিবরণ দিন এবং এই বনভূমির বাণিজ্যিক ব্যবহার আলোচনা করুন।

(৪) বনভূমি ধ্বংস হওয়ার প্রধান কারণগুলি কি কি? বনভূমি সংরক্ষণের প্রকৃতি ও পদ্ধতিগুলি আলোচনা করুন।

(৫) কৃষি বনসৃজন বলতে কি বোঝায় এবং এর প্রকৃতি ও সুবিধাগুলি কি কি? ভারতে কৃষি বনসৃজনের ভূমিকা আলোচনা করুন।

(৬) পশুপালনের সংজ্ঞা দিন। এবং পশুপালনের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

(৭) পৃথিবীর বাণিজ্যিক পশুপালন ক্ষেত্রসমূহ কোথায় কোথায় অবস্থিত? এদের মধ্যে যে কোন একটির অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

(৮) কি কি ভৌগোলিক অবস্থা দোহ শিল্প এবং পশম প্রদায়ী মেষ পালনে সহায়ক? পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উদাহরণ সহ বুঝিয়ে বলুন।

(৯) মাংস ও পশম প্রদায়ী মেষ পালনের মধ্যে কি কি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়? নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার উদাহরণ সহ বুঝিয়ে দিন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

(১) মৌসুমী চিরহরিৎ বনভূমি ও মৌসুমী পর্ণমোচী বনভূমির পার্থক্য সম্পর্কে বুঝিয়ে বলুন।

(২) ভূমধ্যসাগরীয় বনভূমির অবস্থান বর্ণনা করুন।

(৩) নাতিশীতোষ্ণ মিশ্র বনভূমির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

(৪) বনভূমি হ্রাস বলতে কি বোঝেন?

(৫) বনভূমি সংরক্ষণ বলতে কি বোঝেন?

(৬) টীকা লিখুন —

ক) বনমহোৎসব, (খ) সামাজিক বনসৃজন, (গ) প্রেইরী তৃণভূমি, (ঘ) ডাউন্স তৃণভূমি

(৭) দক্ষিণ গোলার্ধে অধিক মেষপালনের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

8A.26 উত্তরমালা

(১) 8A.1 এবং 8A.2 অংশ দেখুন।

(২) 8A.4 এবং 8A.4.1.1 অংশ দেখুন।

(৩) 8A.4.3.3 অংশ দেখুন।

(৪) 8A.5, 8A.6 এবং 8A.7 অংশ দেখুন।

(৫) 8A.9 এবং 8A.30 অংশ দেখুন।

(৬) 8A.12 এবং 8A.13 অংশ দেখুন।

(৭) 8A.15 এবং 8A.15.1 অংশ দেখুন।

(৮) 8A.11 এবং 8A.12 অংশ দেখুন।

(৯) 8A.22, 8A.22.1 এবং 8A.22.2 অংশ দেখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন —

(১) 8A.4.2 অংশ দেখুন।

(২) 8A.4.3.1 অংশ দেখুন।

(৩) 8A.4.3.2 অংশ দেখুন।

(৪) 8A.5 অংশ দেখুন।

(৫) (ক) 8A.8 (খ) 8A.11, (গ) 8.15.11 (ঘ) 8A.15.15 অংশ দেখুন।

(৬) 8A.23 অংশ দেখুন।

একক 8B ▫ সামুদ্রিক সম্পদ (Marine Resource)

গঠন

8B.0 প্রস্তাবনা

8B.1 উদ্দেশ্য

8B.2 সমুদ্রের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

8B.3 সমুদ্রের বিভিন্ন উদ্ভিদ সংগ্রাহক দেশ সমূহ

8B.4 সমুদ্র হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন রাসায়নিক ও খনিজ সম্পদ

8B.4.1 সমুদ্রজলে দ্রাব্য অবস্থায় প্রাপ্ত খনিজ

8B.4.2 সমুদ্রতট অঞ্চল ও মহীসোপান অঞ্চল হতে আহৃত বিভিন্ন সম্পদ সমূহ

8B.4.3 সমুদ্রে গভীর অঞ্চল হতে সংগৃহীত বিভিন্ন সম্পদ সমূহ

8B.5 মৎস সম্পদ ও তার প্রকারভেদ

8B.6 নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে মৎস্য কেন্দ্র গড়ে ওঠার কারণ সমূহ

8B.7 পৃথিবীর বিভিন্ন মৎস্যক্ষেত্র সমূহ

8B.7.1 উত্তর পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের মৎস্যক্ষেত্র সমূহ

8B.7.2 উত্তর পূর্ব আটলান্টিক উপকূলের মৎস্যক্ষেত্র সমূহ

8B.7.3 উত্তর পশ্চিম আটলান্টিক মৎস্যক্ষেত্র

8B.7.4 উত্তর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় ক্ষেত্র

8B.7.5 উত্তর গোলার্ধের অন্যান্য মৎস্যক্ষেত্র

8B.8 দক্ষিণ গোলার্ধের মৎস্যক্ষেত্র

8B.8.1 দক্ষিণ পূর্ব আটলান্টিক মহাসাগরীয় মৎস্যক্ষেত্র

8B.8.2 দক্ষিণ পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় মৎস্যক্ষেত্র

8B.9 ক্রান্তীয় অঞ্চলের মৎস্যক্ষেত্র সমূহ এবং ব্যাপকভাবে গড়ে না ওঠার কারণসমূহ

8B.10 মৎস্য হ্রাস

8B.11 মৎস্য সংরক্ষণ

8B.12 সারাংশ

8B.13 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

8B.14 উত্তরমালা

8B.0 প্রস্তাবনা

সমগ্র পৃথিবীর আয়তনের এক বিরাট অংশ জুড়ে অবস্থান করছে সাগর মহাসাগর সমূহ। হিসাব করে দেখা গেছে যে সমগ্র পৃথিবীর আয়তনের প্রায় ৫১ কোটি বর্গ কিলোমিটার এবং এই আয়তনকে যদি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—একটি জলভাগ ও অন্যটি স্থলভাগ তবে দুটি ভাগের মধ্যে ৭১.৪০ শতাংশ অংশেই জুড়ে রয়েছে জলভাগ ও মাত্র ২৮.৬০ অংশে হল স্থলভাগ। এই জলভাগ বা বারিমণ্ডলের সিংহভাগই রয়েছে সাগর মহাসাগরের অধিকারে। এই বিপুল জলরাশির মধ্যে রয়েছে খাদ্য, খনিজ, নানা প্রকার শিল্পের কাঁচামাল এমনকি দেশ বিদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা বা বাণিজ্যিক সৌহার্দ্য গড়ে তোলার কাজেও সমুদ্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

8B.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- সমুদ্র সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সমুদ্র হতে আহরণযোগ্য বিভিন্ন সম্পদ সম্পর্কে নির্দেশ দিতে পারবেন।
- সমুদ্র বিজ্ঞান সম্পর্কেও জানতে পারবেন।
- সমদ্রের উপকূল এবং মহীসোপান অঞ্চলের সম্পদ কিভাবে ব্যবহার করা সম্ভব তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সর্বোপরি সমুদ্রকে কিভাবে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা হচ্ছে তা আপনি বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- সমুদ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ মৎস্য সম্পর্কে আপনি জানতে পারবেন।
- মৎস্য সম্পদের ব্যবহার ও বণ্টন সম্পর্কেও আপনি সকলকে বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

8B.2 সমুদ্রের অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Significance of Sea)

সমুদ্র নানা প্রকার গচ্ছিত ও প্রবহমান সম্পদের ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডার মানুষের অর্থনৈতিক জীবনধারার স

মানকে উন্নত করতে নানাভাবে সহায়তা করে। মানব জীবনে সমুদ্র সম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করলে এ বিষয়ে জানা সহজ হবে।

১. সমুদ্র মানুষের খাদ্যের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। আবার এই খাদ্যগুলি যেমন মানুষকে প্রোটিন সরবরাহ করে তেমনি ভিটামিনও সরবরাহ করে থাকে। এছাড়া খনিজ লবন ও আয়োডিনও সরবরাহ করে থাকে।

অতি আদি যুগে মানুষ যখন চাষবাস করতে জানত না, তখন বন হতে যেমন পশু শিকার করত তেমনি সমুদ্র বা জলাশয় হতে মৎস্য শিকার করে খাদ্যের চাহিদা পূরণ করত। বর্তমানকালেও যেসব অঞ্চলে কৃষিকার্য করা সম্ভব হয় না সেসব অঞ্চলের মানুষেরা প্রধানত খাদ্য ও জীবিকা হিসাবে মৎস্য শিকারকেই বেছে নিয়েছে। পৃথিবীর সাগর মহাসাগর হতে বর্তমানে বছরে প্রায় ১০ কোটি মেট্রিক টন মৎস্য শিকার করা হয়—বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্টে এই তথ্য পাওয়া গেছে। প্রোটিন খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রে প্রচুর পরিমানে খাদ্যোপযোগী সামুদ্রিক উদ্ভিদ সংগ্রহ করে সেগুলির সহায়তায় ভিটামিন সমৃদ্ধ নানা পুষ্টিকর খাদ্যের উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। মালয়েশিয়া, চিন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশ প্রচুর পরিমানে সি-উইড উৎপাদন করে মানুষের ও পশু-পাখির ভিটামিন যুক্ত খাদ্য প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছে। এই খাদ্য বহুল পরিমাণে ব্যবহার সম্ভব হলে পৃথিবীর খাদ্য সমস্যার বহুলাংশে সমাধান করা সম্ভব হবে বলে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা অভিমত পোষণ করেন।

২. সমুদ্র বিভিন্ন প্রবহমান সম্পদের উৎস। সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এরূপ একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে ফ্রান্সের লা রান্স নদীর খাড়িতে (১৯৬৬ সালে)। বর্তমানে ভারতসহ বিভিন্ন দেশে জোয়ার ভাঁটার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।

জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের তরঙ্গের শক্তি হতেও বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। জাপানের কাইমি শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে ১৯৭৮ সালে এই ধরনের বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। সমুদ্র জলের উষ্ণতার পার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে ফ্রান্স ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমুদ্র উপকূলে পরীক্ষামূলকভাবে বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে ও বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। ভারতের তামিলনাড়ু উপকূলেও এরূপ একটি কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।

বর্তমানে পৃথিবীতে ব্যবহৃত শক্তির উৎস যথা কয়লা বা খনিজ তেল উভয়ই ক্ষয়িষ্ণু এবং পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রেও এরা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই সমুদ্রের এই সকল শক্তিকে যদি ব্যাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় তবে ভবিষ্যতে শক্তি সম্পদের সমস্যা অনেকাংশেই সমাধান করা সম্ভব হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ দূষণের মাত্রাও অনেক কমে যাবে।

৩. সমুদ্র বিভিন্ন খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার। এই সমস্ত খনিজের মধ্যে সমুদ্রের মহীসোপান অঞ্চল হতে খনিজ তেল বা Hydro Carbon এবং প্রাকৃতিক গ্যাস সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ভারতের মুম্বাই দরিয়া, বৃটিশ যুক্তরাজ্যের রক, সৌদি আরবের সাকানিয়া ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে পৃথিবীতে যে খনিজ তেল আহরণ করা হয় তার ২০-৩০ শতাংশ উৎপাদিত হয় এইসব দরিয়া অঞ্চলগুলি হতে।

বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে সমুদ্র বক্ষে ইউরেনিয়াম সহ অন্যান্য তেজস্ক্রিয় খনিজ সম্পদের যে সঞ্চয় রয়েছে তার ব্যবহার সম্ভব হলে তা থেকে যে পরিমাণ আণবিক শক্তি উৎপাদিত হবে তা দ্বারা পৃথিবীর শক্তি সম্পদের চাহিদা মেটান সম্ভব হবে।

সমুদ্রের গভীরতম অংশে প্রচুর পরিমাণে খনিজ সম্পদ যথা ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, কোবাল্ট, তামা, মলিবডেনাম, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদির ভাণ্ডার রয়েছে। ঐ সকল খনিজ সম্পদ আহরণ করা সম্ভব হলে পৃথিবীর খনিজ সম্পদের চাহিদা সহজেই পূরিত হয়।

এছাড়া সমুদ্রের অন্যান্য আহরণযোগ্য সম্পদগুলির মধ্যে হীরে, প্লাটিনাম, সোনা, লোহা ইত্যাদি মূল্যবান খনিজ সম্পদগুলি বিভিন্ন সমুদ্রের উপকূল অঞ্চলে পাওয়া যায়। আবার সমুদ্রের মহীসোপান অঞ্চলে ফসফেটিক নোডিউলস ও ইভাপোরাইট জাতীয় লবণের স্তর দেখতে পাওয়া যায়। আরও গভীর সমুদ্রের তলদেশে ফেরো ম্যাঙ্গানীজ নোডিউলস্ যা থেকে প্রচুর পরিমাণে লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, তামা নিকেল, কোবাল্ট ইত্যাদি খনিজের আহরণ করা সম্ভব।

সমুদ্রের জল দ্রবীভূত লবণের আকর। প্রতি ১০০০ গ্রাম জল হতে প্রায় ৩৪.৪৫ গ্রাম লবণ পাওয়া যায়।

সমুদ্র জল পরিবহন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিবহনের সর্বাপেক্ষা সহজ ও সস্তা উপায়। অল্প খরচে এতবেশি পণ্যবহন, অন্য কোন পরিবহন ব্যবস্থা দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়।

সমুদ্রের নিকটস্থ স্থলভাগের জলবায়ু সম্পূর্ণরূপে সমুদ্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বাতাসে জলীয় বাষ্পের যোগান দেয় সমুদ্র এবং পরোক্ষভাবে বৃষ্টিপাতে সহায়তা করে থাকে। সমুদ্রের উষ্ণ বা শীতলস্রোত প্রবাহ, সংলগ্ন স্থলভাগের আবহাওয়াকেও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

সমুদ্র জীবিকার এক বিশেষ উৎস। সমুদ্র হতে বিভিন্ন প্রকার মৎস্য সংগ্রহ করা, সংরক্ষণ করা, মৎস্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন জলযান তৈরি করা, মৎস্য শিকারের সরঞ্জাম তৈরি করা, মুক্তা চাষ করা ইত্যাদি নানা ব্যবসা ও তার আনুষঙ্গিক নানা কাজে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে সমুদ্র ও স্থলভাগের মিলনের ফলে যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তা উপভোগ করতে মানুষ বারবার ছুটে যায় সমুদ্রের বেলাভূমিতে। এর ফলে গড়ে উঠেছে নানা আকর্ষণীয় পর্যটন

চিত্র ১। পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্রের অবস্থান।

8B.3 সমুদ্রের বিভিন্ন উদ্ভিদ সংগ্রাহক দেশ সমূহ (Different Sea-weed Hervesting Countries)

পৃথিবীর স্থলভাগের মত জলভাগেও নানাপ্রকার উদ্ভিদ জন্মায়। এই সকল উদ্ভিদ হতে বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় নানাপ্রকার পশুখাদ্য, আয়োডিন, ভিটামিন (AD ও B) মানুষের খাদ্য, নানাপ্রকার সার, রং তৈরির উপকরণ ইত্যাদি নানা-প্রকার সামগ্রী উৎপাদন করা হচ্ছে। এইসব সামুদ্রিক উদ্ভিদ বা সি-উইড (Sea-weed) কে তাদের গঠন অনুসারে যে ভাবে ভাগ করা হয় তা সারণিতে দেখান হল।

সারণি 8.1

সামুদ্রিক উদ্ভিদ

- বিভিন্ন প্রকার শৈবাল ছত্রাক ইত্যাদি
  - এককোষী অ্যালজি (Algae)
  - বহুকোষী ব্যাকটেরিয়া (Bacteria)
- নানা-ধরনের গাছপালা (বাণিজ্যিকভাবে আহরণ করা হয়)

- সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সামুদ্রিক উদ্ভিদ উৎপাদনে চিন প্রথম স্থান অধিকার করে রয়েছে। সমগ্র উৎপাদনের প্রায় ৪০ শতাংশ একা চিন উৎপাদন করে।
- চিনের পর সামুদ্রিক উৎপাদনে জাপানের স্থান দ্বিতীয়। জাপান প্রায় ১৯.১১ শতাংশ উৎপাদন করে।
- চিন ও জাপানের পর দক্ষিণ কোরিয়া ও ফিলিপাইন যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য সি-উইড উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে সি. আই. এস, নরওয়ে, চিলি, ফ্রান্স, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি প্রধান।

8B.4 সমুদ্র হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন রাসায়নিক ও খনিজ সম্পদ (Different chemical and mineral resource of the sea)

সমুদ্র নানাবিধ খনিজের আকর। তাই সমুদ্রের আর এক নাম রত্নাকর। এই সকল খনিজ পদার্থগুলি সমুদ্রের বিভিন্ন স্থান হতে আহরণ করা সম্ভব। প্রাপ্তিস্থান অনুসারে এর বিভাগগুলি পরের পৃষ্ঠায় সারণিতে দেওয়া হল।

সারণি 8.4.1

সামুদ্রিক খনিজ দ্রব্য

দ্রাব্য অবস্থায় সমুদ্র জল হতে লবণ, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি	তটভূমি ও মহীসোপান অঞ্চল হতে হীরে, লোহা, প্লাটিনাম ইত্যাদি	গভীর সমুদ্রের তলদেশে ম্যাঙ্গানিজ নুড়ি

8B.4.1 সমুদ্রজলে দ্রাব্য অবস্থায় প্রাপ্ত খনিজ (Minerals Dissolved in Sea Water)

সমুদ্রজলে দ্রাব্য অবস্থায় বাণিজ্যিকভাবে যেসব খনিজের আহরণ করা হয় সেগুলির মধ্যে লবণ, ব্রোমিন ও ম্যাগনেসিয়াম প্রধান। এগুলি ব্যতীত কিছু ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়ামও সংগ্রহ করা হয়। অতি প্রাচীনকাল হতে মানুষ সমুদ্র জল হতে লবণ সংগ্রহ করত। গড়ে প্রতি ১০০০ গ্রাম সমুদ্র জল হতে ৩৪,৪৫ গ্রাম লবণ পাওয়া যায় তবে সমুদ্র জলে বিভিন্ন প্রকার লবণ দ্রাব্য অবস্থায় থাকে এবং এই সব দ্রাব্য লবণের পরিমাণ সর্বত্র সমান হয় না। নিচে সারণিতে বিভিন্ন লবণের পরিমাণের পরিমাপ হতে ধারণা আরও পরিষ্কার হবে।

সারণি 8.4.1.1

সমুদ্রতলে বিভিন্ন লবণের পরিমাণ

	লবণের নাম	প্রতি ১০০০ গ্রাম জলে লবণের গড় পরিমাণ (গ্রামের হিসাবে)
1.	সোডিয়াম ক্লোরাইড (Nacl)	23.48
2.	ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ($Mgcl_2$)	4.98
3.	সোডিয়াম সালফেট (Na_2SO_4)	3.92
4.	ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ($Cacl_2$)	1.10
5.	পটাসিয়াম ক্লোরাইড (KCl)	0.66
6.	সোডিয়াম বাই কার্বনেট ($NaHCO_3$)	0.19
7.	পটাসিয়াম ব্রোমাইট (KBr)	0.10
8	অন্যান্য	0.02

(উৎস : তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম মল্লিক, অর্থনৈতিক সম্পদ সমীক্ষা, ৬৬ পাতা)

সমুদ্রজল হতে যে সমস্ত লবণ পাওয়া যায় তাদের মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। ডেডসিতে পাওয়া যায় পটাসিয়াম ব্রোমাইড। এই লবণ ফিল্ম ডেভালপিং এর জন্য প্রয়োজন হয়।

হিসেব করে দেখা গেছে যে প্রতি বছর বিশ্বের সমুদ্র জল হতে প্রায় ৪ কোটি মেট্রিক টন লবণ আহরণ করা হয়।

8B.4.2 সমুদ্রতট অঞ্চল ও মহীসোপান অঞ্চল হতে আহৃত বিভিন্ন সম্পদ সমূহ (Resources Available from Bech Zone and Continental Shelves)

সমুদ্র তটভূমি হতে যে সব সম্পদ আহরণ করা হয় তাদের মধ্যে হীরা, প্লাটিনাম, সোনা ও লোহা, রিউটাইল, রেয়ার আর্থ (Rare Earth) ইত্যাদি প্রধান।

- সমুদ্র তটভূমি অঞ্চলের হীরের সন্ধানে নানা সমীক্ষার কাজ চলছে এবং বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলের বিস্তীর্ণ তটভূমি হতে মূল্যবান হীরার সন্ধান পাওয়া গেছে।
- প্লাটিনাম পাওয়া গেছে আলাস্কার সমুদ্র উপকূলে গুডনিউজ, শ্যাগরান বেলাভূমি অঞ্চলে।
- আলাস্কার বেরিং প্রণালী সংলগ্ন অঞ্চল হতে সোনা আহরণ করার কাজ চলেছে।
- জাপানের কিউসু দ্বীপে পাওয়া গেছে লৌহ সমৃদ্ধ বালি। এই তট ভূমি অঞ্চলে নানা সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে আনুমানিক ৪ কোটি টন লোহা এই অঞ্চলে সঞ্চিত রয়েছে।
- অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে কুইন্সল্যান্ড ও নিউ সাউথ ওয়েলস হতে প্রচুর পরিমাণে রিউটাইল (Rutile) উত্তোলন করা হয়। রিউটাইল উৎপাদনে অস্ট্রেলিয়া প্রথম।
- ভারত ও চিন দেশের সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে প্রচুর রেয়ার আর্থ পাওয়া যায়।
- ভারতে যে সকল সমুদ্র সম্পদ তটভূমি হতে আহৃত হয় তাদের মধ্যে জ্যারকন, মোনাজাইট, সিলিমেনাইট, কায়ানাইট প্রভৃতি প্রধান। এগুলি প্রধানত পাওয়া যায় তামিলনাড়ু, কেরালা, মহারাষ্ট্র, গোয়া, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশের সমুদ্র তীরভূমি সংলগ্ন অঞ্চলগুলি হতে।
- সমুদ্রের মহীসোপান অঞ্চল হতে যে সকল সম্পদ আহরণ করা হয় তাদের মধ্যে প্রধান হল ফসফেটিক নোডিউল্‌স (Phosphatic Nodules) ও ইভাপোরাইট প্রধান।
- ফসফরাসের উৎস হিসেবে ফসফেটিক নোডিউল্‌স এর ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও সাবান, ডিটারজেন্ট, চিনি, ফটোগ্রাফির সরঞ্জাম, কীটনাশক, দেয়াশলাই, সামরিক সরঞ্জাম ইত্যাদি তৈরির উপকরণও উৎপাদন করা হচ্ছে। জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, আর্জেন্টিনা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে এরূপ নোডিউল্‌স পাওয়া যায়। বর্তমানে ভারতের কেরালা ও আন্দামান উপকূলের মহীসোপান অঞ্চলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এর সন্ধান পাওয়া গেছে।

8B.4.3 সমুদ্রের গভীর অঞ্চল হতে সংগৃহীত বিভিন্ন সম্পদ সমূহ (Resources Available from Deep Sea)

গভীর সমুদ্রের সঞ্চয় সম্পর্কে এখনও বৈজ্ঞানিকদের সম্পূর্ণ ধারণা করা সম্ভব হয়নি তবে যে সম্পদের সন্ধান তারা দিয়েছেন তার মধ্যে প্রধান হল ফেরো ম্যাঙ্গানিজ নোডিউলস্ (Ferro-Manganese Nodules)

- এই সম্পদটি আসলে সমুদ্রের গভীর তলদেশে লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, তামা, নিকেল, কোবাল্ট ইত্যাদি খনিজে সমৃদ্ধ। বিভিন্ন খনিজের মধ্যে এসকল নুড়িগুলিতে ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ বেশি থাকে বলে একে অনেকে ম্যাঙ্গানিজ নুড়ি বলেও অভিহিত করেন।
- পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্রের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরে সঞ্চিত ম্যাঙ্গানীজ নুড়ির পরিমান সবচেয়ে বেশি বলে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সমীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছেন এবং আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরেরও অস্তিত্ব নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়েছেন।
- পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশগুলি যথা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বৃটিশ যুক্তরাজ্য ও জাপান গভীর সমুদ্রের তলদেশ হতে এই সম্পদ আহরণ করে ম্যাঙ্গানিজ সহ বিভিন্ন ধাতুর নিষ্কাশন আরম্ভ করেছে। ভারতেও এই কাজ বর্তমানে শুরু হয়েছে। এরূপ উত্তোলন ও নিষ্কাশন বাণিজ্যিকভাবে করা সম্ভব হলে ভূ-পৃষ্ঠে অপূরণশীল খনিজের সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। কারণ সমুদ্রের তলদেশের ঐ সকল সম্পদগুলি ক্ষয়িষ্ণু নয় বলেই বিজ্ঞানী J. L. Mero তাঁর গ্রন্থ The Mineral Resource of the Sea (1965) ব্যাখ্যা করে বলেন সমুদ্রের তলদেশের এই নুড়ির পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে চলেছে।

8B.5 মৎস্য সম্পদ ও তার প্রকারভেদ (Fish Resource–Different Types)

মৎস্য সমুদ্রের আর একটি অন্যতম সম্পদ। মৎস্য মানুষের একটি প্রোটিনযুক্ত সুষম খাদ্য। তবে খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য বিভিন্ন কার্যেও এর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন তেল, চামড়া ও সার ইত্যাদি প্রধান উপজাত দ্রব্যগুলি মৎস্য হতে পাওয়া যায়। পৃথিবার অধিকাংশ উপকূলবর্তী দেশগুলি সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণ করে জীবিকা অর্জন করে থাকে। বিশেষত যে সকল অঞ্চলে চাষবাসের জমির অভাব সে সব অঞ্চলের লোকেরা সমুদ্র হতে মৎস্য সংগ্রহ করে জীবনধারণ করে থাকে। জাপান, ইংল্যান্ড, কানাডার নিউ ফাউন্ডল্যান্ড প্রভৃতি অঞ্চল মৎস্য শিকারে পৃথিবীতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। পরের পাতায় সারণিতে মৎস্য চাষের প্রকারভেদ দেওয়া হল।

সারণি 8.5.1

মৎস্য চাষ
- স্বাদুজলের মৎস্য
  - অ্যানাড্রোমাস
  - দেশের আভ্যন্তরীণ নদী বা জলাশয়
- সামুদ্রিক মৎস্য
  - উপকূলীয় মৎস্য পিলেজিক মৎস্য
  - গভীর সমুদ্রের মৎস্য ডোমার্শাল মৎস্য

১. স্বাদুজলের মৎস্য সংগ্রহ করা হয় দেশের অভ্যন্তরস্থ নদী, নালা, খাল-বিল, জলাশয় প্রভৃতি হতে। এই স্বাদুজলের মৎস্যগুলিকে তাদের প্রাপ্তিস্থান অনুসারে দুভাগে ভাগ করা হয়।

ক) অ্যানাড্রোমাস মৎস্য (Anadromus fish) — যে সকল মৎস্য অধিকাংশ সময় সমুদ্র উপকূলের লবণাক্ত জলে বসবাস করলেও বছরের এক বিশেষ ঋতুতে সমুদ্রের খাড়ি অঞ্চলের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে চলে আসে তাকে অ্যানাড্রোমাস মৎস্য বলে— যেমন ইলিশ, স্যামন ইত্যাদি।

খ) দেশের অভ্যন্তরস্থ নদী বা জলাশয়ের মৎস্য — যে সকল মৎস্য দেশের অভ্যন্তরস্থ নদী বা হ্রদ ইত্যাদি স্বাদু জলে জন্মায় এবং বংশ বিস্তার করে সেই সব মৎস্যকে স্বাদুজলের মৎস্য বলে যেমন রুই, কাতলা, শিঙি, মাগুর ইত্যাদি। ভারত, বাংলাদেশ, চিন, মালয় প্রভৃতি অঞ্চলে এই স্বাদুজলের মাছের চাষ প্রচুর পরিমাণে হয়ে থাকে।

স্বাদুজলের মৎস্য চাষের সুবিধা হল যে এই চাষকে চাহিদা অনুসারে উৎপাদন বা সংগ্রহ সম্ভব হয় এবং এই চাষে উৎপাদন খরচও সামুদ্রিক মৎস্য সংগ্রহ হতে অনেক কম হয়। তবে এই চাষ খুব কমই বাণিজ্যভিত্তিক করা সম্ভব হয় কিন্তু ইহা স্থানীয় চাহিদা পূরণে সহায়তা করে বলে এরূপ মৎস্য চাষকে জীবিকা সত্তাভিত্তিক চাষ বললে কিছু ভুল বলা হয় না। এরূপ মৎস্য চাষ দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ার দেশগুলি, পূর্বতন সোভিয়েত দেশ, আফ্রিকার বিভিন্ন নদী ও হ্রদ বিশেষত নীল নদ এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন নদনদী ও হ্রদ সমূহ হতে প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা হয় থাকে।

8B.6 সামুদ্রিক মৎস্য চাষ (Sea water fishing) ও পৃথিবীর প্রধান মৎস্য ক্ষেত্রগুলি (Major fishing grounds of the world)

সাগর বা মহাসাগর হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন মৎস্য প্রাপ্তি ক্ষেত্রকে ভিত্তি করে বাণিজ্যিকভিত্তিক যে মৎস্য সংগ্রহ করা হয় তাকে সামুদ্রিক মৎস্য চাষ বলা হয়। সামুদ্রিক এই মৎস্যকে তার প্রাপ্তিস্থান অনুসারে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়।

- উপকূল অঞ্চলের মৎস্য — উপকূলের অগভীর অঞ্চলে যে সকল মৎস্য বাস করে তাদের বলে পিলেজিক মৎস্য (Pelagic)। এই মৎস্য সাধারণত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর

পরিমাণে পাওয়া যায়। হেরিং, সার্ডিন, পিলচার্ড, ব্রিসলিং প্রভৃতি এরূপ মৎস্যের অন্তর্গত। এরূপ মৎস্য বাণিজ্যিক ও জীবিকা সত্তাভিত্তিক এই উভয় ধরনের হয়ে থাকে।

- গভীর সমুদ্র অঞ্চলে যে ধরনের মাছ পাওয়া যায় তাদের বলে ডেমার্শাল মৎস্য। এই মৎস্য প্রধানত বাণিজ্যভিত্তিক। কড, হ্যালিবাট, টুনা প্রভৃতি এই জাতীয় মৎস্য।

এই সকল সামুদ্রিক মৎস্যগুলির প্রাপ্তিস্থান বিচার করলে দেখা যায় যে পৃথিবীর বিভিন্ন নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলগুলিতে বিশেষত উচ্চ অক্ষাংশে এর অবস্থান। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাগুলি এখানে মৎস্য চাষ গড়ে তুলতে সাহায্য করে বলেই নিম্নোক্ত অঞ্চলগুলিতে মৎস্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে মৎসক্ষেত্র গড়ে ওঠার কারণগুলিকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। (১) প্রাকৃতিক কারণ ও (২) আর্থ সামাজিক কারণ। প্রাকৃতিক অনুকূল কারণগুলি নিম্নরূপ—

(১) **অগভীর সমুদ্র এবং প্লাঙ্কটনের প্রাচুর্য**—সমুদ্রের অগভীর অংশে যেখানে সমুদ্র জলের গভীরতা ২০০ মিটারের মধ্যে অর্থাৎ মহীসোপান অঞ্চলগুলি মৎস্য শিকারের প্রধান ক্ষেত্রের কারণ— (ক) সমুদ্রের এই অগভীর অংশ নদীবাহিত আবর্জনা, জীবজন্তুর মৃতদেহ ইত্যাদি সঞ্চিত হয় এবং এইসব আবর্জনা হতে মৎস্য তাদের খাদ্য সংগ্রহ করে। (খ) সমুদ্রের অগভীর অংশ মাছের ডিম পাড়ার জন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র কারণ এইসব অঞ্চলে জলের উপর ঢেউয়ের যে চাপ পড়ে তা মাছের ডিম হতে পোনা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। (গ) সূর্যালোক ব্যতীত মাছের খাদ্য প্লাঙ্কটনের জন্ম বা বৃদ্ধি ঘটায় এবং সূর্যালোক সমুদ্রের তলদেশে ২০০ মিটারের অধিক গভীরে পৌঁছাতে পারে না তাই অগভীর সমুদ্রে যেখানে সূর্যালোক পৌঁছাতে পারে, সেসব অঞ্চলে প্লাঙ্কটন এবং বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণী জন্মাতে পারে সেসব অঞ্চল মৎস্য চাষের পক্ষে প্রকৃষ্ট। এইসব কারণে অগভীর মহীসোপান অঞ্চলে পিলেজিক জাতীয় মৎস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

(২) **উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলন**—উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলন স্থানগুলি মৎস্য সংগ্রহের আদর্শ কেন্দ্র। উষ্ণ স্রোত প্রধানত শীতল স্রোতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং শীতল স্রোতের নিম্নাভিমুখী চলনের ফলে সমুদ্রের নিম্নস্থ খনিজ এবং খাদ্য সমূহ দুই জলরাশির চলনের ফলে ঊর্ধ্ব দিকে উৎক্ষিপ্ত হয় এর ফলে সমুদ্রস্থিত মৎসের খাদ্যের প্রাচুর্য ঘটে। আবার শীতল স্রোতের সঙ্গে হিমশৈল ইত্যাদি বাহিত হয়ে আসে এবং উষ্ণ স্রোতের প্রভাবে ঐগুলি গলে গেলে ঐ সকল হিমশৈলে সঞ্চিত বালি, মাটি, নুড়ি ইত্যাদি অগভীর সমুদ্রে অধক্ষেপের ফলে বিভিন্ন মগ্ন চড়ার সৃষ্টি হয় বলে ঐ সকল অঞ্চলে প্রচুর মৎস সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। গ্রান্ডব্যাঙ্ক, জর্জেস ব্যাঙ্ক প্রভৃতি মগ্ন চড়াগুলি তাই মৎস্য ক্ষেত্ররূপে পৃথিবী বিখ্যাত।

(৩) **সমুদ্রের ঊর্ধ্বমুখী আবর্ত**—সমুদ্রের বিভিন্ন অংশে উষ্ণতা, লবণতা ও ঘনত্ব ইত্যাদির পার্থক্যের ফলে সমুদ্রজলে এক ঊর্ধ্বমুখী আবর্ত দেখা যায়। এই আবর্তের ফলে সমুদ্রের গভীরে যে সমস্ত বিভিন্ন সমুদ্রজ প্রাণীর মৃতদেহাবশেষের অবশিষ্টাংশ বিভিন্ন খনিজ ইত্যাদি থাকে তা উপরে ভেসে ওঠে এবং ঐ সকল অঞ্চলের মৎস্যের খাদ্যপুষ্টি যোগাতে সহায়তা করে। যে সকল অঞ্চলের জলে এরূপ আবর্ত দেখা যায় সে সকল অঞ্চলে খাদ্যের খোঁজে মৎস্য সকল ঝাঁক বেঁধে আসে বলে মৎস্য সংগ্রহ সহজ হয়।

(৪) **মৃদু শীতল জলবায়ু**—মৃদু শীতল জলবায়ু এই অঞ্চলের সমুদ্রে অংশগ্রহণকারী শিকারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং স্বাভাবিক বরফপ্রাপ্তির সুযোগ হেতু এই অঞ্চলের মৃত মৎস্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়।

(৫) **ভগ্ন উপকূল**—ভগ্ন উপকূলভাগ বন্দর গড়ে ওঠার পক্ষে উপযুক্ত। উত্তর গোলার্ধে ভগ্ন উপকূল যথেষ্ট পরিমাণে থাকার ফলে অতি সহজেই মৎস্য বন্দরগুলি গড়ে উঠতে সহায়তা করেছে এবং তা মৎস্য বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

(৬) **অরণ্যের উপস্থিতি**—উপকূল অঞ্চলে অরণ্যের উপস্থিতি মৎস্য সংগ্রহের জন্য জাহাজ, নৌকা, ট্রলার প্রভৃতি নির্মাণের জন্য সুলভ। নরম উপযুক্ত কাঠের সরবরাহ করে থাকে। এর সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির জলে বনভূমি হতে নদী প্রবাহে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য খাদ্য মহীসোপান অঞ্চলে জমা হয় এর ফলে ঐ সকল অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য সমাগম ঘটে থাকে।

(৭) খাদ্যাভ্যাস ও চাহিদা—সাধারণ সমুদ্র উপকূলের মৎস্য শিকারের অঞ্চলগুলির অবস্থান ও বন্ধুর ভূপ্রকৃতি ঐ সকল অঞ্চলগুলিকে কৃষির অনুপযোগী করে তোলে ফলে বিকল্প খাদ্য ও জীবিকা হিসেবে ঐ সকল দেশ যথা নিউ ফাউন্ডল্যান্ড নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, জাপান ইত্যাদি অঞ্চলগুলি প্রসিদ্ধ মৎস্য শিকার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এর সঙ্গে দ্রুত পচনশীল দ্রব্য মৎস্যের জন্য, বাজারের নৈকট্য একান্ত প্রয়োজন। এই কারণে মৎস্য শিকার কেন্দ্রের নিকটস্থ বিপুল জনতার চাহিদা স্থানীয় মৎস্য বাজারের সৃষ্টি করেছে এবং তা মৎস্য সংগ্রহকে আরও বেশি উন্নত করে তুলতে সহায়তা করছে।

(৮) **শ্রমিকের সরবরাহ**—সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা তুলনামূলকভাবে সমুদ্রে ভেসে চলার ব্যাপারে অনেক সাহসী ও সাঁতারে পটু হয় এবং ঐ সকল অঞ্চল কৃষিকার্যে অনুপযুক্ত বলে মৎস্য শিকার কেন্দ্রগুলিতে প্রচুর সুলভ দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়। এরা সারা বছর ধরেই এই সব কাজে ব্যাপৃত থাকে। মৎস্য শিল্পে মৎস্য সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে মাছ পরিষ্কার করা, প্যাকিং করা বা শুকনো করা তাকে বাজার জাত করা ইত্যাদি কাজে প্রচুর দক্ষ শ্রমিকের সরবরাহ এসব অঞ্চল থেকে পাওয়া যায়।

৯) **দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থা**—মৎস্য সংগ্রহ করার পর তাকে দ্রুত বাজারজাত বা বন্দরজাত করার জন্য উন্নত সড়ক ও রেল পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজন কারণ অধিক বিলম্বে মৎস্য নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এই সকল অঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থা অতি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত হওয়ার ফলে মৎস্য পরিবহনের বিশেষ সুবিধা হয়েছে।

১০) **হিমায়নের সুবিধা**—ধৃত মৎস্য যেহেতু একসঙ্গে বিক্রয় করা সব সময় সম্ভব হয় না তাই মৎস্য বন্দর অঞ্চলে মৎস্যকে শীঘ্র হিমায়িত করার সুবন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে প্রাকৃতিক বরফ প্রাপ্তির সুবিধার জন্য হিমায়ন সুবিধাজনক।

১১) **আর্থিক সুবন্দোবস্ত ও কারিগরী সুবিধা**—মৎস্য সংগ্রহের জন্য যে সব আধুনিক নৌকা, জাহাজ বা ট্রলার, নেট ইত্যাদির প্রয়োজন হয় এবং মৎস্য হিমায়িত করার জন্য যে বরফের প্রয়োজন হয় তার

জন্য উপযুক্ত আর্থিক সচ্ছলতা প্রয়োজন। ফলে এই সকল অঞ্চল কারিগরী ও প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত তাই এই সব অঞ্চলে মৎস্য শিকার বা সংরক্ষণ করা অতি সহজ নয়।

8B.7 পৃথিবীর বিভিন্ন মৎস্যক্ষেত্র সমূহ (World's Fishing Grounds)

উত্তর গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলগুলির ভৌগোলিক এবং আর্থ-সামাজিক পরিবেশ এখানে মৎস্য ক্ষেত্রগুলিকে গড়ে তুলতে সর্বতোভাবে সহায়তা করছে এবং এর ফলে এই অঞ্চলের পাঁচটি প্রধান বাণিজ্যভিত্তিক মৎস্য ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। সারণি ৯.৭.১ এ ক্ষেত্রসমূহ দেওয়া হল।

সারণি 8.7.1

মৎস্যক্ষেত্র সমূহ

- ® উত্তর পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের ক্ষেত্রসমূহ
- ® উত্তর পূর্ব আটলান্টিক উপকূলের ক্ষেত্রসমূহ
- ® উত্তর পশ্চিম আটলান্টিক উপকূলের ক্ষেত্রসমূহ
- ® উত্তর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের ক্ষেত্রসমূহ
- ® উত্তর গোলার্ধের অন্যান্য মৎস্যক্ষেত্রসমূহ

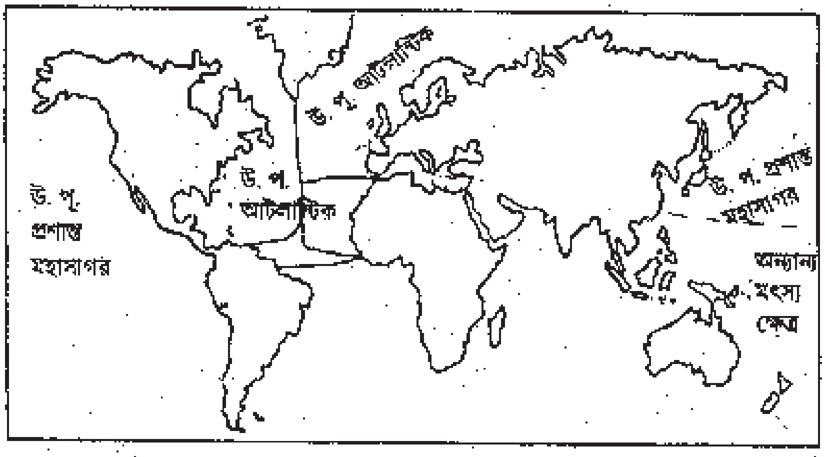

চিত্র ২। পৃথিবীর বিভিন্ন মৎস্যক্ষেত্র সমূহ

8B.7.1 উত্তর পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের মৎস্য ক্ষেত্রসমূহ

উত্তর আমেরিকার উত্তরে আলাস্কা হতে দক্ষিণ পশ্চিমে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত প্রায় ১২,২০০ কি.মি. দীর্ঘ। এই মৎস্যক্ষেত্রটি প্রধানত স্যামন মাছের জন্য বিখ্যাত। এছাড়া হেরিং, মেকারেল, কড, সার্ডিন প্রভৃতি মাছও প্রচুর পরিমাণে শিকার করা হয়। স্যামন, অ্যানাড্রোমাস শ্রেণীর মাছ। এই সাগরে ধৃত মৎস্যের গড় হিসাব ৮.৭.১.১ সারণিতে দেওয়া হল।

সারণি 8.7.1.1

উত্তর-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে ধৃত মৎস্যের গড় হিসাব

	মাছ	গড় উৎপাদন (হাজার টন)
1.	ফ্লাউন্ডার, হেলিবাট, সোল	257
2.	কড, হেক, হ্যাডক	1623
3.	রেডফিশ, বাস (Basses), কনজার (Congers)	307
4.	জ্যাক, ম্যাকারেল, মুলেট (Mullets)	×
5.	হেরিং, সার্ডিন, আংকোভিস	114
6.	টুনা, বোনিটো, বিলফিশ	20
7.	ম্যাকারেল, স্নোক (Snocks), কাটলাসফিশ (Cutlass fish)	×
8.	হাঙর (Sharks), রে (Rays), র‍্যাটফিশ (Ratfish)	3
	মোট	2324 হাজার টন

(উৎস : অনীশ চট্টোপাধ্যায়, অর্থনৈতিক ভূগোল ও সম্পদশাস্ত্রের পরিচয়, ৫১৫ পাতা)

এই অঞ্চলের প্রধান মৎস্য বন্দরগুলি হল সানফ্রান্সিসকো, প্রিন্স রুপার্ট, ভ্যাঙ্কোভার, ভিক্টোরিয়া ইত্যাদি। এখানে মৎস্য ক্ষেত্র গড়ে ওঠার প্রধান কারণগুলি নিম্নরূপ—

- দীর্ঘ ভগ্ন উপকূল (১২,২০০ কিমি) ও মৎস্য বন্দরের প্রাচুর্য।
- অগভীর মহীসোপান : এই মহীসোপান বিশেষত আলাস্কা অঞ্চলে অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা যায় কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমে এই মহীসোপানের বিস্তার তুলনামূলকভাবে কম।
- নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু মৎস্য সংগ্রহ হতে মৎস্য হিমায়নে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে।
- অগভীর সমুদ্রে প্লাঙ্কটন জাতীয় মৎস্য খাদ্যের প্রাচুর্য।
- উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় উষ্ণস্রোত ও শীতল আলাস্কা স্রোতের মিলনে মাছের যোগান বৃদ্ধি হয়।
- এই মৎস্য ক্ষেত্রটি শীতপ্রধান প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশে অবস্থিত বলে কৃষির অসুবিধা মানুষকে তার জীবন ধারণের জন্য মৎস্য সংগ্রহকে জীবিকা গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে।
- উত্তর পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় মৎস্য ক্ষেত্রের মাছের ও মৎস্যজাত দ্রব্যের চাহিদা ক্রমবর্ধমান।

- **উন্নত প্রযুক্তি ও শ্রমিকের প্রাচুর্য** — কেবলমাত্র মৎস্য শিকারই নয় মৎস্য সংরক্ষণেরও যথেষ্ট সুযোগ করে দিয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের শ্রমিকেরা দীর্ঘদিন ধরে মাছ ধরার কাজে ব্যাপৃত থাকার ফলে এরা সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণে অতি দক্ষ।

এই সকল সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা। নিকটবর্তী সরলবর্গীয় অরণ্যের কাঠ সরবরাহ এবং ভগ্ন উপকূলের সুরক্ষিত বন্দরগুলি এই অঞ্চলে মৎস্য ক্ষেত্র গড়ে তুলতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। মৎস্য উৎপাদনে এই অঞ্চলে পৃথিবীতে ষষ্ঠস্থান অধিকার করে আছে। এবং মৎস্য শিকারের ক্ষেত্রে সমগ্র পৃথিবীর প্রায় ৬.১ শতাংশ মৎস্য এই অঞ্চলে শিকার করা হয়ে থাকে। ছবিতে উত্তর পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের মৎস্য ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা হল।

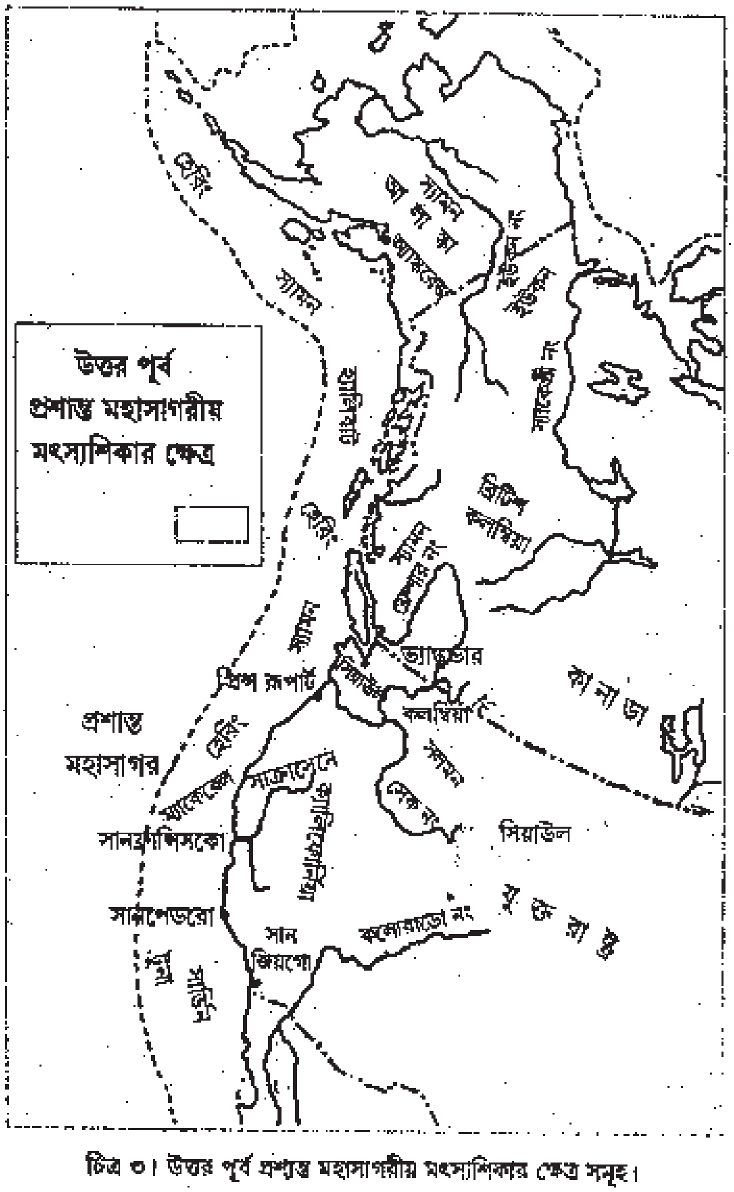

চিত্র ৩। উত্তর পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় মৎস্যশিকার ক্ষেত্র সমূহ।

8B.7.2 উত্তর পূর্ব আটলান্টিক উপকূলের মৎস্যক্ষেত্র

আটলান্টিক মহাসাগরের এই মৎস্যক্ষেত্রটি উত্তরে শ্বেত সাগর হতে দক্ষিণে মরক্কো পর্যন্ত বিস্তৃত এবং পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত মৎস্যক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রটির আয়তন প্রায় ৭.৮ লক্ষ বর্গ কি. মি.। এই মৎস্য প্রধানত ব্রিটেন, হল্যান্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশের মৎস্যশিকারীরা মৎস্য শিকার করে থাকে।

এই মৎস্য ক্ষেত্রটিতে প্রচুর পিলেজিক ও ডেমার্সাল শ্রেণীর মাছ শিকার করা হয়। উত্তর সাগরে ধৃত মৎস্যের অধিকাংশই হল কড়, ম্যাকারেল, হেরিং ইত্যাদি এ ছাড়া এই অঞ্চল তিমি শিকারের জন্য বিখ্যাত। পৃথিবীর প্রায় ৫০ শতাংশ তিমি মাছ শিকার করে থাকে নরওয়ের মৎস্য শিকারীরা। লোফোটেন দ্বীপপুঞ্জের নিকটবর্তী সাগর অঞ্চল তিমি ও কড় মাছ শিকারের জন্য বিখ্যাত। সারণি ৮.৭.২.১ এই সাগরে ধৃত মৎস্যের গড় হিসেব দেওয়া হল—

সারণি 8.7.2.1

উত্তর-পূর্ব আটলান্টিক সাগরে ধৃত মৎস্যের গড় হিসাব

	মাছ	গড় উৎপাদন (হাজার টন)
1.	ফ্লাউন্ডার, হেলিবার্ট, সোল	360
2.	কড, হেক, হ্যাড়ক	3964
3.	রেডফিশ, বাস (Basses), কনজার (Congers)	691
4.	জ্যাক, ম্যাকারেল, মুলেট (Mullets)	295
5.	হেরিং, সার্ডিন, আংকোভিস	1889
6.	টুনা, বোনিটা, বিলফিশ	53
7.	ম্যাকারেল, স্নোক (Snocks), কাটলাসফিশ (Cutlass fish)	378
8.	হাঙ্গর (Sharks), রে (Rays), র‍্যাটফিশ (Ratfish)	103
	মোট	7739 হাজার টন

(উৎস : অনীশ চট্টোপাধ্যায়, অর্থনৈতিক ভূগোল ও সম্পদশাস্ত্রের পরিচয়, ৫০৯ পাতা)

এই অঞ্চলে মৎস্যক্ষেত্র গড়ে ওঠার ভৌগোলিক কারণগুলি নিম্নরূপ—

- অগভীর বিস্তীর্ণ মহীসোপান।
- মৎস্য খাদ্যের যোগান—প্রধানত মিষ্টি জলের নদীগুলি যথা রাইন, সেন্ট, এলব, ওডার ইত্যাদির

মাধ্যমে অগভীর সমুদ্রে মৎস্য খাদ্য বাহিত হয়ে আসে ফলে মৎস্য খাদ্যের যোগানের অভাব ঘটে না।

- উষ্ণ উত্তর আটলান্টিক স্রোত ও শীতল সুমেরু স্রোতের মিলন, মাছের খাদ্য প্লাঙ্কটনের সরবরাহ কে নিয়ন্ত্রিত রাখে। এছাড়াও এই দুই স্রোতের মিলনের ফলে প্রচুর মগ্ন চড়ার সৃষ্টি করেছে। এই সকল মগ্ন চড়াগুলির মধ্যে ডগার্স ব্যাঙ্ক, রকফল ব্যাঙ্ক, গডউইন ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অঞ্চলগুলি মৎস্য শিকারের জন্য বিখ্যাত।
- নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু মৎস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ উভয় কার্যের উপযোগী।
- ভগ্ন উপকূল ও বন্দরের সুযোগ—ভগ্ন উপকূল থাকার ফলে এই অঞ্চলে বিভিন্ন মৎস্য বন্দরগুলি গড়ে উঠেছে। এই বন্দরগুলির মধ্যে বার্জেন, হ্যামারফেস্ট, অ্যাবার্ডিন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
- কৃষির জন্য পর্যাপ্ত জমির অভাব এবং এই অঞ্চলের ঘনবসতি মৎস্য শিকারের জন্য উৎসাহ প্রদান করে থাকে।
- বাজারের সুবিধা—নরওয়ে, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, সুইডেন, জার্মানি প্রভৃতি দেশ ঘন লোকবসতিপূর্ণ হওয়ায় চাহিদা অনুসারে বৃহৎ বাজারের সৃষ্টি হয়েছে।

এই সকল সুবিধাগুলি ব্যতীত উন্নত প্রযুক্তি, দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক, নিকটবর্তী সরলবর্গীয় বনভূমি ইত্যাদি মৎস্য উৎপাদন কেন্দ্রগুলির উন্নতিতে অনেক বেশি সহায়তা করে থাকে।

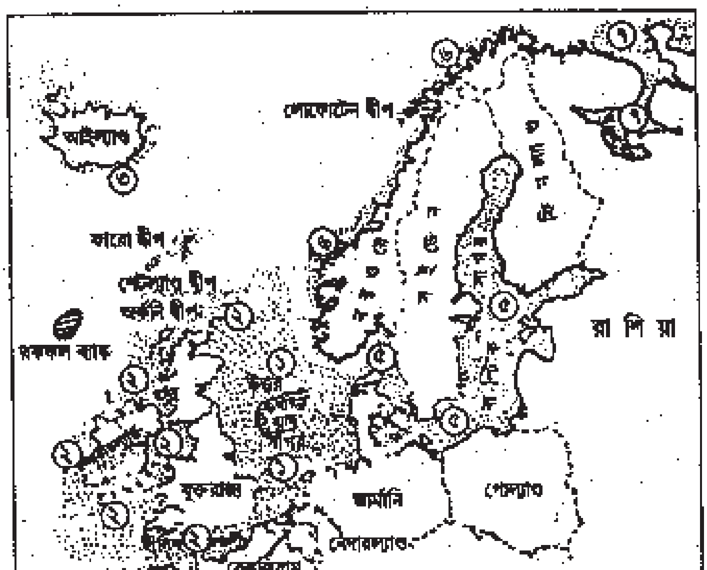

চিত্র ৪। উত্তর পূর্ব আটলান্টিক উপকূলের মৎস্যক্ষেত্র ও মৎস্যবন্দর সমূহ।

এই অঞ্চলের মৎস্য সংগ্রহ কেন্দ্রগুলির মধ্যে নরওয়ে এবং ডেনমার্ক সর্বাধিক মৎস্য শিকার করে। নরওয়ের প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক কারণগুলি একত্রে নরওয়েবাসীদের মৎস্য শিকারে বাধ্য করেছে। এই কারণে নরওয়েকে মৎস্যজীবী দেশ বলা হয়। কড, হেরিং মাছ এখানকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আইসল্যান্ডের জনগণও মৎস্য শিকারকে অর্থনৈতিক কাজকর্মের এক প্রধান অঙ্গ হিসাবে গণ্য করে থাকে।

মৎস্য শিকারের ক্ষেত্রে এই অঞ্চল পৃথিবীতে প্রথম। মোট সংগৃহীত সামুদ্রিক মৎস্যের ২০.৩ শতাংশ সংগ্রহ করা হয় এই মৎস্য ক্ষেত্রটি হতে। এই অঞ্চলে ধৃত মৎসের গড় হিসাব সারণি ৮.৭.২.১ কে দেওয়া হয়েছে।

8B.7.3 উত্তর পশ্চিম আটলান্টিক ক্ষেত্র

উত্তর পশ্চিম আটলান্টিক ক্ষেত্রটি উত্তরে নিউফাউন্ডল্যান্ড হতে দক্ষিণে নিউ ইংল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। উপকূল ভাগের বিস্তার প্রায় ১৪,০০০ কি. মি. এবং সমগ্র মৎস্য ক্ষেত্রটির আয়তন প্রায় ২.৬ বর্গ কি.মি.। এই অঞ্চলে কতগুলি মগ্ন চড়া বর্তমান। এগুলির মধ্যে সেবল আইল্যান্ড ব্যাঙ্ক, গ্রান্ড ব্যাঙ্ক, জর্জেস ব্যাঙ্ক, সেন্ট পিয়ের ব্যাঙ্ক, জেফরী ব্যাঙ্ক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কড, হেরিং, হ্যাডক, ম্যাকারেল, সার্ডিন, চিংড়ি প্রভৃতি এখানকার ধৃত মৎস্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি কড মাছ ধরা হয় নিউফাউন্ডল্যান্ডের পূর্ব উপকূলে। এই সব মাছের সঙ্গে সঙ্গে তিমি শিকার করাও এক লাভজনক ব্যবসা। সারণি 8.7.3.1-এ এই মৎস্যক্ষেত্র হতে আহৃত বিভিন্ন মাছের গড় হিসেব দেওয়া হল।

সারণি 8.7.3.1

উত্তর পশ্চিম আটলান্টিক ক্ষেত্রে ধৃত মৎস্যের গড় হিসাব

	মাছ	গড় উৎপাদন (হাজার টন)
1.	ফ্লাউন্ডার, হেলিবাট, সোল	298
2.	কড, হেক, হ্যাডক	1524
3.	রেডফিশ, বাস (Basses), কনজার (Congers)	353
4.	জ্যাক, ম্যাকারেল, মুলেট (Mullets)	14
5.	হেরিং, সার্ডিন, অ্যাংকোভিস	859
6.	টুনা, বোনিটা, বিলফিশ	18
7.	ম্যাকারেল, স্নোক (Snocks), কাটলাসফিশ (Cutlass fish)	396
8.	হাঙর (Sharks), রে (Rays), র‍্যাটফিশ (Ratfish)	39
	মোট	3503 হাজার টন

(উৎস : অনীশ চট্টোপাধ্যায়, সম্পদ সমীক্ষা, ৫০৬ পাতা)

এই সকল অঞ্চলে মৎস্য সংগ্রহ কেন্দ্র গড়ে ওঠার প্রধান কারণগুলি নিম্নরূপ—

- অগভীর মহীসোপান।
- দীর্ঘ ভগ্ন উপকূল বিভিন্ন মৎস্য বন্দর গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে।
- প্লাঙ্কটন ও মৎস্য খাদ্য উপযোগী বিভিন্ন খাদ্যের প্রাচুর্য।
- উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত ও শীতল ল্যাব্রাডর স্রোতের মিলন মাছের বৃদ্ধি ও খাদ্যের যোগানে সহায়তা করেছে।
- নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু মাছ ধরা ও সংরক্ষণের কাজকে সহায়তা করে থাকে।
- বন্ধুর ভূমিরূপ ও স্থানীয় চাহিদা এখানকার অধিবাসীদের মৎস্য সংগ্রহে সহায়তা করেছে।
- বন্দরের সুযোগ—এখানকার বিভিন্ন বন্দর যথা হ্যালিফাক্স; সেন্ট জন্‌স, পোর্টমাউথ প্রভৃতি বন্দর হতে মাছধরা এবং রপ্তানিতে যথেষ্ট সহায়তা করে থাকে। এই সকল সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সরলবর্গীয় বনভূমি এবং উন্নত প্রযুক্তি এই অঞ্চলের মৎস্য সংগ্রহকে আরও বেশি লাভজনক করে গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে।

উত্তর পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগরীয় অঞ্চলটি মৎস্য সংগ্রহে পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে আছে। এবং এখানে আহরিত মৎস্যের পরিমাণ প্রায় ৯২ শতাংশ। চিত্রে ৫ এ উত্তর পূর্ব আটলান্টিক মৎস্যক্ষেত্রের অবস্থান দেখান হল।

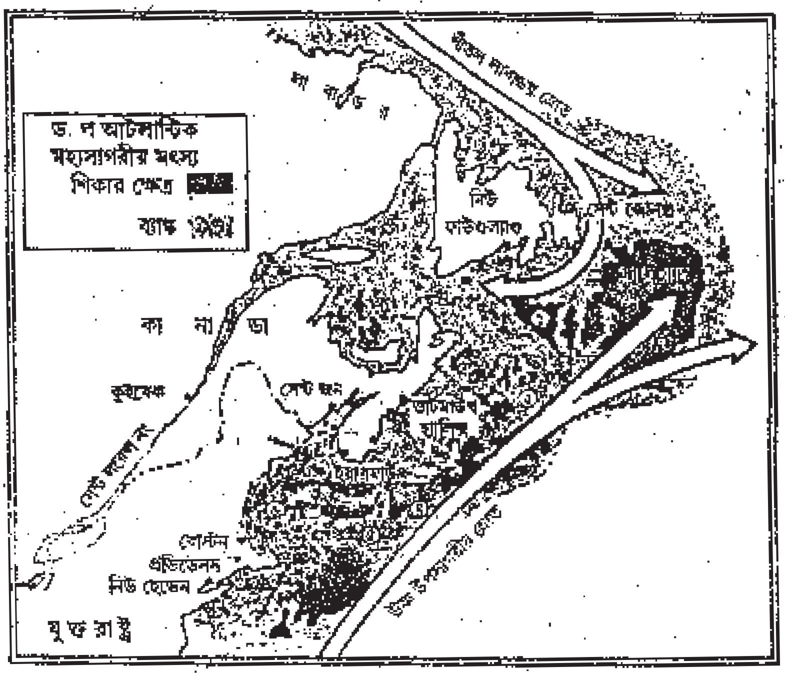

চিত্র ৫। উত্তর পশ্চিম আটলান্টিক মৎস্যক্ষেত্রের অবস্থান।

8B.7.4 উত্তর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় ক্ষেত্র

এই মৎস্য ক্ষেত্রটি এশিয়া মহাদেশের পূর্বাংশে উত্তরে বেরিং প্রণালী হতে শুরু করে দক্ষিণে পূর্ব চীনসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলের উপকূল ভাগের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৯০০ কিমি। এই মৎস্যক্ষেত্রটি পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ মৎস্যক্ষেত্র এবং এই অঞ্চলে অবস্থিত জাপান পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম প্রধান মৎস্য শিকার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। এই সাগরে চিন, জাপান, কোরিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন (পূর্বতন) প্রভৃতি অঞ্চলের ধীবরেরা মৎস্য শিকার করে। পৃথিবীর ধৃত মৎস্যের প্রায় ১৫.৯ শতাংশ এই অঞ্চল হতে আহরণ করা হয়। এই সাগরে ধৃত মৎস্যের গড় হিসাব ৮.৭.৪.১ সারণিতে দেওয়া হল।

সারণি 8.7.4.1

উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে ধৃত মৎস্যের গড় হিসাব

	মাছ	গড় উৎপাদন (হাজার টন)
1.	ফ্লাউন্ডার, হেলিবাট, সোল	310
2.	কড, হেক, হ্যাডক	78
3.	রেডফিশ, বাস (Basses), কনজার (Congers)	783
4.	জ্যাক, ম্যাকারেল, মুলেট (Mullets)	666
5.	হেরিং, সার্ডিন, অ্যাংকোভিস	961
6.	টুনা, বোনিটা, বিলফিশ	336
7.	ম্যাকারেল, স্নোক (Snocks), কাটলাসফিশ (Cutlass fish)	1558
8.	হাঙর (Sharks), রে (Rays), র‍্যাটফিশ (Ratfish)	58
	মোট	4746 হাজার টন

(উৎস : অনীশ চট্টোপাধ্যায়, সম্পদ সমীক্ষা, ৫১২, ৫১৩ পাতা)

এই মৎস্যক্ষেত্র হতে প্রধানত টুনা, সার্ডিন, কড, ম্যাকারেল, হেরিং, স্যামন, চিংড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার মাছ শিকার করা হয়। এছাড়া এই অঞ্চলে বিশেষত জাপানে প্রচুর তিমি মাছ শিকার করা হয়। এখানকার প্রধান মৎস্যক্ষেত্রগুলি হল জাপানের হাকোদাতে, মিকাসি, ওয়াইজু, ইয়াকোহামা, নাগাসাকি, উত্তর কোরিয়ার লুংনাম, দঃ কোরিয়ার মোকাপো, চিনের সাংহাই, হংকং ইত্যাদি বিখ্যাত।

এই অঞ্চলের মৎস্য শিকার কেন্দ্র গড়ে ওঠার কারণগুলি নিম্নরূপ—

- অগভীর মহীসোপান ও ভগ্ন উপকূল।

- দেশের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন নদীগুলি যথা—ইয়েনোশিরো, কিতাকানি, ইয়াংসি, হোয়াংহো প্রভৃতি নদীবাহিত খাদ্যের যোগান।
- উষ্ণ কুরোশিয়ো স্রোতের সঙ্গে শীতল কিউরাইল স্রোতের মিলনের ফলে প্রচুর মাছের সমাগম হয়।
- কৃষি উপযোগী জমির অভাব ও মানুষের খাদ্য ও জীবিকার প্রয়োজনে এই সকল অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানত মৎস্য শিকারী হয়ে থাকে।
- নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু মৎস্য সংরক্ষণের উপযোগী শীতল পরিবেশে কম খরচে মৎস্য সংরক্ষণ করা সম্ভব।
- নিকটবর্তী সরলবর্গীয় বনভূমি মৎস্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন জলযান নির্মাণে সুবিধা প্রদান করেন।
- স্থানীয় চাহিদা ও বাজারের সুবিধা এই অঞ্চলের মৎস্য আহরণকে আরও উৎসাহ প্রদান করে।
- প্রযুক্তির উন্নতির ফলে বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে মৎস্য আহরণের সুবিধা।
- চিন ও জাপানের অধিবাসীরা বহুদিন ধরে এই মৎস্য আহরণের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে এরা খুবই দক্ষ এবং অঞ্চলগুলি জনবহুল হওয়ায় প্রচুর সুলভ ও দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়।

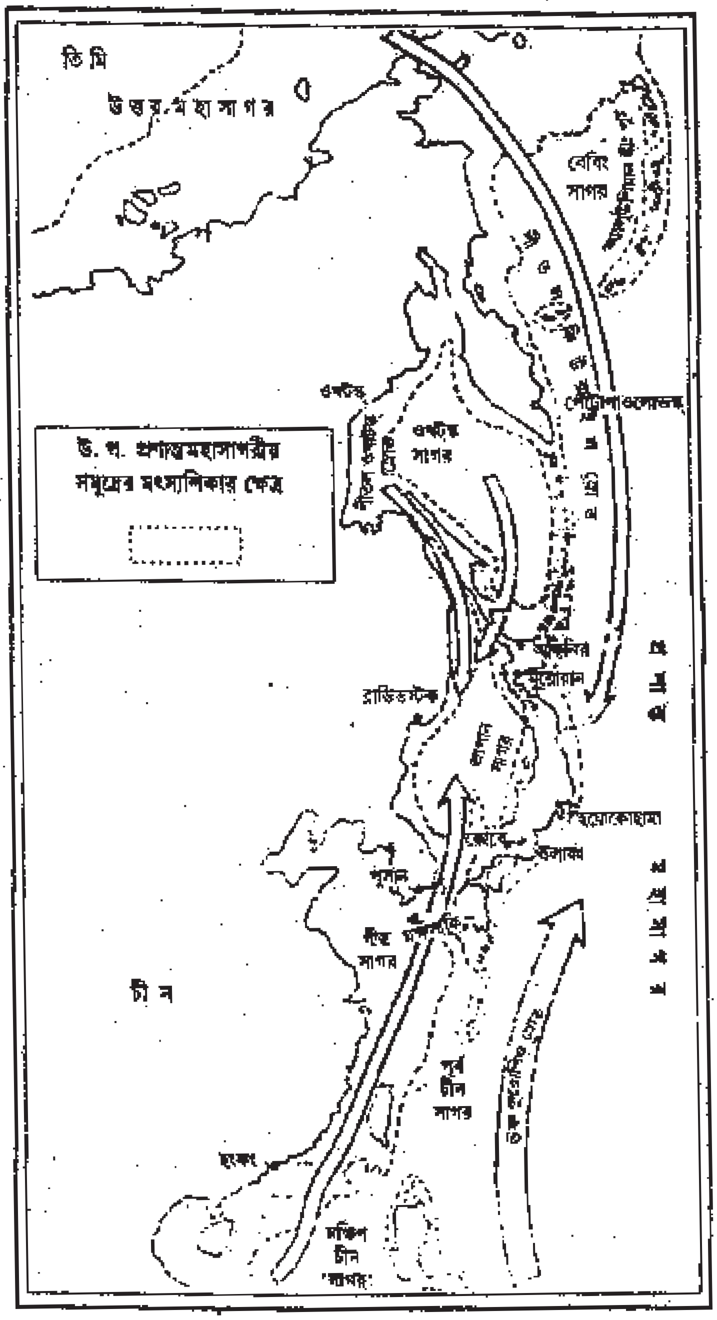

চিত্র ৩। উত্তর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় মৎস্যক্ষেত্র।

- উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা এবং বহু দ্বীপের সমাবেশের ফলে বিশেষত জাপানে দেশের অভ্যন্তরের সঙ্গে উপকূলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ব্যবস্থা মৎস্য আহরণের যথেষ্ট উন্নতির সহায়ক হয়েছে। চিত্রে-৬ উত্তর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় ক্ষেত্রগুলি দেখান হল।

8B.7.5 উত্তর গোলার্ধের অন্যান্য মৎস্যক্ষেত্র

উত্তর গোলার্ধের ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলি যথা ইতালি, পর্তুগাল, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রচুর মৎস্য শিকার করে থাকে। এখানে সার্ডিন, টুনা, স্যামন, ম্যাকারেল, হেরিং প্রভৃতি মাছ প্রধান। এই অঞ্চলটি ভূমধ্যসাগরীয় মৎস্য ক্ষেত্র বলে পরিচিত।

8B.8 দক্ষিণ গোলার্ধের মৎস্যক্ষেত্র (Fishing Grounds in the Southern Hemisphere)

উত্তর গোলার্ধ ব্যতীত দক্ষিণ গোলার্ধের আরও দুটি মৎস্য ক্ষেত্র বিশেষভাবে উন্নত। যথা দক্ষিণ পূর্ব আটলান্টিক মহাসাগরীয় মৎস্যক্ষেত্র ও দক্ষিণ পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় ক্ষেত্র।

8B.8.1 দক্ষিণ পূর্ব আটলান্টিক মহাসাগরীয় মৎস্য ক্ষেত্র

দক্ষিণ পূর্ব আটলান্টিক মহাসাগরীয় ক্ষেত্রটি আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে আঙ্গোলা হতে দক্ষিণে নামিবিয়া হয়ে পশ্চিম উপকূল বরাবর দক্ষিণে প্রসারিত হয়েছে।

- এই অঞ্চলের ধৃত মৎস্যের মধ্যে কড, হেরিং, সার্ডিন প্রধান। এই সকল মৎস্য ব্যতীত এখানে প্রচুর তিমিও শিকার করা হয়। হেরিং ও সার্ডিন মৎস্য শিকারে এই অঞ্চল পৃথিবীর মধ্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

- এই অঞ্চলে মৎস্য কেন্দ্র গড়ে ওঠার বিভিন্ন কারণগুলির মধ্যে অনুকূল জলবায়ু, অগভীর সমুদ্র ও ভগ্ন উপকূল, প্রচুর স্থানীয় চাহিদা, মৎস্য খাদ্যের প্রাচুর্য, পর্যাপ্ত কৃষি জমির অভাব, শ্রমিক ও ধীবরের সহজলভ্যতা ইত্যাদি প্রধান।

- এই অঞ্চলে বর্তমানে মৎস্য শিকারের উন্নতি ঘটায় এখানে কয়েকটি মৎস্য বন্দর গড়ে উঠেছে। এই সকল বন্দরগুলির মধ্যে পোর্টনোলোথ পোর্টএলিজাবেথ মোসেলবাই প্রভৃতি প্রধান।

4B.4.2 দক্ষিণ পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় ক্ষেত্র সমূহ

এই মৎস্য কেন্দ্রটি দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরে দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত পেরু, চিলির উপকূল জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। এই মৎস্য ক্ষেত্রটি ক্রান্তীয় মৎস্য ক্ষেত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে মৎস্য কেন্দ্র গড়ে ওঠার কারণগুলি নিচে আলোচনা করা হল।

- দক্ষিণ কুমেরু সাগর হতে প্রবাহিত চিলি স্রোত পেরুর উপকূলে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য খাদ্য প্লাঙ্কটনের যোগান দেয়। ফলে খাদ্যের খোঁজে প্রচুর পরিমাণে মৎস্যের সমাগম হয়।
- অনুর্বর পর্বতময় তীরবর্তী অঞ্চল কৃষিকার্যের অনুকূল নয় বলে এখানকার মানুষ জীবিকার জন্য সমুদ্রের উপর নিভরশীল।
- বিস্তৃত মহীসোপান অঞ্চল প্রচুর মৎস্যের আবাসস্থল।
- সুলভ শ্রমিক ও ধীবরের প্রাচুর্যতা।
- স্থানীয় বন্দর যথা চিমবোট সামাংকো চ্যান্সে, ক্যালবুকো প্রভৃতি উন্নত বন্দরের মাধ্যমে মৎস্য রপ্তানির সুবিধা। পোর্ট এলিজাবেথ প্রভৃতি উন্নত বন্দরের মাধ্যমে মৎস্য রপ্তানির সুবিধা।
- ধৃত মৎস্যের মধ্যে কড, হেরিং, সার্ডিন ইত্যাদি প্রধান, ম্যাকারেল, টুনা ইত্যাদি প্রধান। এখানে বিভিন্ন ধরনের তিমি মাছও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।
- স্থানীয় চাহিদা বেশি না থাকায় এখানে তেমন কোন বিশেষ মৎস্য বাজার গড়ে ওঠেনি। তবে চিলি ও পেরু হতে কিছু কিছু মৎস্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের কোন কোন দেশে রপ্তানি হয়।

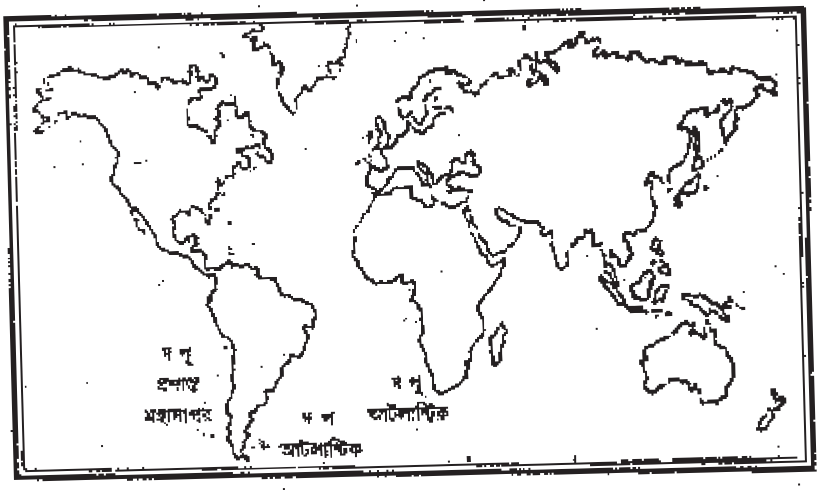

চিত্র ৭। দক্ষিণ গোলার্ধে মৎস্যক্ষেত্র সমূহ।

8B.9 ক্রান্তীয়-অঞ্চলের মৎস্যক্ষেত্র সমূহ এবং ব্যাপকভাবে গড়ে না ওঠার কারণ সমূহ (Major Fishing Areas of Tropical Region & Causes for Non-Development of Commercial Fisheries)

ক্রান্তীয় অঞ্চল মৎস্যক্ষেত্র হিসাবে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মত অগ্রসর নয়। এখানে বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষের সেরূপ কোন বিশেষ উন্নতি ঘটে নি। এর কারণগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

- ক্রান্তীয় অঞ্চলের উষ্ণ জলবায়ুর জন্য মৎস্য দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় এবং মৎস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাও তেমন গড়ে ওঠেনি।
- উষ্ণ জলের প্রভাবে উৎকৃষ্ট প্লাঙ্কটন জন্মাতে পারে না বলে মৎস্য খাদ্যেরও অভাব ঘটে।
- ক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশসমূহের উপকূলের মহীসোপান অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মত মগ্ন চড়াও সৃষ্টি হয়নি। এছাড়া সমুদ্রে খাঁড়ি ও স্বাভাবিক বন্দর ও পোতাশ্রয়ের সংখ্যাও অল্প।
- ক্রান্তীয় অঞ্চলের মৎস্য ক্ষেত্রগুলির অধিকাংশ দেশ স্বল্পোন্নত এবং এখানে মূলধন বা বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তি বিশেষ উন্নত না হওয়া এবং সমুদ্র হতে মৎস্য শিকারের জন্য হিমায়নের ব্যবস্থাসহ মৎস্য সংগ্রহের জাহাজেরও অভাব।
- হিমায়নের অভাবে মৎস্য হিমায়িত করা সম্ভব হয় না।
- উষ্ণ জলবায়ুর জন্য ধীবরদের কর্মক্ষমতাও কমে যায় এবং দক্ষ শ্রমিকেরও অভাব।
- সর্বোপরি এই সকল অঞ্চলে মিষ্টি জলের প্রাচুর্য থাকায় সমুদ্রজাত মৎস্যের চাহিদা অনেক কম।

তবে এই সকল নানা অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে উষ্ণমণ্ডলের বিভিন্ন দেশে সামুদ্রিক মৎস্য শিল্পের উন্নতির জন্য নানা প্রচেষ্টা চলেছে। মৎস্য শিল্পের উন্নতির জন্য বিভিন্ন গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে। সমুদ্র উপকূলে কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। এইভাবে নানা কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে উষ্ণ মণ্ডলের অধিবাসীদের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পর্কে আরও সচেতন করে তোলা হচ্ছে।

- উষ্ণ মণ্ডলের মৎস্য ক্ষেত্রগুলির মধ্যে বর্তমানে ভারতের নাম সকলের উপরে এবং অন্যান্য দেশগুলি হল বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার ইত্যাদি।

8B.10 মৎস্য হ্রাস (Depletion of Fish)

মৎস্য একটি প্রবহমান সম্পদ, স্বাভাবিক নিয়মেই এদের জন্ম ও বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু এই প্রবহমান সম্পদটিও মনুষ্য হস্তক্ষেপের ফলে ধীরে ধীরে নতুনভাবে সৃষ্টি হয়ে স্থান পূরণ করে নিতে অসমর্থ হয়ে পড়েছে। এর

প্রধান কারণ মানুষের নির্বিচারে মৎস্য সংগ্রহ। এর ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন মৎস্য ক্ষেত্রগুলিতে অনেক মৎস্য অবলুপ্ত হয়ে চলেছে।

- মৎস্য হ্রাসের অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে জলদূষণ একটি অন্যতম প্রধান কারণ। সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশগুলি হতে বিভিন্ন কলকারখানার বিভিন্ন আবর্জনা ও রাসায়নিক পদার্থ প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রের জলে মিশে জলকে দূষিত করছে ফলে প্লাঙ্কটন ইত্যাদি মৎস্য খাদ্যের ক্ষতিসাধন করে চলেছে।

- সমুদ্রে বিভিন্ন জাহাজ চলাচল ও সমুদ্র তটবর্তী অঞ্চল হতে তেল উত্তোলনের ফলে সমুদ্রের জলে ক্রমাগত তেল জলে মিশে যাচ্ছে যা সামুদ্রিক প্রাণীর জীবনহানি ঘটিয়ে চলেছে।

- এছাড়াও বিভিন্ন যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের তৈলবাহী জাহাজ ধ্বংস করার ফলে প্রচুর পরিমানে তৈল সমুদ্র জলে মিশে বহু সংখ্যক সামুদ্রিক প্রাণীর জীবননাশ করে। উপসাগরীয় যুদ্ধে (১৯৯০) প্রায় ২০ লক্ষ সামুদ্রিক পাখি, অসংখ্য লেদার ব্যাক, কচ্ছপ ও সামুদ্রিক প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলে বিশেষজ্ঞ মহল অভিমত পোষণ করেন।

মৎস্য হ্রাসের কারণগুলি নিয়ে বর্তমানে বিভিন্ন ভাবনা চিন্তা চলেছে। ভবিষ্যতে কিভাবে এই অবস্থার প্রতিকার করা সম্ভব এসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা সচেতন হচ্ছেন এবং নানা গবেষণা চলেছে।

8B.11 মৎস্য সংরক্ষণ

মৎস্য সংরক্ষণ বলতে সমুদ্রের মৎস্যক্ষেত্রগুলির উৎপাদন 'স্থিতিশীল রাখা এবং সমুদ্রের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখাকে বোঝায়' এ সম্বন্ধে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি নিচে আলোচনা করা হল।

- যথেচ্ছ মৎস্য শিকার ও অপরিণত মৎস্য আহরণ বন্ধ করা।
- বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৎস্য প্রজননের ব্যবস্থা করা।
- বিভিন্ন শিল্প কারখানার বর্জ্য দূষিত পদার্থ সমুদ্রে নিক্ষেপের উপর বাধা নিষেধ আরোপ।
- চাহিদা অনুসারে মৎস্য শিকার করা।
- সমুদ্রের তৈলবাহী জাহাজ হতে তেল ছড়িয়ে পড়ার দিকে নজর রাখা এবং তেল ছড়িয়ে পড়লে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তেলের প্রভাব নষ্ট করা।
- সমুদ্র জল দূষণের মাত্রা রোধ করা।
- সর্বোপরি ক্রমহ্রাসমান মৎস্য প্রজাতির আহরণ নিষিদ্ধ করা। এছাড়া অতি মূল্যবান সিল, তিমি ইত্যাদি শিকার বন্ধ করা এবং এ সম্বন্ধে জনসচেতনাকে বৃদ্ধির দিকে আরও জোর দিতে হবে।

8B.12 সারাংশ

সমুদ্রের অতুলনীয় সম্পদের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে সকল মানুষের সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। স্থলভাগের পরিমাণ সীমিত। ঐ সীমিত অঞ্চলে বসবাসের সঙ্গে সঠিক খাদ্যের যোগান বজায় রাখার বিবিধ সমস্যা তদুপরি পৃথিবীর সর্বত্র ভূপ্রকৃতির তারতম্য দেখা যায়। সেমত ক্ষেত্রে মানুষ সমুদ্রের দিকে হাত বাড়ায়।

সমুদ্র কেবলমাত্র মৎস্যেরই যোগান দিয়ে মানুষকে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করে না সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার জলজ উদ্ভিদ, সমুদ্রজাত নানা রাসায়নিক ও খনিজ, লবণ ইত্যাদিও সরবরাহ করে চলেছে। সমুদ্রের এই সব সম্পদ পূর্ণভব সম্পদ অর্থাৎ ঠিকমত আহরণ করলেও এগুলি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ভয় নেই। বর্তমানে যে হারে জ্বালানি খনিজের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন আগামী কয়েক দশকে ঐ সব জীবাশ্ম জ্বালানি নিঃশেষ হ'য়ে যাবে। তাই বিকল্প শক্তির উৎস হিসেবে জোয়ার ভাঁটার শক্তি বর্তমানে মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেছে। জোয়ার ভাঁটার শক্তির সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। ভারতেও এধরনের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে।

সর্বশেষ বলা যায় যে এরূপ অতি প্রয়োজনীয় সমুদ্রকে দূষণমুক্ত রেখে মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন ধারাকে বজায় রাখতে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। মানুষের সচেতনাকে বৃদ্ধি করে এই প্রবহমান শক্তি সম্পদের ব্যবহার করলে পৃথিবীর পরিবেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতি সম্ভব।

8B.13 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১. সমুদ্রের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

২. সামুদ্রিক উদ্ভিদ বলতে কি বোঝ ? বাণিজ্যিকভাবে আবহযোগ্য সামুদ্রিক উদ্ভিদের বিবরণ দাও এবং সামাজিক উদ্ভিদের ভৌগোলিক বণ্টন ব্যাখ্যা করুন।

৩. রাসায়নিক ও খনিজ সম্পদের উৎস হিসেবে সমুদ্রের গুরুত্ব বর্ণনা কর এবং সমুদ্রের বিভিন্ন অঞ্চল হতে আহরণযোগ্য সম্পদ সমূহের বর্ণনা করুন।

৪. পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য মৎস্যক্ষেত্রগুলির অবস্থান নির্ণয় কর এবং ঐ সকল মৎস্যক্ষেত্রগুলি উত্তর গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিতির কারণগুলি বর্ণনা করুন।

৫. ক্রান্তীয় অঞ্চলের সমুদ্রে বাণিজ্যিক মৎস্য চাষের উন্নতি না ঘটার কারণগুলি ব্যাখ্যা করুন।

৬. মৎস্যক্ষেত্রের উপযোগী প্রাকৃতিক অবস্থানগুলি কি কি? পৃথিবীর যে কোন একটি মৎস্যক্ষেত্রের বর্ণনাসহ তা ব্যাখ্যা করুন।

৭. মৎস্য হ্রাসের কারণগুলি কি কি ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১. সমুদ্র হতে প্রাপ্ত রাসায়নিক ও খনিজ সম্পদগুলির প্রাপ্তিস্থানগুলি কোথায় অবস্থিত?

২. সমুদ্রে দ্রাব্য অবস্থায় প্রাপ্ত খনিজগুলি কি কি?

৩. মৎস্য চাষের প্রকারভেদ অনুসারে বিভক্ত করুন।

৪. অ্যানাড্রোমাস মৎস্য কাদের বলে?

৫. স্বাদু জলের মৎস্য কাকে বলে?

৬. পৃথিবীর প্রধান মৎস্যক্ষেত্রগুলি কোথায় অবস্থিত?

৭. ভূমধ্যসাগরীয় মৎস্যক্ষেত্র সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

৮. মৎস্য সংরক্ষণ বলতে কি বোঝেন।

৯. প্ল্যাঙ্কটন-এর গুরুত্ব লিখুন।

১০. মানুষের সম্ভাবনাময় খাদ্যগুলি কি ?

8B.14 উত্তরমালা

১. 8B.2 অংশ দেখুন।

২. 8B.3 অংশ দেখুন।

৩. 8B.4, 8B.4.1, 8B.4.2 এবং 8B.4.3 অংশ দেখুন।

৪. 8B.6 এবং 8B.7 অংশ দেখুন।

৫. 8B.9 অংশ দেখুন।

৬. 8B.6 এবং 8B.7.1 অংশ দেখুন।

৭. 8B.10 অংশ দেখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ

১. 8B.4 অংশ দেখুন।

২. 8B.4.1 অংশ দেখুন।

৩. 8B.5 অংশ দেখুন।

৪. 8B.5 এর 2 নম্বর অংশ দেখুন।

৫. 8B.5 এর 3 নম্বর অংশ দেখুন।

৬. 8B.7 অংশ দেখুন।

৭. 8B.11 অংশ দেখুন।

৮. 8B.15 অংশ দেখুন।

৯. 8B.6 এর 1 নম্বর অংশ দেখুন।

১০. 8B.2 এর 1 নম্বর এর 8B.3 অংশ দেখুন।

একক 9.0 ☐ সম্পদের ব্যবহার — কৃষি, মানবসম্পদ

গঠন :

9.0 প্রস্তাবনা

9.1 উদ্দেশ্য

9.2 কৃষিকার্যের সংজ্ঞা

9.3 কৃষিকার্যের উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব

9.3.1 কৃষিকার্যের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব

9.3.2 কৃষিকার্যে আর্থসামাজিক পরিবেশ

9.4 কৃষির শ্রেণীবিভাগ

9.4.1 জমির সীমাবদ্ধতা অনুসারে

9.4.1.1 প্রগাঢ় কৃষি

9.4.1.2 ব্যাপক কৃষি

9.4.2 ঋতুভিত্তিক কৃষি

9.4.2.1 খারিফ চাষ

9.4.2.2 রবি শস্য

9.5 আর্দ্রতা অনুসারে চাষ

9.5.1 আর্দ্র কৃষি

9.5.2 সেচন কৃষি

9.5.3 শুষ্ক কৃষি

9.6 ফসল ফলানোর পদ্ধতির তারতম্য অনুসারে

9.7 উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে

9.7.1 জীবিকাভিত্তিক কৃষি

9.7.2 বাণিজ্যিক কৃষি

9.7.3 আদিম কৃষি

9.7.4 বাগিচা কৃষি

9.7.5 মিশ্র কৃষি

9.8 জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে কৃষির বিভাগ

9.8.1 ক্রান্তীয় উষ্ণ আর্দ্র অঞ্চলের কৃষি

9.8.2 ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের কৃষি

9.9 জমির মালিকানাভিত্তিক কৃষি

9.9.1 ব্যক্তিগত খামার

9.9.2 সমবায় খামার

9.9.3 রাষ্ট্রীয় বা সরকারী মালিকানা ভিত্তিক খামার

9.10 আধুনিক সমাজে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ হিসাবে কৃষির ভূমিকা

9.11 বিভিন্ন দেশে কৃষিযোগ্য ভূমি এবং কৃষিনির্ভর জনসংখ্যা

9.12 কৃষিজ উৎপাদনের শ্রেণীবিভাগ

9.13 প্রধান খাদ্য শস্য উৎপাদন — ধান

9.13.1 বিভিন্ন উচ্চফলনশীল জাতের ধান

9.13.2 ধান চাষের ভৌগোলিক পরিবেশ

9.13.3 পৃথিবীর ধান উৎপাদনকারী অঞ্চল সমূহ

9.13.4 ধান উৎপাদনকারী দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মৌসুমী অধ্যুষিত অঞ্চল সমূহ

9.13.5 পৃথিবীর অন্যান্য ধান উৎপাদনকারী দেশ সমূহ

9.13.6 ধানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

9.14 ব্যাপক বাণিজ্যিক কৃষি উৎপাদন — গম

9.14.1 গমের শ্রেণীবিভাগ

9.14.2 গম চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা সমূহ

9.14.3 পৃথিবীর প্রধান প্রধান গম উৎপাদনকারী অঞ্চল সমূহ

9.14.4 গমের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

9.15 বাগিচা ফসল — পানীয় জাতীয় — চা

9.15.1 চা উৎপাদনের ভৌগোলিক পরিবেশ সমূহ

9.15.2 চায়ের শ্রেণী বিভাগ

9.15.3 পৃথিবীর চা উৎপাদনকারী দেশ সমূহ

9.16 মানব সম্পদ সম্পর্কে ধারণা

9.17 সম্পদ সৃষ্টিতে মানুষের দ্বৈত ভূমিকা

9.18 মানব সম্পদের ভৌগোলিক বণ্টন

9.19 মানব সম্পদের অসম বন্টনের কারণ নির্ধারণ

9.20 মানব সম্পদ বৃদ্ধির হার

9.20.1 জন্মহার

9.20.2 মৃত্যুহার

9.21 কাম্য জন সংখ্যা

9.22 জনসংখ্যা অভিক্ষেপ

9.23 জনসমষ্টির বিবর্তন

9.24 জনসংখ্যা কাঠামো ও পিরামিড

9.25 বয়স ভিত্তিক নারীপুরুষের জনসংখ্যা গঠনের প্রকারভেদ

9.26 জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

9.27 জনসংখ্যার ম্যালথুসীয় তত্ত্ব

9.28 জনসংখ্যা সম্পদ অঞ্চল

9.29 জনসংখ্যার সমস্যা

9.30 সারাংশ

9.31 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

9.32 উত্তরমালা

9.0 প্রস্তাবনা

কৃষিকে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির প্রাথমিক স্তর বলে। সাধারণভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক কাজই হল প্রাথমিক অর্থনৈতিক স্তর।

একদা মানুষ বনে জঙ্গলে বসবাস করত তখন কৃষি সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে খাদ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে মৃত্তিকা হতে খাদ্য উৎপাদন করতে শিখল তখন খাদ্য সংগ্রহের প্রধান উপায় হল কৃষি এবং গড়ে উঠল এক নতুন সভ্যতা যা কৃষি সভ্যতা নামে ইতিহাসে পরিচিত হল।

এই আদিম জীবিকাভিত্তিক কৃষিই বিজ্ঞানের সহায়তায় আজ পরিণত হয়েছে বাণিজ্যিক ব্যাপক কৃষি, মিশ্র কৃষি, বাগিচা কৃষি, শস্যাবর্তন ইত্যাদি নানা প্রকার কৃষিতে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিরও উন্নতি ঘটেছে। কৃষির উন্নতির প্রধান মাধ্যম মনুষ্য সম্পদ, তাই কৃষির উন্নতি জানতে গেলে আমাদের একই সঙ্গে জানা প্রয়োজন মনুষ্য সম্পদের কথা। কারণ সমস্ত সম্পদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মানুষ। জিমারম্যান-এর ভাষায় বলা যায় "সম্পদ বিকাশের সামগ্রিক সূচিতে মানুষ এক অনন্য ভূমিকা পালন করে" সম্পদ সৃষ্টি এবং ভোগ উভয়ই নির্ভর করে মনুষ্য সম্পদের উপর। মৃত্তিকার কর্ষণযোগ্যতা বা কৃষি জমির ব্যবহার ও কৃষিজাত-দ্রব্যের ব্যবহার এই উভয়ই নির্ভর করে মানুষের উপর। কারণ মানুষই পারে তার বুদ্ধি, কর্মশক্তি যা তার উদ্ভাবনী ক্ষমতার সহায়তায় নিরপেক্ষ বস্তুকে সম্পদে পরিণত করতে।

মনুষ্য সম্পদ নিয়ে যে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা হয় তাকে ইংরাজীতে বলে Demography. জনসংখ্যার বণ্টন, পরিমাণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, জনবসতির ঘনত্ব, স্ত্রী-পুরুষ ভেদে জন কাঠামো ইত্যাদি জনসংখ্যা বিষয়ক সমগ্র বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করা হয় জনসংখ্যা সম্পর্কিত অনুশীলনে (Demography)। তবে এর সঙ্গে সঙ্গে মানব সম্পদের ধ্বংসাত্মক দিকও বিচার করা হয় কারণ মানুষ যেমন সম্পদ সৃষ্টি বা ভোগ করে তেমনি করে এর বিনাশ। মনুষ্য সম্পদের ধ্বংসাত্মক দিকও বিচার বিবেচনার যোগ্য।

9.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- কৃষিকার্যের সংজ্ঞা সম্পর্কে সকলকে অবহিত করতে পারবেন।
- জানতে পারবেন প্রকৃতি কিভাবে কৃষিকার্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে।
- কৃষির শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে সকলকে বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- জানতে পারবেন আধুনিক সমাজে অর্থনৈতিক কার্য হিসাবে কৃষির ভূমিকা।
- বিভিন্ন দেশে কৃষিযোগ্য ভূমি ও কৃষিনির্ভর জনসংখ্যা কিরূপ তা নির্ধারণ করতে পারবেন।
- পৃথিবীর বিভিন্ন উৎপাদক দেশে বিভিন্ন কৃষি সম্পদের বণ্টন কিরূপ তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- মানুষকে কেন সম্পদ বলা হয় তা জানতে পারবেন।
- জনসংখ্যা অভিক্ষেপ ও জনপিরামিড সম্পর্কেও বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- মানব সম্পদের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় সমূহ যথা জন্মহার, মৃত্যুহার ইত্যাদি সম্পর্কে সকলকে বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- কাম্য জনসংখ্যা ও জনসংখ্যার সমস্যা এবং পৃথিবীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যার প্রভাব সম্পর্কে সকলকে বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- সম্পদ সৃষ্টি ও ধ্বংসকারী হিসেবে মানুষের ভূমিকা কি তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

9.2 কৃষিকার্যের সংজ্ঞা (Definition of Agriculture)

কৃষিকার্যকে ইংরাজীতে বলে Agriculture. Latin শব্দ Ager- এর অর্থ ভূমি বা মৃত্তিকা ও Culture- এর অর্থ কর্ষণ বা মৃত্তিকা কর্ষণ। অর্থাৎ মৃত্তিকা বা ভূমিকর্ষণের ফলে যে ফসল উৎপাদন করা হয় তাই কৃষিকার্য। তবে মৃত্তিকা কেবলমাত্র উদ্ভিদ এবং ফসলই উৎপাদন করে না এর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীজগতের জন্ম ও বৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করে। তাই প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জিমারম্যান (Zimmerman) এর মতে "কৃষি হল একটি উৎপাদনশীল প্রয়াস যার মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী মানুষ স্বকীয় চাহিদা পূরণের জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের স্বাভাবিক বৃদ্ধি অব্যাহত রাখে এবং সম্ভব হলে তাকে ত্বরান্বিত ও উন্নত করে।"

সংজ্ঞা অনুসারে বর্তমানে ভূমি-কর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্ভিদের জন্ম, বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণ, মৎস্য চাষ, পশুপালন ও পশুজাত দ্রব্যাদি আহরণ ইত্যাদিও কৃষিকার্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পৃথিবীর প্রাপ্ত সর্বপ্রকার সম্পদ হতে কৃষি উৎপাদনকে পৃথিবীর সম্পদের প্রাথমিক ভিত্তি বলা চলে। কারণ কৃষি মানুষকে কেবলমাত্র খাদ্যের যোগানই দেয় না, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার বস্ত্র ও নানা শিল্পের কাঁচামাল ও সংগ্রহ করে এই কৃষিকার্য হতে। কৃষি মানুষকে প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ শিল্পকর্মে নিয়োজিত হতে সহায়তা করে। কৃষি দেয় কর্মসংস্থান, কোন কোন কৃষি সম্পদ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও সহায়তা করে থাকে। কৃষি সরকারি রাজস্বের মূল উৎস। কৃষির প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছে নানা শিল্প। তাই প্রাথমিক শিল্প হিসেবে কৃষির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

9.3 কৃষিকার্যের উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব (Influence of Geographical Conditions on Agriculture)

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির স্বাভাবিক কার্যকরী শক্তিকে অনেকাংশে প্রতিহত করতে পারলেও কৃষির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পৃথিবীর যে কোন অংশের কৃষিজ ফলন বা জমির বন্টন যোগ্যতা নির্ভর করে তার ভৌগোলিক পরিবেশের উপর। ভৌগোলিক পরিবেশকে তার কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে প্রধানত দুটি ভাগে ও আরও উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়।

সারণি :— কৃষিকার্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভৌগোলিক পরিবেশ সমূহ

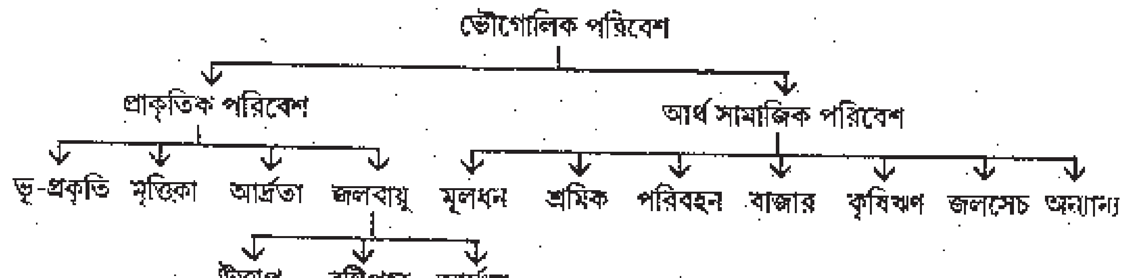

9.3.1 কৃষি কার্যের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব (Influence of Physical Environment on Agriculture)

প্রাকৃতিক উপাদান বলতে প্রকৃতি হতে প্রাপ্ত উপাদান সমূহ যথা জলবায়ু, মৃত্তিকা ও ভূপ্রকৃতি প্রধান।

- **জলবায়ু (Climate)** – কোন অঞ্চলের কৃষিকার্য সম্পূর্ণরূপে জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে কৃষির পার্থক্যে অন্যতম প্রধান কারণ জলবায়ু। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপাদন বিস্তার বা কৃষি পদ্ধতি সবই জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের প্রভাব কৃষির উপর সর্বাধিক।

- **উত্তাপ (Temperature)** – যে কোন প্রকার উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধির জন্য উত্তাপের প্রয়োজন হয়। উত্তাপ অর্থাৎ সূর্যকিরণ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ, বাষ্পমোচন এবং শ্বাসকার্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। উত্তাপ ভিন্ন ফসল উৎপাদিত হতে পারে না। তবে সর্বপ্রকার ফসল একই উত্তাপে জন্মাতে পারে না। এক এক প্রকার ফসলের জন্য এক এক প্রকার উত্তাপের প্রয়োজন হয়। উষ্ণতা আবার অক্ষরেখা অনুসারে তাপের পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার ফসল জন্মায়। উত্তর গোলার্ধে ৬০° উত্তর অক্ষাংশের ঊর্ধ্বে অত্যধিক শৈত্যের জন্য কোন কৃষিকাজ করা সম্ভব হয় না। পৃথিবীর যে সকল অঞ্চলের তাপমাত্রা অধিক সে সব অঞ্চলে ধান, পাট, চা, ইক্ষু, রবার ইত্যাদি ফসল জন্মায় আবার যেখানে তাপ মধ্যম রকমের সেখানে গম, যব, ভুট্টা, রাই, বীট, জোয়ার ইত্যাদি জন্মায়।

- **বৃষ্টিপাত (Rainfall)** – কৃষিকার্যের জন্য জলসরবরাহের প্রধান উৎস হল বৃষ্টিপাত, কারণ যে কোন উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাতের একান্ত প্রয়োজন। এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আবার ফসলের প্রকৃতি অনুসারে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। কোন কোন ফসল অধিক বৃষ্টিপাতে ভাল জন্মায় যেমন ধান, পাট, রবার, চা ইত্যাদি আবার গম, যব, জোয়ার, ভুট্টা ইত্যাদি কম বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলে ভাল জন্মায়।

- **আর্দ্রতা (Humidity)** – আর্দ্রতা ফসলের পুষ্টি ও বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই আর্দ্রতা নির্ভর করে বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যা বাষ্পীভবনের হারের প্রকৃতির উপর। উদ্ভিদের প্রস্বেদন প্রক্রিয়া আর্দ্রতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন ফসলের উৎপাদনও আর্দ্রতার প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। যেমন চা ও কফি উৎপাদনে আর্দ্রতার একান্ত প্রয়োজন হয়। আর্দ্র জলবায়ুতে কৃষির যেমন উন্নতি ঘটে শুষ্ক জলবায়ুতে আবার জলসেচ ব্যতীত কোন ফসল ফলান সম্ভব হয় না।

- **মৃত্তিকা (Soil)** – মৃত্তিকার উর্বরতা কৃষি উৎপাদনের একটি বিশেষ উপাদান। মৃত্তিকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও রাসায়নিক গুণাবলি ফসলের অঙ্কুরোদ্গম প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। মৃত্তিকার গ্রথন, গঠন, প্রবেশ্যতা ইত্যাদি গুণাবলির উপর মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তি অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই একথা সত্য যে উর্বর মৃত্তিকা কৃষিকার্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন। তবে এর সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে সকল প্রকার মৃত্তিকায় সব রকমের ফসল জন্মায় না। মৃত্তিকা ভেদে কৃষি উৎপাদনের পরিবর্তন ঘটায়। যেমন উর্বর পলি মৃত্তিকায় ধান, কৃষ্ণ মৃত্তিকায় তুলা, নাইট্রোজেন মিশ্রিত এঁটেল ও বেলে মাটিতে ভুট্টা ইত্যাদির চাষ সুবিধা ও লাভজনক।

- ভূ-প্রকৃতি (Topography) – কৃষির আর একটি অন্যতম প্রধান উপাদান হল ভূপ্রকৃতি। ভূমির অবস্থান, ঢাল, সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে উচ্চতার তারতম্য ইত্যাদির কারণে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার ফসল জন্মায়। তবে সাধারণভাবে প্রায় সমতল বা সমভূমি অঞ্চলগুলি কৃষিকার্যের জন্য বিশেষ উপযুক্ত তবে চা, কফি, রবার এগুলি উঁচু ও ঢালু পার্বত্য অঞ্চলে ভাল জন্মায়।

উপরে আলোচিত উপাদানগুলিতে একত্রে Physical frontiers of agriculture বলে। কারণ এই চারটি উপাদানের উপরই কৃষির প্রাকৃতিক পরিবেশ বহুলাংশে নির্ভরশীল।

9.3.2 কৃষির আর্থসামাজিক পরিবেশ (Cultural and Economic Conditions for the Growth of Agriculture)

প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের উপরও কৃষির সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। এসব উপাদানগুলি যথাক্রমে—

- **মূলধন (Capital)** – কোন কিছু উৎপাদনের জন্য মূলধনের প্রয়োজন। উন্নত ও লাভজনক কৃষি, মূলধন ব্যতীত সম্ভব হয় না। কৃষির বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, উন্নত মানের বীজ, সার, কীটনাশক, শ্রমিকের মজুরি ইত্যাদি সরবরাহ বজায় রাখতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই মূলধনের অভাব হলে কৃষির উন্নতি ব্যাহত হয়।

- **শ্রমিক (Labour)** – কৃষিকার্য একটি শ্রমনিবিড় অর্থনৈতিক কাজ। এই কাজে জমি চাষ হতে আরম্ভ করে বীজ বপন, রোয়া, কীটনাশক ব্যবহার হতে ফসল কাটাই, বাছাই, তোলা সর্বপ্রকার কাজে শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। তবে এই শ্রমের ব্যবহার কৃষির পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। যেমন শ্রম নিবিড় প্রগাঢ় কৃষির ক্ষেত্রে যেমন অধিক শ্রমিকের প্রয়োজন হয় আবার তেমনি বাণিজ্য ভিত্তিক কৃষিতে শ্রমিক অপেক্ষা যন্ত্র এবং শিক্ষিত দক্ষ শ্রমিকের অধিক প্রয়োজন হয়।

- **পরিবহন ও যোগাযোগ (Transport and Communication)** – কৃষিজাত পণ্যাদি কৃষি খামার হতে গোলাজাত করা বা উৎপাদন ক্ষেত্র হতে বাজার জাত করার জন্য উপযুক্ত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন।

- **বাজার (Market)** – কৃষিজ ফসলের চাহিদা নির্ভর করে বাজারের উপর। কোন ফসলের ব্যাপক চাহিদা না থাকলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। চাহিদার উপর নির্ভর করেই বিভিন্ন কৃষিজ ফসলের উৎপাদন করা হয়। বাজার কৃষি পণ্যের উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

- **কৃষিঋণ (Agricultural Loan)** – কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য বিভিন্নভাবে কৃষিকার্যের সহায়তা করার জন্য এই ঋণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। তবে এই সব প্রকল্প প্রধানত সরকারি ও কিছু বেসরকারি ভাবেই করা হয়ে থাকে। কৃষকের ফসল উৎপাদন ক্ষেত্রে যাতে কোন অভাব না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য বিভিন্ন পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয় এবং এর সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে এই কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করা হয়।

- **জলসেচ (Irrigation)** – কৃষির জন্য জলের প্রয়োজন। বৃষ্টি প্রকৃতি নির্ভর। তাই কৃষিতে জলের সরবরাহকে সতত বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন জলসেচের। যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম সেসব অঞ্চলেও জলসেচের সহায়তায় কৃষি উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রথায় বাঁধ দিয়ে, সেচখাল তৈরি করে কৃষি জমিতে জলসেচের দ্বারা বিভিন্ন ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে।

- **অন্যান্য উপাদান (Other factors for the Agricultural Growth)** – উপরে আলোচিত উপাদান ব্যতীত উন্নত মানের বীজ, সার, কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদির যেমন প্রয়োজন হয় তেমনি প্রয়োজন সরকারি সহায়তা, কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা এবং সমগ্র শিক্ষা পরিকাঠামোর সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন।

9.4 কৃষির শ্রেণী বিভাগ (Classification of Agriculture)

কৃষিকাজ পৃথিবীর অর্থনৈতিক কার্যকলাপের একটি অন্যতম অঙ্গ হলেও কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন, কৃষি পদ্ধতি বা কৃষি সংগঠন পৃথিবীর সর্বত্র একই প্রকার হয় না। জলবায়ু, মৃত্তিকা, ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদানগুলির তারতম্য অনুসারে বা আঞ্চলিক ও সামাজিক পরিবেশের ভিত্তিতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। তাই কৃষি পদ্ধতির বিভিন্নতা অনুসারে পৃথিবীর কৃষি ব্যবস্থাগুলিকে কতগুলি ভাগে ও উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়। সারণিতে এই বিভাগগুলি দেখান হল।

সারণি—10.3.1

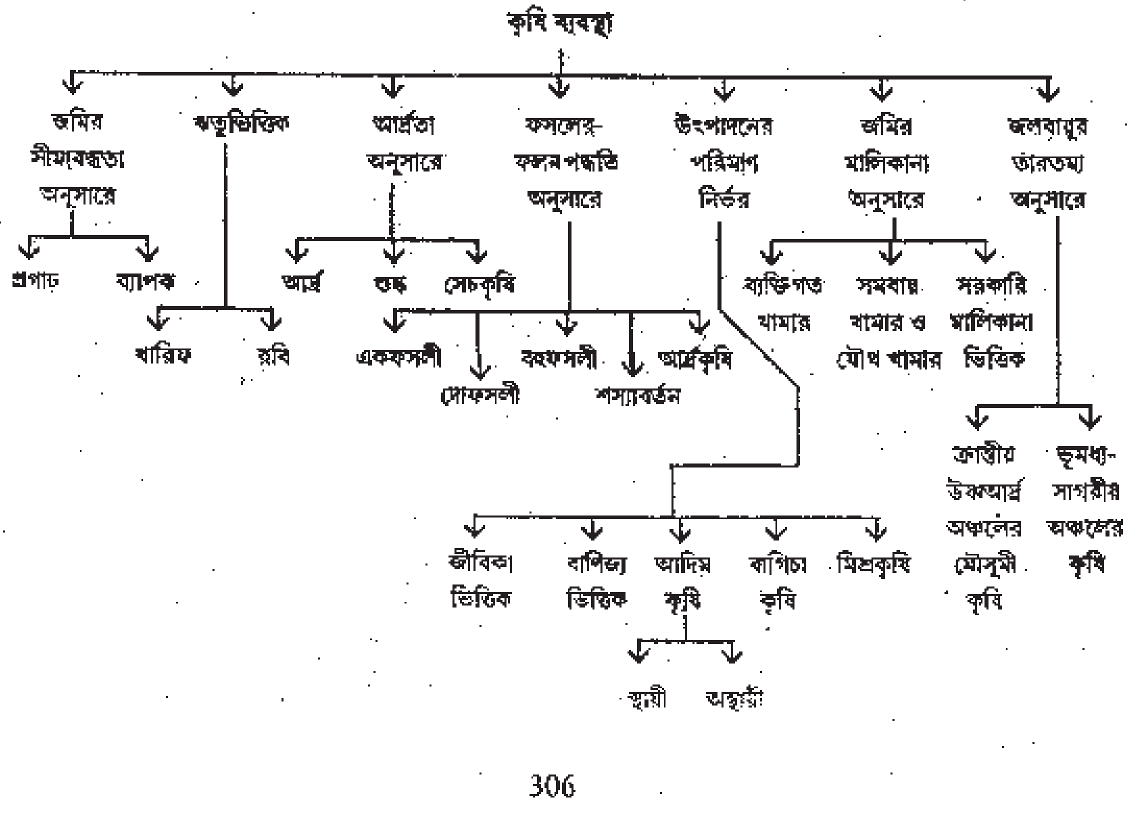

9.4.1 জমির সীমাবদ্ধতা অনুসারে

কৃষি জমির সীমাবদ্ধতার উপর নির্ভর করে কৃষি কাজকে দুভাগে ভাগ করা যায় — (১) প্রগাঢ় কৃষি (২) ব্যাপক বাণিজ্য ভিত্তিক কৃষি।

9.4.1.1 প্রগাঢ় কৃষি (Intensive Farming)

পৃথিবীর প্রাচীনতম জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থার মধ্যে প্রগাঢ় কৃষি একটি অন্যতম পন্থা, কমপক্ষে দশ হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। এই কৃষি ব্যবস্থার প্রাচীনতম রূপটি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মৌসুমী অঞ্চলে আর্দ্র ও নিবিড় পদ্ধতিতে করা ধান উৎপাদনের মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে। এই কৃষি ব্যবস্থাকেই জীবন সত্তা ভিত্তিক প্রগাঢ় বা নিবিড় কৃষিরূপে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

কৃষি সভ্যতা বিকাশে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অবদান প্রচুর, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধানত গাঙ্গেয় ও মেকং নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে Oriza Sativa প্রজাতির তৃণ ও কন্দ জাতীয় শস্যের মিলনে বর্তমান প্রজাতির ধানের উদ্ভব হয়। বর্তমানে এশিয়ায় বিভিন্ন দেশে মূলত মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে এই প্রগাঢ় চাষের ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

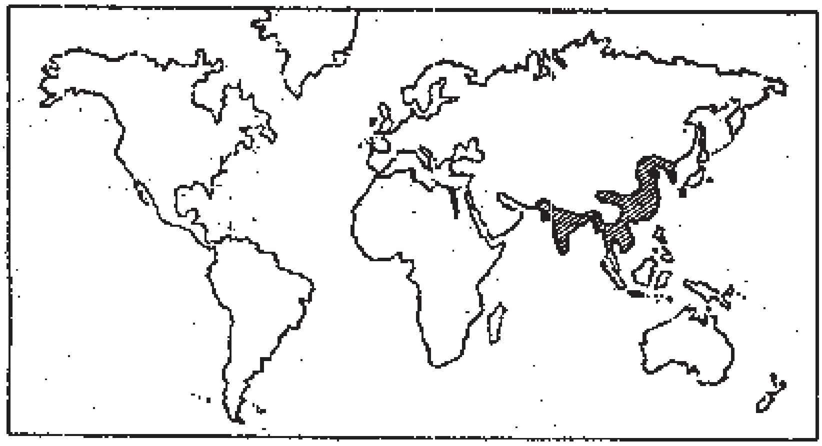

চিত্র ১—পৃথিবীর প্রগাঢ় কৃষি অঞ্চল

এই প্রগাঢ় চাষের ব্যবস্থায় সীমিত জমিতে প্রচুর শ্রমের বিনিময়ে চাষ আবাদ করতে দেখা যায়। এই চাষ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

- এই কৃষির ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগের ফলে এই কৃষিতে ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলির আকার খুবই ছোট হয়। যেমন ভারতে গড় কৃষির আয়তন 0.5 হেক্টর। এই ধরনের ক্ষুদ্রায়তন কৃষি জমি অর্থনৈতিক দিক থেকে কৃষি উন্নতির সহায়ক হয় না।

- জমির আয়তন ছোট হবার জন্য ঐ কৃষি পদ্ধতিতে যন্ত্রের ব্যবহার খুবই অসুবিধাজনক হয়ে থাকে। কৃষকদের দারিদ্রতা, মূলধনের অভাব ও কৃষিক্ষেত্রগুলির বিচ্ছিন্ন অবস্থান কৃষিযন্ত্রীকরণের পথে এক বিরাট বাধা।

- জমির তুলনায় জনবসতি ও জনঘনত্ব বেশি।

- জনসংখ্যার আধিক্যের ফলে কৃষিতে শ্রমিক ও শ্রমের যোগান বেশি।

- নিবিড় জনসত্তা ভিত্তিক কৃষিতে একফসলী প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলেও একই জমিতে বছরে একাধিক চাষ করা হয়।

- উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এরূপ কৃষি ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংগঠিত হয় না। তবে উন্নত দেশগুলিতে সমবায় প্রথায় চাষ এখন বহুল প্রচলিত।

- যন্ত্রপাতির মতই উন্নত বীজ, উপযুক্ত সার, কীটনাশক ও ছত্রাক নাশকের ব্যবহারও কৃষিতে কম। তবে বর্তমানে ভারত, জাপান ও চিন দেশে চাষের ক্ষেত্রে এসবের ব্যবহার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

- এরূপ কৃষিতে বৃষ্টির জলের উপরই সমগ্র চাষ ব্যবস্থা নির্ভরশীল তবে বর্তমানে কিছু কিছু সেচ ব্যবস্থার প্রচলন ঘটেছে।

- ধান এরূপ কৃষির প্রধান কৃষিজাত পণ্য।

- কৃষি পণ্যের উৎপাদন সামগ্রিকভাবে বেশি হলেও মাথা পিছু ফসলের পরিমাণ কম এবং উদ্‌বৃত্তের পরিমাণও কম হয়।

9.4.1.2 ব্যাপক কৃষি (Extensive Farming)

আধুনিক কৃষি যন্ত্রের সাহায্যে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে যে কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে তাই ব্যাপক কৃষি ব্যবস্থা বলে পরিচিত। এরূপ কৃষিতে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন জমিতে স্বল্প সংখ্যক শ্রমিকের সহায়তায় প্রযুক্তি ভিত্তিক ফসলের চাষ প্রথা প্রচলিত রয়েছে। অর্থাৎ একর প্রতি স্বল্প শ্রমিক ও মূলধন প্রয়োগ ও কৃষির যান্ত্রিকরণ এই কৃষি ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এরূপ বাণিজ্যিক কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, যখন শিল্প বিপ্লবের ফলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে সেই সময়। শিল্প বিপ্লবের পর এই বিশেষ কৃষি ব্যবস্থা মানব সমাজের কাছে এক বিশেষ আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে। অন্য কোন কৃষি পদ্ধতিতে যন্ত্রপাতির এত ব্যাপক ও নিবিড় ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না।

এরূপ কৃষি ব্যবস্থা মূলত তিন ধরনের—

(ক) ব্যাপক কৃষি (Extensive farming) — একাধিক ফসল চাষ ও অধিক জমিতে তার চাষ করা।

(খ) নিবিড় কৃষি পদ্ধতি (Intensive farming) — হেক্টর প্রতি জমিতে অধিক ফসল ফলান এবং অধিক ফলনশীল বীজ, সার ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগ।

(ক) মিশ্র কৃষি পদ্ধতি (Mixed farming) — একাধিক ফসল চাষ করা ও সঙ্গে সঙ্গে মাংস ও দুধের জন্য পশুপালন করা।

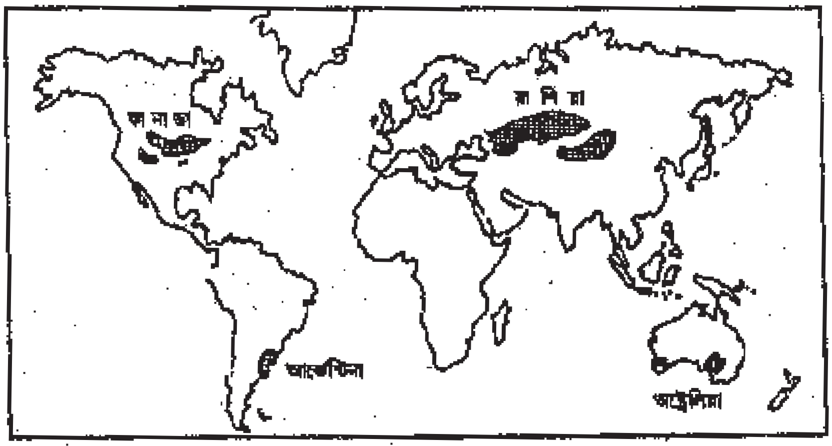

চিত্র ২—পৃথিবীর ব্যাপক কৃষি অঞ্চল সমূহ।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং রাশিয়ার নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ও ব্যাপক আকারে নানাবিধ শস্যের চাষ দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করে এবং শস্যগুলির মধ্যে প্রধান বাণিজ্যিক ফসল হিসেবে গমের চাষ করা হয়। এরূপ চাষের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল।

- কৃষি জমির আয়তন বিশাল হয় এবং বড় কৃষি জমিতে বড় ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুবিধাও বেশি।
- এরূপ কৃষি অঞ্চলগুলিতে জনসংখ্যা কম বলে কৃষি শ্রমিক সুলভ নয়। জমি কর্ষণ হতে শস্য কাটা, এমন কি ফসল মাড়াই, ঝাড়া, বাছাই করা ইত্যাদি সমস্ত কাজ — Combine Harvester নামে যন্ত্রের সাহায্যে করা হয়। এর জন্য প্রচুর মূলধনের বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়।
- ভৌগোলিক পরিবেশ অনুসারে ফসলের চাষ নির্বাচন করা হয়। যেমন নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত সামান্য ও অনিশ্চিত এবং ফসল উৎপাদন সময় সংক্ষিপ্ত বলে প্রত্যেক বছর একটি জমি থেকে একটি মাত্র ফসল পাওয়া যায়।
- বাণিজ্যিক ফসল হিসাবে গম চাষই প্রধান তবে প্রেইরী ও স্তেপ অঞ্চলে খাদ্য শস্য হিসাবে যব, রাই, ভুট্টা ও তৈলবীজ হিসাবে সয়াবিনের চাষ করা হয়।
- কৃষিকাজের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব থাকলেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফসলের উৎপাদন ও ফলনের হারকে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।

- হেক্টর প্রতি উৎপাদন কম হলেও কৃষি শ্রমিক প্রতি উৎপাদন বেশি। জনসংখ্যা কম বলে উদবৃত্তের পরিমাণ বেশি হয় তাই এই বাৎসরিক গম উৎপাদক অঞ্চলগুলিকে পৃথিবীর শস্য ভাণ্ডার বলা হয়।
- কৃষিজমির মালিকরাই প্রধান কৃষক তবে ফসল তোলার সময় কিছু শ্রমিকের যোগানের প্রয়োজন ঘটে।
- উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করার জন্যও আধুনিক ও দক্ষ পরিবহন ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।
- এরূপ কৃষি ব্যবস্থা আধুনিক লাভজনক অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে স্বীকৃত।
- এরূপ কৃষিক্ষেত্রে ফসল উৎপাদনের পরিমাণ ও কৃষিপণ্যের উৎপাদন জলবায়ুর অনুকূল এবং আন্তর্জাতিক বাজারে শস্যের মূল্যের উপর নির্ভরশীল।

9.4.2 ঋতু ভিত্তিক কৃষি

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ফসল জন্মাবার একটা প্রবণতা দেখা যায়। যেমন বর্ষাকালে মে-জুন মাস নাগাদ একটা চাষ শুরু হয় আবার তেমনি শীতকালে অক্টোবর-নভেম্বর মাস নাগাদ অন্য একটি চাষ শুরু হয়। এই ভাবে বৎসরের ঋতুনির্ভর যে চাষ হয় তাকে ঋতুভিত্তিক চাষ বলে।

ঋতুনির্ভর চাষ প্রধানত দু প্রকার—

(১) খারিফ চাষ (২) রবিচাষ

9.4.2.1 খারিফ চাষ (Kharif Crop Cultivation)

বর্ষার শুরুতে অর্থাৎ মে-জুন মাসে ফসলের চাষ শুরু হয় — ও শীতের প্রারম্ভে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে যে শস্য কাটা হয় সেই সব চাষকে খারিফ চাষ বলে। ধান, পাট ইত্যাদি খারিফ শস্য। খারিফ শস্য ধানের ক্ষেত্রে আমন নামেও চিহ্নিত করা হয়। ভারতে খারিফ শস্যের ফলনই সর্বাধিক।

9.4.2.2 রবি শস্য (Rabi Crop Cultivation)

বর্ষার শেষে প্রধানত শীত ঋতুতে ভারতে যে সব ফসলের চাষ হয় এবং বসন্তকালে যে সব ফসল কাটা হয় সেই সব ফসলকে রবিশস্য বলা হয়। গম, যব, ইক্ষু, ডাল, তৈলবীজ, ইত্যাদি রবিশস্যের মধ্যে প্রধান। এই ফসলগুলি অল্প বৃষ্টিপাত বা সেচ এবং অধিক পরিমাণে সূর্যালোক দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। তাই এগুলিকে রবিশস্য বলে।

9.5 আর্দ্রতা অনুসারে চাষ (Agriculture based on Humidity)

আবহাওয়াতে আর্দ্রতার পরিমাণ অর্থাৎ জলকণার পরিমাণের উপর নির্ভর করেও বিভিন্নস্থানে কৃষি পদ্ধতির পার্থক্য হয়ে থাকে। এখানে আর্দ্রতার পরিমাণ বলতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণকে বোঝান হয়েছে। কৃষিকার্য প্রধানত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর। বৃষ্টিপাত যেখানে কম হয় সেইসব অঞ্চলে কৃষিকাজ জলসেচের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। এরূপ আর্দ্রতা নির্ভর কৃষিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলি যথাক্রমে (১) আর্দ্র কৃষি (২) সেচন কৃষি (৩) শুষ্ক কৃষি।

9.5.1 আর্দ্র কৃষি (Humid Farming)

এরূপ কৃষি ব্যবস্থার ফসলের উৎপাদন প্রধানত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল যে সমস্ত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অধিক হয় সে সমস্ত অঞ্চলের মাটি আর্দ্র থাকে এবং কৃষিকার্যের জন্য জলসেচের প্রয়োজন হয় না। এই কৃষি প্রথাকে আর্দ্র কৃষি ব্যবস্থা বলে। এরূপ ক্ষেত্রে বৃষ্টি আরম্ভের পূর্বেই কৃষক জমি তৈরি করে রাখে এবং বৃষ্টি শুরু হলেই জমিতে বীজ বপন আরম্ভ হয়। ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু প্রভাবিত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলে এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলে এরূপ কৃষি ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। এই কৃষির প্রধান ফসল হল—ধান, পাট, আখ, চা ইত্যাদি।

9.5.2 সেচন কৃষি (Irrigation Farming)

যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম বা অনিয়মিত সে সকল অঞ্চলে কৃষিকার্যের জন্য জলসেচের প্রয়োজন হয়। এসব ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাত ঋতুভিত্তিক কিন্তু যথেষ্ট নয় বলে কৃষিকাজ জলসেচ ব্যাতিত সম্ভব হয় না তাই এই সব কৃষিজ উৎপাদনকে সেচন কৃষি বলে। সাধারণত ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলের নদী তীরবর্তী এলাকায় সেচন কৃষির প্রচলন অধিক দেখা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে কূপ, নলকূপ, খাল, বিল ইত্যাদি হতে জলসেচ করা হয় এবং কৃষি সেচ নির্ভর বলে সারা বছর একই জমিতে একাধিক শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়। ভারতের পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু অঞ্চলে এই কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়।

9.5.3 শুষ্ক কৃষি (Dry Farming)

পৃথিবীর যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত খুবই কম এবং জলসেচেরও কোন সুব্যবস্থা থাকে না সে সব অঞ্চলে যে কৃষি ব্যবস্থা প্রচলিত তাকে শুষ্ক কৃষি বলে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রথমে জমি গভীর ভাবে চাষ করা হয় এবং মাটির গভীর অংশে বীজ পোঁতা হয়। গভীর অংশের মাটি তুলনামূলক ভাবে আর্দ্র থাকে এবং ঐ ভেজা

মাটিতে বীজ বপন করা হয় বলে অঙ্কুরোদগমে বিশেষ অসুবিধা হয় না। প্রধানত অনিয়মিত ও স্বল্প বৃষ্টিপাত যুক্ত শুষ্ক মালভূমি অঞ্চলের বেলে দোআঁশ মাটি শুষ্ক কৃষির পক্ষে উপযুক্ত। এখানে এমন ফসলের চাষ করা হয় যা খরাকে সহ্য করে বেঁচে থাকতে পারে। এরূপ কৃষির প্রধান ফসলগুলি হল ভুট্টা, বাজরা, জোয়ার প্রভৃতি। এছাড়া গম এবং তুলা ও এরূপ কৃষিতে উৎপাদন করা হয়ে থাকে। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে এরূপ কৃষির প্রচলন রয়েছে।

9.6 ফসল ফলানোর পদ্ধতির তারতম্য অনুসারে (Agriculture according to Cropping Methods)

ফসল ফলানো পদ্ধতি অনুসারে অর্থাৎ জমিতে ফসল একবার ফসল হবে না দুবার ফলান হবে না বহুবার ফলান হবে তার উপর নির্ভর করে কৃষি পদ্ধতিকে ৫টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলি যথাক্রমে (১) একফসলী কৃষি (২) দো-ফসলী কৃষি (৩) বহু ফসলী কৃষি (৪) আন্ত কৃষি এবং (৫) শস্যাবর্তন।

- **একফসলী কৃষি (Single Crop Cultivation or Mono-Culture)**

যে কোন একটি কৃষিক্ষেত্র হতে বছরে একটি মাত্র ফসল উৎপাদনের ভিত্তিতে যে চাষ করা হয় তাকে একফসলী কৃষি বলে। ভারত বাংলাদেশ বা শ্রীলঙ্কার চা উৎপাদন, কিউবার ইক্ষু উৎপাদন, মালয়েশিয়ার রবার উৎপাদন এরূপ কৃষির বিশিষ্ট উদাহরণ। তবে অনেক ভূগোলবিদরা যে কৃষি ব্যবস্থায় জমিতে বছরে একবার চাষ করা হয় তাকেও একফসলী কৃষি বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। এরূপ কৃষি ব্যবস্থায় যাযাবরী কৃষি বা ঝুমচাষকে বা আর্দ্র অঞ্চলে যে সব জমিতে বছরে একবার মাত্র ফসল ফলান সম্ভব সেই সব কৃষি ব্যবস্থাকেই নির্দেশ করে।

- **দো-ফসলী কৃষি (Double Crop Cultivation or Duo-Culture)**

পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে অনুকূল পরিবেশের প্রভাবে ঋতু অনুসারে একই জমিতে বছরে দুবার দুটি ভিন্ন ভিন্ন ফসল চাষ করা হয় তাকে দো-ফসলী কৃষি বলে। ভারত, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্ষাকালে খারিফ ও শীতের রবি চাষকে দো-ফসলী কৃষির উদাহরণ বলা চলে।

- **বহুফসলী কৃষি ব্যবস্থা (Multiple Crop Cultivation or Oligo-Culture)**

যে সব জমিতে বিভিন্ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় বৃষ্টি ব্যতীত অন্যান্য সেচের সহায়তায় বছরের দুবারের বেশি ফসল উৎপাদন করা হয় তাকে বহুফসলী কৃষি ব্যবস্থা বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উচ্চ-ফলনশীল বীজের ও সেচের সহায়তায় একই জমিতে তিনবার ধানের চাষ করা সম্ভব হয়েছে।

- **আন্তঃ কৃষি (Inter-Culture)**

পৃথিবীর বিভিন্ন কৃষিক্ষেত্রে বিশেষত যে সকল অঞ্চলে কৃষির জন্য জমির পরিমাণ খুবই কম সে সব অঞ্চলে একই জমিতে বিভিন্ন সারিতে দু-তিন রকমের শস্য চাষ করা হয় তাকে আন্তঃ কৃষি বলে। এরূপ

কৃষি ব্যবস্থার ফলে একই জমি হতে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফসল উৎপন্ন করা সম্ভব হয়। জাপান, চিনে, পূর্ব জার্মান, নেদারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে এরূপ কৃষি পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে।

- **শস্যাবর্তন (Crop-Rotation Farming)**

মিশ্র কৃষি ব্যবস্থায় একই জমি হতে একসঙ্গে শস্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে পশুপালনও করা হয়ে থাকে। একদিকে একই জমি হতে খাদ্যশস্য উৎপাদন অন্যদিকে পশুখাদ্য উৎপাদন করা হয়। এইভাবে কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে সারা বছর ধরেই জমিতে যে চাষ হয় সেই পদ্ধতিকে শস্যাবর্তন বলে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে একই জমি হতে বার বার একই ফসল উৎপাদন করার ফলে জমির উর্বরতা শক্তি কমে যায় তখন সার প্রয়োগ ব্যাতিত ঐ একই জমিতে বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করে জমির উর্বরতা শক্তিকে বজায় রাখা সম্ভব হয়। এরূপ কৃষি ব্যবস্থাকেও শস্যাবর্তন বলা হয়ে থাকে।

9.7 উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে (Agriculture Based on Volume of Production)

কৃষিজ উৎপাদনের পরিমানের উপর নির্ভর করে কৃষিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি প্রধানত (১) জীবিকাভিত্তিক কৃষি (২) বাণিজ্যিক কৃষি (৩) আদিম কৃষি --- (৩.১) স্থায়ী ও (৩.২) অস্থায়ী (৪) বাগিচা কৃষি (৫) মিশ্র কৃষি।

9.7.1 জীবিকাভিত্তিক কৃষি (Subsistence Agriculture)

এরূপ কৃষি ব্যবস্থায় কৃষকেরা নিজেদের প্রয়োজনীয় ফসল উৎপাদনের জন্য অনেক সময় বনভূমি পরিষ্কার করে চাষ আবাদ করে। এরূপ কৃষি প্রধানত ক্রান্তীয় অনুন্নত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। এরূপ কৃষিতে কোন স্থানে কয়েক বৎসর কৃষিজ উৎপাদনের ফলে মৃত্তিকার ফলন ক্ষমতা কমে গেলে ঐ জমি পরিত্যাগ করে আবার নূতন জমি বেছে নেয়। এই ধরনের চাষ উত্তর পূর্ব ভারতে "ঝুম চাষ" (Jhum Cultivation) বলে পরিচিত—

এরূপ চাষের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—

- ভ্রাম্যমাণ কৃষি সম্প্রদায়
- কৃষিজ পদ্ধতি অতি পুরাতন। লাঙল, কোদাল, কাস্তে, নিড়ানি ইত্যাদি যন্ত্রই কৃষির প্রধান হাতিয়ার।
- উৎপন্ন ফসলের মধ্যে ধান, ভুট্টা, বাজরা, বিভিন্ন প্রকার ডাল সব্জি ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য শস্যই প্রধান।
- বর্ষার জলের সহায়তায় চাষ হয়। বৃষ্টি না হলে চাষের ক্ষতি হয়।

- অবৈজ্ঞানিক প্রথায় বনভূমি ধ্বংস করার ফলে জমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয় এবং বনভূমি সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটে।
- এরূপ কৃষিতে কোন উদবৃত্ত থাকে না বলে ফসলের ফলনে কমতি হলে খাদ্যের অভাব দেখা দেয়।

এরূপ চাষ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত।[১]

- ঝুম চাষ — উত্তরপূর্ব ভারত ও বাংলাদেশ
- চেপ — শ্রীলঙ্কা
- লুমা — ইন্দোনেশিয়া
- তামরাই — থাইল্যান্ড
- রোকা — ব্রাজিল
- মিলপা — মধ্য আমেরিকা

9.7.2 বাণিজ্যিক কৃষি (Commercial Farming)

যে কৃষি ব্যবস্থায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে করা হয় তাকে বাণিজ্যিক কৃষি ব্যবস্থা বলা হয়। এরূপ কৃষি ব্যবস্থায় কৃষক নিজের প্রয়োজন ব্যতীত অপরের চাহিদা পূরণের স্বার্থে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন জমিতে প্রধানত প্রযুক্তির সহায়তায় এই কৃষি ব্যবস্থা পরিচালনা করে। এরূপ কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- জনসংখ্যার তুলনায় জমির পরিমাণ অনেক বেশি।
- মাথা পিছু জমির পরিমাণ অধিক বলে মাথা পিছু ফলন বেশি কিন্তু একর প্রতি উৎপাদন কম।
- প্রচুর পরিমাণে যন্ত্রের ব্যবহার হয়ে থাকে।
- শ্রমিকের স্বল্পতার দরুন কৃষি ক্ষেত্রে মজুরির অনুপাত অনেক বেশি।
- কৃষিতে মূলধনের বিনিয়োগের পরিমাণও অনেক বেশি।
- উন্নত মানের বীজ, সার ও কীটনাশকের প্রয়োগ ও সেচ ব্যবস্থার প্রচলনের ফলে কৃষিতে অনিশ্চতার পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে কম—
- উন্নত কৃষি ব্যবস্থার প্রচলনের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত।
- কৃষিজ পণ্যের বাজারজাত করার সবরকম সুবিধা।
- এরূপ কৃষির প্রধান ফসল গম।

১। অজিতকুমার শীল — "সম্পদ সমীক্ষা" ১৭৪ পাতা

9.7.3 আদিম কৃষি (Primitive Agriculture)

আদিম কৃষিতে মানুষ পাহাড়ী বা মালভূমি অঞ্চলে অতি প্রাচীন প্রথায় স্থানীয় বা নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীবদ্ধ লোকেদের চাহিদা মেটাবার জন্য চাষ আবাদ করে থাকে। এই কৃষি ব্যবস্থা প্রধানত— বৃষ্টি নির্ভর এবং পশুশক্তি ও পেশীশক্তিই প্রধান। এই কৃষিকে আবার তার স্থায়িত্বের ভিত্তিতে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়।

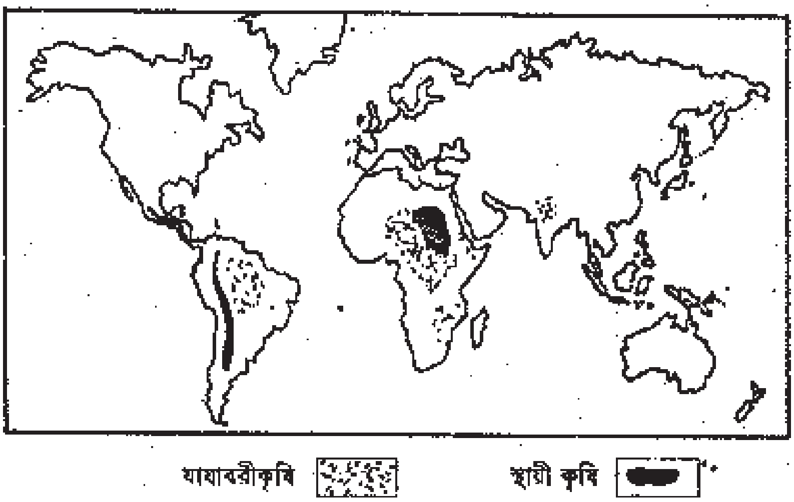

চিত্র ৩— আদিম কৃষি ব্যবস্থা যুক্ত অঞ্চল সমূহ।

- **স্থায়ী কৃষি (Permanent Agriculture)** — স্থায়ী কৃষির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত শ্রেণীর মানুষ কোন এক বিশেষ স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে এবং ঐ বসত অঞ্চলের পার্শ্বস্থ জমিগুলিকে পরিষ্কার করে নিজেদের কৃষি কাজে ব্যবহার করে। এখানে জমির সার হিসেবে জমির সবুজ জংলি গাছ ও ঘাসকেই ব্যবহার করা হয়। ঐগুলি কেটে জমিতে পুড়িয়ে তা সার হিসেবে ব্যবহার করে। অতি প্রাচীন প্রথায় কয়েকটি প্রাচীন যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষ করে। অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমিতে স্থানীয় প্রয়োজনেই চাষ করে। ধান ও কিছু দানা শস্যই প্রধান।

- **যাযাবরী স্থানান্তর কৃষি (Nomadic or Shifting Cultivation)** — এরূপ কৃষিতে ঝুম প্রথায় চাষ করা হয়। জল ও খাদ্যের সন্ধানে পশুচারণ বৃত্তিও গ্রহণ করে থাকে। তবে বর্তমানে স্থায়ী কৃষি ব্যবস্থা ও বিভিন্ন উন্নত কৃষি ব্যবস্থার প্রভাবে এই কৃষি ব্যবস্থাকে অনেকাংশে সীমিত করেছে।

9.7.4 বাগিচা কৃষি (Plantation Agriculture)

এরূপ কৃষি ব্যবস্থায় বড় বড় বাগান নির্মাণ করে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে যে কৃষিকাজ করা হয় তাকে বাগিচা কৃষি বলে। একদা পূর্ব-ইউরোপীয় মূলধন ও দেশীয় শ্রমিকের সহায়তায় পরিচালিত কৃষি ব্যবস্থা হল বাগিচা কৃষি।

এই কৃষি পদ্ধতি এক আধুনিক বৃহৎ আকারের এবং বিভিন্ন প্রকারের বাণিজ্যিক কৃষি প্রনালী। ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের ব্যাপক প্রসার এবং নাতিশীতোষ্ণ দেশগুলিতে উষ্ণমণ্ডলীর বিভিন্ন পণ্য যেমন চা, কফি, রবার, ইক্ষু, তামাক ইত্যাদির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ব্রিটিশ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও পর্তুগীজ প্রভৃতি উপনিবেশিক শক্তিগুলি তাদের ঔপনিবেশগুলিতে বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের জন্য বৃহৎ বৃহৎ বাগিচায় ঐ ফসলগুলির উৎপাদন শুরু করে। জিমারম্যানের মতে "বাগিচা পণ্যের চাষে কৃষি ও শিল্পের অদ্ভুত সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়"।

উৎসভেদে বাগিচা ফসলকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—

(১)	পাতা থেকে প্রস্তুত	—	চা, তামাক
(২)	বীজ থেকে প্রস্তুত	—	কফি, নারকেল
(৩)	কাণ্ড থেকে প্রস্তুত	—	ইক্ষু
(৪)	ফল হিসেবে দেখা যায়	—	আনারস, কলা
(৫)	গাছের রস থেকে প্রস্তুত	—	রবার

বাগিচা কৃষি পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে কৃষিকার্যে একটি মাত্র ফসল উৎপাদনে মনোনিবেশ ঘটে। যেমন চা, কফি, রবার ইত্যাদি।

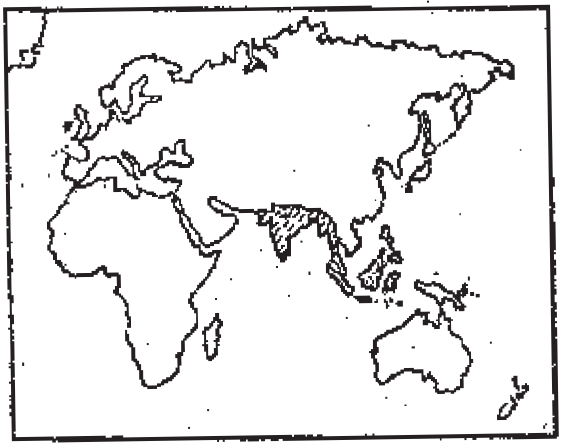

চিত্র ৪— পৃথিবীর বাগিচা কৃষি অঞ্চল সমূহ।

- বাগিচা কৃষির প্রাথমিক পর্বে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। সেই কারণে দেখা যায় পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির ধনী ব্যক্তিরাই এই ধরনের কৃষি ব্যবস্থাগুলি গড়ে তুলেছে। বর্তমানে দেশী ধনীরাও এই ধরনের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত।
- এই কৃষি ব্যবস্থায় প্রথমদিকে বিদেশ থেকে প্রযুক্তিবিদ, চাষের যন্ত্রপাতি, সার, ঔষধপত্র ইত্যাদি আনতে হলেও বর্তমানে দেশীয় প্রযুক্তির সহায়তায় এই শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছে।

- মানুষের শ্রম বাগিচা কৃষির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বৃক্ষরোপণ, পরিচর্যা, ফসলতোলা ও বাজারজাত করা সমস্ত ক্ষেত্রেই মানুষের শ্রমের প্রয়োজন হয়।

- বাগিচা কৃষিতে যে সব ফসলের চাষ হয় তার অধিকাংশই বাগিচা থেকে সাধারণত শিল্পজাত দ্রব্যরূপে এবং ব্যবহারযোগ্য হয়েই বাজারে আসে। তাই এই কৃষিজাত দ্রব্যকে বাগিচা শিল্পজাত দ্রব্য বলে।

- এই কৃষি ব্যবস্থার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র, শ্রমিক শ্রেণী ও তাদের পরিবার কেন্দ্রিয় কার্যালয় এবং পণ্য বাজারজাত করার জন্য কারখানা নিয়ে একটি সুষ্ঠ সাংগঠনিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

- বাগিচা পণ্যের মূল্য বিদেশের বাজারে মূল্যের ওঠানামার উপর নির্ভর করে বলে উৎপাদন ও রপ্তানী এবং চাহিদার মধ্যে সাম্যতা রক্ষার জন্য বিভিন্ন উৎপাদক দেশের সরকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন করে থাকেন।

9.7.5 মিশ্র কৃষি (Mixed Farming)

মিশ্র কৃষি হল এক প্রকার বাণিজ্যিক কৃষি যাতে একই কৃষিক্ষেত্রে ফসল উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে পশুপালন করা হয়। এই কৃষির একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা হল যে যদি কোন এক বছর জমিতে কৃষিজ ফসল উৎপাদন কম বা বিঘ্নিত হয় তবে কৃষকেরা পশুপালনের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে থাকে।

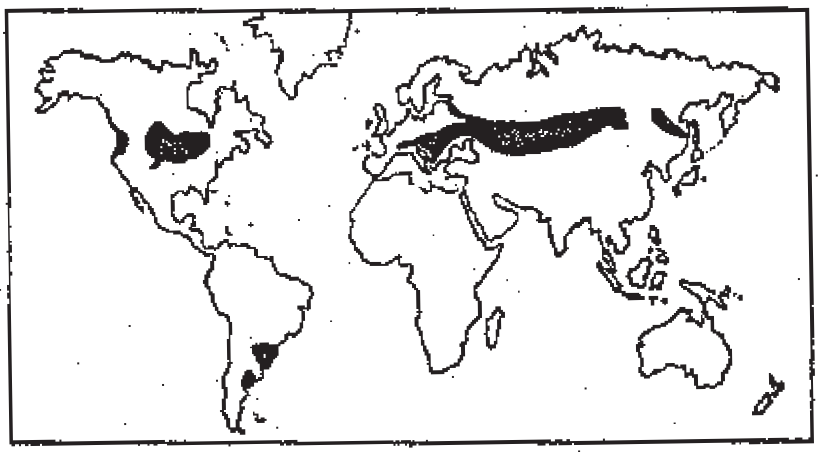

চিত্র ৫ — পৃথিবীর মিশ্র কৃষি অঞ্চল সমূহ।

এই কৃষি ব্যবস্থা সাধারণত নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে গড়ে উঠতে দেখা যায়। এই কৃষি ব্যবস্থায় কতটা জমি ফসল উৎপাদনে এবং কতটা জমি পশুপালনের নিয়োজিত হবে তা নির্ভর করে—

- কৃষি ক্ষেত্রের অবস্থান
- মৃত্তিকার উর্বরতা

- কৃষিক্ষেত্রটির পশুপালনের ক্ষমতা।
- বাজারের চাহিদা
- কৃষিফলন ও পশুজাত দ্রব্যের তুলনামূলক মূল্য এবং সর্বোপরি সরকারি নীতি

মিশ্র কৃষি ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

- মিশ্র কৃষি ব্যবস্থায় জমির পরিমাণ নির্ভর করে সেই অঞ্চলের লোকবসতির ঘনত্ব ও চাহিদার উপর। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার জোতগুলির আয়তন উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের জোতগুলি অপেক্ষা বৃহৎ।
- মিশ্র কৃষি ব্যবস্থা শস্যাবর্তন এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। জমির উর্বরতা বজায় রাখার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- খামারের জমির অধিকাংশই শস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং অল্প পরিমাণ জমিতে স্বাভাবিক উদ্ভিদ বা তৃণ ইত্যাদি জন্মায়।
- এরূপ কৃষিতে প্রচুর জৈব সার ব্যবহার করা সম্ভব কারণ পশু পালনের সুবিধা থাকায় জৈব সার সহজে পাওয়া যায় এবং শস্যাবর্তন প্রক্রিয়ার ফলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।
- কৃষি প্রযুক্তির বহুল ব্যবহার এই সব জোতগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। প্রধানত আমেরিকার বৃহৎ খামারগুলিতে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত ভারি যন্ত্রপাতির প্রচুর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।
- বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করা হয় বলে কৃষি শ্রমিকের চাহিদা সারা বছর বজায় থাকে।

9.8 জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে কৃষির বিভাগ (Agriculture on the Basis of Climate)

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু দেখতে পাওয়া যায়। এবং এই জলবায়ুকে ভিত্তি করে কৃষিকার্যের মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যের ভিত্তিতে কৃষিকার্যকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। একটি ক্রান্তীয় উষ্ণ আর্দ্র অঞ্চলের কৃষি ও অন্যটি ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু-অঞ্চলের কৃষি। একটি অঞ্চলের বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালে অন্য অঞ্চলের শীতকালে। এইভাবে বৃষ্টিপাতের বৈষম্য কৃষিতেও বৈষম্যের সৃষ্টি করে।

9.8.1 ক্রান্তীয় উষ্ণ-আর্দ্র-অঞ্চলের কৃষি (Tropical Farming)

উষ্ণ ক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশগুলিতে যেখানে বৃষ্টিপাত প্রধানত ঋতু-ভিত্তিক এবং বৃষ্টিপাত মুখ্যত বর্ষাকালেই হয়ে থাকে। এশিয়ার দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে যেখানে মৌসুমী জলবায়ুর প্রভাব অধিক সেই সব অঞ্চলে

এই প্রকার কৃষির আধিক্য দেখা যায় বলে এই প্রকার কৃষিকে মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের কৃষিও (Monsoonal Agriculture) বলে। সমগ্র পৃথিবীর প্রায় তিনভাগের দুভাগ লোক এরূপ কৃষির উপর নির্ভরশীল। ভারত, বাংলাদেশ, মায়ানমার, নেপাল, ভুটান, ভিয়েতনাম, মিশর, সুদান, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে এরূপ কৃষির প্রচলন প্রাধান্য লাভ করেছে।

এরূপ কৃষির ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাত প্রধানত জুন হতে সেপ্টেম্বর মাসে হয় এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০-২০০ সেঃ মিঃ। গড়ে তামাত্রা ১৫°—৩৫° সেঃ-এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এখানে খারিফ ও রবি উভয় প্রকার ফসলের আধিক্য দেখা যায়। খারিফ ফসল প্রধানত বৃষ্টি নির্ভর এবং রবি কৃষি প্রধানত সেচ নির্ভর। এরূপ কৃষিতে প্রধানত জীবিকা নির্বাহের উপর ভিত্তি করে করা হয় বলে একে জীবিকা সত্তা ভিত্তিক কৃষিও বলা হয়।

এই অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

- কৃষি জমির পরিমাণ ছোট এবং জনসংখ্যার পরিমাণ অধিক।

(অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের জন্য 9.3.1.1 দ্রষ্টব্য)

9.8.2 ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের কৃষি (Mediterranean Agriculture)

ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে এক বিশেষ ধরনের জলবায়ু দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রকার জলবায়ুকে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু বলে। নিরক্ষরেখার ৩০°—৪৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে প্রধানত পশ্চিমাংশে এই অঞ্চলগুলি অবস্থিত। এই অঞ্চলগুলি হল ইউরোপের পর্তুগাল, স্পেন, দক্ষিণ ফ্রান্স, ইতালি, যুগোশ্লাভিয়া, আফ্রিকার আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া, মরক্কো প্রভৃতি অঞ্চল। এ ছাড়াও ভূমধ্যসাগরের দূরবর্তী

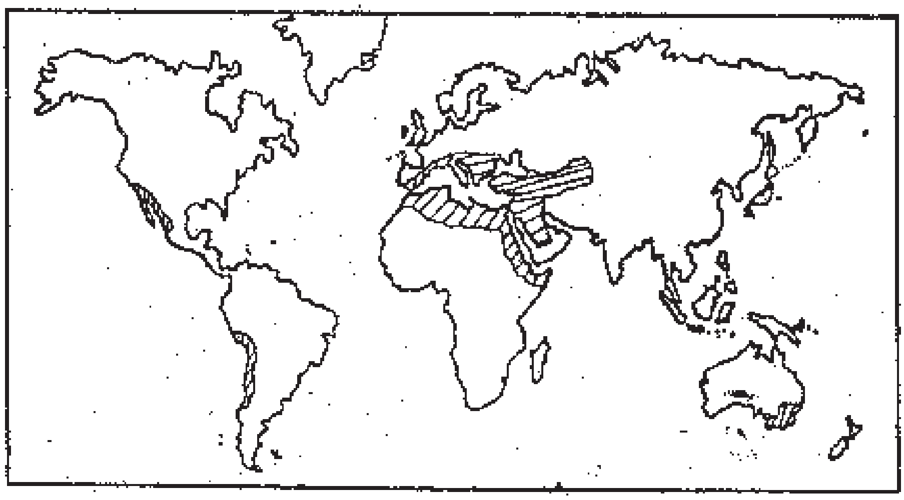

চিত্র ৬— ভূমধ্যসাগরীয় কৃষি অঞ্চল।

কিছু অঞ্চলের এই প্রকার কৃষি দেখতে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলগুলি হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ক্যালিফোর্নিয়া, মধ্য চিলি, দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন ও অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ পূর্ব ও দক্ষিণ পশ্চিমের কিছু অংশ। এখানকার জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শীতকালীন বৃষ্টিপাত ও শুষ্ক গ্রীষ্মকাল।

ভূমধ্যসাগরের এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জলবায়ুর জন্য এই অঞ্চলের দেশগুলিতে এক বিশেষ ধরনের কৃষি ব্যবস্থা দেখা যায় এই কৃষি ব্যবস্থাকেই ভূমধ্যসাগরীয় কৃষি বলে।

এই অঞ্চলে শীতকালের বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করেই এখানে শীতকালে গম, যব, ভুট্টা ইত্যাদি দানাশস্য, ডুমুর, জলপাই, আঙ্গুর, কমলালেবু, পেস্তা ইত্যাদি ফল ও তুঁত গাছের চাষ হয়ে থাকে

ভূমধ্যসাগরীয় কৃষিতে মৌসুমী কৃষির মতই ভূ প্রকৃতি জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্যান্য উপাদানগুলি বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সামগ্রিকভাবে বৃষ্টিপাত এখানে তুলনামূলক ভাবে কম। গড়ে ৩৫— ৪০ সেঃ মিঃ। এর ফলে যে সব ফসল চাষ করতে জলের প্রয়োজন কম যেমন গম, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, নানা প্রকার সব্জি, ফল, পশুখাদ্য ইত্যাদি প্রধান।

ভূমধ্যসাগরীয় কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ।—

- ভূমধ্যসাগরীয় কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এখানে জীবিকা সত্ত্বা ভিত্তিক ও বাণিজ্যিক এই উভয় প্রকার কৃষি ব্যবস্থা পাশাপাশি গড়ে উঠেছে।
- এখানে কৃষির সঙ্গে সঙ্গে পশুপালন ব্যবস্থাও দেখতে পাওয়া যায়।
- ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল হর্টিকালচার অর্থাৎ ফল ও ফুলের চাষের জন্য বিখ্যাত।
- শীতকালেই কেবলমাত্র কৃষি হয় বলে এই অঞ্চলের কৃষি প্রধানত সেচ নির্ভর, তবে এই সেচের কাজ হয় প্রধানত গ্রীষ্মকালে যখন বৃষ্টিপাত হয় না সেই সময়।
- এখানকার ফলের চাষের মধ্যে আঙুর প্রধান, এই আঙুর হতে এখানে মাদক দ্রব্য তৈরি হয়।
- এই কৃষি ব্যবস্থায় প্রচুর মূলধন ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির প্রয়োজন হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে সরকারি এবং উদ্যোগগত সুবন্দোবস্তরও প্রয়োজন।

9.9 জমির মালিকানা ভিত্তিক কৃষি (Agriculture on the Basis of Ownership)

জমির মালিকানার মধ্যে অনেক সময়ই পার্থক্য থাকে। জমিদারি প্রথা নিরসনের পর মালিকানা ব্যক্তি বিশেষে, সমবায় ভিত্তিক, সরকারি মালিকানাতে বিভক্ত হয়েছে। তাই মালিকানার ভিত্তিতে জমিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় — (ক) ব্যক্তিগত খামার (খ) সমবায় ভিত্তিক খামার ও (গ) সরকারি মালিকানা ভিত্তিক খামার।

9.9.1 ব্যক্তিগত খামার (Individual Farm)

যখন কোন ব্যক্তি নিজের জমিতে শ্রমিক নিয়োগ করে বা নিজে নিজেই চাষ করে ফসল ফলায় ও সেই ফসল গৃহজাত বা বাজারজাত করে তখন সেই কৃষি ব্যবস্থাকে ব্যক্তিগত খামার বলে। ব্যক্তিগত চাষের ক্ষেত্রে অনেক সময় মালিক ফসল ও অর্থের বিনিময়ে অন্য কোন চাষিকে জমি কিছুদিন বা বছরের জন্য চাষ করতে দেয় তখন তাকে বর্গাদারী চাষ বলে। কিন্তু মালিক বা তার পরিবারবর্গ যখন নিজেরাই ঐ জমি চাষ করে অথবা কৃষি মজুর দ্বারা চাষ করে তখন তাকে মালিকানা-ভিত্তিক চাষ বলে।

9.9.2 সমবায় খামার ও যৌথ খামার (Co-operative and Collective Farm)

কিছু জমির মালিকেরা যখন একত্রিত হয়ে তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিগুলিকে একত্রে একটি বৃহৎ খামারে পরিণত করে সমবায় প্রথায় বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সহায়তার সাহায্যে চাষ করে তখন তাকে সমবায় খামার বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে ইজরাইল ও মেক্সিকো এই সমবায় প্রথায় চাষ করে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করেছে। ভারতের ক্ষেত্রে এরূপ চাষের আরম্ভ হয়েছে, তবে এর অগ্রগতিতে তেমন সাড়া মেলেনি।

অন্যদিকে যৌথ খামারের ক্ষেত্রেও পরিচালন পদ্ধতি সমবায় পদ্ধতির মতই তবে এখানে মালিকের সংখ্যা কম থাকে। দুই বা ততোধিক মালিক মিলেও যৌথ খামার গড়ে তুলতে পারে।

9.9.3 রাষ্ট্রীয় বা সরকারি মালিকানা ভিত্তিক খামার (Agriculture on the Basis of Land Tenancy)

সরকারি তত্ত্বাবধানে সরকারের জমিতে যে কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে তাকে রাষ্ট্রীয় বা সরকারি মালিকানা ভিত্তিক খামার ব্যবস্থা বলা হয়। এরূপ কৃষির ক্ষেত্রে সরকারি সহযোগিতা যথা মূলধন, কারিগরি সহায়তা ইত্যাদি সহজে পাওয়া যায়। পূর্বতন রাশিয়ায় এরূপ প্রচুর খামার ছিল। রাশিয়ান ভাষায় তাকে সভখোজ (sovkhog) বলা হত। বর্তমানে রাশিয়ায় এরূপ খামারের বিলোপ ঘটলেও চিন ও ভারতে এরূপ খামার দেখা যায়। ভারতে এরূপ খামারে রেশমগুটি পোকার (Sericulture) পালনের জন্য তুঁত গাছের চাষ হয়। আবার ভারতে এ ধরনের খামারের প্রচলন করে কৃষি সম্পর্কিত নানা গবেষনা যেমন উন্নত বীজ, সার ও কীটনাশকের যথাযথ ব্যবহার বা উন্নত মানের বীজের সৃষ্টি করা হয়। ভারতের এরূপ কৃষি গবেষণা খামারগুলি ভারতের কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়তা করে থাকে। ভারতের ICAR (Indian Council of Agricultural Research) উন্নত প্রজাতির বীজ ও উন্নত কৃষি প্রযুক্তি আবিষ্কারের সহায়তায় ভারতের ধান চাষের প্রভূত উন্নতি ঘটিয়েছে।

9.10 আধুনিক সমাজে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ হিসাবে কৃষির ভূমিকা (Importance of Agriculture as an Economic Activity in Modern Society)

মানব সমাজে সভ্যতার সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপ ছিল কৃষির আবিষ্কার ও প্রচলন। মানুষের জীবনধারণের প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু হল খাদ্য এবং খাদ্যের যোগান দেয় এই কৃষি। খাদ্যের পরই মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু হল বস্ত্র। কৃষি মানুষকে খাদ্য ও বস্ত্র উভয়ই যোগান দিয়ে থাকে। এ ছাড়া বর্তমান শিল্পভিত্তিক জীবনধারার শিল্পের কাঁচা মালও সরবরাহ করে এই কৃষি। এই আলোচনা হতে এটা পরিষ্কার যে কৃষি কাজ এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কৃষির উন্নতি জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করতে সহায়তা করে। কিভাবে কৃষি অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সহায়তা করে থাকে তা নিচে আলোচনা করা হল।

- **কৃষিকার্য কর্ম সংস্থানের মাধ্যম (Agriculture is the Medium of Employment)** — পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত বা অনুন্নত সকল প্রকার অঞ্চলেই কৃষিকার্যের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বহুমানুষ জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রায় ৮০% — ৯০% ভাগ মানুষই কৃষির সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে ধীরে ধীরে শিল্পের উন্নতির ফলে কৃষিজীবী মানুষের ও কৃষিজমি উভয়েরই হ্রাস ঘটেছে তবে পরোক্ষভাবে বিভিন্ন শিল্পে কাঁচামাল যোগানের ক্ষেত্রে কৃষির ভূমিকাকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়।

- **শিল্পের কাঁচামালের উৎস (Source of Raw Materials for Agro-based Industry)** — বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ করে এই কৃষি। তাই প্রাথমিক শিল্প হিসাবে কৃষির ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বিভিন্ন স্থানে উৎপাদিত কৃষিজ দ্রব্যগুলির উপর নির্ভর করে ঐ সকল স্থানে বিভিন্ন শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠার দরুন শিল্পায়ন সম্ভব হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পাট উৎপাদিত অঞ্চলে পাট শিল্প, তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চলে বস্ত্র শিল্প এবং এই ভাবে চিনি, চা, রেশম, পশম, চামড়া, দুগ্ধ, মৎস্য ইত্যাদি নানা শিল্পের সমাবেশ ঘটেছে এবং দেশের সামগ্রিক শিল্পায়ন সম্ভব হয়েছে।

- **বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন (Foreign Exchange Earnings)** — বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের ক্ষেত্রে কৃষির ভূমিকা সর্বাধিক। বিভিন্ন প্রকার কৃষিজাত ফসল যথা পাট, তুলা, চা, গম, মাছ প্রভৃতি রপ্তানি করে পৃথিবীর বহু দেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে থাকে। আবার অন্যদিকে কৃষিজাত দ্রব্যের শিল্পসামগ্রী বিশ্বের বাজারে রপ্তানির মাধ্যমেও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। এরূপে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সহায়তায় বিদেশ হতে বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানি করে দেশের শিল্প কারখানার প্রসার ঘটান সম্ভব হয়েছে।

- **কৃষির প্রয়োজনে শিল্প (Industry for Agriculture)** — কৃষির উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য কিছু সহায়ক শিল্পেরও প্রসার ঘটেছে যেমন সার, কীটনাশক বা কৃষি যন্ত্রপাতি। এই সব শিল্পগুলি সম্পূর্ণরূপে কৃষি নির্ভর।

- **জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন (Status of Human Development)** — কৃষিকার্যের উন্নতির সঙ্গে

সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়। কারণ কৃষি প্রয়োজনীয় খাদ্য, শিল্পের কাঁচামাল এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ করে জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করতে সহায়তা করে।

- কৃষি বনাম শিল্পোন্নতি **(Agriculture Versus Industrial Development)** — কৃষি বনাম শিল্পোন্নতি হলো একটি পুরনো বিতর্কিত বিষয়। প্রথম দিকে পৃথিবীর মানুষ শুধুমাত্র কৃষি কাজে আত্মনিয়োগ করাতে এই বিতর্ক ওঠে নি। কিন্তু যখন থেকে শিল্পোন্নয়ন শুরু হয়, তখন পৃথিবীর নানা দেশে কৃষি বনাম শিল্প কোন্ উন্নয়নে অধিকতর মনোনিবেশ করা হবে। এই বিতর্কটি দেখা দেয়, মূলত বলা যেতে পারে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উন্নতিশীল দেশগুলিতে প্রচণ্ড খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার চোখে পড়ে। সেই কারনে উন্নয়নশীল দেশসমূহ কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্পের বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে কৃষি এবং শিল্প উন্নয়নের মধ্যে একটি সাযুস্য আনার চেষ্টা করছে, যাতে একটি উন্নয়নের জন্যে অপর উন্নয়নটি কোন মতেই পশ্চাদমুখী না হয়ে পড়ে। কেননা আমরা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পেয়েছি যে যদি কোন রাষ্ট্রে কৃষি এবং শিল্পের উন্নয়ন ধারাবাহিক এবং সর্বতোমুখী না হয় তাহলে ঐ রাষ্ট্রটির সার্বিক উন্নতি হয় না[২]।

উপরোক্ত আলোচনা হতে এটা পরিষ্কার যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি এক অনন্য ভূমিকা পালন করে। তবে বর্তমানে উন্নত দেশগুলি প্রধানত শিল্প-নির্ভর। যেমন- বৃটিশ যুক্তরাজ্য, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নেদারল্যান্ড প্রভৃতি দেশগুলি প্রচুর পরিমাণে কৃষি-উৎপাদন করলেও তা বাণিজ্যভিত্তিক কারণ দেশের চাহিদা কম। অন্যদিকে এই সব দেশে নগরায়নের পরিমাণ বৃদ্ধি বা বনসৃজন ইত্যাদি কারণের জন্য কৃষি জমির পরিমান কমের দিকে তবে বিভিন্ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটেছে। শিল্প নির্ভর দেশগুলিও কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কৃষির উৎপাদনকে খর্ব করতে পারে নি।

তাই আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় কৃষিকার্যের পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়ে চাষ আবাদ করা হয়। খাদ্য শস্যের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি নির্ভর শিল্পের কাঁচামাল যা অন্যান্য বাজারের চাহিদা অনুসারে ফসল উৎপাদনের দিকে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার আর একটি চাহিদা নির্ভর ফসল হল বাগিচা ফসলের (Horti-culture) উৎপাদন। বছরের বিভিন্ন সময়ে চাহিদার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন সব্জি, ফল ইত্যাদি উৎপাদন করে নিয়মিত বাজারে প্রেরণ করা এই প্রকার কৃষির অন্তর্গত। এই প্রকার কৃষিতে কৃষিজাত দ্রব্যাদি নিয়মিত ট্রাকের সাহায্যে বাজারজাত করা হয় বলে এরূপ কৃষি ব্যবস্থাকে 'ট্রাক ফার্মিংও (Truck farmings) বলা হয়ে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যথা জাপান, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের বিভিন্ন শহরে এরূপ ফার্মিং প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

আধুনিক কৃষির আর একটি প্রধান উপাদান হল ডেয়ারি ফার্মিং (Dairy farming)। খাদ্য ফসলের পাশাপাশি দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন করা হয়।

এই ভাবে আধুনিক সমাজে কৃষির ক্ষেত্রে নূতন নূতন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন কৃষি ফসলের উৎকর্ষতা বৃদ্ধিকরণ, সার ও নানা প্রকার কীটনাশকের ব্যবহার, কৃষি যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক

২। মিত্র-সেন — ''ফলিত ভূবিদ্যা'' পৃঃ ৬৪।

উৎকর্ষতা সাধন এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের দূষণের দিকে দৃষ্টি রেখে কৃষির ক্ষেত্রে এক নয়া যুগান্তর সৃষ্টি করেছে।

9.11 বিভিন্ন দেশে কৃষিযোগ্য ভূমি এবং কৃষিনির্ভর জনসংখ্যা (Arable Land in Various Countries and Economically Active Population in Agriculture)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কৃষিযোগ্য জমির পরিমাপের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যের প্রধান কারণ যদিও প্রাকৃতিক পরিবেশ তবে অর্থনৈতিক কারণগুলিও বর্তমানে অনেকাংশেই দেশের কৃষিযোগ্য ভূমির ফলন ক্ষমতাকে বর্ধিত করতে সহায়তা করছে।

সারণি ১০.১১.১ পৃথিবীর ভূমিভাগের সঙ্গে কৃষিযোগ্য ভূমি ও কৃষিনির্ভর জনসংখ্যার পরিমাণ দেওয়া হল (কয়েকটি বিশেষ উদাহরণ)

সারণি ১০.১১.১

দেশ	মোট জমির আয়তন (০০০ হেঃ)	কৃষিযোগ্য জমি		মোট জনসংখ্যা কোটিতে	মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ হেঃ	কৃষি নির্ভর জনসংখ্যা (%)
		'০০০ হেঃ	শতাংশ			
ভারত	২৯,৭৩,১৯	১৬,৯৭,০০	৫৭	৯৭.৫৭	০.১৯	৬৬
চিন	৯২,৯১,০০	৯,৫৭,৮২	১০	১২৫.৫১	০.০৮	৬৭
বাংলাদেশ	১,৩০,১৭	৮৭,০০	৬৭	১২.৪০	০.০৭	৬৯
পাকিস্তান	৭,৭০,৮৮	২,১৫,১০	২৮	১৪.৭৮	০.১৬	৫০
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	৯১,৫৯,১২	১৮,৭৭,৭৬	২১	২৭.৩৭	০.৭১	২
বৃঃ যুক্তরাষ্ট্র	২,৪১,৬০	৫৯,৪৯	২৫	৫.৮২	০.১০	২

এই সারণি হতে দেখা যাচ্ছে যে মোট জনসংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক চিন ও ভারতে। আবার কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ শতাংশের হিসাবে বাংলাদেশ, ভারত ও ডেনমার্কে মাথাপিছু কৃষিজমির পরিমাণ অধিক। অস্ট্রেলিয়া (২.৬৭ হেক্টর) তারপর আর্জেন্টিনা (০.৭৯ হেক্টর) এবং সর্বাপেক্ষা কম চিনে (.০৮ হেক্টর)।

অন্যদিকে কৃষিনির্ভর জনসংখ্যার দিকে নজর দিলে দেখা যাচ্ছে যে কৃষিনির্ভর জনসংখ্যা সর্বাধিক ইথিওপিয়া (৭৫%) এরপর বাংলাদেশ (৬৯%) তারপর চিন (৬৭%) এবং ভারত (৬৬%)। অন্যদিকে মোট পৃথিবীর হিসাব অনুসারে বর্তমানে মাত্র ৪৭% মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল।

এই সারণি হতে পরিষ্কার অনুধাবন করা সম্ভব যে সকল দেশগুলি উন্নত এবং যে সকল দেশগুলি অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর বা উন্নয়নশীল সেই সব দেশগুলি কৃষির উপর অধিক নির্ভরশীল। কৃষিনির্ভর জনসংখ্যা যে সব দেশে বেশি সে সকল দেশগুলি তুলনামূলক ভাবে দরিদ্র এবং শিল্পের দিকেও সেরূপ উন্নত নয়।

9.12 কৃষিজ উৎপাদনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Agricultural Production)

পৃথিবীতে যে সকল কৃষিজ ফসলগুলি উৎপাদিত হয় তাদের ব্যবহারের পদ্ধতি অনুসারে বিভিন্নভাবে ভাগ করা সম্ভব। এগুলি সারণি ১০.১২.১ দেখান হল।

সারণি ১০.১২.১

কৃষিজ ফসল

খাদ্যশস্য (foodgrain)	পানীয় ফসল (Beverages)	তন্তু জাতীয় ফসল (Fiber Crop)	শর্করা জাতীয় ফসল (Sugar Crop)	অন্যান্য ফসল (Other Crop)
ধান, গম ইত্যাদি	চা, কফি ইত্যাদি	কার্পাস, পাট ইত্যাদি	ইক্ষু, বীট ইত্যাদি	রবার, বাদাম ইত্যাদি

9.13 প্রধান খাদ্য-শস্য উৎপাদন—ধান (Main Foodgrain Production–Rice)

খাদ্যশস্যের মধ্যে প্রধান ধান ও গম। ধানের বিজ্ঞানসম্মত নাম ওরাইজা স্যাটাইভালিন (Oryza sativa Linn) ধান হতে উৎপন্ন চাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ প্রধানত ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য এবং এই ফসল উৎপাদন প্রধানত ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের জীবিকা ভিত্তিক প্রগাঢ় কৃষির এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ধান হতে প্রস্তুত চাল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মানুষের কাছে অতি উপাদেয় খাদ্য। এই ধান হতে প্রস্তুত খই, মুড়ি, চিড়া ইত্যাদিও উপাদেয় খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ধানের খড় পশুখাদ্য হিসেবে, গ্রামাঞ্চলে ঘরের ছাউনি বা জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। ধানের তুষ থেকে বর্তমানে তেল সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং সাবান ও নানা সুগন্ধী দ্রব্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।

ধানের ফলন প্রধানত নির্ভর করে বৃষ্টিপাত অর্থাৎ জলের উপর। বছরের বিভিন্ন সময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বিভিন্ন তাই বছরের বিভিন্ন সময়ে উৎপাদন অনুসারে ধানকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।(১) আউশ (২) আমন এবং (৩) বোরো।

- **আউশ** — এই ধান সাধারণত জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি (মে-জুন) মাসে বপন করা হয় এবং আশ্বিন কার্তিক মাসে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসে কাটা হয়। এই ধান চাষের জন্য জল দাঁড়ায় না এমন উঁচু জমি এবং জল

নিকাশী ব্যবস্থা যুক্ত দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মৃত্তিকার প্রয়োজন। বেশি সূর্যালোকের প্রয়োজন হয় না। বোনার নির্দিষ্ট সময় পর ফুল ফোটে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ২০ লক্ষ একর জমিতে এই ধান চাষ হয়। একর প্রতি ফলন ৮০০ কেজি।

- **আমন ধান** — বর্ষার প্রারম্ভে জুন-জুলাই মাসে এই ধান রোপণ করা হয় এবং শীতের প্রারম্ভে নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে এই ধান কাটা হয়। এই ধান চাষের জন্য সূর্যালোকের প্রয়োজন হয়। আমন ধান চাষের জন্য নিম্ন বা জলাভূমিতে এঁটেল ও দোআঁশ মাটির প্রয়োজন। উঁচু জমিতেও যদি সেচের ব্যবস্থা ভাল থাকে তবে এই ধানের চাষ ভাল হয়। আমন ধানকে শীতকালীন ধানও বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই ধান ওঠার পর অগ্রহায়ণ মাসে বাংলার গ্রামে নবান্ন উৎসব পালন করা হয়।

- **বোরো ধান** — কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে (নভেম্বর-ডিসেম্বর) এই ধানের বীজ বপন করা হয় এবং মার্চ-এপ্রিল মাসে ফসল কাটা হয়। বোরো চাষের জন্য জলসেচ একান্ত প্রয়োজন। এই ধানের ফসল খুব বেশি। এই ধানের উৎকর্ষতাও অন্য দুটি শ্রেণী হতে অনেক কম।

ধানকে তার উৎপাদন অঞ্চল অনুসারে দুভাগে ভাগ করা যায়— (ক) উচ্চভূমির বা পার্বত্যভূমির ধান এবং (খ) নিম্নভূমি বা জলাভূমির ধান।

- **উচ্চভূমির ধান (Upland and Hill paddy)** — পার্বত্যভূমি বা উচ্চভূমিতে যে ধান জন্মে তাকে উচ্চভূমির ধান বলে। এই সব ধান প্রধানত স্থানীয় চাহিদা মেটাবার জন্য চাষ করা হয়। এই ধান অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং এর ফলনও অত্যন্ত কম।

- **নিম্নভূমি ধান (Lowland or Swamp paddy)** — পৃথিবীর নিম্ন উর্বর সমতল ভূমিতে যে ধানের চাষ হয় তা এই শ্রেণীর। পৃথিবীর উৎপাদনের প্রায় ৯৫% হল এই নিম্নভূমি বা জলাভূমির চাষ। বৃষ্টির জল বা সেচের উপর নির্ভর করে এই ধানের চাষ হয়ে থাকে।

9.13.1 বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান (Different High Yielding Variety of Rice)

বর্তমানে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার ফলে আদিম কৃষিজ ফসল ধানের বীজের অনেক উন্নতি ঘটানো সম্ভব হয়েছে। এবং এই উন্নতি ঋতুভিত্তিক ফসলের ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়েছে। নিচে ঋতুভিত্তিক কয়েকটি জাতের ধানের নামকরণ সারণি ১০.১৪.১-এ দেওয়া হল।

সারণি ১০.১৩.১

ঋতুভিত্তিক উচ্চ ফলনশীল ধান

আউস	আমন	বোরো
রত্না, আই আর-৮ পদ্মা, দুলাল প্রভৃতি	বাসমতি, পঙ্কজ, ইন্দ্রসাল মাসুরি প্রভৃতি	বোরো-১, জয়া লাঠিসাল প্রভৃতি

9.13.2 ধান চাষের ভৌগোলিক পরিবেশ (Geographical Environment for the Growth of Rice)

ধান উৎপাদনের জন্য যে সব ভৌগোলিক পরিবেশগুলির প্রয়োজন হয় তাদের বিবরন নিচে সারনিতে দেওয়া হল।

সারণি ১০.১৩.২

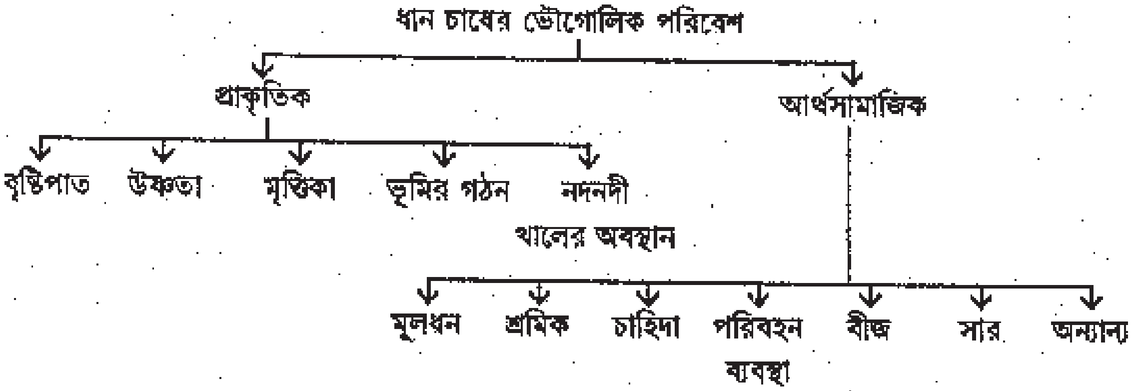

প্রাকৃতিক পরিবেশ

- **বৃষ্টিপাত** — ধান চাষের জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। তাই যে সমস্ত অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের বার্ষিক গড় ১৫০-২০০ সে.মি. সে সব অঞ্চলে ধান ভাল জন্মায়। এই বৃষ্টিপাত সাধারণত ধানের চারা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয়। তবে যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত গড়ে ১০০ সে. মি. এর কম সেখানে জলসেচের প্রয়োজন হয়। এছাড়া ধান গাছের বৃদ্ধির সময় প্রতিমাসে কিছু কিছু বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়। এর পর ধান পাকা হতে ধান কাটা পর্যন্ত সময় উষ্ণ-শুষ্ক আবহাওয়ার প্রয়োজন হয়।

- **উষ্ণতা বা তাপমাত্রা** — জলের মত ধানগাছের জন্য প্রচুর উত্তাপের প্রয়োজন হয়। সাধারণত বীজতলা তৈরি হতে চারাগাছ লাগাবার সময় পর্যন্ত ১০°-২১° সেঃ ও ধান পাকা ও কাটার সময় গড়ে ৩০°-৩৫° সেঃ তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। তাপমাত্রা ১৭° সেঃ-এর কম হলে ধান চাষ ভাল হয় না। আবার কোন কোন প্রজাতির ধান ২০°সেঃ তাপমাত্রার কমে জন্মায় না। আবার উষ্ণতার পরিমাণ যদি অত্যধিক হয় তবে তাও ধান চাষের পক্ষে ক্ষতিকর।

- **মৃত্তিকা** — উর্বর পলিমাটি ধান চাষের পক্ষে উপযুক্ত। এছাড়া দোআঁশ, এঁটেল ইত্যাদি মাটি যা জল ধরে রাখতে পারে সেরূপ মাটি ধান ফলনের পক্ষে উপযুক্ত। এছাড়া বেলেমাটি, ল্যাটারাইট, তরাইও পার্বত্য অঞ্চলের মাটিতেও ধান জন্মায়। আবার যে সব জমির উপরের স্তরে পলিমাটি এবং তার ঠিক নিচেই কাদা মাটির স্তর রয়েছে তা ধান চাষের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী। এই কারণে পৃথিবীর নদী-উপত্যকা বা নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলগুলিতে ধানের চাষ ভাল হয়।

● **ভূ-প্রকৃতি**— ভূমির প্রকৃতির উপরও ধানের চাষ অনেকাংশে নির্ভরশীল। ধান চাষের জন্য সমতলভূমি বিশেষ উপযুক্ত কারণ সমতল জমিতে বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখা সহজ। পাহাড়ি অঞ্চলেও ধানের চাষ হয় তবে ঐ জমিতে ধানের চাষ কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য।

● **নদ নদী ও খালের অবস্থান** — নদনদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে প্রতিবছর নতুন নতুন পলিমাটি সঞ্চিত হয় বলে ঐ সব অঞ্চলে ধানের চাষ ভাল হয়। এছাড়া নদনদী খাল বিল হতে সহজেই জলসেচ করা যায়।

আর্থ সামাজিক কারণ সমূহ—

● **মূলধন** — ধান চাষের যন্ত্রপাতি, সার, উন্নত বীজ, কীটনাশক ও শ্রমিকের মজুরী ইত্যাদির জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়।

● **শ্রমিক**— কৃষি শ্রমনিবিড় উৎপাদন। ধান-বপন, রোপণ, তত্ত্বাবধান, কর্তন, মাড়াই ইত্যাদি নানা প্রকার কাজে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন। জনবসতি পূর্ণ দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী অঞ্চলে সুলভ শ্রমিকের প্রাচুর্যতা হেতু ব্যাপকভাবে ধানের চাষ হয়ে থাকে।

● **চাহিদা**— চাহিদা অনুসারে ধানের চাষ করা হয়। তবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জনবসতি পূর্ণ অঞ্চলে ধানের চাহিদা থাকায় ধানের চাষ অধিক হয়ে থাকে।

● **পরিবহন ব্যবস্থা** — ধান চাষের জন্য শ্রমিক, বীজ, সার, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বয়ে নিয়ে যাওয়া বা উৎপন্ন ফসল বাড়িতে বা বাজারে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুলভ পরিবহন ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন। সাধারণত ভারতের গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাট আধুনিক পরিবহনের উপযোগী নয় বলে বিজ্ঞানসম্মত চাষ ব্যবস্থা সর্বত্র গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। আবার সমুদ্রপথে বিভিন্ন দেশে ধান রপ্তানির সুবিধা থাকায় যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যান্ড, মায়ানমার প্রভৃতি দেশ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধান উৎপাদন করে।

● **বীজ ও সার** — ধান চাষের ক্ষেত্রে বীজের ব্যবহারের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। কারণ উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে। বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র এরূপ উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এই সকল উচ্চফলনশীল বীজের মধ্যে ইবি, ইণ্ডিকা, জাপানিকা, আই আর ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বীজের সঙ্গে সঙ্গে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সারের বহুল ব্যবহারও প্রচলিত। বর্তমানে জৈব সারের সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার রাসায়নিক সারের প্রয়োগ উৎপাদনের মাত্রাকে অব্যাহত রাখতে সহায়তা করে থাকে।

● **অন্যান্য** — অন্যান্য উৎপাদনের মধ্যে কীটনাশক, জলসেচ, কৃষি যন্ত্রপাতি, ধান সংরক্ষণ, বীজ সংরক্ষণ ইত্যাদি প্রধান। এর সঙ্গে সঙ্গে সরকারি উদ্যোগ ও সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। কারণ সরকার পরোক্ষভাবে কৃষক ও শ্রমিকের আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক উন্নতিতে সহায়তা করে উৎপাদন ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে থাকে।

9.13.3 পৃথিবীর ধান উৎপাদনকারী অঞ্চল সমূহ (Rice Producing Areas of the World)

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই কমবেশি ধানের উৎপাদন হয়ে থাকে। তবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মত আর কোনও

অঞ্চলে এত বেশি ধান উৎপন্ন হয় না। পৃথিবীর ধান উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলিকে তাই দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হল। এবং এই উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলিকে নিম্নে সারণিতে দেখান হল।

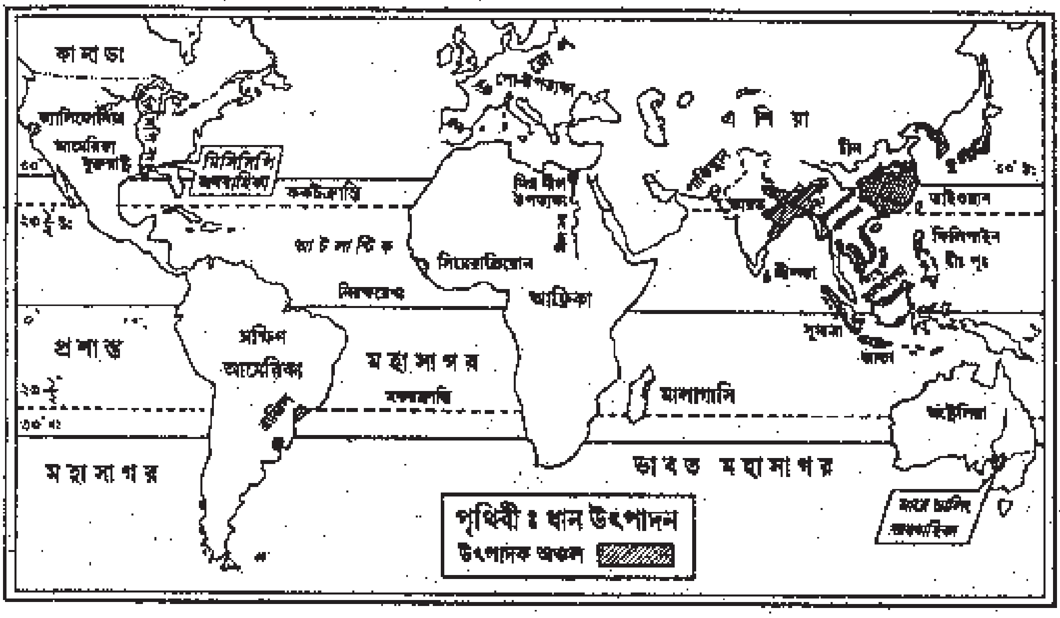

চিত্র ৭— পৃথিবী : ধান উৎপাদন

সারণি ১০.১৩.৩

ধান উৎপাদনকারী অঞ্চল

- দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মৌসুমী জলবায়ু অধ্যুষিত অঞ্চল
- পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল

9.13.4 ধান উৎপাদনকারী দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মৌসুমী অধ্যুষিত অঞ্চল সমূহ (Geographical Distribution of South East Asian Monsoon Climatic Regions of Rice Production)

পৃথিবীর ধান উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির মধ্যে মৌসুমী জলবায়ু অধ্যুষিত ক্রান্তীয় অঞ্চল সমূহের মধ্যে চিন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, জাপান, ভিয়েতনাম, কোরিয়া ইত্যাদি প্রধান।

- চিন — চিন ধান উৎপাদনে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে রয়েছে। মধ্য চিনের ইয়াংসিকিয়াং অববাহিকায়, দক্ষিণ চিনের সিংকিয়াং অববাহিকা, দক্ষিণপূর্ব উপকূলভূমি, রেড বেসিন ইত্যাদি অঞ্চল ধান চাষের জন্য প্রধান। চিনের অন্যান্য প্রদেশগুলির তুলনায় হুনান প্রদেশে এত অধিক ধান উৎপাদন হয় বলে হুনানকে ধানের আধার (Rice bowl) বলে।

প্রগাঢ় কৃষি ব্যবস্থার সহায়তার ক্ষুদ্র ও মাঝারি যন্ত্রপাতির সহায়তায় চাষ আবাদ করে থাকে। কম বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলে জলসেচের সহায়তায় চাষ করা হয়। World Resource অনুসারে ২০০০ সালে চিন বিশ্বে ধান উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। চীনে প্রায় ৩.১৮ কোটি হেক্টর জমিতে ধানের চাষ করা হয় এবং হেক্টর প্রতি উৎপাদন গড়ে ৬০৫৯ কেজি। বর্তমানে পৃথিবীর বাজারে চালের চাহিদা বৃদ্ধি ঘটায় চিন চাল রপ্তানি করে গম আমদানি করে থাকে।

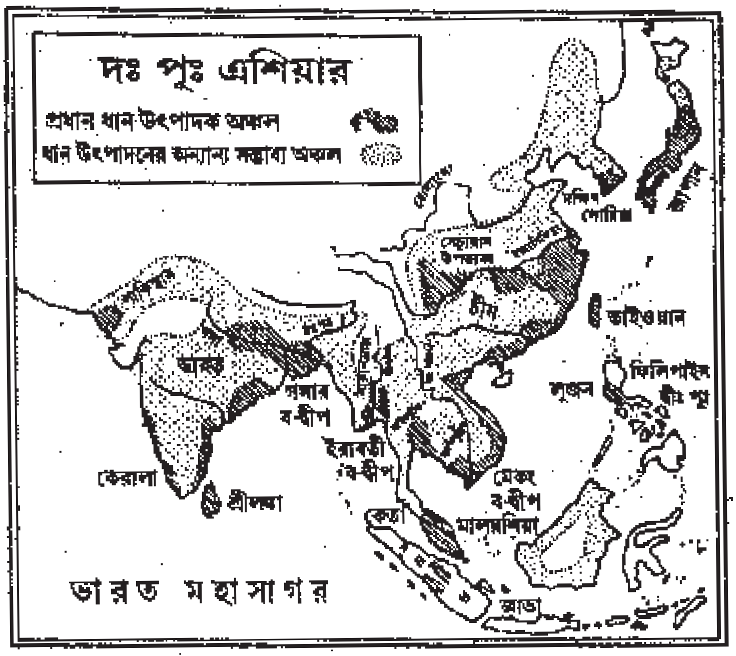

চিত্র ৮— দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রধান ধান উৎপাদক অঞ্চল।

● ভারত — ধান উৎপাদনে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। ভারতের প্রধান খাদ্য শস্য ধান। ভারতের পার্বত্য অঞ্চল হতে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল সমূহে সর্বত্রই ধানের চাষ হয়ে থাকে। ভারতের গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমভূমি, ব-দ্বীপ অঞ্চল এবং পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সমভূমি অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা অধিক ধান উৎপন্ন হয়। ধান উৎপাদন অঞ্চল অনুসারে Indian Agricultural Research Council ভারতকে মোট আটটি উৎপাদন অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন। নিচে সারণিতে তা দেখান হল।

সারণি ১০.১৩.৪

ভারতের ধান উৎপাদন অঞ্চল

- পশ্চিম হিমালয়ের আর্দ্র অঞ্চল
- পশ্চিম ভারতের শুষ্ক মরুপ্রায় অঞ্চল
- গঙ্গা শতদ্রুর শুষ্কপ্রায় সমভূমি অঞ্চল
- পশ্চিমবঙ্গ অসমের নদীগঠিত সমভূমি অঞ্চল
- পূর্ব হিমালয়ের আর্দ্র অঞ্চল
- মধ্যভারতের উচ্চভূমি
- দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল
- পূর্ব-উপকূলের সমভূমি অঞ্চল

- পশ্চিম-হিমালয়ের আর্দ্র অঞ্চল — হিমাচল প্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ গাড়োয়াল প্রধান।
- পশ্চিম-ভারতের শুষ্ক মরুপ্রায় অঞ্চল — হরিয়ানা, রাজস্থান অঞ্চল।
- গঙ্গা শতদ্রুর শুষ্ক প্রায় সমভূমি অঞ্চল — পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার প্রধান।
- পশ্চিমবঙ্গ-অসমের নদী গঠিত সমভূমি অঞ্চল — পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রধান, অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা প্রধান।
- পূর্ব-হিমালয়ের আর্দ্র অঞ্চল — মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চল প্রধান।
- মধ্য-ভারতের উচ্চভূমি — মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ।
- দাক্ষিণাত্যের মালভূমি — মহারাষ্ট্রের কিছু অংশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, কেরালা প্রভৃতি অঞ্চল প্রধান।
- পূর্ব উপকূলের সমভূমি — তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যার সমুদ্র উপকূলবর্তী সমভূমি অঞ্চলগুলি প্রধান।

ভারতের প্রায় সর্বত্রই ধান উৎপাদিত হয়। আউস, আমন ও বোরো এই তিন প্রকারের ধানই উৎপন্ন হয়। ধান উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানে। ২০০০ সালে ভারতে মোট উৎপাদন হয় ১৩.৪১ কোটি মেট্রিক টন। হেক্টর প্রতি উৎপাদন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম প্রায় ২৯২২ কেজি।

ভারত ধান উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হলেও ভারতে ধান চাষের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা রয়েছে। সেগুলি যথাক্রমে —

- হেক্টর প্রতি উৎপাদন কম। পৃথিবীর গড় ফলন যেখানে ৩৭৩০ কেজি / হেক্টর প্রতি ভারতের সেখানে মাত্র ২৯২২ কেজি / প্রতি হেক্টরে।
- ভারতের ধান চাষ প্রধানত মৌসুমী বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল বলে বৃষ্টির অনুপাতের উপর ধান চাষের পরিমাণ অধিক নির্ভরশীল। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা খরা বা বন্যা চাষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
- জমির পরিমাণ ছোট ছোট হওয়ার ফলে কৃষিক্ষেত্রে কৃষি যন্ত্রের ব্যবহার যথোপযুক্তভাবে করা সম্ভব হয় না।
- এর সঙ্গে সঙ্গে মূলধনের সমস্যা, পরিবহনের সমস্যাও ধান চাষের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য বাধা।

এই সকল সমস্যার সমাধানে ভারতের Indian Council of Agricultural Research (ICAR) বর্তমানে কতগুলি প্রকল্প গ্রহণ করেছে যেমন উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার, জলসেচ ও পরিবহনের উন্নতি ঘটানো, কৃষি যন্ত্রায়নের সুবন্দোবস্ত এবং মূলধনের সরবরাহের উদ্দেশ্যে কৃষি ঋণ প্রদান ইত্যাদি প্রধান।

● ইন্দোনেশিয়া — ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীতে তৃতীয়। এই দেশের উর্বর আগ্নেয় ও পাললিক মাটি ধান উৎপাদনে সহায়তা করে ফলে এই দেশে হেক্টর প্রতি উৎপাদন প্রায় ৪৫২০ কেজি। সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, সেলিবিস প্রভৃতি দ্বীপগুলির সমতল ক্ষেত্রে জলসেচের মাধ্যমে প্রচুর ধান উৎপাদন করা হয়। জাভা দ্বীপে সবচেয়ে বেশি ধান উৎপাদিত হয়। এই অঞ্চলের জটিলুহুর (Djatiluhur) সেচ প্রকল্পের সহায়তায় কৃষিকার্যের এই উন্নতি ঘটানো সম্ভব হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন পর্বতগাত্রে ধাপ কেটে চাষও দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে ধান উৎপাদনে এই দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বিশ্বের বাজারে চাল রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে পরিচিত।

● বাংলাদেশ— বর্তমানে বিশ্বের বাজারে ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ চতুর্থ। বাংলাদেশের উর্বর দোআঁশ ও পলিমাটি এবং উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ু এখানে ধান উৎপাদনে সহায়তা করে থাকে। বাংলাদেশের সব জেলাতেই কমবেশি ধান উৎপাদিত হয়। এখানকার ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, বরিশাল, রাজশাহী, খুলনা প্রভৃতি জেলা ধান চাষের জন্য বিখ্যাত। বাংলাদেশে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ভারতের মতই অনেক কম ২৭৫৯ কেজি মাত্র। এখানকার কৃষি ব্যবস্থা আদি জীবিকাসত্তাভিত্তিক শ্রমপ্রগাঢ় ফলে বাংলাদেশের ধান চাষে বেশ কিছু সমস্যা দেখা যায়। এই সমস্যাগুলির মধ্যে প্রধান অপবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, খরা, উন্নতমানের বীজের অভাব, অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদি বাংলাদেশকে ধান উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়েছে।

● থাইল্যান্ড— ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে থাইল্যান্ড বিশ্বের বাজারে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এখানকার মেনাম নদীর অববাহিকা ও ব-দ্বীপ অঞ্চলের উর্বর পাললিক সমভূমি অঞ্চলে প্রচুর ধানের চাষ হয়ে থাকে। এই দেশ চাল রপ্তানিতে পৃথিবীতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। উৎপাদনের প্রায় ৪২% বিদেশে রপ্তানী করে।

● ভিয়েতনাম — ধান উৎপাদনে ভিয়েতনাম পৃথিবীতে পঞ্চম স্থান অধিকার করে রয়েছে। উত্তর ভিয়েতনামের লোহিত নদীর অববাহিকা এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের মেকং নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রচুর ধানের চাষ হয়ে থাকে। এখানে হেক্টর প্রতি উৎপাদনের হার ৩৯৮৬ কেজি। ভিয়েতনামের উৎপাদন চাহিদার তুলনায় বেশি হয় বলে প্রচুর চাল বিদেশে রপ্তানি হয়।

● মায়ানমার — মায়ানমারের মধ্য ও নিম্ন ইরাবতী নদী উপত্যকায় প্রচুর ধানের চাষ হয়ে থাকে। ধান মায়ানমারের প্রধান কৃষিজাত খাদ্যশস্য। এখানকার পার্বত্য অঞ্চলেও ধাপ কেটে ধান চাষ করা হয়। লোকসংখ্যার অনুপাতে উৎপাদন বেশি হয় বলে এই দেশ বিশ্বের বাজারে চাল রপ্তানি করে থাকে।

● জাপান — ধান উৎপাদনে বিশ্বের বাজারে জাপান এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এখানে কৃষি বিজ্ঞান ভিত্তিক নিবিড় চাষ হয় বলে হেক্টর প্রতি উৎপাদন প্রায় ৬১৯০ কেজি। এখানকার হনসু, সিকোকু ও কিউসু দ্বীপের উপকূলবর্তী সমভূমিতে এবং পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে ধানের চাষ করা হয়।

এই অঞ্চলের উপক্রান্তীয় জলবায়ু পরিমিত বৃষ্টিপাত এবং জলসেচের সুবিধাগুলি ধান উৎপাদনে অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। জাপান খাদ্য শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বলে বিদেশ হতে চাল আমদানি করতে হয়।

উপরে আলোচিত প্রধান অঞ্চলগুলি ব্যতীত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য ধান উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, কাম্বোডিয়া, লাওস, ফিলিপাইন, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশগুলি প্রধান।

9.13.5 পৃথিবীর অন্যান্য ধান উৎপাদনকারী দেশসমূহ (Rice Producing Countries of the World)

পৃথিবীর অন্যান্য ধান উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে উঃ আমেরিকা, দঃ আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ, ওশিয়ানিয়া প্রধান।

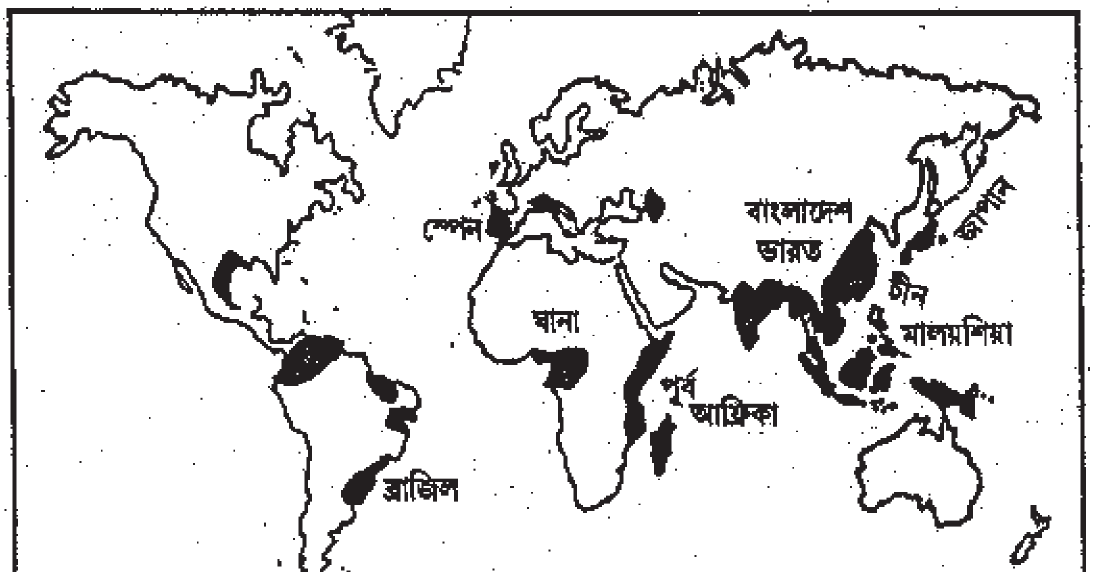

চিত্র ৯— ভারতসহ পৃথিবীর অন্যান্য ধান উৎপাদক দেশ সমূহ।

- **উত্তর আমেরিকা** — উত্তর আমেরিকায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপন্ন করে। তবে আমেরিকার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য গম হওয়ার দরুন এই দেশ বিদেশে চাল রপ্তানি করে থাকে। চাল রপ্তানিতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্থান থাইল্যান্ডের পর দ্বিতীয়।

এখানকার মিসিসিপি নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চল, টেক্সাস ও ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলের উপকূলবর্তী নিম্নভূমিতে ধানের চাষ হয়। এখানে হেক্টর প্রতি উৎপাদন খুব বেশি প্রায় ৬৪৪৪ কেজি।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা, নিকারাগুয়া, গুয়াতেমালা, হণ্ডুরাস ও কোস্টারিকাতেও প্রচুর ধানের চাষ হয়ে থাকে।

- **দক্ষিণ আমেরিকা** — দক্ষিণ আমেরিকা পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে ধান উৎপাদনে শ্রেষ্ঠ। এখানকার ব্রাজিল, সুরিনাম, উরুগুয়ে, পেরু, কলম্বিয়া ও ইকুয়েডরে ধানের চাষ হয়ে থাকে।

ব্রাজিল ধান উৎপাদনে প্রসিদ্ধ। ব্রাজিল ধান উৎপাদনে দক্ষিণ গোলার্ধে প্রথম এবং পৃথিবীতে অষ্টম স্থানের অধিকারী। আমাজন নদীর বিভিন্ন উপত্যকা ও আটলান্টিক উপকূলের প্রচুর বৃষ্টিপাত ও উর্বর মৃত্তিকা ধান চাষের পক্ষে সহায়ক হয়েছে।

- **ইউরোপ মহাদেশ**— ইউরোপের ইতালি ফ্রান্স ও রাশিয়াতে প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপন্ন হয়। এছাড়া যুগোস্লাভিয়া, পর্তুগাল, গ্রিস, বুলগেরিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে ধান উৎপাদিত হয়। এখানকার অধিকাংশ উৎপাদনই বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে।

- **আফ্রিকা** — আফ্রিকার মাদাগাস্কারের উপকূলবর্তী সমভূমি, নাইজেরিয়ার নাইজার ও মেনুই নদীর যুগ্ম অববাহিকায় ধান উৎপাদিত হয়। এখানকার মিশর ধান উৎপাদনকারী দেশ। মিশরের নীলনদের ব-দ্বীপ ও উপত্যকা অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপন্ন হয়। এছাড়া আফ্রিকার কঙ্গো, এঙ্গোলা, সেনেগাল, আলজিরিয়া, সুদান, কেনিয়া প্রভৃতি দেশেও ধানের চাষ হয়।

- **অস্ট্রেলিয়া** — অস্ট্রেলিয়ার মারে ডার্লিং অববাহিকায় জলসেচের সাহায্যে চাষ করা হয়। স্থানীয় চাহিদা কম বলে চাল বিদেশে রপ্তানি করে থাকে।

9.13.6 ধানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade of Rice)

আন্তর্জাতিক বাজারে ধানের গুরুত্ব অনেক কম। কারণ ধান প্রধানত জীবিকাসত্তা ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থায় উৎপাদিত ফসল যা উৎপাদিত হয় তার অধিকাংশই দেশগুলি নিজেদের আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে ব্যবহার করে। এশিয়া ও আফ্রিকাতে উৎপাদনের প্রায় ৯০% খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর কারণ এখানকার দেশগুলির জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি ফলে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ খুবই কম।

পৃথিবীর প্রধান চাল রপ্তানিকারক দেশগুলি হল থাইল্যান্ড আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ভিয়েতনাম, পাকিস্তান, ইতালি, ভারত ইত্যাদি এবং আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে প্রধান ইরাক, ইরান, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি।

9.14 ব্যাপক বাণিজ্যিক কৃষি উৎপাদন—গম (Extensive Commercial Crop Production–"Wheat")

গম মূলত নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলীয় ফসল তবে বর্তমানে উপক্রান্তীয় আবহাওয়াতেও গমের চাষ করা হয়। গমের বিজ্ঞানসম্মত নাম হল ট্রিটিকাম ইস্টিভাম (Triticum aestivam Linn)। গম প্রধানত উত্তর গোলার্ধের ৩০°—৫০° অক্ষাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। থাকলেও দক্ষিণ গোলার্ধে ২০°—৪০° দক্ষিণ অক্ষাংশের গমের চাষ লক্ষ্য করা যায়।

গম পৃথিবীর প্রধান খাদ্যশস্যের মধ্যে একটি অন্যতম দানা জাতীয় শস্য। গম হতে আটা, ময়দা, সুজি ইত্যাদি তৈরি হয়। এছাড়া বিস্কুট, কেক, পাউরুটি ইত্যাদিও গমের আটা হতে তৈরি হয়। গমের খড় গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই খড় হতে নিকৃষ্ট ধরনের কাগজও তৈরি হয়।

9.14.1 গমের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Wheat)

গমের বীজ বপন ও ফসল সংগ্রহের সময় এবং আকৃতি ও প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। বীজ বপনের সময় অনুসারে একে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা হয় (১) শীতকালীন গম ও (২) বসন্তকালীন গম।

- **শীতকালীন গম —(Winter Wheat) —** নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে শীতকালীন গমের চাষ হয়। উত্তর গোলার্ধে শীতের প্রারম্ভে অর্থাৎ নভেম্বর মাসে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে এপ্রিল মে মাসে এই ফসলের বীজ বপন করা হয়। গ্রীষ্মকালের গরমে এই ফসল পাকে। পৃথিবীর গম উৎপাদনের প্রায় ৮০% ভাগই শীতকালীন গম। এই গমের চাষ প্রধানত নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়।
    - আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তৃণভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত মিসৌরী, কানসাস, নেব্রাস্কা প্রভৃতি প্রধান।
    - চিন দেশের হোয়াংহো নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলের পললযুক্ত সমভূমি অঞ্চল এবং চীনের উত্তর ও পশ্চিমভাগে শীতকালীন গমের চাষ দেখতে পাওয়া যায়।
    - জাপানের পূর্ব উপকূলের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে এই গমের চাষ হয়।
    - ভারতের উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যে রবিশস্য হিসেবে শীতকালীন গমের চাষ হয়।
    - উপরের উল্লিখিত অঞ্চল ব্যতীত দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা, নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণের সমুদ্র উপকূলের সমভূমি অঞ্চলে, পাকিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলের শীতকালীন গমের চাষ হয়ে থাকে।
- **বসন্তকালীন গম —(Spring Wheat) —** যে সব দেশে শীতকালীন তুষারপাত হয়। সাধারণত সেই সব দেশে বসন্তকালে গমের চাষ হয়। সাধারণত বসন্তের প্রারম্ভে যখন বরফ গলে যায় তখন ঐ বরফগলা

ভিজে মাটিতে এই গমের চাষ হয়ে থাকে। বসন্তকালীন গমের চাষ প্রধানত কানাডা, পূর্বতন রাশিয়ার স্তেপ তৃণভূমি এবং সাইবেরিয়াতেও প্রচুর পরিমাণে হয়ে থাকে। এই সব অঞ্চলে বসন্তকালে গমের চাষ হয় এবং হেমন্তের প্রথমদিকে গম সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

শীতকালীন বা বসন্তকালীন উভয় ধরনের গমকেই আবার তাদের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে তিনভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। (১) লাল গম (২) সাদা গম ও (৩) ডুরাম গম।

- **লাল গম —(Red Wheat)** — সাধারণত শীতল ও শুষ্ক অঞ্চলে এই লাল গমের চাষ হয়। এই গম শীত ও বসন্ত উভয় ঋতুতে জন্মায়। সাধারণত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সি. আই-এস-এর অন্তর্ভুক্ত দেশ সমূহ। মধ্য ইউরোপ প্রভৃতি অঞ্চলে এই গমের চাষ বেশি দেখা যায়। এই গমের দানাগুলি ছোট বা মাঝারি হয় এবং এগুলি কঠিন প্রকৃতির গম বলে পরিচিত। এই গমে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে বলে এই গমের ময়দায় পাউরুটি ভাল হয়।

- **সাদা গম —(White Wheat)** — সাদা গম শীত বা বসন্ত উভয় ঋতুতেই জন্মায়। এই গমের দানাগুলি বড় হয় এবং এই সাদা গম নরম জাতের। এই গমে জলীয় বাষ্প বেশি পরিমাণে থাকে এবং এই গমের ময়দা থেকে কেক, পেস্ট্রি, বিস্কুট প্রভৃতি ভাল হয়। এই গমের চাষ প্রধানত এশিয়ার অধিকাংশ দেশে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণ-আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার চিলি প্রভৃতি অঞ্চলে পাওয়া যায়।

- **ডুরাম গম —(Durum Wheat)** — এই গম বসন্তকালে জন্মায় এবং এটি কঠিন জাতের গম। ভারতের দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল, উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এবং ইউরোপের বিভিন্ন অংশে এই গম জন্মাতে দেখা যায়।

9.14.2 গম চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা সমূহ (Geographical Conditions Favourable for Wheat Productions)

গম চাষের বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থাগুলি নিচে সারণীতে দেওয়া হল।

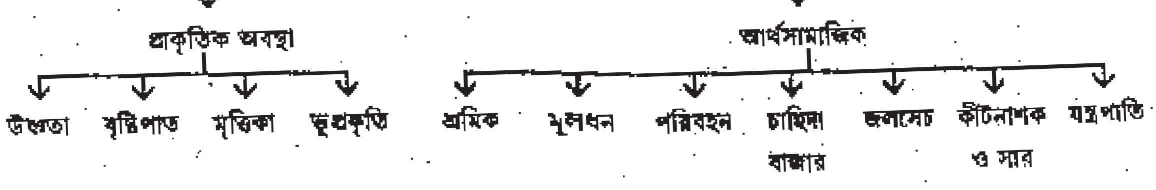

প্রাকৃতিক অবস্থা সমূহ —(Physical Conditions) —

- **উষ্ণতা** — গম উৎপাদনের জন্য কমপক্ষে ১০°—২০° সেঃ উত্তাপের প্রয়োজন। অত্যধিক উত্তাপে গমের দানাগুলির পুষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটায়। তাই গম চাষের জন্য নাতিশীতোষ্ণ ও শীতল আবহাওয়ার প্রয়োজন।

● বৃষ্টিপাত — গম চাষের জন্য সাধারণত অধিক জলের প্রয়োজন হয় না। কারণ গম অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলে চাষ হয়। গম চাষের জন্য মোটামুটি ভাবে গড়ে ৫০°—১০০° সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত ও ১১০ টি তুহিন মুক্ত দিবসের প্রয়োজন হয়।

● মৃত্তিকা — উর্বর দোআঁশ মাটি গম চাষের পক্ষে অনুকূল। আমেরিকার প্রেইরি অঞ্চলের গাঢ় বাদামী এবং পর্ণমোচী বনভূমির পড়সল মাটি যা জৈব পদার্থে মিশ্রিত কালো মাটি বা চেরনোজেম মাটি গম চাষের পক্ষে অনুকূল। গম চাষের ফলে জমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়ে যায় তাই মাটির উর্বরতা শক্তি বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সারের ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন।

● ভূ-প্রকৃতি — ব্যাপকভাবে গম চাষের জন্য জলনিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত প্রায় সমতলভূমি যা সামান্য ঢাল বিশিষ্ট জমিই উপযুক্ত কারণ সমতল ভূমিতে জলসেচ করা সহজ হয়। আবার সমতল ভূমিতে বর্তমান কৃষি ব্যবস্থার আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারও সহজ হয়। সাধারণত ধাপ কেটে গমের চাষের বিশেষ প্রচলন দেখা যায় না তবে চাষের জমির অভাবে অনেক সময় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই ধাপ চাষ করা হয়ে থাকে।

আর্থসামাজিক কারণ সমূহ —(Socio Economic Causes) —

● শ্রমিক — জমি তৈরি হতে আরম্ভ করে শস্য বপন, কর্তন ইত্যাদি কাজে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। তবে বর্তমানে উন্নত দেশগুলিতে গমের চাষ করার জন্য জমি তৈরি হতে শুরু করে বীজ বপন, ফসল কাটা বা সংগ্রহ করা সব কাজেই যন্ত্রের ব্যবহার করা হয় বলে বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। তবে পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলি যথা ভারত, চিন প্রভৃতি অঞ্চলে যন্ত্র হতে মানুষের ব্যবহার অধিক হয়ে থাকে।

● মূলধন — কৃষি জমি সংগ্রহ, বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়, উৎকৃষ্টবীজ ও সার, কীটনাশক ইত্যাদি সর্বপ্রকার কার্যে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। মূলধনের অভাবে গমের চাষ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে গম চাষের প্রধান কারণ এই সকল অঞ্চলের চাষীদের মূলধনের সহজলভ্যতা।

● চাহিদা ও বাজার — পৃথিবীতে খাদ্য শস্যের বাজারে গমের স্থান প্রথম। বিশ্বের বাজারে গমের চাহিদা প্রচুর থাকায় দরুন পৃথিবীর বহুদেশ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গমের চাষ করে থাকে। তাই দেখা যায় বাজারের চাহিদার উপর গমের চাষ অনেকাংশে নির্ভরশীল।

● পরিবহন ব্যবস্থা— গম বাজারভিত্তিক উৎপাদন হওয়ার দরুন উৎপাদিত অঞ্চল ও দেশ বিদেশের বাজারের মধ্যে সুলভ ও সহজলভ্য পরিবহনের একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া কৃষিক্ষেত্র বীজ, সার, শ্রমিক, যন্ত্রপাতি বহন বা শস্য ক্ষেত্র হতে শস্য সংগ্রহের জন্যও সুলভ পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজন। এই কারণে গম উৎপাদন সমৃদ্ধ আমেরিকার প্রেইরী অঞ্চলে যা রাশিয়ার গম উৎপাদন অঞ্চলে রেল ও সড়ক পথের সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।

● জলসেচ — গম উৎপাদনের প্রাকৃতিক পরিবেশগুলির অনুকূল অবস্থান থাকলে কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে জলসেচের দ্বারা গম চাষ করা সম্ভব হয়। ভারত, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে জলসেচের সহায়তায় ব্যাপকভাবে গমের চাষ হয়ে থাকে।

- **কীটনাশক ও সার** — কীটপতঙ্গের আক্রমণ ও কীটপোকার হাত থেকে গম চাষকে রক্ষা করার জন্য কীটনাশক ব্যবহার করা প্রয়োজন। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে বিমানের সহায়তায় তাদের বিস্তৃত গম ক্ষেত্রগুলিতে কীটনাশক ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

গম উৎপাদনের ফলে মাটির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণভাবে দেখা যায় যে মাটির নাইট্রোজেনের পরিমাণ কমে যায় তাই এই সব ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন এবং অন্যান্য সারের ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

- **যন্ত্রপাতি**—বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিরাট এলাকা জুড়ে গম চাষের জন্য বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয়। এদের মধ্যে ট্রাক্টর, কম্বাইন্ড হারভেস্টর, সিডার ইত্যাদি প্রধান। বিভিন্ন উন্নত দেশগুলিতে গম চাষের উন্নতির মূলে এই যন্ত্রপাতির ব্যবহার এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

এই সব কারণ ব্যতীত গম উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে গমের ব্যবসার ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ এক বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকে।

9.14.3 পৃথিবীর প্রধান প্রধান গম উৎপাদনকারী অঞ্চল সমূহ (Major Wheat Producing Areas of the World)

পৃথিবীর বিভিন্ন নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলগুলি ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ভৌগোলিক পরিবেশের সহায়তার দরুন ব্যাপকভাবে গমের চাষ হয়ে থাকে। তবে গম বিভিন্ন জলবায়ুতে জন্মাতে পারে বলে ক্রান্তীয়

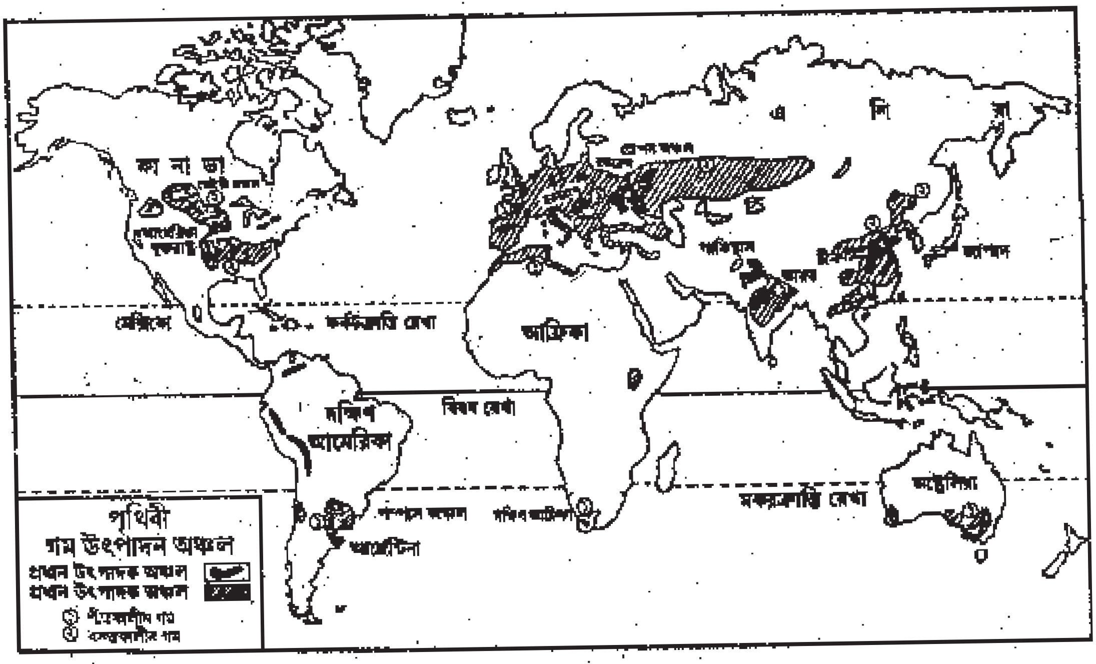

চিত্র ১০— পৃথিবীর গম উৎপাদন অঞ্চল সমূহ।

ও উপক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলেও গমের চাষ হয়ে থাকে। গমের উৎপাদন ও ব্যবহারের ভিত্তিতে গম উৎপাদন অঞ্চল গুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

- যে সমস্ত দেশে শুধুমাত্র স্থানীয় চাহিদা মেটানোর জন্য গম উৎপাদন করা হয়। যেমন চিন, রাশিয়া, ভারত, পাকিস্তান, ইরাক, তুরস্ক, ইউক্রেন ইত্যাদি ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল।

- যে সমস্ত দেশ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে গমের উৎপাদন করে থাকে। যথা—কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা ইত্যাদি স্বল্প বসতিযুক্ত অঞ্চল সমূহ।

পৃথিবীর গম উৎপাদন অঞ্চলগুলি, ২০০০

সারণি 10.19.3.1

দেশ	উৎপাদন (কোটি মে. টন)	দেশ	উৎপাদন (কোটি মে. টন)
চিন	12.05	অস্ট্রেলিয়া	1.95
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	6.05	জার্মানি	2.10
ভারত	7.42	তুরস্ক	1.98
রাশিয়া	4.32	পাকিস্তান	2.10
ফ্রান্স	3.75	ইউক্রেন	1.73
কানাডা	2.68	গ্রেট ব্রিটেন	1.67

- **চিন (China)** — পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গম উৎপাদক দেশ চিন। ২০০০ সালে World Resource এর হিসাব অনুসারে চিন 12.05 কোটি মেট্রিক টন গম উৎপাদন করে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এবং চিনের হেক্টর প্রতি উৎপাদন গড়ে প্রায় 3795 কেজি। এখানে শীত ও বসন্তকালীন এই দুই প্রকারের গম উৎপাদিত হলেও অধিকাংশ গমই শীতকালীন।

চিনের গম উৎপাদন অঞ্চলগুলির মধ্যে উত্তর চিনের হোয়াংহো নদীর অববাহিকা, উত্তর পূর্ব চিনে, চিনে ইয়াং সিকিয়াং অববাহিকা ও ব-দ্বীপ অঞ্চল এবং সেচুয়ান অববাহিকায় প্রচুর গম উৎপন্ন হয়।

চিনে প্রচুর গম উৎপাদিত হওয়া সত্ত্বেও জনসংখ্যা অধিক হওয়ার জন্য বিশ্ববাজারে রপ্তানি করার মত গম অবশিষ্ট থাকে না উপরন্তু প্রচুর গম আমদানি করার প্রয়োজন হয়।

- **আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (United States of America)** — আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ও দক্ষিণ ডাকোটা, মন্টানা, মিনেসোটা ও সংলগ্ন কানাডার আলবার্টা, সাসকাচুয়ান, অন্টারিও প্রদেশে অতি ব্যাপক আকারে যান্ত্রিক উপায়ে বসন্তকালীন গম চাষ করা হয়ে থাকে। ইহা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গম উৎপাদক অঞ্চল। এখানে প্রতি হেক্টরে উৎপাদন প্রায় ৬৪১১ কেজি। এই গম অঞ্চলে অবস্থিত লোহিত নদী উপত্যকায় এত বেশি গম উৎপাদিত হয় যে একে পৃথিবীর রুটির ঝুড়ি বলা হয়ে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ৯৪° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশের পশ্চিমে প্রেইরি ও চেরনোজেম মৃত্তিকা বলয়ে তিনটি গম উৎপাদন বলয় গড়ে উঠতে দেখা যায়। সেগুলি যথাক্রমে নিম্নরূপ—

- বাসন্তিক গম বলয় — প্রেইরির উত্তরাংশে মন্টানা, উত্তর ও দক্ষিণ ডাকোটা ও মিনেসোটা এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানে প্রধানত লাল কঠিন বসন্তকালীন গম চাষ করা হয়।

- শীতকালীন গম বলয় — শীতকালীন গম অঞ্চলে নরম ও কঠিন উভয় প্রকার গমের চাষ হয়ে থাকে। বসন্তকালীন গমবলয়ের দক্ষিণে নেব্রাস্কা কানসাস, মিসৌরী, ওকলাহামা এবং উত্তর টেকসাস অঞ্চলে লাল কঠিন শীতকালীন গমের চাষ হয়। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যভাগ হতে পূর্বদিকে সমুদ্রের উপকূলভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের প্রধানত ইলিনয় ইন্ডিয়ানা, ওহিও, পেনসিলভেনিয়া ও মধ্য আটলান্টিক অঞ্চল সমূহে নরম শীতকালীন গমের চাষ হয়।

- সাদা নরম গম অঞ্চল — যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত ক্যালিফোর্নিয়া এবং কলম্বিয়ার মালভূমির ওয়াশিংটন, ওরিগন, ইডাহো প্রভৃতি রাজ্যগুলিতে প্রচুর পরিমাণে সাদা গমের চাষ হয়। কলম্বিয়া নদী পরিকল্পনার সহায়তায় এই অঞ্চলে জলসেচ করা হয়। এখানকার অধিকাংশ গম শুষ্ক কৃষির মাধ্যমে উৎপন্ন হয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এবং বৃহদায়তন কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে গম চাষ করা হয় এবং দেশের জনসংখ্যার তুলনায় উৎপাদন অনেক বেশি হয় বলে প্রচুর পরিমাণে গম বিদেশে রপ্তানি করা হয়। গম উৎপাদনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্থান তৃতীয় হলেও রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম। এই অঞ্চলের নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি বন্দর হতে গম রপ্তানি করা হয়।

- কানাডা — পৃথিবীতে গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে কানাডা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মত কানাডাতেও যন্ত্রের সহায়তায় ব্যাপক কৃষি পদ্ধতির মাধ্যমে গমের চাষ হয়। অতিরিক্ত শীতলতার জন্য এই অঞ্চলে শীতকালীন অপেক্ষা বাসন্তিক গমের চাষ অধিক হয়ে থাকে। তবে দক্ষিণ পূর্ব লরেন্সীয় নিম্নভূমিতে শীতকালীন গমের চাষ হয়ে থাকে। এখানকার প্রধান গম উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির মধ্যে ম্যানিটোবা, সাসকাচুয়ান, আলবার্টা প্রভৃতি প্রধান। সাসকাচুয়ানে সবচেয়ে বেশি গম উৎপাদিত হয়। মোট উৎপাদনের প্রায় ৬৫% এই অঞ্চল হতে সংগৃহীত হয়ে থাকে। আভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় গমের উৎপাদন অনেক বেশি হয় বলে প্রচুর গম পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে রপ্তানি করা হয়। গমের রপ্তানি বাড়িয়ে এই দেশ পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে রয়েছে। পোর্ট-আর্থার, চার্চিল, উইনিপেগ, হ্যালিফ্যাক্স প্রভৃতি বন্দরগুলি হতে গম রপ্তানি হয়ে থাকে।

- রাশিয়া — রাশিয়া গম উৎপাদনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রয়েছে। ইউক্রেনে সারনোজেম কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর দিক দিয়ে পূর্বদিকে সাইবেরিয়া পর্যন্ত একটি ত্রিভুজের আকারে গম বলয় বিস্তৃত রয়েছে। ডন উপত্যকা, ভলগা অঞ্চল, ইউরাল অঞ্চল, কাজাকিস্তান, উত্তর ককেসাস, মস্কো ও গোর্কী গম উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। এই অঞ্চলে কৃষি বিপ্লবের পর থেকে যৌথ খামার চালু হবার ফলে গম উৎপাদনের অঞ্চলের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। স্তেপ অঞ্চলের নীপর নদী অঞ্চল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের এশিয় অংশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল কৃষি জমির অধীনে আনা হয়েছে। এই

লয়ের উত্তরে বাসন্তিক গম এবং দক্ষিণে শীতকালীন গম প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। দেশের জনসংখ্যা অধিক বলে আভ্যন্তরীণ চাহিদার জন্য বিদেশে গম রপ্তানি করা সম্ভব হয় না। অধিকন্তু প্রতিকূল আবহাওয়া বা ফসল হানি হলে তখন বিদেশ থেকে গম আমদানি করতে হয়।

এখানে অধিক শীতলতার জন্য উচ্চফলনশীল গমের বীজ হতে দ্রুত বীজের অঙ্কুর উদগম করার জন্য এক বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তাকে বলে ভার্নালাইজেশন (Varnalisation) পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে সাইবেরিয়ার এক বিপুল অংশে গমের চাষ করা হয়।

□ **ইউক্রেন অঞ্চল** — C.I.S. এর অন্তর্ভুক্ত দেশের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম গম উৎপাদন অঞ্চল হল ইউক্রেন। ইউক্রেনে পরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গম উৎপাদন করা হয় বলে এই দেশে প্রচুর পরিমাণে গম উৎপাদিত হয়ে থাকে। অত্যধিক গম উৎপাদনের জন্য ইউক্রেনকে রুটির ঝুড়ি (Bread busket) বলা হয়। এখানকার নীপার ও নিস্টার নদীর অববাহিকা এবং খারকভ ও কিয়েভ অঞ্চলের উর্বর চেরনোজেম মৃত্তিকা অঞ্চলে প্রধানত গমের চাষ হয়। এখানে শীত ও বসন্ত উভয়প্রকার গম জন্মালেও শীতকালীন গমের চাষই অধিক হয়ে থাকে।

□ **কাজাকিস্থান** — C.I.S. অঞ্চলের আর একটি অন্যতম গম উৎপাদক দেশ হল কাজাকিস্থান। কাজাকিস্থানের কাস্পিয়ান সাগর ও আরল সাগর সংলগ্ন স্থানে জলসেচের সহায়তায় শীতকালীন গমের চাষ হয়ে থাকে।

● **আর্জেন্টিনা** — দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা বিশ্বের গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এখানকার নাতিশীতোষ্ণ পম্পাস তৃণভূমি অঞ্চলে বাণিজ্যভিত্তিক গমের চাষ হয়ে থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার মোট উৎপাদনের প্রায় ৬২% উৎপাদিত হয় এই অঞ্চলে। এখানে জনবসতি কম বলে উৎপাদনের উদ্বৃত্ত গম বিদেশে রপ্তানি হয়।

● **ব্রাজিল** — দক্ষিণ আমেরিকার অন্য বৃহত্তম গম উৎপাদক দেশ ব্রাজিল। এখানকার তৃণভূমি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে গম উৎপাদিত হয়। দেশের দক্ষিণে অবস্থিত রিও গ্রানডে ডো সুল (Rio Grande do sul) প্রদেশে সবচেয়ে বেশি গম উৎপাদিত হয়।

● **অস্ট্রেলিয়া** — অস্ট্রেলিয়ার দুটি গম বলয় ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু যুক্ত অঞ্চলে অবস্থিত। প্রধান বলয়টি দেশের দক্ষিণ পূর্ব ভাগে মারে ডার্লিং উপত্যকায় ভিক্টোরিয়া ও নিউ সাউথ অস্ট্রেলিয়া এবং অপর বলয়টি দেশের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে গড়ে উঠেছে।

এই অঞ্চলে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক গম উৎপাদিত হয় বলে প্রচুর পরিমাণে গম বিদেশে রপ্তানি করে। গম রপ্তানিতে এই দেশ পৃথিবীতে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। প্রধানত এডিলেড, সিডনি ও মেলবোর্ন বন্দর হতে গম রপ্তানি করা হয়।

● **ভারত** — ১৯৯১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গম উৎপাদনে ভারতের স্থান পৃথিবীতে তৃতীয় এবং এশিয়ায় দ্বিতীয়। এদেশে সাধারণত অক্টোবর, নভেম্বর মাসে গম চাষ শুরু হয় এবং মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে ফসল কাটা হয়। অর্থাৎ ভারতে ইহা রবি শস্য হিসাবে চাষ হয়। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের গম চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা—

জলবায়ু — শীতকালে উষ্ণতা ১০°—১৫° সেঃ এবং গ্রীষ্মকালে ২১°—২৬° সেঃ প্রয়োজন। ভারতে ৫০-৭৫ সে.মি. বৃষ্টিপাত গম চাষের পক্ষে আদর্শ। দক্ষিণ ভারতের বৃষ্টিপাত উত্তর ভারতের তুলনায় তুলনামূলক ভাবে বেশি হয়। বেশি বৃষ্টিপাত গম চাষের পক্ষে ক্ষতিকর।

মৃত্তিকা—নাইট্রোজেন, পটাশ ও ফসফেট সমৃদ্ধ ভারী উর্বর দোআঁশ মৃত্তিকা বা হাল্কা কাদা মাটি গম চাষের পক্ষে উপযুক্ত। উত্তর ভারতের গম উৎপাদক অঞ্চল উর্বর দোআঁশ পলল মৃত্তিকায় গঠিত। দক্ষিণ ভারতের লাভা সমৃদ্ধ কৃষ্ণ মৃত্তিকায় Triticum Durum জাতীয় গম এবং নীলগিরি অঞ্চলের লোহিত মৃত্তিকায় Triticum Dicoccum জাতীয় গম চাষ হয়।

ভারতের প্রধান উৎপাদক অঞ্চল

উত্তর ভারত—

উত্তরপ্রদেশ — গোরকপুর, বুলন্দ, মীরাট, মুরাদাবাদ ও সাহাজাহানপুর।

পাঞ্জাব — ফিরোজপুর, লুধিয়ানা, ভাতিণ্ডা, অমৃতসর, গুরুদাসপুর।

হরিয়ানা — ঝিন্দ, আম্বালা, গুরগাও, হিসার।

এ ছাড়াও হিমাচল প্রদেশের কামরা ও মাণ্ডি জেলা, জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগর, অনন্তনাগ, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং বিহারের চম্পারন, পাটনা মুঙ্গের, গয়া প্রভৃতি জেলা।

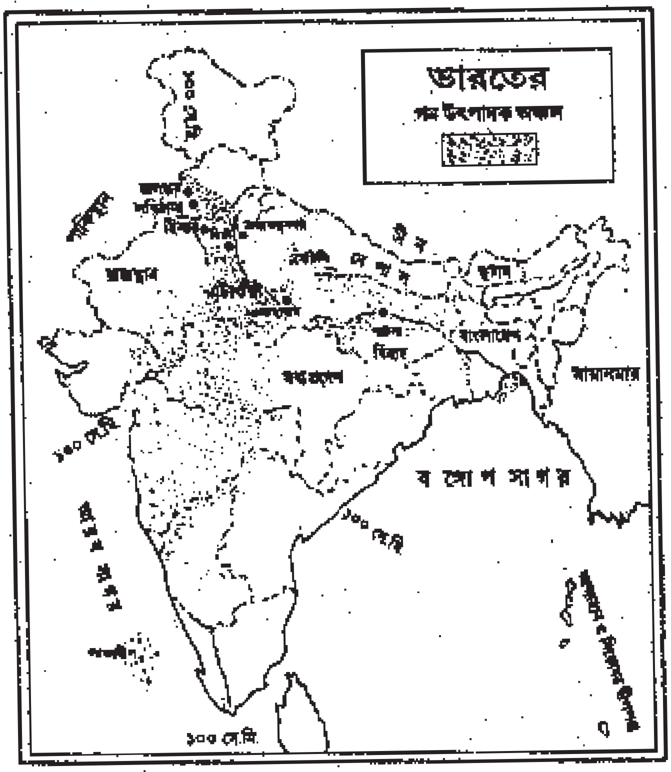

চিত্র ১১— ভারতের গম উৎপাদক অঞ্চল সমূহ।

দক্ষিণ ভারত— প্রধান রাজ্যগুলি হল মধ্য প্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র।

মধ্যপ্রদেশ — নর্মদা নদী উপত্যকা এবং সাগর, জব্বলপুর, ইন্দোর, ভূপাল প্রভৃতি।

মহারাষ্ট্র — নাগপুর, আকোলা, অমরাবতী, ওয়াঙ্গাবাদ, নাসিক, পুনে।

গুজরাট — আমেদাবাদ, রাজকোট ও খেরা।

এছাড়াও কর্ণাটক, বিজাপুর, রায়পুর জেলায় গম চাষ হয়ে থাকে।

ভারতের গম চাষের সমস্যা

- জলবায়ুর উপর নির্ভরশীলতা — মৌসুমী জলবায়ু সমৃদ্ধ ভারতে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় না। অথচ গম শীতকালীন ফসল হিসাবে চাষ হয়। শীতকালে বৃষ্টিপাত (পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে) না হলে সেচের উপর নির্ভর করতে হয়। এতে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

- হেক্টর প্রতি কম ফলন — সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতে গমের উৎপাদন আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও অন্যান্য দেশের তুলনায় যথেষ্ট কম। যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে .... সেখানে ভারতে .... কেজি।

- কৃষক প্রতি গম জমির পরিমাণ কম — ভারতে মাথা পিছু গম জমির পরিমাণ খুব কম। অস্ট্রেলিয়া ও কানাডায় যেখানে মাথা পিছু ১ হেক্টর করে গম জমি দেখা যায় সেখানে ভারতে ১ হেক্টর জমি গড়ে ২৫ জনের ভাগে।

- অভ্যন্তরীণ চাহিদা — প্রতি বছর ভারতে জনসংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে সমতা আনা যায় না বরং বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

- অতিরিক্ত সেচের কুফল — ভারতে প্রধান গম উৎপাদক রাজ্য উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা প্রধানত সেচ নির্ভর অতিরিক্ত সেচের ফলে কৃষি জমিতে লবণতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে উৎপাদনের পরিমাণও হ্রাস পাচ্ছে।

ভারতের প্রধান গম উৎপাদন রাজ্যগুলির পরিসংখ্যান নিম্নে সারণিতে দেওয়া হল।

সারণি 10.19.3.2

ভারতের গম উৎপাদন ২০০০

রাজ্য	উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)	রাজ্য	উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)
উত্তরপ্রদেশ	259.8	মধ্যপ্রদেশ	84.6
পাঞ্জাব	159.1	রাজস্থান	67.3
হরিয়ানা	96.4	বিহার	43.7

উৎস :

9.14.4 গমের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade of Wheat)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে খাদ্যশস্য হিসেবে গমের স্থান প্রথম। পৃথিবীর গম রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স ইত্যাদি প্রধান এবং আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে রাশিয়া, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, ভারত, চিন, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশগুলি প্রধান। চিত্রে গমের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যগত অবস্থা দেখান হল।

9.15 বাগিচা ফসল - পানীয় জাতীয়- চা (Plantation Crop–Bevarage Tea)

বাগিচা কৃষির সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্যের জন্য ১০.৭.৪ দ্রষ্টব্য। চা উষ্ণ এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের এক প্রকার চিরহরিৎ গুল্মের পাতা। এই গাছের পাতা শুকিয়ে চা প্রস্তুত করা হয়। চা একটি জনপ্রিয় মৃদু উত্তেজক পানীয়। চিন দেশ চায়ের আদি জন্মভূমি। চায়ের বিজ্ঞানসম্মত নাম "Thea Sinerinis" চা প্রধানত দুটি প্রজাতির হয়। (১) চৈনিক চা (Thea Sinernis) (২) ভারতীয় চা (Thea assamica) ।

চিন জাতীয় গাছের পাতা স্বাদ ও গন্ধের জন্য প্রসিদ্ধ এবং অসম জাতীয় ভারতীয় গাছের পাতা রং এর জন্য বিখ্যাত। চা গাছ আকারে ৯ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে কিন্তু চা পাতা আহরণের সুবিধার জন্য ঐ গাছগুলিকে ২ মিটারের বেশি বড় হতে দেওয়া হয় না। তাই গাছগুলিকে দেখতে এক একটা ঝোপের মত মনে হয়।

চা যদিও মাত্র কয়েকটি দেশে উৎপাদিত হয় কিন্তু মৃদু উত্তেজক পানীয় হিসাবে সমগ্র বিশ্বে এর চাহিদা বর্তমান।

9.15.1 চা উৎপাদনের ভৌগোলিক অবস্থা সমূহ (Geographical Conditions for the Growth of Tea)

চা উৎপাদনের ভৌগোলিক পরিবেশগুলিকে ২টি প্রধান ভাগে এবং কিছু উপবিভাগে বিভক্ত করা যায়।

সারণি ১০.২১.১.১

চা উৎপাদনের ভৌগোলিক উপাদান

- প্রাকৃতিক
  - জলবায়ু
    - উত্তাপ
    - বৃষ্টিপাত
  - মৃত্তিকা
  - ভূমিরূপ
- আর্থসামাজিক
  - শ্রমিক
  - মূলধন
  - বাজার
  - পরিবহন
  - সার ও কীটনাশক

প্রাকৃতিক কারণ সমূহ—

জলবায়ু — জলবায়ু বলতে কোন অঞ্চলের উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতকে বোঝায়। চা উষ্ণ ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলের ফসল তাই চা চাষের জন্য প্রচুর পরিমাণে জলের দরকার। এই জল পাওয়া যায় বৃষ্টিপাত হতে। এই বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে চায়ের স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ ইত্যাদি। সাধারণত ১৫০ সে. মি. হতে ২০০ সে. মি. বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে চা ভাল জন্মায়। তুষার বা কুয়াশা এবং শীতল জলবায়ু চা চাষের পক্ষে খুব ক্ষতিকর না হলেও চা পাতার উৎপাদনকে ব্যাহত করে।

বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে গড় উষ্ণতা ২০° সেঃ হতে ৩০° সেঃ এবং গ্রীষ্মকালে অন্তত ২৭° সেঃ তাপমাত্রা সম্পন্ন অঞ্চলে চায়ের ফলন ভাল হয়।

মৃত্তিকা— জলনিকাশী বন্দোবস্তযুক্ত উর্বর লৌহ মিশ্রিত অম্লধর্মী দোআঁশ মাটি চায়ের পক্ষে উপযোগী।

ভূ-প্রকৃতি— জলনিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত পাহাড়ী ঢালু জমি চা চাষের পক্ষে উপযোগী। কারণ চা গাছের গোড়ায় জল জমলে তা চা গাছের ক্ষতি করে। এই কারণে পাহাড়ী ঢালু জমি চা বাগানগুলি গড়ে উঠতে দেখা যায় এবং উচ্চতার তারতম্যে চায়ের গুণাগুণেরও তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

আর্থ সামাজিক কারণ সমূহ—

শ্রমিক — চা চাষের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দক্ষ ও পরিশ্রমী শ্রমিকের প্রয়োজন। জমি তৈরি করা, গাছ ছাঁটাই, সার দেওয়া, বাগান পরিষ্কার ইত্যাদি কাজে যেমন প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয় তেমনি গাছ হতে চা পাতা সংগ্রহ করার জন্য যথেষ্ট নিপুণ শ্রমিকের প্রয়োজন। শ্রমিকের নিপুণতার উপর চায়ের গুণাগুণ নির্ভর করে। কারণ দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি ঠিকমত সংগ্রহ করতে না পারলে চায়ের উৎকর্ষতা কমে যায়।

মূলধন — চা বাগান তৈরি করা, সার, কীটনাশক, নানা যন্ত্রপাতি, শ্রমিকের মজুরী ইত্যাদি কার্জে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়।

বাজার — চা বাণিজ্য ভিত্তিক ফসল তাই চায়ের চাষ নির্ভর করে চাহিদা বা বাজারের উপর দেশের আভ্যন্তরীন চাহিদা ব্যতীত, চিন, শ্রীলঙ্কা, কেনিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে চায়ের ব্যাপক চাহিদা থাকার ফলে ভারতে চাষের এত উন্নতি ঘটেছে।

পরিবহন ব্যবস্থা— চা যেহেতু বাণিজ্য ভিত্তিক ফসল তাই দেশ বিদেশে চা সরবরাহের জন্য উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

সার কীটনাশক ইত্যাদি— চা চাষের ফলে মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে চায়ের জমিতে উপযুক্ত সারের ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। তাই সারের অভাব হলে হেক্টর প্রতি উৎপাদন কমে যায়।

এছাড়া চা-গাছ ও এর পাতাকে পোকা মাকড়ের হাত হতে রক্ষা করার জন্য নানা কীটনাশক ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। আবার বৃষ্টিপাতের অভাব হলে জলসেচের ব্যবস্থা রাখারও অত্যন্ত প্রয়োজন।

9.15.2 চায়ের শ্রেণিবিভাগ (Types of Tea)

প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া অনুসারে চা-কে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি যথাক্রমে নিম্নরূপ—

- **কালো চা (Black Tea)** — গাছ থেকে পাতা তুলে তাকে শুকিয়ে গুঁড়ো করা হয়। এরপর ঐ গুঁড়ো পাতাকে দু-তিন দিন ঘরে বদ্ধ করে রেখে ঐ গুঁড়ো পাতাকে আগুনে সেঁকে চালুনিতে ছেঁকে গুঁড়ো চা, পাতা চা ইত্যাদি নানা ভাগে ভাগ করা হয়।

- **সবুজ চা (Green Tea)** — কালো চায়ের মত এই পাতাকে সেঁকা হয় না। চা পাতাকে গরম জলে সিদ্ধ করে রোদে শুকিয়ে এই চা তৈরি করা হয় তাই এই চায়ের রং সবুজ থাকে। এই চা সাধারনত চিন, জাপান, ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে এই চায়ের প্রচলন রয়েছে।

- **ইষ্টক চা (Brick Tea)** — এই চায়ের ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট প্রকৃতির চায়ের পাতার সঙ্গে মশলা, মাখন, ভাতের মত ইত্যাদি মিশিয়ে চাপ দিয়ে ইটের আকারে জমিয়ে যে চা প্রস্তুত করা হয় তাকে ইষ্টক চা বলে। চিন, জর্জিয়া, আজার বাইজান প্রভৃতি দেশে এই চায়ের বিশেষ প্রচলন রয়েছে।

- **ওলং চা (Olong Tea)** — তাইওয়ানের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের চা বাগানে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সুগন্ধী এক প্রকার চা প্রস্তুত করা হয় একে ওলং চা বলে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই চায়ের বিশেষ কদর রয়েছে।

- **প্যারাগুয়ে চা (Paraguay Tea)** — প্যারাগুয়ে ও ব্রাজিলের অরণ্য হতে এক প্রকার বন্য চায়ের পাতা সংগ্রহ করে বিশেষ প্রক্রিয়ায় চা প্রস্তুত করা হয়। এই জাতীয় চাকে প্যারাগুয়ে চা বলা হয়। বর্তমানে ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি অঞ্চলে এই চা বেশ জনপ্রিয়।

9.15.3 পৃথিবীর চা উৎপাদনকারী দেশসমূহ (Tea Producing Areas of the World)

পৃথিবীর উৎপাদিত চায়ের শতকরা ৮০ ভাগই উৎপাদিত হয় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া মহাদেশের ভারত, চিন, জাপান, তাইওয়ান, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, ইরান, মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে। এছাড়া আফ্রিকার কেনিয়া, তানজানিয়া, মোজাম্বিক, মাদাগাস্কার প্রভৃতি ক্রান্তীয় অঞ্চলগুলিতেও চা উৎপাদিত হয়। নিম্নে সারণিতে পৃথিবীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চা উৎপাদনকারী দেশের উৎপাদন দেওয়া হল।

সারণি ..... ঃ পৃথিবীর চা উৎপাদনকারী দেশ সমূহ (২০০০)

দেশ	উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)	দেশ	উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)
ভারত	8.10	কেনিয়া	2.25
চিন	7.23	ইন্দোনেশিয়া	1.52
শ্রীলঙ্কা	2.84		

চা উৎপাদনে বিশ্বে ভারতের স্থান পৃথিবীতে প্রথম। এর পর চিন, শ্রীলঙ্কা, কেনিয়া, ইন্দোনেশিয়ার স্থান।

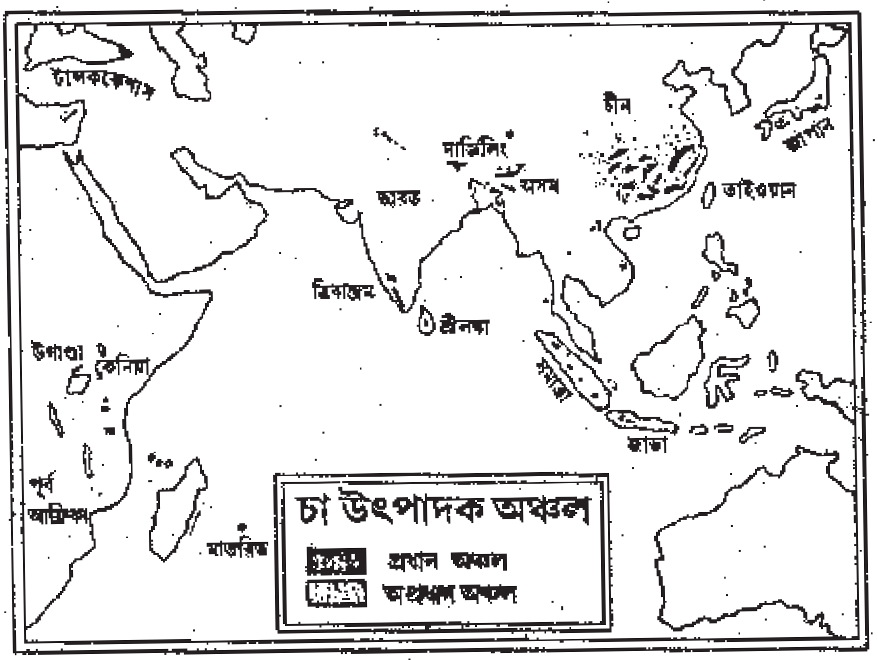

চিত্র ১২— চা উৎপাদক অঞ্চল।

- **ভারত (India)** — ভারতের একটি অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক ফসল চা। চা রপ্তানি করে ভারত প্রচুর পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে। ভারতের অধিকাংশ চা কালো চা (Black Tea) এবং এই চায়ের ৮০% ভাগ উৎপন্ন হয় উত্তর ও উত্তরপূর্ব ভারতে। অবশিষ্ট 20% উৎপন্ন হয় দক্ষিণ ভারতে।

- **উত্তর ও উত্তর পূর্ব ভারতের চা উৎপাদক অঞ্চল (Tea Producing Areas of North and North Eastern India)** — উত্তর ভারতের চা বাগানগুলি প্রধানত উত্তর প্রদেশের নরেন্দ্রনগর, গাড়োয়াল, আলমোড়া, দেরাদুন প্রভৃতি জেলায় এবং হিমাচল প্রদেশের সোলান, মান্ডি প্রভৃতি জেলায় উপত্যকা সন্নিহিত পাহাড়ী ঢাল অঞ্চলে অবস্থিত। অন্যদিকে উত্তর পূর্ব ভারতের চা বাগিচাগুলি প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, ডুয়ার্স অঞ্চল, অসমের সুর্মা উপত্যকা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অঞ্চলের পাহাড়ের ঢালের উপর ৯০মিঃ হতে ২০০০ মিটার উচ্চতার মধ্যে অবস্থিত। এখানকার প্রধান চা উৎপাদন অঞ্চলগুলি হল দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, কাছার, লখিমপুর, কামরূপ, শিবসাগর, নওগাঁ, গোয়ালপাড়া, তেজপুর, ডিগবয় ইত্যাদি প্রধান।

এছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা, ধর্মপুর, যড়ামুড়া, মনিপুর, অরুণাচল প্রদেশে বিক্ষিপ্ত ভাবে চা উৎপাদিত হয়।

- **দক্ষিণ ভারতের চা উৎপাদক অঞ্চল (Tea Producing Areas of Southern India)** — দক্ষিণ ভারতের কেরালা, নীলগিরি পার্বত্য অঞ্চল, কর্ণাটক জেলার কোয়েম্বাটুর, মাদুরাই, ইড়ুকু, প্রভৃতি জেলায় এবং তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলি, নাগারকোয়েল প্রভৃতি জেলায় চা উৎপাদিত হয়।

পৃথিবীতে চা উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থানে অবস্থিত হলে ভারতের চা বাগিচাগুলি কতগুলি বিশেষ সমস্যায় জর্জরিত। এই সমস্যাগুলি নিয়ে নিচে আলোচনা করা হল।

- ভারতে চা চাষের সমস্যা (**Problems of Tea production in India**) —
    - ভারতের চা বাগানের অধিকাংশ গাছগুলি পুরানো এবং এই পুরানো গাছগুলির পরিবর্তে সময় মত নতুন চারা রোপণ করা হয় না বলে চায়ের উৎপাদন কম। ভারতে হেক্টর প্রতি ফলনের গড় ১৭৭১ কেজি।
    - বেশির ভাগ চা বাগিচা আয়তনে ছোট বলে আধুনিক প্রথায় চাষ করতে অসুবিধা হয় এবং উৎপাদন ব্যয় বেশি পড়ে। এ ছাড়া সার, সেচ, বিদ্যুৎ, মজুরী ও অন্যান্য পরিকাঠামোগত ব্যয় বেশি হওয়ার জন্যও চায়ের দাম বেশি বলেও চায়ের দাম তুলনামূলকভাবে বেশি।
    - আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষত কেনিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তাইওয়ান, চিন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক দামে ভারতের স্থান ধীরে ধীরে পশ্চাদপদ হয়ে চলেছে।
    - বনভূমি হ্রাস পাওয়ার ফলে চায়ের প্যাকিং করার জন্য বাক্সের সমস্যাও একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বাধা।
    - উৎপাদনকারী রাজ্যগুলি নানা রাজনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত হবার ফলেও চায়ের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

সমাধান—

- চায়ের উৎপাদন বাড়াতে নতুন গাছ লাগাতে হবে।
- উৎপাদন ব্যয় কমাতে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নত মানের সার ব্যবহার প্রয়োজন। পাতা তুলতে যন্ত্র ব্যবহার করলে খরচ অনেক কমবে। এছাড়া চা বাগিচার অব্যবহৃত জমিতে চা-এর পরিবর্ত হিসাবে অন্যান্য ফসল বা ফলের চাষ (আনারস) করলে উৎপাদন ব্যয় অনেক কমবে।
- চা রপ্তানির জন্য ভারতীয় জাহাজের সংখ্যা বাড়াতে হবে।
- বৈজ্ঞানিক উপায়ে Plywood এর পরিবর্তে চায়ের বাক্স প্রস্তুতের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে চায়ের স্বাদ, গন্ধ বা রং নষ্ট না হয়।
- আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতকে Instant Tea উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি করে এবং বিদেশের বাজারে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রচার দ্বারা ভারতে চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

- অন্যান্য চা উৎপাদক দেশ সমূহ ঃ—

চিন (China) — চায়ের আদি জন্মস্থান চিন হলেও উৎপাদনের ক্ষেত্রে চিনের স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয়। চিন সবুজ চা উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ হলেও কালো চাও চিনে উৎপাদিত হয়।

চিন দেশে চা প্রধানত দক্ষিণ পূর্ব চিনের সিকিয়াং ও ইয়াং সিকিয়াং নদীর অববাহিকায় পর্বতের ঢালে ও পাদদেশে চা উৎপাদিত হয়ে থাকে। চা উৎপাদনের দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করলেও চা রপ্তানিতে চিন পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

শ্রীলঙ্কা — চা উৎপাদনে শ্রীলঙ্কার স্থান তৃতীয়। এখানকার কাণ্ডির দক্ষিণে পার্বত্য অঞ্চলে অধিকাংশ চা বাগানগুলি অবস্থিত। চা রপ্তানিতে শ্রীলঙ্কা এক বিশেষ স্থানে অবস্থান করে রয়েছে।

পৃথিবীর অন্যান্য চা উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে কেনিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, জাপান এবং বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য।

- **চায়ের আন্তর্জাতিক বানিজ্য :—**

মৃদু উত্তেজক পানীয় রূপে চায়ের বাজার বিশ্বব্যাপী। চা রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে ভারত পৃথিবীতে সর্বপ্রথম। এরপর চিন, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ইত্যাদি দেশের স্থান। এইসব অঞ্চল হতে চা ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার মত উন্নত দেশগুলিতে চা রপ্তানি করে। ভারত হতে চা প্রধানত বৃটিশ যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, ইরান, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে চা রপ্তানি করা হয়।

9.16 মানব সম্পদ সম্পর্কে ধারণা (Concept on Human Resource)

মানুষ এবং সম্পদ একে অপরের পরিপূরক। মানুষ সম্পদের সৃষ্টিকারী এবং ভোগকারী কোন দেশের সম্পদ উন্নয়নে মানুষের ভূমিকা দুপ্রকার (১) পরিমাণগত দিক ও (২) গুণগত দিক। প্রথমটি হল জনশক্তি বা Man Power এবং দ্বিতীয়টি হল মানুষের শ্রম, বুদ্ধি প্রযুক্তিগত দিক, শিক্ষা ইত্যাদি।

(এর পরবর্তী অংশের জন্য EGO 06, Block I 4.2.1, 4.2.2 অংশ দেখুন)

9.17 সম্পদ সৃষ্টিতে মানুষের ত্রয়ী ভূমিকা (Triple Role of Man in Resource Creation)

EGO 06, Block I 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 অংশ দেখুন।

9.18 মানব সম্পদের ভৌগোলিক বন্টন (Geographical Distribution of Human Resource)

মানব সম্পদের সম্পর্কে ধারণা সম্পূর্ণ করতে গেলে পৃথিবীতে মানব সম্পদের ভৌগোলিক বন্টন সম্পর্কে ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবীর জনসংখ্যার বন্টন লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে কোথাও

জনসংখ্যা বেশি আবার কোথাও কম। নিম্নে সারণি লক্ষ্য করলে পৃথিবীর জনবসতির বণ্টন সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে।

সারণি ......

পৃথিবীর জনসংখ্যা বণ্টন, ২০০০

মহাদেশ	জনসংখ্যা (কোটি)
এশিয়া	370.78
আফ্রিকা	80.04
ইউরোপ	76.03
উঃ আমেরিকা	31.27
দঃ আমেরিকা	48.45
ওশিয়ানিয়া	3.03
মোট	609.56

পৃথিবীর মোট জনবসতির অর্ধেকের বেশি বাস করে এশিয়াতে, তারপর আফ্রিকা ও ইউরোপে। এর পরের অংশের জন্য EGO 06, Block I এর 4.6, 4.6.1, 4.6.1.1 হতে 4.6.1.6 পর্যন্ত দেখুন।

9.19 মানব সম্পদের অসম বণ্টনের কারণ নির্ধারণ (Factors for Uneven Distribution of Population in the World)

মানব সম্পদের বণ্টন বলতে পৃথিবীতে বসবাসযোগ্য ভূমিতে জনসংখ্যার ঘনত্বকে বোঝায়। অর্থাৎ প্রতি কিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে তার পরিমাপকে, প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যার ঘনত্ব হল জমির পরিমাণের সঙ্গে জনসংখ্যার পরিমাণের একটা আনুপাতিক সম্পর্ক। এই ঘনত্বের বিচারে পৃথিবীর জনসংখ্যা বিচার করলে দেখা যায় যে এই ঘনত্ব সর্বত্র সমান নয়। অঞ্চল ভেদে এই জনঘনত্বের বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

(এরপর EGO 6, Block I এর 4.5, 4.5.1 হতে 4.5.5 এবং 4.5.5.1 হতে 4.5.5.3 সঙ্গে 4.5.6 অংশ দেখুন)

9.20 মানব সম্পদ বৃদ্ধির হার (Growth Rate of Human Resource)

পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হারে ঘটেছে। এই বৃদ্ধির হার জানতে গেলে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ইতিহাস জানা প্রয়োজন।

(এরপর EGO 6, Block I এর 4.4 অংশ দেখুন)

9.20.1 জন্মহার (Birth Rate)

জন্মহার কোন নির্দিষ্ট সময়, কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট পরিমাণ জনসংখ্যার সাথে সম্পর্কিত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্ণয় করার জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তা Barclay সংজ্ঞা অনুসারে "The Crude Birth Rate is a ratio of total registered live birth to the total population, also in some specific year, also multiplied by 1000." এই জন্মহারকে বলা হয় মূল জন্মহার বা Crude Birth Rate (C.B.R).

$$\text{C. B. R.} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বছরের মোট জীবিত জন্মহার}}{\text{নির্দিষ্ট বছরে (মধ্য সময়ে) মোট জনসংখ্যা}} \times 1000$$

জন্মহার ১০০০ এর পরিবর্তে শতকরা হিসেবে নির্ণয় করতে হলে ধ্রুবক ১০০০ এর পরিবর্তে ১০০ দিয়ে গুণ করে নেবেন।

9.20.2 মৃত্যুহার (Mortality Rate)

David-M-Heer তাঁর Society and population গ্রন্থে মৃত্যুহার এর সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন "Crude death rate is the ratio of the number of deaths which occur within a given population during a specified year to the Size of death population at the mid-year". অর্থাৎ অশোধিত মৃত্যুহার হল নির্দিষ্ট বৎসরের মধ্য সময়ে কোন জনসমষ্টির সাথে প্রতি হাজারে মৃত্যু সংখ্যার অনুপাত। এইভাবে নির্ণয় করা মৃত্যুহারে যেহেতু জনসংখ্যার বয়স, লিঙ্গ ইত্যাদি অন্যান্য দিকগুলি বিবেচনা করা হয় না তাই এইরূপ গড় মৃত্যুহারকে স্থূল মৃত্যুহার (Crude Death Rate–C.D.R) বলে।

এই মৃত্যুহার নির্ণয়ের সূত্রটি হল

$$\text{C.D.R} = \frac{D}{P} \times k$$

১। মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার "জনবিজ্ঞান ও জনসংখ্যার উন্নয়ন" ২২৩ পাতা

এখানে D = নির্দিষ্ট বছরের মোট মৃত্যু সংখ্যা

P = ঐ সময়ের মোট জনসংখ্যা

k = (Constant) ধ্রুবক = 1000.

মৃত্যুহার শতকরা হিসেবে নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ধ্রুবক — 1000 এর পরিবর্তে 100 ধরে নির্ণয় করবেন।

9.21 কাম্য জনসংখ্যা (Optimum Population)

E.G.O. 6 এর — ১ নম্বর পর্যায়ে 8.10.2 অংশে দেখুন।

9.22 জনসংখ্যা অভিক্ষেপ (Population Projection)

কোন দেশের বা কোন অঞ্চলের বর্তমান জনসংখ্যার কাঠামো জন্মহার, মৃত্যুহার, পরিব্রাজন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে ভবিষ্যত জনসংখ্যা সম্পর্কে আগাম পূর্বাভাষকেই বলে জনসংখ্যা অভিক্ষেপ। (Population projection), জনসংখ্যা অভিক্ষেপের সহায়তায় ভবিষ্যত জনসংখ্যার কর্মক্ষমতার হার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক হার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। অর্থাৎ জনসংখ্যার যুক্তিসম্মত পূর্বাভাষই জনসংখ্যার অভিক্ষেপ। V. C. Sinha এবং E. Zacharia তাঁদের Element of Demography পুস্তকে জনসংখ্যা অভিক্ষেপের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন "Population projection are calculation of future demographic quantities and trends obtained by using accumulated substantine knowledge and applying the most recent methodology"[২], কারণ জনসংখ্যার আগাম জ্ঞানের সাহায্যে ভবিষ্যত জনসংখ্যার আয়তন বিষয়ে অর্থনীতিবিদ, জনবিজ্ঞানী, পরিকল্পনাবিদ প্রমুখ চিন্তাবিদদের ধারণা থাকলে ভবিষ্যতের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে পরিকল্পনা মতো পরিকাঠামো স্থির করা সম্ভব হবে।

এই জনসংখ্যা অভিক্ষেপের সহায়তায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (U.N.O) মতে উন্নয়ন ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মিলিত জনসংখ্যায় বৃদ্ধির বার্ষিক গড় শতকরা ১.৪। অর্থাৎ বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় ৮.৩০ কোটি করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে চলেছে। U.N.O- র মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার যদি (১.৪%) বর্তমান থাকে তবে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে ২০২৫ খৃষ্টাব্দে হবে ৮০৪ কোটি এবং ২০৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ৯৩৭ কোটিতে দাঁড়াবে। জনসংখ্যার এরূপ অসাধারণ বৃদ্ধিকে জনভূগোলের ভাষায় বলে জনবিস্ফোরণ (Population Explosion) জনসংখ্যার এই অভূতপূর্ব বৃদ্ধি নিয়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে নানা মতামত প্রচলিত থাকলেও এদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে এই জন্মহার বৃদ্ধি নির্ভর করে প্রধানত জন্মহার ও মৃত্যুহারের উপর। জনসংখ্যার এই হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং এই জনসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধির

২। মোঃ জহিরুল ইসলাম শিকদার "জনবিজ্ঞান ও জনসংখ্যার উন্নয়ন" ৪৩৯, পাতা।

ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নতি কিভাবে জড়িত সেই সম্পর্কে সর্বপ্রথম মতামত প্রকাশ করেন ওয়ারেন থম্পসন (Warren Thompson - 1929) এই মতবাদকে আরও সুদৃঢ় করেন নটস্টাইন (Notestein-1945) ব্লেকার (Blacker - 1947) ইত্যাদি অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীরা।

9.23 জনসমষ্টির বিবর্তন (Demographic Transition)

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানীদের জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সমাজ ও অর্থনীতির যে সম্পর্ক রয়েছে সেই সম্পর্কের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে জনসমষ্টির বিবর্তন তত্ত্ব।

এই তত্ত্বে জনবিবর্তনকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়।

(১) প্রথম পর্যায় — উচ্চ জন্মহার ও উচ্চ মৃত্যুহার

(২) দ্বিতীয় পর্যায় — উচ্চ জন্মহার ও মৃত্যুহার নিম্নমুখী

(৩) তৃতীয় পর্যায় — জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই নিম্নমুখী

(৪) চতুর্থ পর্যায় — জন্মহার অপেক্ষা মৃত্যুহার অধিক নিম্নমুখী।

(এরপর EGO 06 : 01 এর 4.7.1, 4.7.2 এবং 4.7.3 অংশ দেখুন)

9.24 জনসংখ্যা কাঠামো ও পিরামিড (Population Structure and Pyramid)

কোন দেশ বা অঞ্চলের জনসংখ্যার গঠনগত বৈশিষ্ট্য জানতে হলে সেই দেশ বা অঞ্চলের নারী পুরুষের অনুপাত, নারী পুরুষের বয়সভিত্তিক অনুপাত ইত্যাদি জানা প্রয়োজন এবং এই তথ্যের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনসংখ্যার বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক বিন্যাস বা বন্টন করে দেখার রীতিকে বলা হয় জনসংখ্যার বয়স কাঠামো।

অতএব বলা যায় যে জনসংখ্যা কাঠামো ও পিরামিড হল একটি আদর্শ জনসংখ্যার ভিত্তি এবং এই জনসংখ্যার লিঙ্গ বয়সভিত্তিক গঠন বিন্যাস যখন রৈখিক চিত্রাকারে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে বলে জনসংখ্যা পিরামিড।

এইভাবে নারীপুরুষের বয়সভিত্তিক কাঠামো হতে বিভিন্ন উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব হয়। আবার কোন দেশে জনসংখ্যা উন্নতির কোন পর্যায়ে অবস্থান করছে সেই বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হবে।

9.25 বয়সভিত্তিক নারীপুরুষের জনসংখ্যা গঠনের প্রকারভেদ (Age and Sex Structure of Population)

বিভিন্ন অঞ্চলে নারী পুরুষের সংখ্যা বা অনুপাত এক থাকে না। জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জন সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। তবে এই হ্রাসের সামগ্রিক প্রকৃতি যেমন ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে পৃথক হয়ে থাকে তেমনি বিভিন্ন বিভিন্ন বয়স্ক নারী পুরুষের সংখ্যাগত পার্থক্যও দেখতে পাওয়া যায়। এই পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য একটি লেখচিত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। যে লেখচিত্রের সাহায্যে কোন দেশ বা অঞ্চলের জনসাধারণের বয়স অনুসারে নারী পুরুষের জন্ম মৃত্যুর আয়তন ও গঠন বিন্যাস প্রকাশ করা হয় তাকে Age/Sex Pyramid বলা হয়। আবার একে বয়সভিত্তিক শুধু পুরুষের আপাতসূচক বা বয়:গোষ্ঠীর পিরামিডও বলা হয়।

জনসংখ্যা তত্ত্ববিদেরা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লক্ষ করেছেন যে জনসংখ্যার গঠনে কোন দেশ বা অঞ্চলের আর্থ সামাজিক প্রকৃতির— প্রভাব তার উপর পড়ে। জন্ম ও মৃত্যুহারের পার্থক্য এই গঠনকে নিয়ন্ত্রিত করে। জনসংখ্যার বিবর্তনে কোন পর্যায়ে এই দেশ বা অঞ্চলটি অবস্থিত তাও এই চিত্র থেকে পরিস্ফুট হয়।

বয়সভিত্তিক নারী পুরুষের জনসংখ্যা গঠনের প্রকারভেদ— প্রধানত তিন ধরনের জনসংখ্যার গঠন দেখতে পাওয়া যায়।

(I) X- অক্ষ চওড়া থাকে এবং পার্শ্ব রেখার ঢাল ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে Y- অক্ষের শীর্ষবিন্দুতে মেশে। Y-অক্ষের নিচের দিকে 15 এবং উপর দিকে 65 অর্থাৎ নির্ভরশীল জনসংখ্যার মোট পরিমাণ দেখা যাচ্ছে সামগ্রিক নির্ভরশীলতার চেয়ে বেশি এরূপ গঠন বিশিষ্ট দেশে গড় বয়স ও পরমায়ু খুব কম। জনসংখ্যার বিবর্তনে প্রাথমিক পর্যায়ে এই গঠন আদিবাসী সমাজ ছাড়া বিশেষ দেখা যায় না।

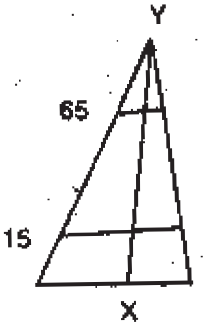

(II) এখানে X অক্ষটি প্রথমটি থেকে চওড়া। এবং এর পার্শ্ব দুটি সামান্য অঞ্চল আকৃতিতে Y- অক্ষের শীর্ষবিন্দুতে মিলিত হয়েছে। জন্মহার বেশি হওয়ায় X- অক্ষ বেশি চওড়া এবং শিশু মৃত্যু আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সক্ষম হওয়া গেছে বলে 15 বছরের নিচে জনসংখ্যার পরিমাণ বেশি। শিশু মৃত্যু কিছুটা কমলেও দরিদ্র বেকারী অপুষ্টি ইত্যাদি কারণে পরমায়ু বেশি নয়। ফলে জনসংখ্যার গড় বয়স এই শ্রেণীতেও কম।

উন্নয়নশীল স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যার গঠন এরূপ। দেশ উন্নত হলে পার্শ্বরেখার আকৃতি ক্রমশ অবতল থেকে উত্তল হতে থাকে। জনসংখ্যার বিবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায়েও এই গঠন দেখা যায়।

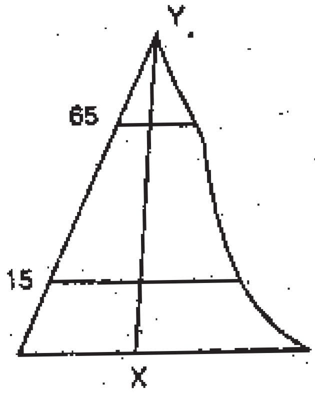

(III) জনসংখ্যা গঠনের পিরামিড এখানে অবতল হতে উত্তল হতে দেখা যায়। জন্মমৃত্যুর হার নিয়ন্ত্রিত হয় বলে X অক্ষ বেশ চওড়া হয় আর Y অক্ষটি X এর প্রায় সমান্তরালে উত্তল আকৃতিতে হঠাৎ বাঁক নিয়ে শীর্ষবিন্দুতে মিলে যায়। উন্নত দেশগুলিতে এরূপ গঠন দেখতে পাওয়া যায়। জনসংখ্যা বিবর্তনের এটি তৃতীয় পর্যায়।

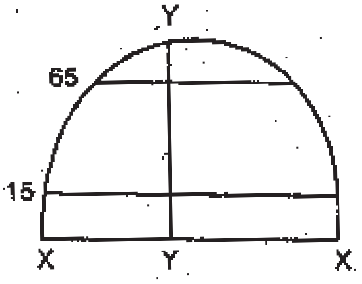

(IV) বিভিন্ন দেশ থেকে কাজ ও শিক্ষার সুযোগ নিতে যুবক সম্প্রদায় এর বেশি সংখ্যায় আগমনের ফলে চতুর্থ পর্যায়ের পিরামিডের পার্শ্বচিত্রটি কিছুটা ওঠার পর হঠাৎ উত্তল বাঁকে উপরে উঠে যায়। কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে এটিকে সুষমভাবে উঠতে দেখা যায়।

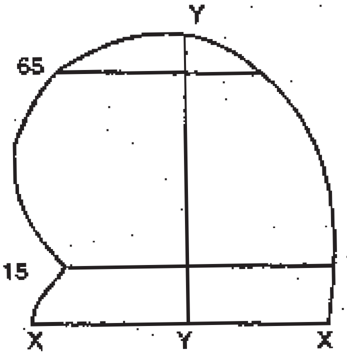

(V) জনবিবর্তনের পঞ্চম পর্যায়ে দেখা যায় দেশের যুবাবয়সী পুরুষেরা বাইরে চলে গেলে সেদেশে পিরামিড চিত্রে পুরুষদের দিকে পার্শ্বরেখাটি বিপরীত আকৃতির হয়। আবার যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে যুবা পুরুষের মৃত্যু বেশি হলেও পিরামিডের আকৃতি এরূপ হতে পারে।

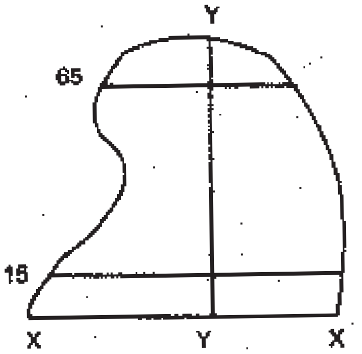

এরূপ পিরামিডের সহায়তায় নারী-পুরুষের বয়স ভিত্তিক বিন্যাসের তারতম্য অতি সহজেই প্রকাশ করা যায় এবং কোন দেশ বা অঞ্চলের জন্ম ও মৃত্যুহার আর্থসামাজিক পরিস্থিতি ও জনসংখ্যার বিবর্তনের স্তর সম্পর্কে ধারণা করা সহজ হয়।

9.26 জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Population and Economic Development)

(এই অংশের জন্য EGO : 06 : 01 এর 4.10 অংশ দেখুন)

9.27 জনসংখ্যার ম্যালথুসীয় তত্ত্ব (Malthusian Theory on Population Growth)

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা বর্তমানে ৬১৫ কোটি এবং জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। জনসংখ্যার এই

ক্রমবিকাশমান চরিত্রের বিচার বিশ্লেষণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জন বিজ্ঞানী বা সমাজ বিজ্ঞানীরা তুলে ধরেছেন। এই সব তত্ত্বগত বিশ্লেষণের মধ্যে রবার্ট ম্যালথাসের জনসংখ্যা হতাশা তত্ত্বের (Population Passimism) জনক বলা হয়।

(এর পরবর্তী অংশের জন্য EGO : 06 : 01 এর 4.10.1 অংশটি দেখুন)

9.28 জনসংখ্যা সম্পদ অঞ্চল (Population Resource Region)

(এই অংশের জন্য EGO : 06 : 01 এর 4.10.4 অংশটি দেখুন)।

9.29 জনসংখ্যার সমস্যা (Population Problem)

জনসংখ্যার বৃদ্ধি কোন অঞ্চলের সম্পদ উন্নয়নে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিঘ্নিত হয় এবং নানা প্রকার আর্থ-সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই জনসংখ্যার বৃদ্ধি যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পদ কিন্তু যখন অতি জনসংখ্যা দেশের খাদ্য, বাসস্থান, কর্মজীবনের বিঘ্ন ঘটায় তখন জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে সম্পদের পরিবর্তে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

তাই জনসংখ্যা কোন দেশের পক্ষে উৎপাদনে সহায়ক এবং কোন দেশে তার প্রতিবন্ধক তা দেশ ও কাল ভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ইউরোপ আমেরিকার মত উন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা সম্পদ, কিন্তু ভারত চিনের মত উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে অতি জনসংখ্যা একটি সমস্যা, কারণ এই সকল দেশে জমির বহন ক্ষমতার তুলনায় জনসংখ্যার তুলনায় দ্রুত ফলে দেশে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে।

- খাদ্যাভাব ঘটে।
- শিক্ষার প্রসার ব্যাহত হয়।
- খাদ্যাভাব অপুষ্টির সৃষ্টি করে।
- মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলেও মাথাপিছু আয় কম হয়।
- এর ফলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব দেখা যায়।
- জীবন যাত্রার মান নিম্নমুখী হয়।
- উৎপাদনশীল জনসংখ্যার তুলনায় নির্ভরশীল জনসংখ্যার বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়।
- সর্বোপরি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা পরিবেশেও নানা সমস্যার সৃষ্টি করে।

9.30 সারাংশ

সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে কৃষি একটি অতি প্রয়োজনীয় এবং সুপ্রাচীন প্রথা। তবে সৃষ্টির আদিকালে প্রাগঐতিহাসিক যুগে মানুষের কৃষি সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু ক্রমে খাদ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে ধীরে ধীরে কৃষি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করে নেয়। তারপর ঐ কৃষিই হয় মানুষের জীবন যাত্রার এক অপরিহার্য অঙ্গ। কৃষিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে কৃষি সভ্যতা। কৃষি একদা ছিল আদিম কৃষি কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞান ঐ আদিম কৃষিকে পরিণত করে বর্তমান কালের আধুনিক কৃষিতে।

এই কৃষিতে যেমন প্রগাঢ় কৃষি ব্যবস্থায় ধানের চাষ করা হয় আবার বাণিজ্যিক ভাবে করা হয় গমের চাষ। নতুন কৃষির সংযোজন দেখা যায় বাগিচা কৃষির ক্ষেত্রে। চা বাগিচা কৃষির এক অন্যতম ফসল। এই সকল কৃষি ব্যবস্থা পৃথিবীর বিভিন্ন জলবায়ু অনুসারে পরিবর্তিত হয়। কৃষির পরিবর্তন জীবন ধারার ও পরিবর্তন ঘটায়। কৃষি তাই আজ আর কেবলমাত্র বেঁচে থাকার উপায় নয় জীবিকা এবং ভোগেরও অনুষঙ্গ। কৃষি তাই আজ এক অনন্য সম্পদ।

কৃষিকে সম্পদে পরিণত করেছে মানুষ। মানুষ তাই নিজেই একটি সম্পদ। মানুষ সম্পদের উদ্ভাবক, নিয়ন্ত্রক এবং ভোগকর্তা। সম্পদ এবং মানুষ একে অপরের পরিপূরক বললে ভুল বলা হবে না। আবার এই সম্পদকে মানুষই ধ্বংস করে চলেছে। তাই বলা হয় সম্পদ সৃষ্টিতে মানুষের দ্বৈত ভূমিকা রয়েছে।

এই মানব সম্পদ পৃথিবীতে সমানভাবে বণ্টিত হয়নি। এই বণ্টনের প্রভাব আবার সম্পদ সৃষ্টিকেও প্রভাবিত করে থাকে। পৃথিবীর জনসংখ্যার ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এই সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে চলেছে। এই বৃদ্ধির হার আবার সর্বত্র সমান নয়। উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই হার অনেক বেশি।

পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যে-রূপ তার ফলে ভবিষ্যতে সম্পদ সঙ্কট দেখা দেবার সম্ভাবনা। এই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত প্রয়োজন। নতুবা জনসংখ্যার সমস্যা বিরাট আকারে দেখা দিতে পারে। সর্বশেষ বলা যায় যে নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা পৃথিবীর সম্পদ সেই সম্পদকে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করা অবশ্য প্রয়োজন।

9.31 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

1 কৃষির সংজ্ঞা কি ? কৃষিকাজের উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

2 কৃষিকার্যের উপর প্রাকৃতিক ও আর্থ সামাজিক কারণগুলি কি বুঝিয়ে লিখুন।

3 কৃষির শ্রেণী বিভাগের ভিত্তিগুলি কি ? প্রগাঢ় কৃষি কোন শ্রেণীতে পড়ে ? এই কৃষির বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করুন।

4 বাণিজ্য ভিত্তিক ব্যাপক কৃষি বলতে কি বোঝায়। এই কৃষির বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝিয়ে বলুন।

5 ফসল ফলানোর পদ্ধতির তারতম্য অনুসারে কৃষিকে কিভাবে বিভক্ত করা যায় বুঝিয়ে বলুন?

6 মিশ্র কৃষি ব্যবস্থা কাকে বলে? মিশ্র কৃষির বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

7 ভূমধ্যসাগরীয় কৃষি পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে দেখা যায়? এই কৃষির বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করুন।

8 ধান চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থার কথা বর্ণনা করুন। প্রধান প্রধান ধান উৎপাদন অঞ্চলগুলির অবস্থান বর্ণনা করুন।

9 এশিয়ার মৌসুমী অঞ্চল সমূহে ধানের উৎপাদন কেন কেন্দ্রিভূত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন।

10 ধান চাষকে জীবিকা ভিত্তিক কৃষি হিসাবে গণ্য করা হয় কেন? কোন কোন বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থা এই কৃষি ব্যবস্থাকে সহায়তা করে বুঝিয়ে বলুন।

11 ভারতে ধান চাষের উপযোগী ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনা করুন। প্রধান প্রধান ধান উৎপাদন অঞ্চলগুলির বণ্টন ব্যাখ্যা করুন।

12 গম চাষের উপযোগী ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ননা করুন। পৃথিবীর প্রধান প্রধান গম উৎপাদক অঞ্চলগুলির বণ্টন বর্ণনা করুন।

13 ১৯৯১ সালের পর হতে ভারতে গম চাষের বন্টন ও উৎপাদনগত অগ্রগতি বিশ্লেষণ করুন।

14 চা চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা সমূহ বর্ণনা করুন। চা এর প্রধান প্রধান উৎপাদকের নাম লিখুন এবং চা এর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

15 ভারতের চা বাগিচা গড়ে ওঠার প্রাকৃতিক ও আর্থসামাজিক কারনগুলি আলোচনা করুন।

16 সম্পদ সৃষ্টিতে মানুষের ভূমিকা আলোচনা করুন।

17 সম্পদ উন্নয়নে মানবশক্তি ও কায়িক শ্রমের ভূমিকা আলোচনা করুন।

18 সম্পদ উৎপাদনে মানুষের ত্রিবিধ ভূমিকা আলোচনা করুন।

19 পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে লোকবসতির ভারসাম্যের কারণগুলি নির্ধারণ করুন।

20 পৃথিবীর জনসংখ্যা বন্টন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

21 পৃথিবীর জনসংখ্যা বন্টন কি কি প্রাকৃতিক কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বর্ণনা করুন।

22 মানব সম্পদ বৃদ্ধির হার বর্ণনা করুন।

23 জনসংখ্যা অভিক্ষেপ কাকে বলে? এর সহায়তায় কি ভাবে বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যার ভবিষ্যত বর্ণনা করা যায় বুঝিয়ে বলুন।

24 জনসমষ্টির বিবর্তন তত্ত্ব বলতে কি বোঝায়? এই তত্ত্বে জনবৃদ্ধির হার কি কি পর্যায়ে দেখান হয়েছে বুঝিয়ে বলুন।

25 জনসংখ্যা কাঠামো পিরামিড বলতে কি বোঝায়? উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে জন পিরামিডের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

26 জনসংখ্যার বিবর্তনে ম্যালথাসের তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

27 জনসংখ্যা সম্পদ অঞ্চল বলতে কি বোঝায় ? পৃথিবীর জনসংখ্যা সম্পদ অঞ্চলগুলি নিয়ে আলোচনা করুন।

28 জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাগুলি আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

1 আর্দ্র কৃষির বৈশিষ্ট্য কি ?

2 ঋতুভিত্তিক কৃষির বৈশিষ্ট্য কি ?

3 খারিফ ও রবি শস্য বলতে কি বোঝায় ?

4 জীবিকা ভিত্তিক কৃষির বৈশিষ্ট্য কি ?

5 আদিম কৃষি বলতে কি বোঝায় ?

6 ক্রান্তীয় উষ্ণ আর্দ্র অঞ্চলের কৃষি বলতে কি বোঝায়?

7 আধুনিক সমাজে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ হিসেবে কৃষির ভূমিকা কি ?

8 এক ফসলী কৃষির বৈশিষ্ট্য কি?

9 শুষ্ক কৃষির বৈশিষ্ট্য কি ?

10 বসন্তকালীন ও শীতকালীন গমের পার্থক্য কি?

11 বীজ বপন ও ফসল সংগ্রহের সময় অনুসারে গমের শ্রেণীবিভাগ করুন।

12 বিশ্বের রুটির ঝুড়ি কোন অঞ্চলে কেন বলে?

13 উৎপাদনের অঞ্চল অনুসারে ধানের শ্রেণীবিভাগ করুন।

14 বৃষ্টিপাতের পরিমাণের উপর নির্ভর করে ধানের শ্রেণীবিভাগ করে আলোচনা করুন।

15 চায়ের শ্রেণীবিভাগ করুন।

16 ভারতে চা বাগিচার সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করুন।

17 জন পিরামিডের বৈশিষ্ট্য কি?

18 জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে কি বোঝায়?

19 কাম্য জনসংখ্যা বলতে কি বোঝায়?

20 জনসমষ্টির বিবর্তন কাকে বলে? এবং এর পর্যায়গুলি কি কি ?

21 সম্পদ ধ্বংসকারী রূপে মানুষের ভূমিকা কি ?

22 জন্মহার বলতে কি বোঝায়?

23 মৃত্যুহার বলতে কি বোঝায়?

9.32 উত্তরমালা

1 9.2 এবং 9.3 অংশ দেখুন।

2 9.3.1 এবং 9.32 অংশ দেখুন।

3 9.4 এবং 9..4.1.1 অংশ দেখুন।

4 9.7.2 অংশ দেখুন।

5 9.6 অংশ দেখুন।

6 9.7.5 অংশ দেখুন।

7 9.8.2 অংশ দেখুন।

8 9.13.2 এবং 9.13.3 অংশ দেখুন।

9 9.13.4 অংশ দেখুন।

10 9.7.1 এবং 9.13.2 অংশ দেখুন।

11 9.13.4 অংশ দেখুন।

12 9.14.2 এবং 9.14.3 অংশ দেখুন।

13 9.14.3 অংশ দেখুন।

14 9.15.1, 9.15.3 এবং 9.15.3.1 অংশ দেখুন।

15 9.15.3 অংশ দেখুন।

16 9.17 অংশ দেখুন।

17 9.18 অংশ দেখুন।

18 E.G.O : 06 : 01 এবং 4.3 এর সকল অংশ দেখুন।

19 9.09 অংশ দেখুন।

20 9.18 অংশ দেখুন।

21 9.18 এবং 9.19 অংশ দেখুন।

22 9.20 অংশ দেখুন।

23 9.21 এবং 9.24 অংশ দেখুন।

24 E.G.O : 06 : 01 এর 4.7 অংশ দেখুন।

25 9.25 অংশ দেখুন।

26 9.27 অংশ দেখুন।

27 9.28 অংশ দেখুন।

28 9.29 অংশ দেখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

1 9.5.1 অংশ দেখুন।

2 9.4.2 অংশ দেখুন।

3 9.4.2.1 এবং 9.4.2.2 অংশ দেখুন।

4 9.7.1 অংশ দেখুন।

5 9.7.3 অংশ দেখুন।

6 9.8.1 অংশ দেখুন।

7 9.10 অংশ দেখুন।

8 9.7 অংশ দেখুন।

9 9.5.3 অংশ দেখুন।

10 9.14.1 অংশ দেখুন।

11 9.14.1 অংশ দেখুন।

12 9.14.3 অংশ দেখুন।

13 9.12 অংশ দেখুন।

14 9.8 অংশ দেখুন।

15 9.15.1 অংশ দেখুন।

16 9.15.3 অংশ দেখুন।

17 9.28 অংশ দেখুন।

18 E.G.O : 06 : 01 এর 4.5 অংশ দেখুন।

19 9.21 অংশ দেখুন।

20 9.23 অংশ দেখুন।

21 E.G.O : 6 : 01 এর 4.3.3 অংশ দেখুন।

22 9.20.1 অংশ দেখুন।

23 9.20.2 অংশ দেখুন।

একক 10 ❑ খনিজ ও শক্তি সম্পদ

10.0 প্রস্তাবনা

10.1 উদ্দেশ্য

10.2 খনিজ ও শক্তি সম্পদের ভূমিকা

10.2.1 খনিজ ও অন্যান্য সম্পদ

10.2.2 খনিজ সম্পদের শ্রেণীবিন্যাস

10.3 লৌহঘটিত ধাতব খনিজ

10.3.1 লৌহ

10.3.2 ম্যাঙ্গানিজ

10.3.3 ক্রোমাইট

10.3.4 নিকেল

10.3.5 ভ্যানাডিয়াম

10.3.6 টাইটানিয়াম

10.3.7 মলিবডেনাম

10.4 লৌহেতর ধাতব খনিজ

10.4.1 তামা

10.4.2 দস্তা-সীসা

10.4.3 টিন

10.4.4 টাংস্টেন

10.4.5 এ্যান্টিমনি

10.4.6 এ্যালুমিনিয়াম (বক্সাইট)

10.5 মহার্ঘ ধাতু

10.5.1 স্বর্ণ

10.5.2 রৌপ্য

10.5.3 প্লাটিনাম

10.6 অধাতব খনিজ

10.6.1 চুনাপাথর ও ডলোমাইট

10.6.2 ম্যাগনেসাইট

10.6.3 অভ্র

10.7 খনিজ সার

10.7.1 ফসফেট

10.7.2 জিপসাম

10.8 রত্ন-উপরত্ন

10.8.1 হীরক

10.8.2 কোরান্ডাম

10.8.3 বেরিল

10.8.4 টোপাজ

10.8.5 মুক্তা

10.9 নির্মাণ দ্রব্য খনিজ

10.10 প্রাকৃতিক জ্বালানি

10.10.1 খনিজ তেল

10.10.2 কয়লা ও লিগনাইট

10.0 প্রস্তাবনা

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ আছে যা আজকের দিনে সর্বস্তরের মানুষের বিভিন্ন কাজে লাগে। আগের এককে আমরা যে সব সম্পদ সম্বন্ধে জেনেছি সেগুলোকে বলা হয় — 'প্রবাহমান সম্পদ' (Renewable resource) যা অতিরিক্ত ব্যবহার করলে ফুরিয়ে যায় বা কমে যায় — কিন্তু আবার নতুন করে সৃষ্টি করা যায়। এই এককে আমরা সামগ্রিক ভাবে বিবেচনা করব এমন সম্পদের বিষয়ে যেগুলোকে বলা হয় 'সঞ্চিত সম্পদ' (Non-renewable resource) — যেগুলি অল্প পরিমাণে আছে এবং বেশি ব্যবহার করলে সহজেই ফুরিয়ে যায়। এই সম্পদ একবার শেষ হলে আর পাওয়ার আশা থাকেনা। এই খনিজ ও শক্তি সম্পদ আবার সব দেশেই আর্থিক বিকাশে বিরাট ভূমিকা পালন করে। ভারতে স্বাধীনতা পরবর্তীযুগে এই সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিষয়েও সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হবে যাতে খনিজ ও শক্তি সম্পদে আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা হয়। এই প্রসঙ্গে যে সব উন্নয়নমুখী কর্মসূচি খনিজ ও শক্তিসম্পদের উপর নির্ভরশীল তাদের অগ্রগতি টিকিয়ে রাখার জন্য কি করা উচিত সে সম্বন্ধেও আলোচনা করা হবে।

10.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা এই বিষয়গুলি অনুধাবন করতে পারবেন :

- খনিজ ও শক্তি সম্পদ কি এবং আমাদের দেশে কোন রাজ্যে কি পাওয়া যায়।
- এই সম্পদগুলির চাহিদা আমাদের দেশে কি প্রকার এবং সেটার কতটা মেটানো সম্ভব।
- এই সম্পদ ব্যবহার করার ফলে আনুষঙ্গিক কি কি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং সেটা মেটানোর জন্য সম্ভাব্য পদক্ষেপ কি।
- গত পঞ্চাশ বছরে এই সব সম্পদ ব্যবহার করার ব্যাপারে সামগ্রিক পরিবর্তন কি হয়েছে।
- বিভিন্ন খনিজ সম্পদের বর্তমান অবস্থা কি এবং সমস্যাগুলিই বা কি।

10.2 খনিজ ও শক্তি সম্পদের ভূমিকা

খনিজ ও শক্তি সম্পদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। অন্যান্য সম্পদ যথা, অরণ্য, কৃষিজ, পশুপালন প্রভৃতি সম্পদের চেয়ে খনিজ সম্পদের কিছু তফাৎ এবং বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলো এখানে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হবে।

● গোটা পৃথিবীতে প্রচুর খনিজ সম্পদ আছে কিন্তু দেশ হিসাবে বিভিন্ন দেশে এর পরিমাণে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। এর ভূবৈজ্ঞানিক কারণগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে — বিভিন্ন প্রকারের খনিজ সম্পদ — বিশেষ বিশেষ শিলাস্তরের মধ্যে প্রকৃতিতে থাকে। প্লাটিনাম, নিকেল, কোবাল্ট প্রভৃতিকে ম্যাগমাজাত অবক্ষেপ (magmatic deposit) হিসাবে দেখা যায়। এরা সাধারণত ভূত্বকের গভীরে উৎপন্ন হয় এবং সৃজনকারী আগ্নেয়শিলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই সব শিলার খনিজ গোষ্ঠী প্রবল তাপে (900° থেকে 1500° K) এবং কঠোর চাপে (ভূগর্ভের গভীর অঞ্চলে) উৎপন্ন হয়।

অন্যদিকে বহু কোটি বছর পূর্বের বনাঞ্চলের উদ্ভিদ থেকেই কয়লার সৃষ্টি। ভেষজ বস্তুর প্রথম পরিবর্তন হয় রাসায়নিক — যাতে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং অঙ্গারের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। প্রথম অঙ্গারময় পদার্থের নাম পিট (Peat)-এর পরিবর্তনের জন্য 35° থেকে 40°K তাপমাত্রার প্রয়োজন। সবচেয়ে উন্নতমানের কয়লার জন্য 160° থেকে 200°K তাপমাত্রার প্রয়োজন। কয়লার রূপান্তরে চাপেরও প্রভাব সক্রিয় থাকে।

খনিজ সম্পদ বিভিন্ন প্রাচীনতার বিভিন্ন প্রকৃতির শিলার (পাললিক আগ্নেয় শিলা প্রভৃতি) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এইজন্য ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন হয় যে কোনও খনিজ সম্পদ সম্পর্কে জানতে।

পৃথিবীতে প্রচুর খনিজ থাকা সত্ত্বেও - সর্বত্র তাহা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহার করা যায় না। ইহার নানা কারণ থাকতে পারে। প্রথম খনিজ পদার্থের অবস্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে সকল খনিজ পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজন হয় বিশেষ শিল্পে যেমন সিমেন্ট শিল্পের জন্য চুনাপাথর কিংবা লৌহশিল্পের জন্য লৌহ আকর এগুলি যদি খুব দুর্গম জায়গায় পাওয়া যায় তাহলে আপাতত কাজে লাগানো শক্ত। এদের খননে অনেক মূলধন এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োজন হতে পারে। সম্প্রতি তিব্বতের মালভূমি অঞ্চলে যেখানকার উচ্চতা 15000 ফুটেরও বেশি তামার খনিতে

উৎপাদনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পাপুয়া-নিউগিনিতে বোগেনভিল্ তামার খনিও বিখ্যাত। যদিও এখানকার আকরে তামার পরিমাণ কম।

দ্বিতীয়ত খনিজ পদার্থ বিশেষ পরিমাণে না থাকলে তাকে মাটির তলা থেকে উঠিয়ে শিল্পে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলাতে প্রচুর মূলধন ও আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োজন হয়। তবে কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়। যেমন সোনার খনি — সোনা যেহেতু মহার্ঘ্য ধাতু, এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব আছে — সেইজন্য যত বেশি অসুবিধাই হোক না কেন বা যত খরচই হোক না কেন কোলারের সোনার খনি এখনও উৎপাদন করে চলেছে। এই অঞ্চলে আধুনিক প্রক্রিয়ায় খনন কার্য শুরু হয়েছে প্রায় 100 বছর আগে এবং বর্তমানে খনিগহ্বর প্রসারিত হয়েছে 3000 মিটারের চেয়েও অনেক বেশি। স্বর্ণভাণ্ডারও প্রায় নিঃশেষিত। আজ পর্যন্ত আনুমানিক 850 টন সোনা কোলার খনি থেকে আহরণ করা হয়েছে।

● কিছু কিছু খনিজ দ্রব্য অন্যান্য খনিজের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় প্রকৃতিতে থাকে। এই মিশ্রণের পরিমাণের উপর ঐ খনিজের শিল্পে উপযোগিতা নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, লৌহ আকরিকের মধ্যে যদি শতকরা 30 ভাগের কম লৌহ থাকে অথবা যদি 50 ভাগ লৌহ এবং তার সঙ্গে বেশ কিছু পরিমাণ ফস্‌ফরাস্ ও গন্ধক থাকে তবে তা আর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সাধারণত ব্যবহার করা চলে না। অনুরূপ ভাবে কিছু কয়লা আছে যেগুলোকেই কেবল সরাসরি ইস্পাত কারখানায় ব্যবহার করা যায় — অন্য কয়লা যাতে ছাই এবং জলের পরিমাণ বেশি সেগুলোকে করা যায় না।

● পৃথিবীতে বহুপ্রকার খনিজ পদার্থ আছে। সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষ কিছু কিছু খনিজদ্রব্য ব্যবহার করে আসছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, লোহা, তামা এবং সোনা। প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং ঐতিহাসিকেরা সভ্যতার ইতিহাসের বিবর্তন বোঝাতে লৌহযুগ (Iron Age) তাম্রযুগ (Copper Age), ব্রোঞ্জ যুগ (Bronze Age) প্রভৃতি ব্যবহার করে থাকেন। এর দ্বারা বোঝানো হয় আনুমানিক কতবছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ঐ সব ধাতু বা মিশ্রণের ব্যবহার শুরু করেছিলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রত্নতত্ত্ববিদদের অনুমান অনুসারে তুরস্কে তামা-সীসা-দস্তা খনিজপদার্থ ব্যবহার করা হত আনুমানিক খৃষ্টজন্মের 5000 বছর আগে; ভারতবর্ষের হীরকের ভাণ্ডার সম্বন্ধে প্রাচীন পর্যটকদের লেখা থেকে জানা যায় যে খৃষ্টজন্মের 200-300 বছর আগে আমাদের দেশেই সারাপৃথিবীর হীরকের চাহিদা মেটাত। ফরাসী পর্যটক ট্যাভার্নিয়ে সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখেছিলেন যে আনুমানিক 60000 লোক কৃষ্ণা নদীর তীরের হীরক ভাণ্ডারে কাজ করত।

10.2.1 খনিজ ও অন্যান্য সম্পদ

খনিজ এবং শক্তি সম্পদের সঙ্গে অন্যান্য সম্পদের বেশ কিছু পার্থক্য আছে সেগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব।

খনিজ ও শক্তি সম্পদ এমন ধরনের যার প্রয়োগ এবং ব্যবহার সর্বস্তরের দেশ এবং সর্বধরনের সমাজ ব্যবস্থায় সব লোকেরই কিছু না কিছু প্রয়োজন। যেমন সার (fertilizer) প্রায় সবদেশের কৃষকেরই অল্পবিস্তর প্রয়োজন। লোহা, সিমেন্ট, উন্নত ধনীদেশেরও যেমন প্রয়োজন — অনুন্নত দেশেও প্রয়োজন। জ্বালানি তেল কিংবা কয়লা সম্বন্ধেও একইভাবে প্রযোজ্য। মহাকাশযান থেকে শুরু করে ভূমিহীন কৃষকের লাঙ্গল — সব ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু খনিজ পদার্থের প্রয়োজন। খনিজ তৈল পরিশোধন করার সময় যে সব উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায় — যথা ন্যাপথা, পীচ, কৃত্রিম বস্ত্র প্রভৃতি — সেগুলোও আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনে লাগে। এগুলি থেকে নানারকম ঔষধও তৈরি হয় বা কীটনাশক বিষ হয় — যা কৃষিকার্যেও লাগে।

● খনিজ পদার্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে ক্রমাগত ব্যবহারে তা ফুরিয়ে যায়। এইখানেই অন্যান্য সম্পদ থেকে মূল পার্থক্য। একই জমিতে বার বার চাষ করা যায়; নদী কিংবা সমুদ্রে মাছ ধরা যায় এবং জঙ্গল কমে গেলে বনসৃজন করা যায়। কিন্তু একটা কয়লা খনিতে — একটা সময় আসে যখন আর কয়লা পাওয়া যায় না এবং সেটা পরিত্যক্ত খনি হিসাবে গণ্য হয়।

● প্রকৃতিতে খনিজ সম্পদের অবস্থান এবং প্রাচুর্য সেই জায়গার ভূবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। প্রাচীন পাথর যেখানে আছে সেখানে ধাতব খনিজ থাকার সম্ভাবনা; অনুরূপভাবে নতুনযুগের শিলাস্তর থাকলে খনিজ তৈল ও গ্যাস থাকবার সম্ভাবনা। আবার শুধু 'প্রাচীনস্তর' ওপর খনিজ সম্পদ থাকা নির্ভর করেনা — উদাহরণ স্বরূপ আমাদের দেশে আসামের তেল সম্পদ যে শিলাস্তরে পাওয়া যায় — অন্য জায়গায় সেই শিলাস্তরে তৈলসম্পদ নেই।

এই প্রসঙ্গে একটা বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। খনিজ সম্পদের অবস্থান এবং প্রাচুর্যের ওপর মানুষের কোনও কর্তৃত্ব নেই — কিন্তু এই সকল খনিজসম্পদকে ব্যবহার উপযোগী করার দায়িত্ব মানুষের। মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির দৌলতেই উপকূলের কাছে তেল থাকবার সম্ভাবনার কথা ভাবা হয়েছিল এবং আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার জন্য মুম্বাই উপকূলে সমুদ্রের জলের তলা থেকে পেট্রোলিয়াম উত্তোলন করা সম্ভব হচ্ছে — এবং আমাদের দেশে সেটাই এখন তৈলসম্পদের প্রধান উৎস। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত আরবদেশ ছিল কেবলমাত্র মরুভূমি — কিন্তু পরবর্তীকালে মরুভূমির তলায় যে বিপুল তৈলভাণ্ডার ছিল তার সন্ধান পাওয়ায় — আরব দেশগুলো এখন ধনী দেশ।

● অনেকের মতে খনিজ সম্পদ ব্যবহার করতে গেলে যেসব খনি তৈরি হয় — সেটা প্রচুর জমি ব্যবহার করে যাতে কৃষি বা অন্য কাজ ব্যাহত হয়। খনি অঞ্চলে জনপদ গড়ে ওঠে — এবং আশেপাশের গ্রাম থেকে লোকজন সব চলে আসে কাজকর্মের জন্য। খনি শহরের লোকজনকে কিন্তু — খাদ্যের জন্য কৃষি এলাকার ওপর নির্ভর করতে হয়। খনির ভাণ্ডার ফুরিয়ে গেলে — সেই শহরের অবস্থা খারাপ হয়। অপরদিকে কৃষি এলাকায় কখনই এরকম হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং কৃষিকার্য স্থায়ী এবং গঠনমূলক — অন্যদিকে খনিজ শিল্প প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসকারী।

সাম্প্রতিক এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে সারাদেশে আনুমানিক 10000 খনি সম্পর্কে Lease আছে, যার মোট পরিমাণ 1100 হেক্টর। সারাদেশের আয়তনের অনুপাতে এটা মাত্র 0.35 শতাংশ। খনিবিজ্ঞানীদের মতে এই lease জায়গার মাত্র 30-35 শতাংশ ব্যবহার হবে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে mining lease-এর পরিমাণ 5 হেক্টার — শুধুমাত্র কয়লা, লোহা এবং কিছু অন্য খনিজের বেলায় — জায়গার পরিমাণ বেশি লাগে। বেশির ভাগ কয়লা খনির 'লিজ' 500 হেক্টরের মতো — কেবলমাত্র কিছু বড়মাপের কয়লা খনির 'লিজ' 1000 হেক্টরের মতো। কিছু লোহার খনির 'লিজ' 2000 থেকে 5000 হেক্টরের মতো — অর্থাৎ 20 থেকে 50 বর্গ কিলোমিটার।

উপরের আলোচনার উদ্দেশ্য যে 'খনিজ সম্পদ' যেখানে থাকে — সেখানেই খনি করা সম্ভব, অন্যত্র নয়। অন্য শিল্পের বেলায় কাঁচামালের থেকে দূরত্ব বেশি হলেও অসুবিধে নেই। জাপানে আকরিক লোহা নেই — অথচ বড় জাহাজ তৈরি শিল্প গড়ে উঠেছে। সভ্যতা, অর্থনীতিতে খনিজ সম্পদ যে পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ সেই তুলনায় জায়গা নষ্ট অনেক কম। এছাড়াও আজকাল পরিবেশ চেতনার জন্য নানারকম সরকারি নীতি অনুসৃত হচ্ছে যাতে করে খনির আশেপাশের জায়গা কম নষ্ট হচ্ছে।

10.2.2 খনিজ সম্পদের শ্রেণিবিন্যাস

খনিজ সম্পদকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয় :

- ধাতব খনিজ
- অধাতব খনিজ
- ইন্ধন ও শক্তি উৎপাদক খনিজ

ধাতব খনিজ বলতে সেইসকল খনিজকে বোঝায় যেগুলি হতে ধাতু নিষ্কাশন করা যায় যথা — লৌহ, তাম্র, স্বর্ণ প্রভৃতি। এগুলিকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায় — যেমন

- লৌহ ও লৌহ খাদ ধাতব : লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, নিকেল
- অলৌহ ধাতব : তাম্র, এ্যালুমিনিয়াম, সীসা, দস্তা, টিন প্রভৃতি
- মহার্ঘ ধাতব : স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম

অধাতব খনিজ বহু প্রকার হয় — যেমন, চুণা পাথর (Limestone), অভ্র (Mica), গন্ধক (Sulphur), লবণ (Salt), মার্বেল (Marble), ফসফেট (Phosphate), গ্রাফাইট (Graphite) প্রভৃতি। এগুলি নানাবিধ শিল্পে প্রয়োজন হয় — যেটা নিম্নলিখিত তালিকা থেকে কিছুটা অনুমান করা যাবে।

ইন্ধন শক্তির প্রধান উৎসগুলি হল — কয়লা ও লিগনাইট ; খনিজ তৈল ও গ্যাস ; চলমান জল ; ইউরেনিয়াম। অপ্রচলিত শক্তি — যেটা প্রবাহমান — nonconventional energy – অর্থাৎ সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি প্রভৃতির ব্যবহারও আরম্ভ হয়েছে।

খনিজ পদার্থগুলিকে নিম্নলিখিত তালিকায় দেখান হল :

খনিজ (Minerals)

- ধাতব (Metals)
  - লৌহ ও খাদ (Ferrous Metal and alloys)
    - লৌহ
    - ম্যাঙ্গানিজ
    - নিকেল
    - ক্রোমিয়াম
    - ভ্যানাডিয়াম
    - টিটানিয়াম
    - মলিবডেনাম
  - অলৌহ Non-ferrous metals
    - তামা
    - এ্যালুমিনিয়াম
    - দস্তা
    - সীসা
    - টিন
    - অ্যান্টিমনি
    - পারদ (তরল)
    - ম্যাগনেশিয়াম
  - মহার্ঘ Precious metals
    - স্বর্ণ
    - রৌপ্য
    - প্ল্যাটিনাম
- অধাতব (Non-metals)

নির্মাণ দ্রব্য

- মার্বেল
- চুনাপাথর
- বেলেপাথর
- শ্লেট
- গ্রানাইট
- বালি

রাসায়নিক

- গন্ধক
- নাইট্রেট
- ফসফরাস
- পটাস
- বোরাক্স
- লবণ

অন্যান্য

- গ্রাফাইট
- অভ্র
- চীনামাটি
- সিলিকা

ইন্ধন দ্রব্য

- কয়লা
- খনিজ তৈল
- গ্যাস
- ইউরেনিয়াম

● অন্যান্য সম্পদের বেলায় যেমন কৃষিজ, অরণ্য প্রভৃতি সম্পদের ব্যবহার সরাসরি প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে জড়িত - খনিজ সম্পদের বেলায়ও অনেকটা তাই। তবে অনেক জায়গায় ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষাতে আকরের উপস্থিতি — কোনও বিশেষ শিলাস্তরে পাওয়া গেলেও - পরবর্তী সমীক্ষাতে সেগুলোকে বর্তমান বাজারে উত্তোলনের উপযুক্ত বলে মনে করা হয়না। সেইজন্য মানচিত্রে — যেসব জায়গায় বিভিন্ন আকরের অবস্থান দেখান হল — সেগুলোর সব জায়গায় খনি নেই কিংবা আপাতত খনি করার পরিকল্পনা নেই।

● খনিজ সম্পদ — মাটির নীচে থাকে — এবং সমীক্ষাতে কেবল অনুমান করা যায় সম্পদের পরিমাণ কত। কেবলমাত্র খনির কাজ শুরু হলেই জানা যায় — যে সম্পদের প্রকৃত পরিমাণ কত। অথচ মূলধন বিনিয়োগের জন্য জানা প্রয়োজন কতটা সম্পদ আছে। খনিজ সম্পদের পরিমাণের শ্রেণীবিন্যাস হল :

(১) প্রমাণিত (Proved বা Measured) – যেখানে প্রচুর পরিমাণে সমীক্ষা করে মাটির নীচেকার সম্পদ সম্বন্ধে নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব।

(২) সম্ভাব্য (Possible বা Indicated) – যেখানে মাটির নিচেকার সম্পদ সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য আছে এবং সম্পদ সম্বন্ধে অনুমান করা সম্ভব।

(৩) অনুমিত (Probable বা Inferred) যেখানে মাটির নিচেকার সম্পদ সম্বন্ধে অল্প তথ্য আছে এবং ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষাতে ঐ জায়গায় সম্পদ থাকার সম্ভাবনা আছে।

বিভিন্ন আকরের ভাণ্ডার সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় ঐ আকরের মোট পরিমাণ 'উপরের শ্রেণীবিভাগ' অনুসারে আলোচনা করা হবে।

অনুশীলনী 1

1. 'সঞ্চিত সম্পদ' ও 'প্রবাহিত সম্পদ' কাহাকে বলে?
2. খনিজ তৈল পরিশোধন করার সময় প্রতিদিনের প্রয়োজনে লাগে এমন কয়েকটি দ্রব্যের নাম লিখুন।
3. প্রাচীন পাথর যেখানে আছে সেখানে কি খনিজ আশা করা যায়?
4. উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে পরের পৃষ্ঠার শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করুন।

(ক) ইন্ধন শক্তির প্রধান উৎস হল ....

(খ) ধাতব খনিজ বলতে .... প্রভৃতি

(গ) কিছু কয়লা আছে যেগুলোকে কেবল সরাসরি ইস্পাত কারখানায় .... যায় .... যায় না।

(ঘ) আজ পর্যন্ত .... কোলার খনি থেকে আহরণ করা হয়েছে।

(ঙ) ফরাসী পর্যটক টাভার্নিয়ে .... লোক .... কাজ করত।

5. খনিজ সমাজের পরিমাপের শ্রেণীবিন্যাস কি কি?

10.3 লৌহ ঘটিত ধাতব খনিজ

লৌহঘটিত ধাতব খনিজগুলির মধ্যে প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ ধাতুগুলি লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমাইট, নিকেল, ভ্যানাডিয়াম, টাইটানিয়াম এবং মলিবডেনাম। আমাদের দেশে লোহা, ম্যাঙ্গানিজ এবং ক্রোমাইট পাওয়া যায়। নিকেল আকর উড়িষ্যার সুকিন্দাতে আছে কিন্তু কোনও খনি নেই। ভ্যানাডিয়াম - টাইটানিয়াম - মলিবডেনাইটের আকরের উপস্থিতি সম্বন্ধে জানা আছে কিন্তু বিশেষ পরিমাণ সম্পদ আমাদের দেশে নেই।

10.3.1 লৌহ

ভূত্বকে যেসব মৌলিক উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচুর্যের তালিকায় লৌহের স্থান চতুর্থ। মানবসভ্যতার প্রথম যুগে লোহার ব্যবহার ছিল — বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। 'অথর্ববেদে' এবং 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে'ও লোহার উল্লেখ আছে। প্রকৃতিতে মৌল বা মুক্ত অবস্থায় লোহা কদাচিৎ দেখা যায়। অল্পবিস্তর লোহা প্রায় সবরকম শিলাতে পাওয়া যায়। উল্কা (meteorite) তে শতকরা 13 থেকে90 ভাগ লোহা থাকে। প্রাণীজগত এবং উদ্ভিদের জীবন্ত 'টিসু'তে(Tissue) লোহা অপরিহার্য্যভাবে থাকে। আমাদের রক্তের লোহিত কণিকা এবং গাছের ক্লোরোফিলেও লোহা উপস্থিত থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিবিধ পরিমাণের অপ্রয়োজনীয় গৌণ পদার্থ (gaugue) যেমন, সিলিকা, চুন, ফসফরাস প্রভৃতি লোহার আকরের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। আকরিক লোহা সাধারণত অক্সিজেন বা গন্ধকের সঙ্গে যৌগ অবস্থায় বিরাজ করে। লোহার বিভিন্ন আকরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

- হেমাটাইট (Hematite, Fe_2O_3) বা লাল আকর (90% লোহা)
- ম্যাগনেটাইট Magnetite, Fe_3O_4 বা কাল আকর(92.8% লোহা)
- লিমোনাইট Limonite, $2Fe_2O_3$, $3H_2O$ বা বাদামি আকর (62,9% লোহা)
- সিডেরাইট Siderite, $FeCO_3$ বাদামী বা ধূসর হলুদ বর্ণের আকর (48.2% লোহা)

দেখা যাচ্ছে, ম্যাগনেটাইট আকরে লোহার পরিমাণ সবচাইতে বেশি। আমাদের দেশে নিম্নমানের ম্যাগনেটাইট পাওয়া যায়। সিডেরাইট এবং লিমোনাইট পাওয়া গেলেও লোহার আকর হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার উপযোগী ভাণ্ডার আমাদের দেশে নেই।

ভারতের অধিকাংশ লৌহ আকর ভাণ্ডার হেমাটাইট জাতীয়। লৌহ আকরের প্রধান ভাণ্ডারগুলি রয়েছে আনুমানিক 250 থেকে 290 কোটি বছর পুরানো হেমাটাইট - জেসপার শিলার অভ্যন্তরে। সাধারণত এইসব

শিলাতে গঠিত পাহাড়ের শীর্ষদেশে উৎকৃষ্ট আকর পাওয়া যায়। বিহার-উড়িষ্যা-মধ্যপ্রদেশ-কর্ণাটক-গোয়ায় এই লৌহ আকরের ভাণ্ডার আছে।

রূপান্তরণের ফলে এই শিলা কিছু জায়গায় কোয়ার্টজাইট-ম্যাগনেটাইট শিলায় পরিবর্তিত হয়েছে যেমন তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকে।

বিহার-উড়িষ্যার লৌহ-আকর ভাণ্ডার : বিহারের সিংভুম ও উড়িষ্যার বোনাই-কেওনঝর অঞ্চলে লোহার প্রধান ভাণ্ডারগুলি অবস্থিত। এই অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক গঠন যথেষ্ট জটিল। শিলাস্তরের মধ্যে বিভিন্ন মাপ ও আকৃতির ভাঁজ রয়েছে। পর্বতমালার দৈর্ঘ্য আনুমানিক 50 কিলোমিটার।

লৌহ আকরের গ্রথনের উপর ভিত্তি করে খনিজের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে

- সংহত লৌহ আকর — ভূপৃষ্ঠের উপরে এই আকর বিশাল স্তূপের আকারে থাকে। সব চেয়ে উৎকৃষ্ট আকরে লোহার পরিমাণ শতকরা 68.70 ভাগ (অনুমানিক)।
- লঘুস্তরিত (Laninated) আকর — এই আকর প্রায়শই সংহত আকরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। কোথাও এরা দৃঢ়সংবদ্ধ, কোথাও বা সরন্ধ্র। এরা হেমাটাইট-জ্যাসপার স্তর থেকে সিলিকা বিশ্লিষ্ট হওয়ার ফলে সৃষ্ট হয়েছে। নোয়ামুণ্ডি-জামদা অঞ্চলে — এই আকরের লোহার পরিমাণ শতকরা 56-64 ভাগ।
- চূর্ণ আকর বা নীল ধূলা (Blue Dust) — উপরের দুই শ্রেণির আকরের সঙ্গে প্রায় সকলক্ষেত্রেই এই আকর থাকে এবং এর মধ্যে লোহার পরিমাণ 66 থেকে 69 শতাংশ।

এই অঞ্চলে অনেক বড় বড় খনি আছে — বেশির ভাগই পাহাড়ের গায়ে খনি। এদের উৎপাদনই কাজে লাগায় — রাউরকেল্লা, জামশেদপুর, বোকারো, বার্নপুর এবং দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানাগুলি।

মধ্যপ্রদেশের লৌহ আকর ভাণ্ডার : মধ্যপ্রদেশে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভাণ্ডার হল বস্তার জেলার বায়লাডিলা অঞ্চল। এই সম্পদের প্রথম সন্ধান পান বিশিষ্ট ভূবৈজ্ঞানিক প্রমথনাথ বোস (P. N. Bose)। ইনি ময়ূরভঞ্জের লোহার আকরও আবিষ্কার করেছিলেন — এবং Tata Iron & Steel Company-র সফল হয়ে ওঠার পিছনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল।

বায়লাডিলায় বিভিন্ন আকারের ও আয়তনের মোট 14টি ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে 5টি বায়লাডিলা পর্বতমালার পশ্চিমদিকে এবং বাকি 9টি পূর্বদিকে অবস্থিত। বায়লাডিলার 1,4,5,10,11,13 ও 14 নম্বর খনিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সব আকর অত্যন্ত উচ্চমানের এবং এর মধ্যে লোহার ভাগ শতকরা 60-69 পর্যন্ত। বস্তারের রাওঘাটে এক অশ্বখুরাকৃতি পর্বতমালার শীর্ষে লৌহ আকর ভাণ্ডার আছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে আনুমানিক 500 মিটার উপরে এই ভাণ্ডারের অবস্থান। ছয়টি প্রধান ভাণ্ডার হল A, B, C, D, E এবং F। F ভাণ্ডারটি রাওঘাটের দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত পর্বতমালায় প্রায় 2-5 বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত। এখানকার আকরে লোহার পরিমাণ 59-66 শতাংশ; সিলিকা 0.91-3.94 শতাংশ এবং ফসফরাস 0.04 থেকে 0.15 শতাংশ।

দুর্গ জেলায় দাল্লি-রাজহারা পাহাড়ে লৌহ আকর ভাণ্ডার। এখানে হেমাটাইট-জ্যাসপার শিলা জটিল ভাঁজের গঠনে অবস্থিত।

হেমাটাইট খনিজ প্রধান আকর কিন্তু কিছু জায়গায় ম্যাগনেটাইট পাওয়া যায়। এখানে আকরদেহ মসুর (lense) আকৃতির এবং আকরের মধ্যে লোহা 66 শতাংশ; সিলিকা 0.71 শতাংশ এবং ফসফরাস 0.06 শতাংশ। এইখানকার আকরই ভিলাই ইস্পাত কারখানার চাহিদার জোগান দেয়।

কর্ণাটকের লৌহ ভাণ্ডার : ম্যাঙ্গালোর বন্দরের অদূরে পশ্চিমঘাট পর্বতে কুদ্রেমুখ — বাবাবুদান এলাকায় ম্যাগনেটাইট আকরের ভাণ্ডার আছে। কুদ্রেমুখে - ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি সংহত আকর দেখা যায়। লৌহ সমৃদ্ধ স্তর 15 থেকে 60 মিটার পুরু। কুদ্রেমুখের লোহার খনি ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বড় যান্ত্রিক (mechanised) লোহার খনিগুলির মধ্যে অন্যতম। এখানকার আকরিক নিম্নমানের বলে — এখানকার কারখানায় বড়ি (pellet) তৈরী করা হয় এবং ম্যাঙ্গালোর বন্দর থেকে রপ্তানি করা হয়।

গোয়ার লৌহ ভাণ্ডার : এই অঞ্চলে লৌহ আকরের বিস্তার যদিও উত্তর-পশ্চিমে নইবাগ থেকে দক্ষিণপূর্বে ম্যালিগিনিম পর্যন্ত কিন্তু উৎকৃষ্ট আকর উত্তর গোয়ার এ্যাডভালাপোল থেকে উসগাওয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দক্ষিণ গোয়ায় লৌহ আকরের পরিমাণ ক্রমশ কমে গিয়ে ম্যাঙ্গানিজ আকর দেখা যায়। এখানকার লোহার বেশির ভাগই রপ্তানি করা হয়। সালগাওকার কোম্পানি গোয়ার প্রতিষ্ঠিত রপ্তানিকারক।

অন্যান্য রাজ্যগুলির লৌহ ভাণ্ডার : অন্ধ্রপ্রদেশের কাদাপ্পা, চিত্তুর, নেলোর; তামিলনাড়ুর সালেম অঞ্চল; হরিয়ানায় মহেন্দ্রগড় ; রাজস্থানের আলোয়ার ও ঝুনঝুনু; এবং মধ্যপ্রদেশের বিজাওয়ার ও গোয়ালিয়রে নিম্নমানের লৌহ আকরের সন্ধান পাওয়া গেছে।

মানচিত্রে লৌহঘটিত ধাতবগুলির আকরের অবস্থান দেখান হয়েছে। এ থেকে দেখা যায় যে পশ্চিম উপকূলের মধ্যভাগে (গোয়া-কর্ণাটকে); পূর্ব উপকূলের কাছাকাছি কয়েক জায়গায় এই আকরগুলি অবস্থিত। এছাড়া মধ্যপ্রদেশে ভাণ্ডার আছে। উত্তর, উত্তর পূর্ব এবং পশ্চিম ভারতে লোহার ভাণ্ডার নেই বললেই চলে।

1994 সালের MGMI International Conference-এর আলোচনা পুস্তক থেকে নেওয়া ভারতবর্ষের লৌহ আকর ভাণ্ডারের পরিমাণ (কোটি টন)

	উচ্চমানের	মধ্যমানের	নিম্নমানের	যে আকরের শ্রেণিবিভাগ করা হয়নি	মোট পরিমাণ (সবকিছুতে আকরকে যোগ করে)
বিহার-উড়িষ্যা	34.8	308.4	165.5	49.1	563.3
রয়েলাডিলা	51.1	3.8	21.3	21.8	104.6
দাল্লি-রাজহারা	4.8	44.5	30.3	18.4	99.6
চন্দ্রপুর	.05	3.1	.05	10.9	14.1
গোয়া	1.4	15.9	48.0	9.8	79.8
বেল্লারি-হোসপেট	22.1	43.8	7.2	19.5	92.85
অন্যান্য	0.65	0.6	3.85	0.5	5.65
লোহা + ৬৫% সিলিকা- ০.৫ - ৩.১৫% সর্বোচ্চ এ্যালুমিনা - ৩% সর্বোচ্চ ফসফরাস - ০.১%		লোহা - + ৬২% সিলিকা- ০.৬-৪% এ্যালুমিনা (সর্বোচ্চ) ৪% ফসফরাস সর্বোচ্চ ০.১%	লোহা + ৬২% সিলিকা ১ - ৮% এ্যালুমিনা (সর্বোচ্চ) ২-৬% ফসফরাস সর্বোচ্চ ০.১%		

উচ্চমানের লোহার (৬৫ শতাংশে বেশি লোহা) রাজ্যভিত্তিক অবস্থান নিচে দেওয়া হল।

- মধ্যপ্রদেশ 63 কোটি টন
- উড়িষ্যা 32 " "
- কর্ণাটক 22.1 " "
- বিহার 8.5 " "

এই আকরের বেশির ভাগই হেমাটাইট প্রকৃতির। মধ্যমানের অর্থাৎ যে আকরে লোহার ভাগ 62 - 65 শতাংশ পাওয়া যায় বিহার (179 কোটি টন); উড়িষ্যা (129 কোটি টন) ; মধ্যপ্রদেশ (48.5 কোটি টন); কর্ণাটক (44 কোটি টন); এবং গোয়া (15 কোটি)। সরাসরি ধাতুশিল্পে ব্যবহার উপযোগী (metallurgical grade) ম্যাগনেটাইট আকর পাওয়া যায় কর্ণাটকে (130 কোটি টন), গোয়া (10 কোটি টন) এবং অন্ধ্রপ্রদেশ (3.8 কোটি টন)।

- আমাদের দেশে লৌহ খনির সংখ্যা অনেক। এর মধ্যে বেশ কিছু আধুনিক এবং যন্ত্রচালিত যেমন জেনিমালাই, কুদ্রেমুখ, বায়লাডিলা প্রভৃতি। বাকি অনেক খনিতে এখনও আধুনিক যন্ত্রচালিত প্রযুক্তি কেবল আংশিক।

- 1998 সালে মুদ্রিত পুস্তক অনুসারে ভারতবর্ষে 1996-97 সালে মোট লৌহ আকর উৎপাদন ছিল — প্রায় 7 কোটি টন যার রাজ্যভিত্তিক হিসাব হল : মধ্যপ্রদেশ (1.8) ; গোয়া (1.54); বিহার (1.32); কর্ণাটক (1.3); উড়িষ্যা (1.05)।

- এই 7 টনের মধ্যে আনুমানিক 4.5 কোটি টন আমাদের ইস্পাত ও অন্য শিল্পে লাগে এবং বাকি 2.5 কোটি টন রপ্তানি করা হয়। পৃথিবীর প্রথম দশটি লৌহ আকর রপ্তানিকারী দেশের মধ্যে ভারতের স্থান পঞ্চম। অন্য চারটি দেশ যথাক্রমে ব্রাজিল (12.5 কোটি টন); অস্ট্রেলিয়া (12 কোটি টন); পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন (3.3 কোটি টন) এবং কানাডা (2.8 কোটি টন)।

ভারত শুধু লৌহ আকরই রপ্তানি করে না — বড়ি (pellets), লৌহ অক্সাইড প্রভৃতিও করে। মোট 27টি দেশে আমাদের লোহা রপ্তানি হয় — এদের মধ্যে সব থেকে বেশি নেয় জাপান।

- মোট লৌহ আকরের ভাণ্ডার অনুযায়ী ভারতের স্থান পৃথিবীর সবদেশের তালিকাতে পঞ্চম এবং ইস্পাতশিল্প উৎপাদনে দশম স্থানে।

- লৌহ আকরের আলোচনা শেষ করার আগে — কয়েকটি খনি সম্বন্ধে কিছু তথ্য দেওয়া হল — আপনাদের অবহিত করার জন্য।

দেশের দুটি বৃহৎ খনি হল বায়লাডিলা এবং জেনিমালাই — এগুলি চালায় ন্যাশনাল মিনারেল ডেভলপমেন্ট করপোরেশন (National Mineral Development Corporation)। বায়লাডিলার উত্তোলন বাড়ানোর জন্য 10/11 ভাণ্ডারে একটি বছরে 50 লক্ষ টন আকর উত্তোলন করার মতন খনির কাজ শুরু হয়েছে।

কুদ্রেমুখ খনি রাজ্য সরকারি কর্পোরেশন (Kudremukh Iron Ore Corporation) এইটি আমাদের দেশে লৌহ রপ্তানিকারী সংস্থার মধ্যে বৃহত্তম। এখানকার আকর magnetite এ লোহার অংশ 32 থেকে42 শতাংশে — একে প্রথমে চৌম্বকীয় পদ্ধতিতে লোহার পরিমাণ 67 শতাংশতে বাড়ান হয় এবং পরে 'বড়ি' (pellet) তৈরি করে পুরো উৎপাদনই জাপান, হাঙ্গেরী, তুরস্ক, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হয়।

- লৌহ খনি বেশির ভাগই খোলামেলা (Opencast)। এতে প্রচুর জায়গায় পরিবেশ পরিবর্তিত হয়। এই সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র আলোচনা করব।

10.3.2 ম্যাঙ্গানিজ

ম্যাঙ্গানিজ একটি মৌল ধাতু-এর রাসায়নিক চিহ্ন Mn। এই গ্রীক শব্দটির অর্থ "পবিত্র করা"। প্রবাদ অনুসারে সভ্যতার আদিম যুগে ম্যাঙ্গানিজ আকর পাইরোলুসাইট (pyrolusite) কাঁচকে পরিষ্কার বা স্বচ্ছ করার জন্য ব্যবহৃত হত। 1882 খৃঃ অব্দে ইংলন্ডে সর্বপ্রথম ম্যাঙ্গানিজ ব্যবহার করে বিশেষ ধরনের ইস্পাত তৈরি করা হয়। ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ম্যাঙ্গানিজ মিশ্রিত ইস্পাত করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

ম্যাঙ্গানিজ অবক্ষেপ প্রধানত দুটি প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হয়। সমজাত (syngenetic) পাললিক এবং পরবর্তীকালে রূপান্তরিত অথবা অনুজাত (epigenetic) অবশিষ্ট সমৃদ্ধিকরণ ও জারণ। পাললিক আকর পরবর্তীকালে তাপ ও চাপের প্রভাবে ম্যাঙ্গানিজ সমৃদ্ধ আকর ভাণ্ডারের উৎপত্তি ঘটায়। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় 90 শতাংশই ব্রনাইট $3Mn\ zO_3$, $Mn\ Si\ O_3$, পাইরোসুলাইট ($Mn\ O_2$); সাইলোমিলেন (MnO_2, H_2O) থেকে উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ ভাণ্ডারগুলি আছে মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা এবং কর্ণাটকে। এছাড়াও গুজরাত, গোয়া, অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান ও বিহারে আছে বিভিন্ন আকারের ভাণ্ডার। নিচে আমরা এইগুলি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম।

মধ্যপ্রদেশ-মহারাষ্ট্র : মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট ও ছিন্দাওয়ারা এবং মহারাষ্ট্রের নাগপুর - ভাণ্ডারা অঞ্চলের ম্যাঙ্গানিজ আকরের অস্তিত্ব প্রায় 200 কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষাতে প্রায় 100 বছর আগে এই ভাণ্ডারের উপস্থিতি সম্বন্ধে জানা গিয়েছিল। এই ভাণ্ডার অতিপ্রাচীন শিলাস্তর "সসারে" (Sausar) এ অবস্থিত এবং ভূবৈজ্ঞানিকদের গবেষণায় জানা গেছে যে এখানকার শিলাস্তরে নানাপ্রকার ভাঁজ ও চ্যুতি আছে। আকরগুলির ভাণ্ডারের গঠনে জটিলতা আছে।

উৎকৃষ্টমানের ম্যাঙ্গানিজ আকর পাওয়া যায় বালাঘাট, ছিন্দওয়ারা, ভাণ্ডারা এবং নাগপুর অঞ্চলে। এখানকার আকরের ম্যাঙ্গানিজের ভাগ আনুমানিক 46 শতাংশ; 2 থেকে 7 শতাংশ সিলিকা; লোহার পরিমাণ 7 শতাংশের কম এবং ফসফরাসের পরিমাণ 0.03 থেকে 0.1 শতাংশ। ভাণ্ডারার আকরিকে ফসফরাসের পরিমাণ বেশি (0.06 থেকে 0.34 শতাংশ)। অল্প পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ আকর জব্বলপুর, ঝাবুয়া এবং বিলাসপুর জেলাতেও পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্রের উপকূলবর্তী এলাকাতে — কিছু ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশ-মহারাষ্ট্রে বিভিন্ন মাপের প্রায় 200টির বেশি খনিজ ভাণ্ডার আছে।

উড়িষ্যা-অন্ধ্র : উড়িষ্যাতে তিনটি শিলাস্তরে ম্যাঙ্গানিজ আকর দেখা যায়। (১) প্রাচীনতম শিলাসমষ্টি "আয়রন ওর" যার সৃষ্টি আনুমানিক 320 থেকে 295 কোটি বছর পূর্বে। (২) প্রাক্-কেমব্রিয়ান (Pre-Cambrian) খণ্ডালাইট (Khondalite) শিলাগোষ্ঠীতেও সামান্য আকর দেখা যায়। (৩) উপজীবীয় যুগের (২৫০ কোটি থেকে ৬০ কোটি বছর) গাংপুর শিলাস্তরেও এই আকর আছে।

"আয়রন-ওর (Iron-Ore)" শিলা সমষ্টিতে উড়িষ্যার বোনাই, কেওনঝর এবং নিকটবর্তী দক্ষিণ সিংভূমে ম্যাঙ্গানিজ আকরের ভাণ্ডার সুপরিচিত। এই আকরে ফসফরাসের অংশ লক্ষণীয়ভাবে কম। উড়িষ্যার কোরাপুট-কালাহাণ্ডিতে এবং অন্ধ্রপ্রদেশে শ্রীকাকুলামে খণ্ডেলাইট পাথরের ম্যাঙ্গানিজ আকর লক্ষ্য করা যায়। গাংপুর শিলাগোষ্ঠীর মধ্যে ম্যাঙ্গানিজ আকর পাওয়া যায় উড়িষ্যার সম্বলপুর জেলায়।

কর্ণাটক - গোয়া : কর্ণাটকের বেলারী, চিত্রদুর্গা, উত্তর কানাড়া, শিমোগা, টুমকুর অঞ্চলে এবং উত্তর গোয়াতে — ম্যাঙ্গানিজ আকরের ভাণ্ডার আছে। গোয়ার পারনেম এবং বারদার অঞ্চলে ম্যাঙ্গানিজ আকর —

লৌহ আকরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখানে দুরকমের আকর পাওয়া যায় : (ক) যে আকরে ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ 35 থেকে40 শতাংশ এবং (খ) যে আকরে ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ 10 থেকে 35 শতাংশ। অনেক সময় (ক) আকরের লৌহ থাকায় ঐ আকরের মোট লোহা + ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ 50 শতাংশ ছাড়িয়ে যায়।

কর্ণাটকের শিমোগা চিত্রদুর্গায় ম্যাঙ্গানিজ আকর 240 কোটি বছর প্রাচীন চিত্রদুর্গা শিলাস্তরে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে ম্যাঙ্গানিজ তিনটি বিভিন্ন স্তরে রয়েছে।

- উপরের ল্যাটেরাইট পাথরে 5 মি গভীর পর্যন্ত নিম্ন মানের আকর পাওয়া যায়। প্রধান আকারক খনিজ - পাইরোলুসাইট ও ক্রিপ্টোমিলেন।

- এর নিচে 10 - 15 মি গভীর পর্যন্ত ম্যাঙ্গানিজের শিরা বা পকেট অধক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। এখানে উন্নতমানের খনিজ।

- সর্বনিম্নে প্রাথমিক খনিজ সঞ্চয় হিসাবে ম্যাঙ্গানীজ থাকে সান্দুর অঞ্চলে ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনের 80 শতাংশ করা হয় স্তরায়িত আকরদেহ থেকে অবশিষ্ট উৎপন্ন হয় ওপরের ল্যাটেরাইট থেকে।

বিহার : ম্যাঙ্গানিজ আকর গুয়া-বড়াজামদা এলাকায় পাওয়া যায়। এখানকার খনিগুলি বেশ পুরানো।

রাজস্থান : বাঁশওয়াড়া অঞ্চলে অল্প পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ আকর আছে। এতে ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ 25 থেকে 46 শতাংশ লোহা- 3 থেকে 7 শতাংশ, সিলিকা 11 থেকে32 শতাংশ।

পশ্চিমবঙ্গ : মেদিনীপুর জেলায় কয়েকটি স্থানে শিমুলপাল, বাঁশপাহাড়ি প্রভৃতিতে ম্যাঙ্গানিজ আকরের ছোট পকেট দেখা যায়। এতে ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ 30 শতাংশ।

আমাদের দেশে ম্যাঙ্গানিজ আকরের পরিমাণ আনুমানিক 176 কোটি টন যার রাজ্যভিত্তিক হিসাব নিচে দেওয়া হল।

রাজ্য	ভাণ্ডারের পরিমাণ (হাজার টন)			
	প্রমাণিত	সম্ভাব্য	অনুমিত	মোট
অন্ধ্রপ্রদেশ	7	4157	3368	7532
বিহার	—	—	2298	2294
গোয়া	2151	11432	9976	23559
গুজরাট	—	—	1477	1477
কর্ণাটক	2262	10427	51858	64547
মধ্যপ্রদেশ	9216	2510	4818	16544
মহারাষ্ট্র	10138	5662	3373	19173
উড়িষ্যা	4793	7605	28438	40836
রাজস্থান	—	—	409	409
পশ্চিমবঙ্গ	—	—	100	100
মোট	28567	41793	106115	176475

এই প্রসঙ্গে আরও কিছু তথ্য এখানে দেওয়া হল :

● ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ম্যাঙ্গানিজ আকরের ভাণ্ডার অনেক কম। মোট ভাণ্ডারের খুব অল্প পরিমাণ (আনুমানিক 16 শতাংশ) উন্নত মানের আকর যাতে ফসফরাসের পরিমাণ কম।

● বর্তমানে আমাদের দেশে মোট উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় 19 লাখ টন। এই মোট হিসাবের শতকরা 34 ভাগ উড়িষ্যা; 24 ভাগ কর্ণাটক; 20 ভাগ মধ্যপ্রদেশ এবং 17 ভাগ মহারাষ্ট্রের খনি থেকে উত্তোলিত হয়।

● এ্যালয় শিল্পে সব ম্যাঙ্গানিজ আকর ব্যবহার করা সম্ভব নয়। যে ধরনের আকর ব্যবহার করা সম্ভব তার পরিমাণ কম — এবং বৈজ্ঞানিকদের অনুমান যে আর মোট 30 থেকে 50 বছর এই শিল্পের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে।

এই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য রপ্তানির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। মধ্যম মানের আকর অর্থাৎ যাতে 38 থেকে 46 শতাংশ ম্যাঙ্গানিজ থাকে সেটার রপ্তানির সীমা ধার্য্য করা হয়েছে বছরে 1 লক্ষ টন এবং নিম্ন মানের (38 শতাংশের কম ম্যাঙ্গানিজ) আকরের রপ্তানির সীমা ধার্য করা হয়েছে বছরে 3 লক্ষ টন।

● 1996-97 সালে আমরা মোট 4 লক্ষ বিশ হাজার টন ম্যাঙ্গানিজ আকর রপ্তানি করেছিলাম।

● আকর ভাণ্ডার হিসাবে পৃথিবীর প্রথম দশটি দেশের নাম হল (১) অস্ট্রেলিয়া (২) ব্রাজিল (৩) চিনা (৪) গ্যাবন (৫) জর্জিয়া (৬) ঘানা (৭) ভারতবর্ষ (৮) কাজাখস্থান (৯) মেক্সিকো (১০) দক্ষিণ আফ্রিকা।

● গোটা বিশ্বের মোট ম্যাঙ্গানিজ আকরের উৎপাদনের 7.5 শতাংশ আমাদের দেশে হয়। ম্যাঙ্গানিজ এ্যালয়ের মোট উৎপাদনের মাত্র 3.5 শতাংশ আমাদের দেশে উৎপাদিত হয়।

● আমাদের দেশের 206টি ম্যাঙ্গানিজ খনির মধ্যে মাত্র ৬টি মাটির নিচেকার সম্পদ আহরণ করে (Underground mines) — বাকি সবই খোলামেলা (opencast) খনি।

● আকরের ভাণ্ডার বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় ভূবৈজ্ঞানিক সর্বেক্ষণ উড়িষ্যার বোলানগির এবং সুন্দরগড় এবং মহারাষ্ট্রের নাগপুর অঞ্চলে গবেষণা চালাচ্ছে। উপকূলবর্তী সমুদ্রের ম্যাঙ্গানিজ নিয়েও সমীক্ষা চলছে।

10.3.3 ক্রোমাইট

ক্রোমাইট একটি প্রাকৃতিক খনিজ এবং ক্রোমিয়াম ধাতুর প্রধান ও একমাত্র আকর। এর রঙ কালো অথবা বাদামী এবং রাসায়নিক ফর্মুলা — $Fe\,O.Cr_2\,O_3$। প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ ক্রোমাইট খুব কমই দেখা যায়। ক্রোমাইটে ক্রোমিয়াম ধাতু 46.7 শতাংশ থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই মৌলিক ক্রোমিয়াম Cr অ্যালুমিনিয়াম দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় এবং লৌহ হয় ম্যাগনেশিয়াম দ্বারা।

● ক্রোমিয়াম ধাতু অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে মিশ্রণ করে alloy করা হয়। স্টিলের সঙ্গে অল্প পরিমাণ ক্রোমিয়াম মেশালে সেটা অনেকটা শক্ত হয় এবং তাতে ক্ষয় কম হয় (Wear resistant)। স্টেনলেস স্টীল যাতে মরিচা পড়ে না — সেটাতে 17 থেকে 19 শতাংশ ক্রোমিয়াম এবং 8 থেকে 13 শতাংশ নিকেল থাকে।

● কোবাল্ট, মলিবডেনাম এবং ক্রোমিয়াম-এর মিশ্র ধাতুর এক বিশেষ গুণ হল — মানুষের দেহে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। শল্যবিদদের বেশির ভাগ ছুরি-কাঁচি-ফরসেপস্ তৈরি এই মিশ্র ধাতু দিয়ে যার নাম 'কোমোক্রোমিয়াম' (Comochromium)

ভারতবর্ষে ক্রোমাইট পাওয়া যায় বিহার-উড়িষ্যা অঞ্চলে, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশে। এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

বিহার : সিংভূম জেলার জজুহাটু, বোরোবোরু প্রভৃতি এলাকায় ক্রোমাইটের সন্ধান বিংশ শতাব্দীর একদম গোড়ায় পাওয়া গিয়েছিল। এখানে খনিগুলোও পুরোনো। বোরোবুরুতে ক্রোমাইটের স্তর প্রায় 0.3 মি. পুরু এবং 1.6 কিলোমিটার অঞ্চলে পরিব্যপ্ত। এই আকরে ক্রোমিয়ামের পরিমাণ থেকে 46-51 শতাংশ এবং লৌহ অক্সাইডের পরিমাণ 16-31 শতাংশ। অন্য জায়গায় ক্রোমাইটের স্তর কয়েক সেন্টিমিটার পুরু এবং প্রায় 50 মিটার বিস্তৃত।

উড়িষ্যা : আমাদের দেশে ক্রোমাইট উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই রাজ্যই সর্বপ্রথম। কেওনঝরের নৌসাহি, কটকের সুকিন্দা এবং ঢেনকানালের কটপাল এলাকায় এই আকর প্রচুর পরিমাণে আছে। সুকিন্দা অঞ্চলে ক্রোমাইটের একাধিক স্তর বর্তমান। আকরদেহ 0.1 মিটার থেকে 21 মি. পর্যন্ত পুরু। এই আকরে ক্রোমিয়াম অক্সাইড 49.6 থেকে 51.4 শতাংশ; ফেরাস অক্সাইড 13.7 থেকে 14.8 শতাংশ এবং সিলিকার পরিমাণ 5.02 থেকে 7.86 শতাংশ।

নৌসাহিতে (সুকিন্দার 48 কিলোমিটার উত্তর পূর্বে) ক্রোমাইট আকর ভাণ্ডার আছে। আকরবাহী শিলাসমষ্টি দৈর্ঘ্যে প্রায় 3 কিলোমিটার এবং প্রস্থে 600 মিটার। ক্রোমাইটের ছয়টি স্তর মসুর (lense) আকারের এবং 2.0 মিটার থেকে 3.9 মিটার পুরু। নৌসাহি-সুকিন্দার আকরিক খনিজ ভাণ্ডারের পরিমাণ 9.98 কোটি টন।

কর্ণাটক : এই রাজ্যে প্রথম ক্রোমাইট আকরের সন্ধান পাওয়া যায় 1889 খৃঃ অব্দে। পরবর্তীকালে মহীশূর, সিমোগা, হাসান, কোদুর, চিত্রদুর্গা প্রভৃতি জেলাতে অনুসন্ধান চালিয়ে আকর ভাণ্ডার পাওয়া গেছে। হাসান জেলায় বেশ কয়েকটি জায়গায় খনিজ ভাণ্ডার আছে। এই অঞ্চলে আকরদেহ 25 সেন্টিমিটার থেকে 13 মিটার পর্যন্ত প্রসারিত এবং 10 মিটার থেকে 400 মিটার দীর্ঘ। আকরে ক্রোমিয়াম অক্সাইডের পরিমাণ 24 থেকে 28 শতাংশ। কর্ণাটক রাজ্যে মোট ভাণ্ডারের পরিমাণ প্রায় 0.11 কোটি টন। ভারতবর্ষে একমাত্র বাইরাপুরে ভূগর্ভস্থ খনি থেকে ক্রোমাইট আকর সংগ্রহ করা হয়। সম্প্রতি উড়িষ্যাতে FACOR কোম্পানী 2টি ভূগর্ভস্থ ক্রোমাইট খনি চালু করেছে।

তামিলনাড়ু : সালেম জেলায় সীতামপুন্ডি অঞ্চলে স্তরায়িত (layered) ক্ষারকীয় ও অতিক্ষারকীয় শিলাস্তরের মধ্যে পাঁচটি ক্রোমাইট আকরের স্তর আছে যা পাইরক্সিনাইট (Pyroxenite) শিলাস্তরের মধ্যে আছে। এখানকার আকর নিম্নমানের যাতে ক্রোমিয়াম অক্সাইডের পরিমাণ 21 থেকে 38 শতাংশ। এখানে 2.2 লক্ষ টন ক্রোমাইট আছে বলে অনুমান করা হয়।

অন্ধ্রপ্রদেশ : কৃষ্ণা জেলার কোনডাপল্লীর ক্রোমাইট খনিজ অতিক্ষারকীয় চার্নোকাইট (charnokite) শিলার মধ্যে পাওয়া যায়। আকরদেহে ক্রোমিয়াম অক্সাইড 38 থেকে 49 শতাংশ এবং এ্যালুমিনার পরিমাণ 16 থেকে 19 শতাংশ।

অন্যান্য অঞ্চল : ভারতবর্ষে নাগাল্যান্ড, মণিপুর, এবং আন্দামানে ওফিওলাইট শিলাসমষ্টিতে কিছু জায়গায় ক্রোমাইট দেখা যায়। মণিপুরে মোরে (Moreh)র কাছে মসুরাকৃতি (lensoid) বিচ্ছিন্নভাবে ক্রোমাইট আকর দেখা যায় যেটা কিছুদিন আগে পর্যন্ত উড়িষ্যা মাইনিং কর্পোরেশন সংগ্রহ করত। এখন এগুলোতে কোনও কাজ হয় না। এই প্রসঙ্গে বলা যায় ওফিওলাইট (Ophiolite) শিলার ব্যবচ্ছিন্ন চরিত্রের জন্য এখনও পর্যন্ত খনন উপযোগী আকরদেহ প্রমাণিত হয় নি। উল্লেখ্য, সাইপ্রাসে ওফিওলাইট শিলাস্তরে মসুরাকৃতি ক্রোমাইটের খনি আছে।

ভারতবর্ষে ক্রোমাইটের মোট মজুদ ভাণ্ডারের পরিমাণ 18.2 কোটি টন যার মধ্যে আনুমানিক 8.8 কোটি কোটি টন উত্তোলন করা সম্ভব (mineable)। নিচে ক্রোমাইট সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য দেওয়া হল আপনাদের জানানোর জন্য।

- পৃথিবীতে মোট ক্রোমাইট আকরের পরিমাণ আনুমানিক 680 কোটি টন। অবশ্য এই হিসাবে পূর্ব ইউরোপ ধরা হয়নি। এই মোট ভাণ্ডারের 84 শতাংশ আছে দক্ষিণ আফ্রিকাতে; জিম্বাবোয়েতে আছে 11 শতাংশ; এবং ভারতে 2 শতাংশ।

- 1994 সালের হিসাব অনুযায়ী ক্রোমাইট উৎপাদনের হিসাবে পৃথিবীতে প্রথম ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা, দ্বিতীয় স্থানে কাজাকস্থান এবং তৃতীয় স্থানে ভারত। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পৃথিবীর মোট আকর ভাণ্ডারের মাত্র 2 শতাংশ আমাদের দেশে থাকা সত্ত্বেও — আমরা উৎপাদনে অনেক এগিয়ে আছি।

- 1995-96 সালে আমাদের ক্রোমাইট উৎপাদন হয়েছিল 16 লক্ষ টন যার মধ্যে আমরা 4 লক্ষ টন রপ্তানী করেছিলাম এবং 12 লক্ষ টন নিজের দেশে এ্যালয় শিল্পে কাজে লেগেছিল।

- এই উৎপাদনের শতকরা 96 ভাগ উত্তোলন করা হয় উড়িষ্যা থেকে। যে তিনটি বড় কোম্পানি খনির কাজ চালায় তারা হল টাটা (Tata Iron and Steel Company); ও এম সি (Orissa Mining Corporation) এবং ফ্যাকর (Ferroy Alloys Company)

- ক্রোমাইটের অনেক খোলামেলা খনি (opencast mines) 40 থেকে 60 মিটারের পর বন্ধ করে দিতে হয়েছে খনি-নিরাপত্তার কারণে। অন্য কারণগুলি হল যে ক্রোমাইটের অনেক স্তরই খাড়াভাবে থাকে — কাজেই তাকে ভূগর্ভ থেকে ওঠাতে গেলে প্রচুর খননকার্য্য করতে হয়। এতে অনেক জায়গা খনির আওতায় পড়ে এবং এছাড়াও যেহেতু ঐ উত্তোলিত শিলাতে নিকেল (যা আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য) থাকে — সেইগুলিকেও আলাদাভাবে জমিয়ে রাখার প্রয়োজন হয়। এতে নানা অসুবিধা হয়। বিশেষজ্ঞরা এসব সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছেন এবং সমীক্ষা চলছে যাতে ঐ নিকেলমিশ্রিত Gangue বা অন্য পদার্থ থেকে নিকেলকে নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়।

- আমাদের দেশে Scrap থেকে ধাতু নিষ্কাশন নেই বললেই চলে। কিন্তু অন্যান্য দেশে (Stainless Steel) স্টেনলেস স্টিল থেকে ক্রোমাইটকে আবার নিষ্কাশন করে নেওয়া হয়। 1994-95 সালে আমেরিকাতে প্রায় 5 লক্ষ টন ক্রোমাইট ফেলে দেওয়া বা Scrap স্টেনলেস স্টিল থেকে নিষ্কাশন করা হয়েছিল।

- ক্রোমাইটের সম্পদ কম কিন্তু অ্যালয় শিল্পে এর চাহিদা যথেষ্ট। ধাতুশিল্পে উচ্চমানের আকর লাগে সেইজন্য উড়িষ্যার তিনটি কোম্পানিই টিসকো, ও এম সি এবং ফ্যাকর আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে নিজেদের কারখানাতে নিম্নমানের ক্রোমাইট আকরকে লৌহঅ্যালয় শিল্পে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলছে।

- প্রকৃতিতে ক্রোমিয়াম যে ভাবে থাকে — সেটার সঙ্গে জলের সংমিশ্রণে যে দূষণ সৃষ্টি হয় সেটা মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পর জানা গেছে হেক্সাভ্যালেন্ট ক্রোমিয়াম বা Cr^{+6} কে যদি ট্রাইভ্যালেন্ট ক্রোমিয়াম বা Cr^{+3} করা যায় তাহলে মানুষের শরীরের ওপর এর প্রভাব কম। টিসকো সম্প্রতি ব্যবস্থা নিয়েছে যাতে খনি থেকে বেরোনো জলে ট্রাইভ্যালেন্ট ক্রোমিয়ামই থাকে।

10.3.4 নিকেল

নিকেল একটি মৌল ধাতু যার রাসায়নিক চিহ্ন Ni। এই ধাতুর বৈশিষ্ট্য হল এতে মরিচা ধরেনা এবং ক্ষয় খুব কম পরিমাণে হয়। মুদ্রা তৈরি করতে, বিভিন্ন অ্যালয়ের জন্য — এর চাহিদা প্রচুর। সাধারণভাবে পৃথিবীর শিলাস্তরে এর

পরিমাণ থাকে 0.016 শতাংশ। নিকেল যৌগ তিন প্রকারের হয় : সালফাইড (পিরোটাইট, পেন্টল্যান্ডাইট, মিলারাইট); সিলিকেট (গার্নিয়ারাইট) এবং আর্সেনিক যৌগ নিকোলাইট। এছাড়া প্রকৃতিতে ল্যাটেরাইটের মধ্যেও নিকেল মিশ্রিত থাকে।

ভারতবর্ষে নিকেল আকরের সন্ধান একমাত্র উড়িষ্যার সুকিন্দাতে পাওয়া গেছে। এইখানে অতিক্ষারকীয় শিলার উপরিভাগে লিমোনাইট আছে যার মধ্যে নিকেল অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড হিসাবে রয়েছে। লিমোনাইট পাথরে নিকেলের পরিব্যাপ্তি খুব সুনিয়ন্ত্রিত নয় — তবুও এই ধাতুর গুরুত্ব জেনে ভারতীয় ভূবৈজ্ঞানিক সর্বেক্ষণ (Geological Survey of India) এখানে বিশেষ ধরনের সমীক্ষা করেছিল। এই সমীক্ষাতে কানসা অঞ্চলে 1.4 কোটি টন আকরের সন্ধান পাওয়া গেছে যাতে নিকেলের পরিমাণ 0.7 থেকে 1.9 শতাংশ।

এছাড়া সুকিন্দার ল্যাটেরাইট স্তরেও নিকেলের হদিশ পাওয়া যায়। এই ল্যাটেরাইটের বিস্তার অনেকখানি এবং এতে নিকেলের পরিমাণ আনুমানিক 0.5 থেকে 10 শতাংশ। সমীক্ষা অনুসারে এই ধরনের ল্যাটেরাইটের পরিমাণ 2১ কোটি টন যাতে 0.2 শতাংশ নিকেল থাকতে পারে।

আমাদের দেশে নিকেলের কোনও খনি নেই অথচ এর চাহিদা আছে যেটা প্রায় পুরোটাই আমদানি করে মেটাতে হয়। ঘাটশিলাতে হিন্দুস্থান কপার লিমিটেডের Smelter এ তামা নিষ্কাশনের সময় আনুমানিক 200 টন নিকেল, নিকেল সালফাইড by-product হিসাবে পাওয়া যায়। অ্যালয় শিল্পের চাহিদা মেটাতে 1994-95 সালে আমাদের 14000 টন ফেরো নিকেল আমদানি করতে হয়েছিল। আপনাদের অবহিত হওয়ার জন্য নিচে কিছু তথ্য দেওয়া হল।

- পৃথিবীতে সব চাইতে বেশি নিকেল উৎপাদন হয় কানাডাতে; এর পরের স্থানগুলিতে পর পর আছে ডোমিনিকান রিপাবলিক; আমেরিকা (উত্তর ও দক্ষিণ); কিউবা; প্রাক্তন রাশিয়া; চিন এবং অন্যান্য দেশ। 1995 সালে গোটা পৃথিবীতে মোট নিকেলের উৎপাদন ছিল 905000 টন। এই সঙ্গে জানা যায় যে ঐ সময়ে চাহিদার মোট পরিমাণ ছিল 10 লক্ষ টন।

- 1995 সালে সবচাইতে বেশি নিকেল লেগেছিল জাপানে (20800 টন)। এর পর ছিল দক্ষিণ কোরিয়া (46000 টন); চিন (39600 টন); রাশিয়া (48000 টন); চিন (40,200 টন)

- পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও অধিক পরিমাণে নিকেল কাজে লাগিয়েছে 1995 সালে। জার্মানি (98000 টন); ইটালি (46500 টন); ফ্রান্স (45000 টন); ইংল্যান্ড (38000 টন)। ছোট্ট দেশ ফিনল্যান্ড 1995 সালে নিকেল কাজে লাগিয়েছে আনুমানিক 31,500।

- এই ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণ হচ্ছে — ক্রমশই স্টেনলেস স্টিলের ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছে। অনুমান করা হয় যে চাহিদার থেকে যোগান কম থাকায় নিকেলের মূল্য ক্রমশই বেড়ে যাবে।

- আমাদের দেশে সুকিন্দাতে নিকেলের ভাণ্ডার সম্বন্ধে অনেকদিন ধরে জানা থাকলেও এই ধাতু নিষ্কাশনের ব্যাপারে আজও কোনও নীতি নির্ধারণ হয়নি। উদার নীতির পরিপ্রেক্ষিতে অনেকের ধারণা যে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের নিকেল উৎপাদন হওয়া সম্ভব।

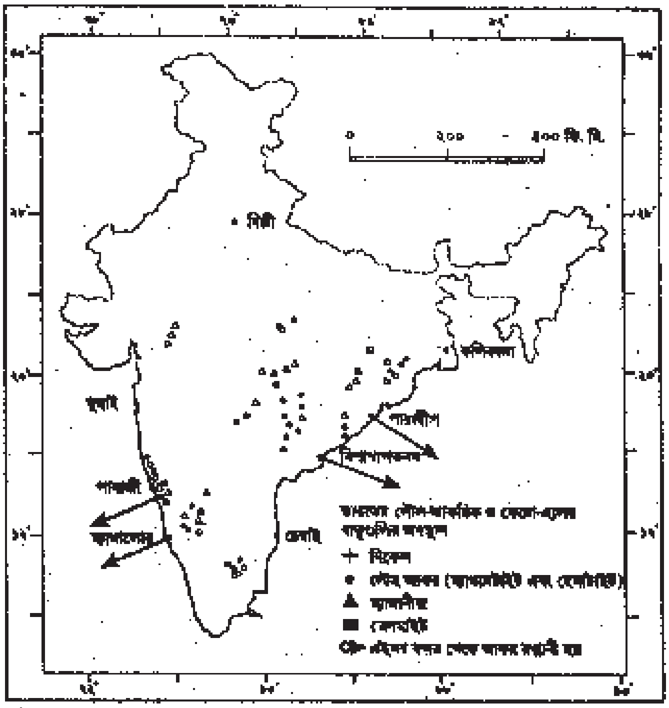

ভারতে লৌহ-আকরিক ও ফেরো-অ্যালয় ধাতু আকরগুলির অবস্থান রপ্তানিকারী বন্দর

10.3.5 ভ্যানাডিয়াম

ভ্যানাডিয়াম ধাতু অ্যালয় শিল্পে নানা কাজে লাগে। ইস্পাত শিল্প ছাড়াও অন্যান্য অ্যালয়ে ভ্যানাডিয়ামের চাহিদা আছে। ভ্যানাডিয়াম মিশ্রিত সোনা দাঁত বাঁধাতে কাজে লাগে; ভ্যানাডিয়াম-এ্যালুমিনিয়াম এরোপ্লেনের কাঠামো করাতে প্রয়োজন হয়; ভ্যানাডিয়াম - কপার এরোপ্লেনের ইঞ্জিন তৈরি করতে কাজে লাগে।

এই ধাতু ম্যাগনেটাইট আকরের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায় আমাদের দেশে। এর সঙ্গে আরও একটি মূল্যবান ধাতু টাইটানিয়ামও মিশ্রিত থাকে।

- বিহারের সিংভূম অঞ্চলের দক্ষিণপূর্বে; উড়িষ্যায় ময়ূরভঞ্জে এবং দক্ষিণ কর্ণাটকে টাইটানিয়াম এবং ভ্যানেডিয়াম যুক্ত ম্যাগনেটাইট আকর দেখা যায়। এই আকর সাধারণভাবে অতিক্ষারকীয় (ultra-basic) শিলার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই অঞ্চলের আকরের পরিমাণ আনুমানিক 29 লক্ষ টন যাতে ভ্যানাডিয়াম অক্সাইড (V_2O_5) এর পরিমাণ প্রায় 0.5 থেকে 2.0 শতাংশ।

- কেওনঝরে ক্রোমাইট খনিজের সঙ্গে ভ্যানাডিয়াম যুক্ত ম্যাগনেটাইটের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই আকরে ভ্যানাডিয়াম আনুমানিক 2 শতাংশ এবং টাইটানিয়াম 13 থেকে 25 শতাংশে আছে।

- কর্ণাটকে সিমোগাতে ভ্যানাডিয়াম যুক্ত ম্যাগনেটাইট পাওয়া যায়। এখানে V_2O_5 এর পরিমাণ 0.62 থেকে 0.89 শতাংশ।

- ভারতের বক্সাইটে (পরে আলোচনা করা হবে) অনেক ক্ষেত্রেই V_2O_5 পাওয়া যায় যার পরিমাণ 0.01 থেকে 0.2 শতাংশ। বৈজ্ঞানিকদের মতে Vanadium ধাতুর এটা একটা প্রধান উৎস হতে পারে।

- সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে বিহার ও উড়িষ্যার ভ্যানাডিয়াম যুক্ত ম্যাগনেটাইট আকর থেকে ভ্যানাডিয়াম নিষ্কাশন করা সম্ভব। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও উৎপাদন শুরু করা হয়নি এবং এবিষয়ে কোনও পরিকল্পনা আছে কিনা এটাও সাধারণভাবে জানা নেই।

10.3.6 টাইটানিয়াম

টাইটানিয়াম (Titanium) এর দুটি প্রধান আকর হল ইলমেনাইট (FeO, Ti O_2) যাতে টাইটানিয়াম অক্সাইডের পরিমাণ হল 52.6 শতাংশ আর টাইটানিয়াম ধাতুর পরিমাণ 31.6 শতাংশ। অন্য আকরটির নাম রুটিল (Rutile; Ti O_2) যাতে টাইটানিয়ামের পরিমাণ 90 শতাংশ। এই দুই আকরই অন্যদের তুলনায় ভারী টাইটানিয়াম অক্সাইড — নানা কাজে লাগে যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল : রঙ (paint) শিল্প; কাগজ; চামড়া, প্লাস্টিক, লিনোলিয়াম, ছাপার কালি, কাপড় শিল্প প্রভৃতি। টাইটানিয়াম ধাতু হালকা কিন্তু এর এ্যালয় খুব শক্ত এবং তাপ সহ্য করতে পারে। মহাকাশ যান এবং এরোপ্লেন শিল্পে এর প্রচুর চাহিদা।

এই আকর আমাদের দেশে কোথায় পাওয়া যায় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

উপকূল ভাগ : পূর্ব উপকূলে ইলমেনাইট এবং রুটিল স্থাপক অবক্ষেপ (Placer deposits) হিসাবে দেখা যায়। পশ্চিমে রত্নগিরি থেকে পূর্বে উড়িষ্যার তটভাগে অনেক জায়গাই দেখা যায়। কিন্তু মোটামুটি বিশেষ জায়গায় বালির মধ্যে এই আকরের পরিমাণ বেশি থাকে। এই জায়গাগুলি হল :

- কেরালার কুইলন জেলায় নীন্দাকারা থেকে কায়ামকুলাম পর্যন্ত প্রায় 22 কিলোমিটার তটভূমি;
- তামিলনাড়ুতে কোলোচেল থেকে মানাভালাকুরুচি পর্যন্ত 6 কিলোমিটারের বেশি তটভূমি;
- উড়িষ্যাতে ছত্রপুর তটভূমি গঞ্জাম জেলায় প্রায় 18 কিলোমিটারের মতো তটভূমি।

গুরুত্বপূর্ণ আকর ভাণ্ডার হল কেরালার কুইলোনে এবং তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী অঞ্চলে। কুইলোনের বালুকাতে ইলমেনাইটের ভাগ 65 থেকে 70 শতাংশ এবং রুটিলের ভাগ 3 থেকে 4 শতাংশ। কন্যাকুমারীর মানাভালাকুরুচি অঞ্চলে টাইটানিয়াম অক্সাইডের পরিমাণ প্রায় 50-45 শতাংশ।

অন্যান্য জায়গা : ● উপরের অঞ্চলগুলি ছাড়া ইলমেনাইট সমৃদ্ধ বালুকা পাওয়া যায় তামিলনাড়ুর তিরুচিরপল্লী; মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি; অন্ধ্রে বিশাখাপত্তনম; উড়িষ্যার গঞ্জাম এবং গোয়া ও গুজরাটের কোনও কোনও উপকূলভাগে।

- বিহার-উড়িষ্যার ভ্যানাডিয়াম যুক্ত ম্যাগনেটাইট আকরের সঙ্গেও ইলমেনাইট দেখা যায়। কোথাও কোথাও এর পরিমাণ 15 থেকে 17 শতাংশ।
- রাজস্থানের দেগানাতে টাংস্টেন আকরের সঙ্গেও ইলমেনাইট পাওয়া যায়।
- টাইটানিয়ামের গুরুত্বের জন্য এ্যাটমিক এনার্জি কমিশন এর ভাণ্ডারের হিসাব রাখে। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী আমাদের দেশের তটভাগে মোট 13.8 কোটি টন ইলমেনাইট এবং 70 লক্ষ টন রুটিল আছে।
- ভারতবর্ষে কয়েকটি কোম্পানি সমুদ্রের তটভাগ থেকে ইলমেনাইট ও রুটিল নিষ্কাশন করে।

(ক) ইন্ডিয়ান রেয়ার আর্থ লিমিটেড (Indian Rare Earth Limited) তামিলনাড়ুর মানাভালাকুরুচিতে বালি থেকে আকর সংগ্রহ করে।

(খ) কুইলন অঞ্চলে কেরালা মিনারেলস এন্ড মেটালস লিমিটেড (Kerala Minerals and Metals Limited) একটি রাজ্য সরকারি কোম্পানি যাদের ইলমেনাইট উৎপাদনের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা হল 2 লক্ষ টন।

(গ) তিরুভনন্তপুরমের একটা কোম্পানি ও টাইটানিয়াম অক্সাইড উৎপাদন করে।

- আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি ছোট কারখানা আছে যারা টাইটানিয়াম অ্যালয় তৈরি করে।

- ভারতবর্ষের রুটিলের চাহিদা মেটাতে বেশ কিছু পরিমাণ আমদানি করতে হয়। অবশ্য ইলমেনাইটের বেলায় ভারতবর্ষ রপ্তানিকারক দেশ।

10.3.7 মলিবডেনাম

মলিবডেনাম ধাতু প্রকৃতিতে সাধারণত থাকে মলিবডেনাইট (MoS_2) আকর হিসাবে। এই আকর খুব কম জায়গায় এবং কম পরিমাণে পাওয়া যায়। মলিবডেনাইট বেশ ভারী এবং এর রঙ ধূসর। মলিবডেনাইটের সঙ্গে গ্রাফাইটের বাহ্যত সাদৃশ্য থাকলেও গ্রাফাইটের থেকে অনেক ভারী।

ধাতু বিজ্ঞানে মলিবডেনামের গুরুত্ব অনেক। এই ধাতু রঞ্জনরশ্মি এবং টেলিভিশনের টিউব নির্মাণে কাজে লাগে — এছাড়া ইস্পাতের শক্তিবৃদ্ধির জন্য এই ধাতু ব্যবহার করা হয়। মলিবডেনাম - লৌহ অ্যালয় মোটরইঞ্জিন, হাওয়াই জাহাজের যন্ত্রাংশ এবং পেট্রোলিয়াম সংশোধনাগারের যন্ত্রাংশ নির্মাণের জন্য বিশেষ কাজে লাগে। মলিবডেনাইটে মলিবডেনাম ধাতুর পরিমাণ 60 শতাংশ।

মলিবডেনাইট সাধারণত গ্রানাইট, পেগমাটাইট এবং কোয়ার্টজ শিরার মধ্যে দেখা যায়। ভারতবর্ষের কোথাও মলিবডেনাইটের আকর নিষ্কাশন করা হয় না।

- সম্প্রতি তামিলনাড়ুর ধর্মপুরী জেলায় হারুর-উত্তানগরাই অঞ্চলে মলিবডেনাইটের সন্ধান পাওয়া গেছে। ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে একাধিক আকর দেহ প্রমাণিত হয়েছে। এদের বিস্তার 1.17 মিটার থেকে 8.5 মিটার এবং মলিবডেনামের পরিমাণ 0.05 থেকে 0.4 শতাংশ। সমীক্ষা অনুসারে 0.16 কোটি টন আকর থাকা সম্ভব তবে খননযোগ্যতা সম্বন্ধে আরও তথ্যসংগ্রহের প্রয়োজন আছে।

- বর্তমানে ভারতবর্ষে মলিবডেনামের মোট চাহিদা প্রায় 550 টন। এই চাহিদা পূরণ করা হয় আমেরিকা চিলি, পেরু, নরওয়ে প্রভৃতি দেশ থেকে আমদানির মাধ্যমে।

অনুশীলনী 2

১। লোহার বিভিন্ন আকরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কি কি?

২। উল্কাতে কত ভাগ লোহা থাকে?

৩। বিহার-উড়িষ্যার লৌহ আকর সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৪। ভারতবর্ষের কোন্ অঞ্চলে লোহার ভাণ্ডার নেই বললেই চলে।

৫। পৃথিবীর প্রথম পাঁচটি লৌহ রপ্তানিকারী দেশের নাম লিখুন।

৬। মধ্যপ্রদেশ-মহারাষ্ট্রের ম্যাঙ্গানিজ ভাণ্ডারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৭। আমাদের দেশে মোট ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদন কোন রাজ্যে কতটা হয় তার বিষয়ে যা জানেন তার বিবরণ দিন।

৮। ম্যাঙ্গানিজের আকর ভাণ্ডার হিসাবে পৃথিবীর প্রথম দশটি দেশের নাম লিখুন।

৯। বিহারের ক্রোমাইট ভাণ্ডারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

১০। কর্ণাটকের ক্রোমাইট ভাণ্ডারের বৈশিষ্ট্য কি লিখুন।

১১। ভারতের ক্রোমাইট উৎপাদন, চাহিদা সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

১২। ভারতবর্ষের নিকেল আকর ভাণ্ডারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

১৩। নিকেল উৎপাদনের পরিমাণে প্রথম পাঁচটি দেশের নাম লিখুন।

১৪। ভ্যানাডিয়াম ও টাইটানিয়াম কি কি কাজে লাগে?

১৫। উপকূলভাগ থেকে ইলমেনাইট ও রুটিল নিষ্কাশন করে কোন সংস্থা?

১৬। আমাদের দেশে মলিবডেনামের আকর ভাণ্ডার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

10.4 লৌহেতর ধাতব খনিজ Non-ferrous (অলৌহ)

অলৌহ বা লৌহেতর ধাতুগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল তামা-সীসা-দস্তা এবং অ্যালুমিনিয়াম। এই ধাতুগুলি অনেক কাজে লাগে। আমাদের দেশে এইগুলির আকর ভাণ্ডারও আছে। অন্য অলৌহ ধাতুগুলির মধ্যে আছে টিন-টাংস্টেন-অ্যান্টিমনি প্রভৃতি — এগুলি যদিও বিশেষ বিশেষ শিল্পে প্রয়োজনীয় — কিন্তু আমাদের দেশে এর আকর ভাণ্ডার খুবই অল্প।

10.4.1 তামা

তামার ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। ইতিহাসে তাম্রযুগের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ধাতুর রাসায়নিক চিহ্ন Cu। আকরিক তামা প্রধানত তিন শ্রেণির যথা :

- সালফাইড — উল্লেখযোগ্য খনিজগুলি হল চ্যালকোপাইরাইট ($Cu\ Fe\ S_2$), বোরনাইট ($Cu_3\ Fe\ S_4$), কভেলাইট ($Cu\ S$) এবং চ্যালকোসাইট ($Cu_2\ S$)। গন্ধকযুক্ত আকরই তামার মূল আকর হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

- অক্সাইড জলযুক্ত কার্বোনেট — ম্যালাকাইট ($Cu\ CO_3$, $Cu\ (OH)_2$ ও এ্যাজুরাইট ($2\ Cu\ CO_3$, $Ca\ (OH)$ — এগুলো সাধারণত গন্ধকযুক্ত আকরের অক্সিডেশনের ফলে উৎপন্ন হয়। এতে তামার পরিমাণ কম তবে আকর হিসাবে ব্যবহার হয়।

- প্রকৃতিগত (native) — সাধারণভাবে তামার এইরূপে অবস্থান প্রকৃতিতে খুব সীমাবদ্ধ। এছাড়া ক্রাইসোকোলা ($Cu\ SiO_3$, H_2O) কখনও কখনও তামার আকর হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

তামার সঙ্গে অন্য ধাতু মিলিয়ে অনেক রকমের সংকর ধাতু তৈরি করা হয়। যেমন কাঁসা, ব্রোঞ্জ, গানমেটাল, জার্মান-সিলভার প্রভৃতি। তামার তার বিদ্যুৎ পরিবাহী বলে বৈদ্যুতিক শিল্পে এর গুরুত্ব অনেক। অনেক দেশেই তামাকে মুদ্রা তৈরিতে কাজে লাগানো হয়।

এছাড়া বাসন এবং বিভিন্ন কলকব্জা তৈরিতে তামার ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের তাম্র সম্পদ : বিভিন্ন রাজ্যে তামার আকর ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেলেও আহরণযোগ্য অবক্ষেপ এখনও পর্যন্ত বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটকে পাওয়া যায়।

বিহার : সিংভূমের তাম্র আকরের ক্ষেত্র অনেকখানি জায়গা জুড়ে অবস্থিত। পূর্বে ধলভূমগড় থেকে পশ্চিমে গয়েলকেরা পর্যন্ত 160 কিলোমিটার অঞ্চলে অনেক পুরোনো খনি আছে।

- খরখরি নদী এবং রাজদা গ্রামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য খনিজ অবক্ষেপ আছে তামাপাহাড়-সুরদা অঞ্চলে, তুরামডি-নান্দুপ-বয়ানবিল-রামচন্দ্র পাহাড়ে। এছাড়াও বোয়াম-সিদ্ধেশ্বর অঞ্চলে সমৃদ্ধ ভাণ্ডার রয়েছে।
- চাপড়ি-কেন্দাদি-সুরদা অঞ্চলেও তামার ভাণ্ডার আছে।
- এর দক্ষিণে সুরদা-ধোবানি-মোসাবনি-বাদিয়াতে খনি আছে যেখান থেকে আগে আকর আহরণ করা হত — এবং কোনওটিতে এখনও উৎপাদন অব্যাহত আছে অবশ্য অল্প পরিমাণে।
- মোসাবনি - বাদিয়ার আকরস্তর মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার থেকে 11 মি. পর্যন্ত পুরু এবং স্তরগুলির নতি সাধারণত 25° থেকে 30°। এখানে প্রধান আকরিক খনিজ চ্যালকোপাইরাইট। আনুষঙ্গিক খনিজের মধ্যে পিরোটাইট-পেন্টলাণ্ডাইট উল্লেখযোগ্য কারণ এতে নিকেল থাকে। আপনার মনে আছে যে আমরা জানিয়েছিলাম যে যদিও ভারতবর্ষে নিকেলের খনি নেই — কিন্তু ঘাটশিলার ধাতু নিষ্কাশনের কারখানাতে তামার আকর থেকে তামা নিষ্কাশনের সময় — প্রায় দুশো টন নিকেল বাইপ্রডাক্ট হিসাবে পাওয়া যায়। এছাড়াও সামান্য পরিমাণে কোবাল্ট, মলিবডেনাম, বিসমাথ প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে তামার আকরের সঙ্গে।

সিংভূম অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের তাম্র খনিজের ভাণ্ডারের পরিমাণ এবং আকরের মধ্যে তাম্রের পরিমাণ নীচে দেওয়া হল।

স্থান	তাম্রের সঞ্চয় (কোটি টনে)	তাম্রের পরিমাণ (শতাংশে)
বাহারাগোড়া	0.39	1.0
মোসাবনি	1.76	1.73
সুরদা	2.35	1.21
কেন্ডাডি	1.48	1.76
রাখা	5.44	1.19
সিদ্ধেশ্বর	3.88	1.40
তামাপাহাড়	2.88	1.11
তুরামডি	1.78	1.57
বয়ানবিল	0.28	1.21
নান্দুপ	0.40	1.29
খাণ্ডাসুন্দরী	0.05	1.21

রাজস্থান : ● ক্ষেত্রী অঞ্চলে অতি প্রাচীনকাল থেকে তামা আহরণের ইতিহাস আছে। স্বাধীনতার পর ভারতীয় ভূবৈজ্ঞানিক সর্বেক্ষণ ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো শুরু করে। এর ফলে উত্তরপূর্বে সিংহনা থেকে দক্ষিণপশ্চিমে রঘুনাথপুর পর্যন্ত 80 কিলোমিটার লম্বা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমায়িত একটি বলয়ের আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। এর মধ্যে মদন-কুদান কোলিহান ও চাঁদমারির তাম্রের ভাণ্ডার গুরুত্বপূর্ণ এবং খননকার্য চলছে।

এখানে আকরস্তর কোথাও মসুরাকৃতি, কোথাও শিরাকৃতি এবং কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে আছে। এছাড়া যে শিলাস্তরের মধ্যে পাওয়া যায় তার গঠনপ্রকৃতি অতি জটিল। আকর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এগুলি বাধা সৃষ্টি করে।

তাম্র আকরের প্রধান খনিজ চ্যালকোপাইরাইট এবং সঙ্গে থাকে পিরোটাইট এবং পাইরাইট।

এই খনিজমণ্ডলের উত্তর অংশে করে আনুমানিক 8.5 কোটি টন তাম্রভাণ্ডারের সন্ধান মিলেছে। এই আকরের মধ্যে তামার পরিমাণ কমবেশি 1 শতাংশ।

মধ্যপ্রদেশ : ● বালাঘাটের 90 কিলোমিটার উত্তরপূর্বে মালাঞ্জখণ্ড অঞ্চলে তাম্রভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানকার তাম্র আকর মূলত কোয়ার্টজ খনিজের মধ্যে শিরাকৃতি রূপে কেন্দ্রীভূত যেগুলি প্রাক-কেম্ব্রীয় যুগের গ্রাণিটয়েড শিলার (বয়স আনুমানিক 236 কোটি বছর) মধ্যে উদভেদীরূপে অবস্থিত। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 60 থেকে 70 মিটার গভীর পর্যন্ত আকরের ওপর অম্লজানের ক্রিয়া দেখা যায় — যেখানে ম্যালাকাইট ও এ্যাজুরাইট খনিজ সৃষ্ট হয়েছে। এর নিচে প্রাথমিক আকর স্তরে মূলত চ্যালকোপাইরাইট স্ফ্যালেরাইট (Sphalerite), মলিবডেনাইট প্রভৃতি আছে। এখানকার প্রমাণিত আকর ভাণ্ডারের পরিমাণ 78.9 কোটি টন যার মধ্যে শতকরা 0.83 ভাগ তামা; 0.008 ভাগ মলিবডেনাম এবং প্রতি টনে 0.2 গ্রাম সোনা ও 6 গ্রাম রূপো নির্ধারিত হয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ : ● কুডাপ্পা অঞ্চলে বেশ কিছু তামার আকর ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই আকরের সঙ্গে অনেক জায়গায় সীসা-দস্তাও পাওয়া যায়। এখানকার প্রধান ভাণ্ডারের অবস্থান — নালাকোন্ডা, ধুকোন্দা এবং বান্দালামোট্টু।

● এছাড়া অন্য যেসব জায়গায় অল্পবিস্তর তামার আকর পাওয়া যায় সেগুলি হল জঙ্গমরাজুপল্লী, ভারিকুন্টা গনি-কালাড়া প্রভৃতি। গুন্টুর জেলায় আনুমানিক 64 লক্ষ টন তামার আকর আছে।

● খাম্মাম জেলায় মাইলারাম অঞ্চলে তামা-সীসা-দস্তার আকর পাওয়া যায়। এগুলি রূপান্তরিত শিলার মধ্যে আছে। ভাণ্ডারের পরিমাণ আনুমানিক 40 লক্ষ টন।

কর্ণাটক : ● চিত্রদুর্গার 8 কিলোমিটার দক্ষিণপূর্বে চিত্রদুর্গা তামার ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানকার শিলাস্তরের মধ্যে নানারকম ভাঁজ ও চ্যুতি দেখা যায় — তামার আকরের পরিমাণ নির্ধারণে এতে অনেক অসুবিধা হয়। এখানে তামার ভাণ্ডারের পরিমাণ আনুমানিক 17 লক্ষ টন। কর্ণাটক রাজ্য সরকার এইখানে খননকার্য করার জন্য কর্ণাটক স্টেট মাইনিং কোম্পানি নামে একটি কোম্পানি করেছেন — যারা বর্তমানে উৎপাদন করছে।

অন্যান্য অঞ্চল : ● সিকিমে রংপোর কাছে ছোট আকারের তামার ভাণ্ডার আছে যেখানে খনন কার্য চালাচ্ছে — সিকিম মাইনিং কর্পোরেশন নামক একটি সরকারি সংস্থা।

● পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া জেলায় তামাখুন অঞ্চলে অল্পবিস্তর তামার আকর আছে। প্রধান খনিজ চ্যালকোপাইরাইট এবং অল্পপরিমাণ এ্যাজুরাইট। প্রাথমিক সমীক্ষায় জানা গেছে ভূপৃষ্ঠের 60 মি গভীর পর্যন্ত এই অঞ্চলে মোট আকর ভাণ্ডারের পরিমাণ 80000 টন।

তামার খনি এবং ধাতু নিষ্কাশনের কারখানা

● ভারতবর্ষে আজ পর্যন্ত 205 টি তামার আকর ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে যেখানে আকরের মোট পরিমাণ হচ্ছে প্রায় 60 কোটি টন যাতে আনুমানিক 80 লক্ষ টন তামা সঞ্চিত আছে।

● সরকার পরিচালিত হিন্দুস্থান কপার লিমিটেড কোম্পানি বিভিন্ন জায়গায় মোট 10 টি খনি পরিচালনা করে — যেখানে মোট মজুত ভাণ্ডারের পরিমাণ 18.5 কোটি টন এবং এই আকরে তামার পরিমাণ গড়ে 1 শতাংশ। আরও দুটি জায়গার থেকে উৎপাদন হয় যেমন সিকিম এবং কর্ণাটক। এই দুই রাজ্য থেকে আকর উৎপাদনের পর তাকে ঘনীভূত বা পরিশুদ্ধ করে ধাতু নিষ্কাশনের জন্য হিন্দুস্থান কপারের ঘাটশিলায় ধাতু নিষ্কাশনের কারখানাতে পাঠানো হয়।

● বিহারের মোসাবনি ও রাখার তামার ভাণ্ডার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখানে মাটির নিচে প্রায় 1200 মিটার পর্যন্ত খনি চলে গেছে। আকর উত্তোলনে অনেক বেশি খরচ পড়ছে এবং ক্ষতি হচ্ছে।

● মধ্যপ্রদেশের মালাঞ্জখণ্ড অঞ্চলে খোলামেলা খনিতে আকর উৎপন্ন হয়। পরিকল্পনা অনুসারে এখানেও ভূগর্ভস্থ খনি করা হবে — এবং এর জন্য মূলধন পৃথিবীর অন্যদেশ থেকে গ্রহণ করা হবে।

● ভারতবর্ষে মোট তামার আকরের উৎপাদন — তামার ক্যাথোড (Copper Cathode) উৎপাদনে লাগে। 1997-98 সালে ক্যাথোড উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 42,700 টন। আমাদের দেশে তামার মোট চাহিদার পরিমাণ 335,000 টন এবং 2001-2002 সালে অর্থাৎ নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বছরে এই চাহিদা বেড়ে দাঁড়াবে আনুমানিক 487,000 টন। বৈদ্যুতিক শিল্প, টেলিকমিউনিকেশান, ইলেকট্রনিক শিল্পের উন্নতির জন্যই এই বাড়তি চাহিদার অনুমান করা হচ্ছে।

● উদারনীতির ফলে এবং তামার চাহিদা মেটাতে অনেক বেসরকারি সংস্থা ধাতু নিষ্কাশনের কারখানা করতে এগিয়ে আসছে যেখানে বিদেশ থেকে ঘনীভূত আকর ব্যবহার করা যাবে। কয়েকটি কারখানার বিবরণ নিচে দেওয়া হল :

(ক) স্টারলাইট কপার কোম্পানী : প্রথমে এরা ভেবেছিল রত্নগিরিতে কারখানা করবে কিন্তু পরিবেশ সংক্রান্ত অসুবিধার জন্য তামিলনাড়ুর টিউটিকোরিনে কারখানা স্থাপন করেছে। এদের বার্ষিক উৎপাদনের ক্ষমতা 100,000 টন যেটাকে বাড়িয়ে 150,00 টন করা হবে।

(খ) বিড়লা কপার কোম্পানি, বরোদার কাছে দাহেজে যে কারখানা করেছে তার উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে 100,000 টন তামার ক্যাথোড প্রতি বছরে করা।

(গ) SWIL কোম্পানি বরোদার ঝাগাদিয়াতে যে ধাতুনিষ্কাশন কারখানা করেছে — সেখানে সহায়তা পাচ্ছে সুইডেনের প্রসিদ্ধ কোম্পানির কাছ থেকে।

(ঘ) মেটাডিস্ট বিখ্যাত জাপানি কোম্পানি মিটসুবিশির সহায়তায় গুজরাতের পিপাভরে তামা নিষ্কাশনের কারখানা করার উদ্যোগ নিয়েছে।

(ঙ) হামকো (বেসরকারি সংস্থা) উড়িষ্যা মাইনিং কর্পোরেশনের সহায়তায় তামার অনুসন্ধান চালাচ্ছে।

এছাড়াও ভাগ্যনগর মেটালস, গুলিষ্ট ইম্পেক্স প্রভৃতি বেসরকারি সংস্থাও — উদ্যোগ নিয়েছে তামার ক্যাথোড তৈরি করার কারখানা করার।

উপরের বিবরণ থেকে একটা জিনিষ দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা বিদেশী কোম্পানির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তামার ক্যাথোড তৈরি কারখানা তৈরি করার চেষ্টা করছে। এদের সবাইকেই তামা কনসেনট্রেট আমদানির উপর নির্ভর করতে হবে। পরিবহন খরচা কমানোর জন্য প্রায় সব কোম্পানি কারখানাগুলো বন্দরের কাছে গিঠে করেছে কিম্বা করার পরিকল্পনা করছে।

পৃথিবীর সামগ্রিক তামার ভাণ্ডার সম্বন্ধে কিছু তথ্য নিচে দেওয়া হল —

1995 সালে সারা পৃথিবীতে মোট তামার উৎপাদন হয়েছিল 98.6 লক্ষ টন এর মধ্যে বিভিন্ন দেশের অবদান ছিল নিম্নলিখিত হিসাবে যেমন চিলি 24 লক্ষ; আমেরিকা 18.6 লক্ষ; কানাডা 7.3 লক্ষ; রাশিয়া 4.8 লক্ষ; ইন্দোনেশিয়া 4.3 লক্ষ; পেরু 4.3 লক্ষ; চিনা 3.9 লক্ষ; অস্ট্রেলিয়া 3.5 লক্ষ; জাম্বিয়া 3.4 লক্ষ; মেক্সিকো 3.2 লক্ষ; পাপুয়া নিউগিনি 2.1 লক্ষ; এবং অন্যান্য দেশ ভারতকে নিয়ে মোট 50,000 টন।

উল্লেখ্য, শিল্পে উন্নত দেশ কিম্বা বৃহদাকার দেশ — এই সবের সঙ্গে তামার উৎপাদনের কোনও সম্পর্ক নেই। অস্ট্রেলিয়া একটা বৃহৎ দেশ এবং পাপুয়া নিউগিনি ছোট্ট দ্বীপপুঞ্জ — এদের তামার উৎপাদন তুলনা করলেই এটা বোঝা যায়। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের উৎপাদন অনেক কম এটাও বোঝা যাচ্ছে। এর পরিমাণ বাড়ানোর জন্য — আমদানিকৃত তামার কনসেনট্রেট থেকে তামা উৎপাদনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

চিলি, ইন্দোনেশিয়া এবং চিন দেশে আগামীকালে তামার উৎপাদন বাড়ার সম্ভাবনা আছে। বর্তমান তামার আন্তর্জাতিক বাজারের দাম এই সবের ওপর নির্ভরশীল।

10.4.2 সীসা দস্তা

সীসা ও দস্তা আকরিক খনিজের সৃষ্টি এবং উৎপত্তিস্থল সাধারণত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশেষত আমাদের দেশে এই দুটি ধাতু প্রায়ই একসঙ্গে থাকে। এইজন্য এই দুটি ধাতুর বিবরণ একসাথেই দেওয়া হল। অবশ্য কিছু মৌলিক তথ্য আলাদাভাবে দেওয়া হল।

সীসা — ● অতি প্রাচীনকালে সীসার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সীসা একটি মৌলধাতু এবং এর রাসায়নিক সংকেত pb। এই ধাতু খুব নমনীয় অথচ প্রচণ্ড ভারী — এর আপেক্ষিক গুরুত্ব 7.5। এর গলনাঙ্ক 327.4K হলেও স্ফুটনাঙ্ক 1740।

● বিদ্যুৎ পরিবাহী বিশেষ চরিত্রের জন্য বিদ্যুৎ শিল্পে সীসার গুরুত্ব অনেক। গাড়ির ব্যাটারির প্লেট তৈরি করতে সীসা কাজে লাগে। জলের পাইপ, রাসায়নিক দ্রব্য তৈরির পাত্র ইত্যাদিতে এই ধাতুর বহুল ব্যবহার। সীসা রঞ্জনরশ্মি এবং গামা-রশ্মির দ্বারা অভেদ্য বলে নানা যন্ত্রের আবরণ ও পারমাণবিক পরীক্ষাগারের আচ্ছাদন তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। বন্দুকের গুলি নির্মাণেও এর ব্যবহার।

● সীসার সঙ্গে অন্য ধাতুর মিশ্রণে বিভিন্ন সংকর ধাতু উৎপন্ন হয় যা বহুশিল্পে কাজে লাগে :— ফাউন্ড্রি শিল্পে (সীসা + টিন + এ্যান্টিমনি); সোলডারিঙে (সীসা + টিন) প্রভৃতি।

● সীসার প্রধান আকর গ্যালেনা (Pbs)। অন্যান্য আকরের মধ্যে কার্বোনেট অর্থাৎ সেরুসাইট ($PbCO_3$), সালফেট বা এ্যাংলেসাইট ($PbSO_4$) এবং অক্সিজেন ঘটিত অর্থাৎ ওকার। সাধারণত সালফাইড খনিজের রূপান্তরের ফলে কার্বোনেট বা সালফেট খনিজের সৃষ্টি হয়।

দস্তা : ● দস্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌল ধাতু এবং এর রাসায়নিক সংকেত Zn। এ্যাগ্রিকোলা (1494-1555) প্রথম 'Zincum' কথাটা ব্যবহার করেন সাইলেশিয়াতে পাওয়া কোনও আকরকে বর্ণনা করার জন্য।

● দস্তার রঙ নীলাভ শ্বেত — অবশ্য বাতাসের সংস্পর্শে এর দ্যুতি এবং উজ্জ্বলতা কমে যায় কারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খনিজের গাড় একটি আস্তরণের সৃষ্টি হয়।

● দস্তা প্রকৃতিতে ধাতু অবস্থায় পাওয়া যায় না — তবে খনিজ অবস্থায় পাওয়া যায় মণ্ডশিলাস্তরে। দস্তার প্রধান ব্যবহার ইস্পাতে মরিচা ধরা আটকানোর জন্য। ইস্পাতকে গলিত দস্তার মধ্যে ডুবিয়ে একটি আস্তরণের সৃষ্টি করা হয় — যাতে বাতাসের অক্সিজেন প্রভৃতিতে কোনওরকম মরিচা ধরেনা। দস্তার অন্যান্য ব্যবহার বয়নশিল্পে, ব্লক নির্মাণের কাজে, ফটো এনগ্রেভিং ইত্যাদিতে এবং কৃষিকার্যে, রঙ ও ঔষধ উৎপাদনে।

● দস্তার আকরিক খনিজ হল গন্ধক ঘটিত — স্ফ্যালেরাইট(ZnS) বা জিঙ্ক ব্লেন্ড। এছাড়াও স্মিথসোনাইট ($ZnCO_3$) ও হেমিমরফাইট বা ক্যালামিন যা দ্বিতীয় পর্যায়জাত, দস্তার আকরিক খনিজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ভারতবর্ষের সীসা-দস্তা অঞ্চল

অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও সীসা-দস্তার আকর ভাণ্ডার প্রায়ই একই জায়গায় পাওয়া যায়। এর প্রধান ভাণ্ডার হল রাজস্থান। এছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যাতেও এর সন্ধান পাওয়া গেছে।

রাজস্থান — উদয়পুরের জাওয়ার অঞ্চলে বহু পুরাতন পরিত্যক্ত খনি এবং কাছাকাছি স্তূপীকৃত আকরমল, মাটির ঢালাই পাত্র অতীতের খননকার্যের প্রমাণ দেয়। প্রকাশিত পুঁথিপত্র থেকে জানা যায় যে আনুমানিক সপ্তম শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এখান থেকে সীসা-দস্তার আকর সংগ্রহ করা হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্মাদেশ জাপানি দখলে এবং সেখানকার বিখ্যাত খনি 'বদউইন' থেকে নিষ্কাশিত সীসা-দস্তার আমদানি কমে যাওয়ায় - তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার এই খনিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করে। পরে ভারতের ধাতু কর্পোরেশন নামে এক বেসরকারি সংস্থা এখানে খননকার্য চালু করে। ১৯৬৫ পর্যন্ত ভারতে এইটাই সীসা দস্তার একমাত্র খনি ছিল। ১৯৬৬ সালে এই সংস্থাকে জাতীয়করণ করে হিন্দুস্থান জিঙ্ক লিমিটেড নামে এক সংস্থা গড়ে তোলা হয়। এই সংস্থা 51 বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত অঞ্চলে খনিজ আহরণের কার্যকলাপ চালাচ্ছে। জাওয়ার অঞ্চলে সীসা-দস্তার প্রধান আকর হল গ্যালেনা ও স্ফ্যালেরাইট। অন্যান্য আনুষঙ্গিক খনিজের মধ্যে পাইরাইট, চ্যালকোপাইরাইট, পিরোটাইট ও আরসেনোপাইরাইট অন্যতম। আকরের মধ্যে মূল্যবান ধাতু রৌপ্য ও ক্যাডমিয়ামও আছে।

এখানকার প্রধান খনি মোচিয়া-বালেরিয়া এবং অন্য খনি সোনারিয়া-রূপারিয়া। এখানকার আকরকে ঘনীভবন করার যে অংশে 52 ভাগের অধিক দস্তা থাকে তাকে দেবারির কাছে ধাতু নিষ্কাশনের জন্য পাঠানো হয়। সীসার ঘনীভূত অংশ (65 শতাংশের বেশি সীসা) বিহারে টুনডু এবং বিশাখাপত্তনমে বিদ্রাবনের জন্য পাঠানো হয়। কয়েকটি খনির বিশদ তথ্য নীচে দেওয়া হল।

খনির নাম	ভাণ্ডার (কোটি টন)	আকরে দস্তার পরিমাণ শতাংশ	আকরে সীসার পরিমাণ (শতাংশ)	ভাণ্ডারের গভীরতা (মিটারে)
মোচিয়া	2.6	3.79	1.69	400
বালেরিয়া	1.8	5.66	1.14	380
সোনারিয়া-রূপারিয়া	0.7	3.0	1.0	250

● দারিবা-রাজপুরা অঞ্চলেও দস্তা-সীসার ভাণ্ডার আছে। এই অঞ্চল প্রায় 20 কিলোমিটার দীর্ঘ এবং দারিবা থেকে বেথুমনি পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার আকরিক খনিজ নানারকমের সালফাইডের সংমিশ্রণ যেমন

পিরোটাইট, স্ফ্যালেরাইট, গ্যালেনা, চ্যালকোপাইরাইট প্রভৃতি। এই আকরে ক্যাডমিয়াম, রৌপ্য, আর্সেনিক প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া গেছে।

● রামপুরা-আগুচা অঞ্চলে পরিত্যক্ত খনি ও আকরমলের স্তূপের সন্ধান পাওয়া গেলে এখানকার আকর ভাণ্ডার মোটামুটি সাম্প্রতিক আবিষ্কার। এই অঞ্চলে 5.5 কোটি টন আকর ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে যাতে আনুমানিক 16.97 লক্ষ টন দস্তা এবং 2.46 লক্ষ টন সীসা আছে বলে অনুমান।

অন্ধ্রপ্রদেশ : ● গুন্টুর জেলায় তিনকুন্ডা অঞ্চলে অগ্নিগুন্ডলার পরিত্যক্ত খনিগুলিতে অতীতকালের খনিজ আহরণের নিদর্শন পাওয়া যায়। ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা চালিয়ে কয়েকটি জায়গায় আকর ভাণ্ডার পাওয়া গেছে যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

(ক) বান্ডালোমোট্টুর ভাণ্ডারটি সবচেয়ে বড় এবং ডলোমাইট শিলার মধ্যে সীমিত। আকর ভাণ্ডার আনুমানিক 1200 মিটার দীর্ঘ এবং 500 মিটার গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত বলে প্রমাণিত। প্রধান আকরিক খনিজ গ্যালেনা-সঙ্গে চ্যালকোপাইরাইট-পাইরাইট এবং স্ফ্যালেরাইট। খনিজবাহী স্তরটি 1 থেকে 11 মিটার পুরু। এই খনিজ সীসার পরিমাণ 3.1 থেকে 6.45 শতাংশ এবং তাম্র 0.56 থেকে 1.71 শতাংশ। এখানে সীসার মোট পরিমাণ 1.1 কোটি টন এবং তামার পরিমাণ মাত্র 10 লক্ষ টন।

(খ) নানাকোন্ডার খনিজস্তরটি 900 মি. দীর্ঘ এবং গড়ে 2.76 মি. পুরু। এখানে তামা প্রধান আকর-সীসার এবং গ্যালেনার পরিমাণ কম। তাম্র ভাণ্ডারের মোট পরিমাণ 31 লক্ষ টন।

(গ) ধুকোন্ডাতে শিলাস্তরের গঠন খুবই জটিল। এখানকার আকরে তামার পরিমাণ গড়ে 1.5 শতাংশ এবং সীসার পরিমাণ 4.9 শতাংশ। মোট ভাণ্ডার আনুমানিক 21 লক্ষ টন তামা এবং 4 লক্ষ টন সীসা।

উড়িষ্যা : সুন্দরগড় জেলায় সারগিপল্লীতে সীসা ও দস্তার আকরভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রধান আকরিক খনিজ গ্যালেনার সঙ্গে চ্যালকোপাইরাইট ও স্ফ্যালেরাইট মিশ্রিত অবস্থায় উপস্থিত। আকরদেহটি 900 মিটার দীর্ঘ এবং গড়ে 2 থেকে 3 মিটার পুরু। ভাণ্ডারের মোট পরিমাণ 18 লক্ষ টন যার মধ্যে সীসার পরিমাণ 74 হাজার টন। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে এই আকরটি ভাণ্ডারের খুব কাছেই হীরাকুঁদ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং রুড়কেল্লা-রাজগাঙ্গপুর শিল্পাঞ্চল — যার ফলে এই ভাণ্ডারটির গুরুত্ব বেড়ে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গ : জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং জেলার গরুবাথান অঞ্চলে 3 কিলোমিটার উত্তর পূর্বে সালফাইড আকর আছে। ডালিংচু অঞ্চলে গ্যালেনা ও কিছু পরিমাণ স্ফ্যালেরাইট, চ্যালকোপাইরাইট প্রভৃতি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখা যায়।

খনিজস্তরগুলির মসৃণ ও বুদিনের (boudin) এর আকারে অবস্থিত। প্রায় 3.5 কিলোমিটার জায়গা জুড়ে খনিজ স্তরগুলি বিস্তৃত। কোথাও 1.5 মিটার পুরু এবং 500 মিটার দীর্ঘ। এখানে আকর ভাণ্ডারের পরিমাণ 22 লক্ষ টন যা থেকে আনুমানিক 56000 হাজার টন সীসা এবং 56000 টন দস্তা আহরণ করা যেতে পারে। এখানে কিছু রূপাও পাওয়া যায়। জটিল ভূতাত্ত্বিক গঠনের জন্য এই সঞ্চয়ের খননযোগ্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায়না।

গুজরাট : আম্বামাতা অঞ্চলে আকর ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানে মোট ভাণ্ডারের পরিমাণ প্রায় 50 লক্ষ টন যার মধ্যে 108000 টন সীসা এবং 173000 টন দস্তা আছে।

অন্যান্য রাজ্য : ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও বিভিন্ন অঞ্চলে সীসা-দস্তার আকর ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে — কিন্তু বেশির ভাগ জায়গায়ই আকরে সীসা-দস্তার পরিমাণ কম শতাংশ এবং মোট ভাণ্ডারের পরিমাণ কম। কয়েকটি জায়গার নাম দেওয়া হল; খামাম-কার্নুল-নালগোন্ডা (অন্ধ্রপ্রদেশ); পাঁচমহল-সুরাট (গুজরাট); দক্ষিণআর্কট (তামিলনাড়ু); গোয়ালিয়র-জব্বলপুর (মধ্যপ্রদেশ); আজমীর-সোয়াই মাধোপুর (রাজস্থান) প্রভৃতি।

ভারতের মোট সম্পদের ব্যবহার : সীসা-দস্তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ধাতু — নিচে দেশবিদেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

● ভারতে সীসার মোট উৎপাদন 50,000 টন-এর মধ্যে খনিজ উৎপাদন ছাড়াও scrap বা পুরোনো জিনিষ থেকে উদ্ধার করা ধাতুও আছে। আমাদের দেশে মোট ধাতু নিষ্কাশনের ক্ষমতা প্রায় 89000 টন। এই কারখানাগুলির অবস্থান এবং উৎপাদন ক্ষমতা নিচে দেওয়া হল।

রাষ্ট্রায়ত্ত			
হিন্দুস্থান জিঙ্ক	চান্দ্রেইয়া	35,000	টন/প্রতি বছর
লিমিটেড	বিশাখাপত্তনম	22,000	টন/প্রতি বছর
	টুণ্ডু	8000	টন/প্রতি বছর
বেসরকারি			
ইণ্ডিয়ান লেড	কলকাতা	12,000	টন/প্রতি বছর
লিমিটেড	থানে (মহারাষ্ট্র)	12,000	টন/প্রতি বছর

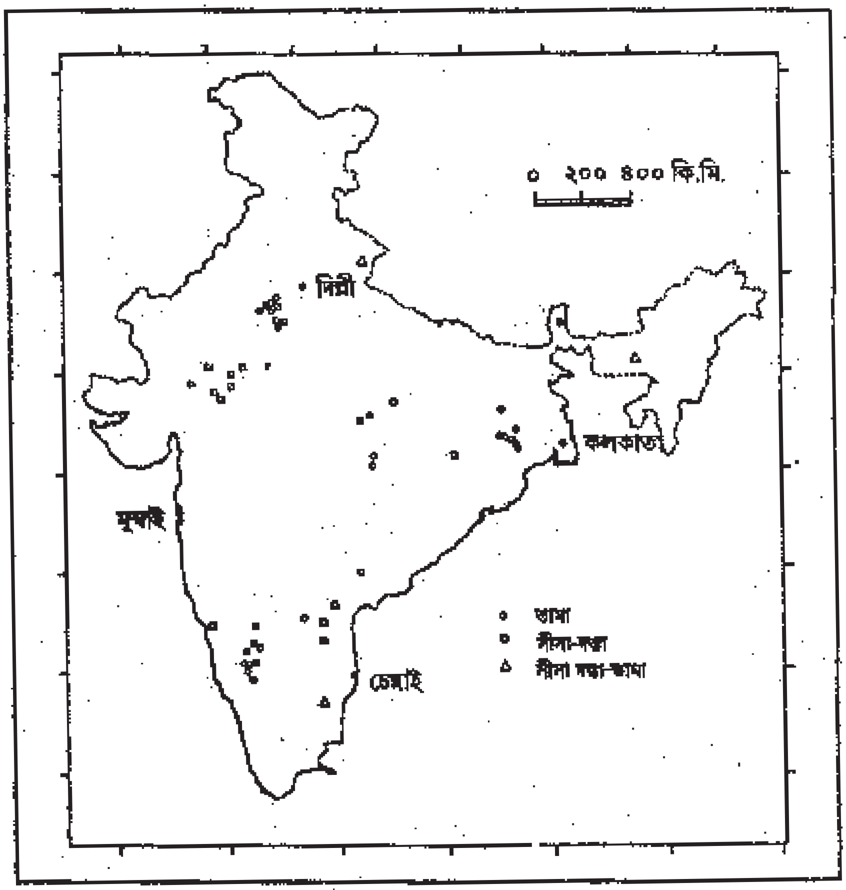

তামা, সীসা, সীসা ও দস্তা

- ইন্ডিয়ান লেড লিমিটেডের কারখানা পুরোপুরি আমদানি করা সীসা কনসেনট্রেটের উপর নির্ভরশীল।

- আমাদের মোট উৎপাদন প্রায় 50,000 টন আর চাহিদা প্রায় 80,000 টন। যোজনা কমিশনের মত অনুসারে - প্রতি বছর চাহিদা 7 শতাংশ হারে বাড়তে পারে।

- রামপুরা-আগুচার আকরে প্রচুর পরিমাণে গ্রাফাইট আছে। এর জন্য চান্দ্রেইয়ার ধাতু নিষ্কাশনের কারখানাতে অসুবিধা হচ্ছে এবং সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

- দস্তার মোট প্রয়োজন আনুমানিক 220,000 টন প্রতি বছরে অথচ 1997-98 সালে মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 150,500 টন। হিসাব অনুসারে 2002 সালে চাহিদা বেড়ে হবে আনুমানিক 280,000 টন।

- এই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আমাদের দস্তা নিষ্কাশন করার কারখানাগুলি হল

রাষ্ট্রায়ত্ত হিন্দুস্থান জিঙ্ক লিমিটেড	চান্দ্রেইয়া	70,000	টন/প্রতি বছরে
	উদয়পুর	49,000	টন/প্রতি বছরে
	* বিশাখাপত্তনম	30,000	টন/প্রতি বছরে
বেসরকারি বিনানী ইন্ডাস্ট্রিস্	* আলওয়েই	30,000	টন/প্রতি বছরে

* এই দুটি কারখানাই আমদানি করা দস্তা কনসেনট্রেটের উপর পুরোপুরি নির্ভর করে।

- ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হিসাবে উপরের দুটি কোম্পানিই তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। বিনানী আলওয়াই কারখানার ক্ষমতা দ্বিগুণ (অর্থাৎ বছরে 60,000 টন) করতে চলেছে হিন্দুস্থান জিঙ্ক কোম্পানিও উদয়পুর এবং ভাইজাগ কারখানার ক্ষমতা 10,000 টন করে বাড়াচ্ছে। এছাড়াও 60,000 থেকে 100,000 টন ধাতু নিষ্কাশন করার ক্ষমতাসম্পন্ন কারখানা খোলার কাজ চালু হয়েছে যেটা সম্পূর্ণরূপে আমদানি করা কনসেনট্রেটের ওপর নির্ভর করবে।

- দস্তা তৈরির আরেকটি ছোট কারখানা আছে মধ্যপ্রদেশের পিথামপুরে। এটির মালিক বেসরকারি কোম্পানি ইন্দো-জিঙ্ক লিমিটেড এবং এর ক্ষমতা বছরে মাত্র 4500 টন ধাতু নিষ্কাশন করা। এরা মূলত scrap থেকেই ধাতু তৈরি করে।

- পৃথিবীর মোট সীসা উৎপাদন 1995 সালে প্রকাশিত খবর অনুসারে প্রায় 56.3 লক্ষ টন — এর মধ্যে আমেরিকা (12.6); চিন (4.2); ইংল্যান্ড(3.1); জার্মানি (3.1); ফ্রান্স (2.8); কানাডা (2.7); অস্ট্রেলিয়া (2.3); জাপান (2.2); মেক্সিকো (2.1); ইটালি (1.6); কাজাকস্থান (1.5); বেলজিয়াম (1.2) প্রভৃতি। লক্ষণীয় অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের উৎপাদন এবং জাপানের মতো ছোট দ্বীপপুঞ্জের উৎপাদন প্রায় সমান।

- 1995 খৃঃ অব্দে দস্তার মোট উৎপাদন ছিল 69.4 লক্ষ টন যেটার বেশির ভাগই এসেছিল আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, চিন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে। পরের পৃষ্ঠায় পৃথিবীর কয়েকটি দেশের দস্তা উৎপাদন এবং ব্যবহার সম্বন্ধে তথ্য দেওয়া হল।

	খনির উৎপাদন কেবল ধাতুর পরিমাণ ('000 টন)		নিষ্কাশিত ধাতুর পরিমাণ ('000 টন)		বিভিন্ন শিল্পে মোট ধাতুর ব্যবহার ('000 টন)	
আমেরিকা	1997 - 98		1997 - 98		1997 - 98	
(উত্তর এবং দক্ষিণ)	3335	3366	1700	1766	1997	2001
অস্ট্রেলিয়া	972	985	307	311	176	177
চিন	1210	1100	1434	1469	830	885
কানাডা	1077	1063	704	745	158	169
জাপান	72	68	608	608	742	659
কোরিয়া সাধারণতন্ত্র	9	11	336	390	343	310
কাজাখস্থান	223	224	185	240	30	30
ইংল্যান্ড	—	—	93	79	224	219
নেদারল্যান্ডস	—	—	203	217	93	95
কলম্বিয়া	—	—	—	—	18	18
ভেনিজুয়েলা	—	—	—	—	15	15
ভারতবর্ষ	142	195	166	178	220	232

উপরের তথ্য থেকে দেখা যায় যে পৃথিবীতে কিছু দেশ আছে (অস্ট্রেলিয়া, চিন প্রভৃতি) যেখানে মোট দস্তার উৎপাদন থেকে ব্যবহার কম — কাজেই এরা রপ্তানি করতে পারে। আবার জাপানে উৎপাদন কম চাহিদা বেশি কাজেই তাকে আমদানির উপর নির্ভর করতে হয়। ইউরোপের কয়েকটি দেশে (ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস) দস্তার খনি নেই — কিন্তু স্ক্র্যাপ এবং আমদানি করা ঘনীভূত আকরের সাহায্যে ধাতু উৎপাদন হয় এবং বাকি চাহিদা আমদানি করে মেটাতে হয়। দক্ষিণ আমেরিকার কিছু দেশে কলম্বিয়া, ভেনিজুয়েলাতে — কোনও ধাতু নিষ্কাশন কারখানা নেই, কাজেই তারা সরাসরি ধাতু আমদানি করে।

সীসা সম্বন্ধে অনুরূপ তথ্য নিচে দেওয়া হল

	খনির উৎপাদন ধাতুর পরিমাণ '000 টন		ধাতু উৎপাদন '000 টন		ধাতুর ব্যবহার '000 টন	
	1997	1998	1997	1998	1997	1998
সুইডেন	109	115	86	86	35	33
ইটালি	12	7	212	202	259	264
জার্মানি	–	–	329	353	340	360

	খনির উৎপাদন ধাতুর পরিমাণ '000 টন		ধাতু উৎপাদন '000 টন		ধাতুর ব্যবহার	
	1997	1998	1997	1998	1997	1998
ফ্রান্স	-	-	283	289	256	258
ইল্যান্ড	-	-	427	396	365	318
কানাডা	186	189	270	261	71	65
মেক্সিকো	174	174	267	263	148	154
আমেরিকা	459	458	1417	1440	1650	1741
চিন	712	710	707	707	485	505
জাপান	5	6	297	304	330	308
অস্ট্রেলিয়া	486	583	229	200	63	54
পেরু	258	254	98	104	14	13
ভারতবর্ষ	33	38	60	67	88	86

উপরের তথ্য থেকে দেখা যায় যে কিছু দেশে (অস্ট্রেলিয়া, পেরু প্রভৃতি) উৎপাদনের তুলনায় ব্যবহার কম — কাজেই তারা হচ্ছে রপ্তানিকারী দেশ। কিছু দেশে (জার্মানি, ফ্রান্স) খনিজ উৎপাদন না থাকলেও এই ধাতুর প্রচুর চাহিদা — যেটা আমদানি করে মেটাতে হয়।

- সীসার ব্যবহারে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলে — পরিবেশবিদরা নানারকম আন্দোলন করছেন বিভিন্ন দেশে। এর মধ্যে কিছু আন্তর্জাতিক স্তরে সমঝোতা হয়েছে যার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা হল :

(ক) 1996 সালে Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) সিদ্ধান্ত নেয় যে এই সমিতির সব সদস্য দেশ নিজের নিজের দেশে সীসা ব্যবহার করার জন্য দূষণ-কমানোর চেষ্টা করবে।

(খ) ১৯৯৮ সালে United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) সিদ্ধান্ত নেয় যে এই সমিতির 50 এর বেশি সদস্য দেশ পেট্রোলে সীসা থাকলে যে দূষণ হয় সেটা এড়ানোর ব্যবস্থা নেবে।

এছাড়াও বিভিন্ন দেশে ভারী ধাতু (সীসা, ক্যাডমিয়াম, পারা প্রভৃতি) ব্যবহার কমানোর চেষ্টা চলছে। এর মানে অবশ্য এই নয় যে এদের প্রয়োজন বা ব্যবহার নিষিদ্ধ হবে — তবে নির্মাতারা নানারকম চাপের মধ্যে থাকবে এই ধাতু ব্যবহারের বিকল্প খোঁজার জন্য।

10.4.3 টিন

অতি প্রাচীনকাল থেকেই টিনের ব্যবহার প্রচলিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে টিন ও তামার সংকর ধাতু ব্যবহারের জন্য ঐ সময়টিকে ব্রোঞ্জ যুগ (Bronze Age) বলা হয়। টিন একটি বিরল মৌলিক ধাতু এবং এটিকে সাধারণ ভাষায় 'রাং' বলা হয়।

চিহ্ন Sn, আপেক্ষিক গুরুত্ব 7 এবং গলনাঙ্ক 230°K।

- টিনের প্রধান আকরিক অক্সাইড অর্থাৎ ক্যাসিটারাইট (SnO_2) এবং সালফাইড টিন পাইরাইট ($Cu_2 Fe Sn S_4$)। শেষোক্ত খনিজে লৌহ প্রায়শই দস্তার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। পৃথিবীর সর্বত্রই ক্যাসিটারাইটই আকর হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

- টিনের ব্যবহার নানা রকমের। টিনের নমনীয়তার জন্য এই ধাতুকে পিটিয়ে খুব পাতলা পাতে বা চাদরে করা সম্ভব। 1 সেন্টিমিটারের 200 ভাগ পাতলা পাত করা সম্ভব। এই ধরনের চাদরে খাবারের পাত্র তৈরি হয়ে থাকে।

- এছাড়া গলানো ধাতু ইলেক্ট্রোকোটিং বা তড়িত লেপন হিসাবে এর ব্যবহার প্রচুর।

- ঝালাই এর কাজে, সীসার সঙ্গে টিনের ব্যবহার আমাদের সকলেরই জানা আছে।

- বিভিন্ন শিল্পে টিন মিশ্রিত সংকর বহু কাজে লাগে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : ব্রোঞ্জ (তামা + 3 শতাংশ টিন), বেল মেটাল (তামা + 20 শতাংশ টিন); গান মেটাল (তামা + 8 থেকে 10 শতাংশ টিন); ব্রিটানিয়া মেটাল (টিন + 5 শতাংশ এ্যান্টিমনি) প্রভৃতি।

- রেশমশিল্পে, রঙের কাজে এবং চীনামাটির তৈজসপত্র অলঙ্করণে টিনের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের আকর ভাণ্ডার : ভারতবর্ষে টিন আকরের সন্ধান পাওয়া গেছে বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও হরিয়ানায়। এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

বিহার, রাঁচী, হাজারীবাগ ও গয়া জেলায় কয়েকটি স্থানে গ্রানাইট শিলার আভ্যন্তরে অল্প পরিমাণ টিন আকরের সন্ধান পাওয়া যায়। এই বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত আকরের পরিমাণ খুবই অল্প - এবং এদের অর্থকরী ভাবে সংগ্রহ করা

উড়িষ্যা-মধ্যপ্রদেশ : মধ্যপ্রদেশের বস্তার এবং উড়িষ্যার কোরাপুটের কয়েকটি জায়গায় ক্যাসিটারাইটের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই আকর পেগমাটাইট শিলাতে পাওয়া যায়। সাধারণভাবে দেখা গেছে যে ক্ষারকীয় শিলার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট পেগমাটাইটই টিন আকরের উৎস। এই ধরনের পেগমাটাইট বেত্তানপাল থেকে মুত্তাভাল এবং কুদ্রিপাল থেকে মুত্তাগুড়া অঞ্চলে রয়েছে। এদের দৈর্ঘ্য 200 মিটার থেকে 1 কিলোমিটার এবং প্রস্থে 1 মিটার থেকে 5 মিটার। টিনের পরিমাণ কোথাও 0.1 থেকে 0.3 শতাংশ কোথাও 0.5 থেকে 0.1 শতাংশ। এছাড়া, বস্তারের কোথাও কোথাও টিনের প্রকীর্ণক (placer) অবক্ষেপও পাওয়া যায় বালি ও মাটির মধ্যে।

হরিয়ানা : ভিলওয়ানি জেলার তোষাম অঞ্চলের টিন আকরের সন্ধান পাওয়া যায় 1982 সালে ভারতীয় ভূবৈজ্ঞানিক সর্বেক্ষণের সমীক্ষার সময়। এই অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক গঠন এবং খনিজীভবনের প্রকৃতি বেশ জটিল।

- টিনের আকর প্রধানত সূক্ষ্মদানার আকারে রূপান্তরিত শিলার মধ্যে নিহিত। ক্যাসিটারাইট দানার পরিমাপ 0.01 থেকে 0.6 মিলিমিটারের মধ্যে। কোথাও সূক্ষ্ম (0.5 থেকে 5 মিলিমিটার) খনিজ শিলা হিসাবে পাওয়া যায়। এই খনিজীভবন আনুমানিক 58 কোটি বছর আগে হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। আকরদেহ প্রায় 2 কিলোমিটার দীর্ঘ এবং বিস্তারে প্রায় 24 মিটার। আনুমানিক মোট ভাণ্ডারের পরিমাণ 3.83 কোটি টন যাতে টিনের পরিমাণ গড়ে 0.17 শতাংশ।

- এখানকার আকরের সঙ্গে বিভিন্ন পরিমাণে তামা, টাংস্টেন, সীসা, রৌপ্য, এবং সোনাও পাওয়া যায়।

উৎপাদন : অন্যান্য খনিজ যেখানে হাজার বা লক্ষ টনে বলা হয়েছে - টিন কনসেনট্রের উৎপাদন সেখান কিলোগ্রামে দেখানো হল।

1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
127340	59226	54991	31184	35143

10.4.4 টাংস্টেন

টাংস্টেন একটি বিরল মৌলিক ধাতু। এর রাসায়নিক চিহ্ন W ; এবং গলনাঙ্ক 3399K। এই ধাতুর বৈশিষ্ট্য হল অ্যাসিডের সঙ্গে নিষ্ক্রিয়তা এবং উচ্চ গলনাঙ্ক। একে পিটিয়ে পাতলা করা সম্ভব — হিসাব করে দেখা গেছে 10 গ্রাম ধাতু থেকে ৪ কিলোমিটার লম্বা তার তৈরি করা সম্ভব; বা ২ টন টাংস্টেন থেকে প্রায় 10 কোটি বালবের ফিলামেন্ট করা সম্ভব।

● টাংস্টেন যুক্ত ইস্পাতে নানা ধরনের যন্ত্রনির্মাণে অপরিহার্য ভূত্বকের শিলা ছেদন করার ড্রিল যন্ত্রের (Drilling Machine) বিট (Bit) নির্মাণে এর বহুল ব্যবহার হয়।

● টাংস্টেন, কোবাল্ট ও ক্রোমাইটের মিশ্রণে টাংস্টেন কার্বাইড Tungsten Carbide বা সংক্ষেপে Tc প্রস্তুত করা হয় যার কাঠিন্য হীরকের চেয়ে সামান্য কম — এইজন্য ড্রিলিং বিটে এটার ব্যবহার।

● টাংস্টেন — কোবাল্ট - মলিবডেনাম ইত্যাদির নানা অনুপাতের মিশ্রণে বিভিন্ন সংকর ধাতু উৎপন্ন হয় যেগুলি যন্ত্রশিল্পে বিভিন্ন বস্তুর উৎপাদনে কাজে লাগে।

● ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক শিল্পে ও রাসায়নিক শিল্পে এটি অতি প্রয়োজনীয় ধাতু। বস্ত্র এবং সিরামিক সামগ্রী প্রভৃতিতে রঙিন অলঙ্করণের কাজে এই ধাতুর বহুল ব্যবহার।

● টাংস্টেনের মূল আকর উলফ্রাম বা উলফ্রামাইট [(Fe, Mn) WO_4] যাতে টাংস্টেনের পরিমাণ 51 শতাংশ; অন্য আকর শিলাইট ($CaWO_4$) যাতে টাংস্টেনের পরিমাণ 64 শতাংশ। উলফ্রামাইটের আপেক্ষিক গুরুত্ব 7.2 থেকে 7.5 এবং চৌম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। শিলাইট আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মিতে দ্যুতি ওঠে। খনিজ সন্ধানের ব্যাপারে তাই আলট্রা ভায়োলেট ল্যাম্প অনেক সময় ব্যবহৃত হয়।

ভারতবর্ষের আকর ভাণ্ডার : আমাদের দেশে টাংস্টেন ভাণ্ডারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাজস্থানের নগৌর জেলায় দেগানা অঞ্চল এবং পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার ছেঁদাপাথর ও পোড়াপাহাড় অঞ্চল।

রাজস্থান : পশ্চিম রাজস্থানে প্রাক-কেমব্রীয় শিলায় অনুপ্রবিষ্ট শিরাকৃতি কোয়ার্টজ খনিজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অবস্থায় আকরিক টাংস্টেন লক্ষ্য করা যায়। এর সঙ্গে চ্যালকোপাইরাইট ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খনিজ পাওয়া যায়। শিরাতে আনুমানিক 234,000 টন আকর আছে যাতে WO_3র পরিমাণ 0.25 থেকে 0.54 শতাংশ। দেগানা পাহাড়ের তলায় যে বোল্ডার বা প্রস্তর খণ্ড পড়ে আছে তাতে 13 লক্ষ টন আকর আছে যাতে গড় WO_3র পরিমাণ 0.04 শতাংশ।

পশ্চিমবঙ্গ : ছেঁদাপাথর অঞ্চলে প্রাচীনতম শিলাগোষ্ঠীর কোয়ার্টজাইট ও ফিলাইট শিলায় অনুপ্রবিষ্ট কোয়ার্টজ শিরার মধ্যে অল্পপরিমাণ টাংস্টেন পাওয়া যায়। অন্য আনুষঙ্গিক খনিজ হল ম্যালাকাইট, ম্যাগনেটাইট প্রভৃতি। গৌরীপুর ইন্ডাস্ট্রিজ নামে একটি বেসরকারি কোম্পানি অল্প পরিমাণে খনিজ উত্তোলন করত — কিন্তু এখন খনিগুলি

পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। এই শিরাগুলি 1.22 মিটার থেকে 1.83 মিটার পর্যন্ত পুরু। আনুমানিক ভাণ্ডারের পরিমাণ 105,840 টন যাতে 0.05 থেকে 0.06 শতাংশ WO_3 আছে এবং 56,700 টন যাতে 0.03 থেকে 0.07 শতাংশ WO_3 আছে।

এছাড়া মহারাষ্ট্রে নাগপুর জেলায় অমরগাঁও অঞ্চলে; বিহারের গয়া জেলার ধনরাস অঞ্চলে; তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লী অঞ্চলে; গুজরাটে পাঁচমহল জেলার ঝের এলাকায় টাংস্টেন সঞ্চয়ের খোঁজ পাওয়া গেছে। এই সবগুলি জায়গায়ই মোট আকর ভাণ্ডার বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত এবং মোট পরিমাণও কম।

ভারতবর্ষে টাংস্টেন ভাণ্ডার অতি কম — সেইজন্য চাহিদা মেটাতে এই ধাতু আমদানি করতে হয়। গত কয়েক বছরের কনসেনট্রেটের উৎপাদন নিচে দেওয়া হল কিলোগ্রাম হিসাবে :

1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
5247	5721	6451	3826

10.4.5 অ্যান্টিমনি

অ্যান্টিমনি বিরল ধাতুর মধ্যে অন্যতম। এর রাসায়নিক চিহ্ন Sb এবং এর মূল ব্যবহার অ্যালয় শিল্পে। এর অক্সাইড রঙ শিল্পে লাগে। এ ছাড়া ঔষধ শিল্পে, অস্ত্র তৈরিতে, ইলেকট্রিক ব্যাটারিতে এবং বহু অন্য শিল্পে এর প্রয়োজন হয়।

এই ধাতুর মূল আকর হল স্টিবনাইট (Sb_2S_3) যাতে 71.4 শতাংশ অ্যান্টিমনি থাকে। native অবস্থায় এই ধাতু খুব কম জায়গায়ই পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে এই ধাতুর প্রধান ভাণ্ডার হল হিমাচল প্রদেশের কাঙড়া জেলায় লাহুল — স্পিটি অঞ্চলে। এই অঞ্চলে অ্যান্টিমনি শিরা 13 সেন্টিমিটার চওড়া এবং পেগমাটাইট্ শিলাতে পাওয়া যায়। এখানকার আকরে স্টিবনাইট ছাড়া গ্যালেনা এবং স্ফ্যালেরাইট পাওয়া যায়। এই আকর ভাণ্ডারের আনুমানিক পরিমাণ 10588 টন যার মধ্যে ষ্টিবনাইট আকর 3296 টন যাতে 2.88 শতাংশ অ্যান্টিমনি আছে ; 7292 টন অ্যান্টিমনি-সীসা-দস্তার আকর ভাণ্ডার যাতে 1.02 শতাংশ অ্যান্টিমনি; 1.40 শতাংশ সীসা এবং 0.54 শতাংশ দস্তা পাওয়া যায়।

এই অঞ্চল ছাড়া — অন্ধ্রপ্রদেশের করিমনগরে; কর্ণাটকের চিত্রদুর্গাতে; রাজস্থানের উদয়পুরে এবং উত্তরপ্রদেশের চামোলীতে অল্প পরিমাণ স্টিবনাইট আকরের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু এগুলির সব জায়গায়ই আকর বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বিস্তৃত এবং মোট মজুত ভাণ্ডারের পরিমাণও কম।

আমাদের দেশে অ্যান্টিমনির কোনও খনি নাই — কাজেই পুরো চাহিদাই আমদানি করে মেটাতে হয়।

10.4.6 অ্যালুমিনিয়াম আকরিক বক্সাইট — (Bauxite)

অ্যালুমিনিয়াম একটি মৌল ধাতু; এর রাসায়নিক চিহ্ন Al, এবং পরমাণুক্রমাঙ্ক 13। গুরুত্বের হিসাবে লৌহের পরেই এর স্থান। এর চাহিদা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে — যার কারণগুলো হল : ● এর তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা — বৈদ্যুতিক শিল্পে তামার পরিবর্তে এখন অ্যালুমিনিয়াম ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়।

● এর উজ্জ্বল রঙ এবং লঘু ভার। টিটানিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম সহযোগে এই ধাতু বিমান শিল্পে খুব প্রয়োজনীয়। গৃহনির্মাণে এবং গৃহস্থের বাসনপত্রেও এই ধাতু খুবই ব্যবহৃত হয়।

- এই ধাতু খুব সহজেই অন্য ধাতুর সঙ্গে মিশ্রণে মিশ্রধাতু (alloy) তৈরি করতে পারে। এই ক্ষমতার জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এ্যালুমিনিয়ামের চাহিদা ক্রমবর্ধমান — যেমন মহাকাশের রকেট নির্মাণ প্রভৃতি।

বক্সাইট ($Al_2O_3 2H_2O$) এ্যালুমিনিয়াম ধাতুর প্রধান আকর। সাধারণত যেসব বক্সাইটে এ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের (Al_2O_3) পরিমাণ 58 শতাংশের বেশি এবং লৌহের পরিমাণ 5 শতাংশের কম — সেই সব আকর ধাতু নিষ্কাশনে ব্যবহৃত হয়। বিশুদ্ধ বক্সাইটে অ্যালুমিনা (Al_2O_3) পরিমাণ 73.9 শতাংশ।

বক্সাইট আরও দুটি কাজে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে অন্যতম হল তাপরোধ কার্য (Refractory)। সাধারণত যে সব আকরে এ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের পরিমাণ ন্যূনতম 59 শতাংশ — সেগুলোই এই কাজে লাগে এছাড়াও বক্সাইট ঘর্ষণ (Abrasive) কার্যে ব্যবহৃত। যে সব আকরে এ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের পরিমাণ ন্যূনতম 55 শতাংশ সেগুলোই এই কাজে লাগে।

প্রাকৃতিক অবস্থায় বক্সাইট আরও দুটি মণিক (mineral) এর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় দেখা যায় — যেমন ডায়াসপোর (Al_2O_3, H_2O) এবং গিবসাইট ($Al_2O_3, 3H_2O$)। রাসায়নিক দিক দিয়ে এই সহাবস্থান গুরুত্বপূর্ণ — অর্থাৎ প্রকৃতিতে এ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড — তিন রকম মণিক হিসাবে থাকে যথা : ডায়াসপোর (Al_2O_3, H_2O) – বক্সাইট ($Al_2O_3, 2H_2O$) এবং গিবসাইট ($Al_2O_3, 3H_2O$)। প্রকৃতিতে বক্সাইট খনিজের সঙ্গে বিভিন্ন পরিমাণে লৌহ, টাইটানিয়াম, ক্যালসিয়াম ও সিলিকা মিশ্রিত থাকে।

পৃথিবীর বিভিন্ন বক্সাইট ভাণ্ডারের প্রকৃতি অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে এ্যালুমিনিয়াম আকর সাধারণত এ্যালুমিনিয়াম সমৃদ্ধ সিলিকেট শিলা অথবা ব্যাসাল্ট, কাদাপাথর, অশুদ্ধ চুনাপাথর, ফেল্‌সপারযুক্ত শিলা প্রভৃতির অপক্ষয় (Weathering) এর ফলে সৃষ্ট হয়। ভূপৃষ্ঠের গ্রীষ্মমণ্ডলী অর্থাৎ ২০° উত্তর থেকে ২০° দক্ষিণ বলয়ের মধ্যেই বক্সাইটের প্রধান ভাণ্ডারগুলি অবস্থিত। মানচিত্রে পৃথিবীর বক্সাইট আকর ভাণ্ডারের অবস্থান দেখান হল।

ভারতবর্ষের বক্সাইট ভাণ্ডার : এই ভাণ্ডারগুলিকে মোটামুটি দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। (ক) উচ্চ মালভূমি অঞ্চল — বিহার-মধ্যপ্রদেশের মালভূমি অঞ্চল এবং পূর্ব ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বক্সাইট আকর ভাণ্ডারগুলি 900 থেকে 1000 মিটার ওপরে অবস্থিত।

(খ) সমভূমিতে অবস্থিত আকর পাওয়া যায় গুজরাট, কচ্ছ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও কেরালাতে।

আকর ভাণ্ডারগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হল। রাজ্য অনুযায়ী না করে এখানে বলয় অনুযায়ী করা হয়েছে।

- উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্বঘাট পর্বতমালার বক্সাইট ভাণ্ডার ভারতের বৃহত্তম। গুরুত্বপূর্ণ ভাণ্ডারগুলি পেটাঙ্গি, বালাডা প্রভৃতি অঞ্চলে। আকরস্তর কোথাও 60 মিটার পর্যন্ত পুরু। এখানে লৌহের পরিমাণ বেশি 8 থেকে 28 শতাংশ লৌহ অক্সাইড; সিলিকা 1.5 থেকে 3.5 শতাংশ, টাইটানিয়াম 1 থেকে 3 শতাংশ।

- বিহারের লোহারডাগার বক্সাইট ভাণ্ডার আনুমানিক 900 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। এখানে বক্সাইটের আকর 3 থেকে 4 মিটার পুরু এবং অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের পরিমাণ 51 থেকে 60 শতাংশ।

- মধ্যপ্রদেশের সারগুজা-রায়গড় এবং বিলাসপুর মালভূমি অঞ্চলে এবং কাটনির সমভূমিতে উল্লেখযোগ্য ভাণ্ডার আছে। অমরকণ্টক এলাকায় আকরস্তর উন্নত মানের এবং তিন মিটার পুরু। ভারত এ্যালুমিনিয়াম

কোম্পানির কারকানায় এই আকর কাজে লাগানো হয়। কাটনীর ভাণ্ডার দীর্ঘসময় ব্যবহারের ফলে প্রায় নিঃশেষিত।

- পশ্চিমঘাট পর্বতমালাতে সাধারণত 1000 মিটার উঁচুতে উন্নতমানের বক্সাইট ভাণ্ডার পাওয়া যায় বেশ কিছু অঞ্চলে যেমন উদগিরি, কোলাবা। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের পরিমাণ 51 থেকে 52 শতাংশ।

- তামিলনাড়ুর সালেম, মাদুরাই এবং নীলগিরি অঞ্চল বক্সাইট লৌহসমৃদ্ধ। এখানে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড 34 থেকে 42 শতাংশ এবং লৌহ অক্সাইড 22 থেকে 40 শতাংশ।

- গুজরাটের কচ্ছ এবং সৌরাষ্ট্রের ভাণ্ডারগুলি সমুদ্রতটের কাছাকাছি অবস্থিত। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের পরিমাণ 55 শতাংশের বেশি।

- জম্মু-কাশ্মীর এলাকায় উধমপুর-পুঞ্চ অঞ্চলের বক্সাইট আকরে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের পরিমাণ 60 শতাংশ।

এরপর আমরা আমাদের দেশে অ্যালুমিনিয়াম কারখানা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করব। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে বক্সাইট থেকে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন করতে গেলে প্রচুর বিদ্যুতের প্রয়োজন। প্রতি কিলোগ্রাম অ্যালুমিনিয়াম তৈরি করতে 6 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ লাগে।

গত কয়েক বছরের বক্সাইট উৎপাদনের পরিমাণ নিচে দেওয়া হল টনের হিসাবে :

1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
5534913	4912737	5564775	6035579	5983708

আমাদের দেশে বক্সাইট থেকে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন করার মোট ক্ষমতা কোম্পানি হিসাবে দেওয়া হল :

ন্যাশনাল অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি (NALCO)	:	প্রতি বছর	218,000	টন
হিন্দালকো ইন্ডাস্ট্রিজ (HINDALCO)	:	প্রতি বছর	210,000	টন
ইন্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম (INDAL)	:	প্রতি বছর	117,000	টন
ভারত অ্যালুমিনিয়াম (BALCO)	:	প্রতি বছর	100,000	টন
ম্যাড্রাজ অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি (MALCO)	:	প্রতি বছর	25,000	টন

সরকারি তথ্য অনুসারে জানা যায় যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে নতুন কোনও কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে না — তবে NALCO তাদের কারখানার ক্ষমতা 218,000 টন থেকে বাড়িয়ে বছরে প্রায় 345,000 টন করার পরিকল্পনা করছে। সরকারি সংস্থা BALCO আধুনিকীকরণ করে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে বছরে 250,000 টন করতে চায় MALCO কে Sterlite নামে বেসরকারি সংস্থা অধিগ্রহণ করেছে — এরাও বছরে 1000 টন উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছে।

- বৈদ্যুতিক সরবরাহ বিঘ্নের জন্য বেশ কিছু কারখানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে — যেমন

(ক) ইন্ডালকে বেলগমের কারখানা বন্ধ করতে হয়েছে এবং কেরালার আলুপুরম কারখানাতেও উৎপাদন স্থগিত রাখতে হয়েছে। এই কারখানার যন্ত্রাংশ কোম্পানি হীরাকুঁদ (উড়িষ্যা) অঞ্চলে নিয়ে আসতে চাইছে।

(খ) অনেকেই বিদেশী ঋণের সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তি বেশি উৎপন্ন করার দিকে নজর দিয়েছে।

- আকর ভাণ্ডারের পরিমাণ এবং বক্সাইট উত্তোলনের ভিত্তিতে পৃথিবীর প্রথম কয়েকটি দেশের বিবরণ দেওয়া হল :

	দেশের নাম	আকর ভাণ্ডারের পরিমাণ (10 লক্ষ টন)		দেশের নাম	উৎপাদনের পরিমাণ (10 লক্ষ টন)
1	অস্ট্রেলিয়া*	9316	1	অস্ট্রেলিয়া*	40
2	গিনি*	9000	2	গিনি*	97
3	ভেনিজুয়েলা	5000	3	জামাইকা	12
4	চিন	5000	4	ব্রাজিল	11
5	ব্রাজিল	3337	5	পূর্বতন রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র	7
6	ভারতবর্ষ	3037	6	চিন	7
7	জামাইকা	1000	7	ভারতবর্ষ	5
8	ক্যামেরুন	1000	8	ভেনিজুয়েলা	5
9	ইন্দোনেশিয়া	897	9	সুরিনাম	5
10	কলম্বিয়া	855	10	গায়না	4.5
11	গায়না	805	11	হাঙ্গেরী	2.0
12	গ্রীস*	650	12	গ্রীস	2.0*
13	সুরিনাম	473	13	ইন্দোনেশিয়া	1.5
14	যুগোশ্লাভিয়া	400	14	সিয়েরা লিওন	1.3
15	রাশিয়ান যুক্তরাষ্ট্র	300			
16	হাঙ্গেরী	.300			
17	সিয়েরা লিওন	280			

উপরের তথ্য থেকে দেখা যায় যে প্রথম এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়া এবং গিনিতে সবচাইতে বেশি আকর ভাণ্ডার আছে এবং সবচাইতে বেশি বক্সাইড উৎপন্ন হয়। এর পর সমঅবস্থানের (১২) আছে গ্রীস। এছাড়া বেশির ভাগ রাষ্ট্রেরই আকর ভাণ্ডারের তালিকার স্থান এবং উৎপাদনের তালিকার স্থান বিভিন্ন।

- আমাদের দেশে বেশির ভাগ বক্সাইট খনির উৎপাদন ক্ষমতা বছরে 50,000 থেকে 60,000 টনের মতো। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজকাল খোলামেলা এবং বড় সাইজের বক্সাইট খনি চালু আছে। অস্ট্রেলিয়া এবং

গিনিতে কিছু খনি আছে যাতে বছরে বক্সাইট উৎপাদন হয় 1 কোটি 10 লক্ষ টন। এতে টন প্রতি খরচ কম পড়ে। আমাদের দেশে নালকো-র পাঁচপটমালী অঞ্চলে খনির উৎপাদন ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি বছরে 24 লক্ষ টন। এখানে প্রায় সব উত্তোলনই যান্ত্রিক উপায়ে করা হয় — এবং সব চাইতে কম খরচে বক্সাইট উত্তোলন করা হয়।

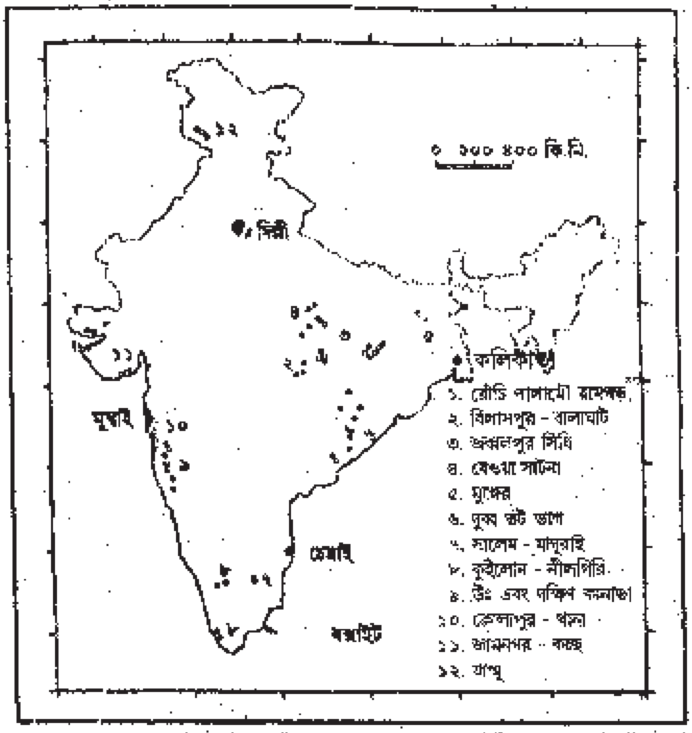

আমরা জেনেছি যে কিছু কোম্পানি অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড বা অ্যালুমিনা (Al_2O_3) তৈরি করে রপ্তানি করে এছাড়া কিছু কোম্পানি অ্যালুমিনিয়ামের জিনিষ তৈরি করে রপ্তানি করে। আমাদের দেশে বৈদ্যুতিক শক্তির চাহিদার থেকে উৎপাদন কম — এবং বক্সাইট থেকে রূপান্তর করতে গেলে বেশি বিদ্যুৎ লাগে। কাজেই অ্যালুমিনিয়াম

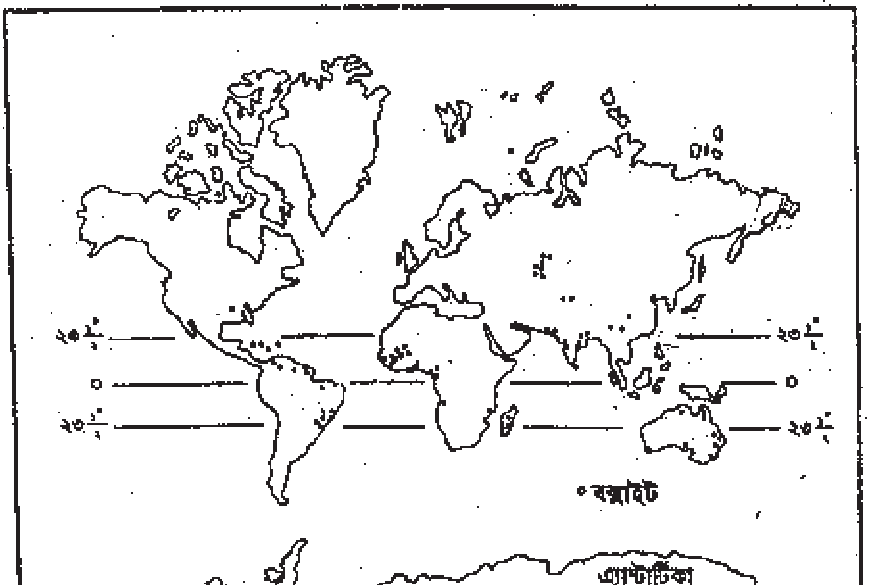

রপ্তানি করার অর্থ বিদ্যুৎ শক্তি রপ্তানি করা যা আমাদের অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকর। সরকারি- ভাবে ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে যাতে আমদানি করা অ্যালুমিনা থেকে অ্যালুমিনিয়ামের জিনিষ তৈরি করে রপ্তানি করা।

অ্যালুমিনিয়াম আকর খনি থেকে পরিবেশ দূষণের ব্যাপার আমরা অন্য জায়গায় আলোচনা করব।

অনুশীলনী 3

1. আকরিক তামা কয় প্রকারের এবং তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
2. বিহারের তামার আকর ভাণ্ডার সম্বন্ধে যা জানেন তা লিখুন।
3. অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটকে যেখানে তামার সন্ধান পাওয়া গেছে তাদের সম্বন্ধে লিখুন।
4. উদারনীতির ফলে যেসব বেসরকারি সংস্থা তামা নিষ্কাশনের কারখানা করছে — তাদের সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।
5. তামার উৎপাদন অনুসারে পৃথিবীর পাঁচটি দেশ কি কি এবং সেখানে কত উৎপাদন হয়?
6. সীসার প্রধান আকর কি কি এবং কোথায় এই ধাতু ব্যবহৃত হয়?
7. রাজস্থানের সীসা-দস্তা অঞ্চল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
8. আমাদের দেশে সীসা ধাতু নিষ্কাশনের কারখানা সম্বন্ধে আপনি কি জেনেছেন?
9. দস্তা নিষ্কাশন কারখানাগুলি সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।
10. সীসা ব্যবহারে আন্তর্জাতিক স্তরে কি সমঝোতা হয়েছে?
11. ভারতবর্ষের টিন উৎপাদনে গত কয়েকবছরে কি পরিবর্তন হয়েছে?
12. হরিয়ানার টিনের আকর ভাণ্ডার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
13. টাংস্টেনের আকর কি কি? এর ব্যবহার কোন শিল্পে হয়?
14. আমাদের দেশের টাংস্টেন আকর ভাণ্ডারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
15. আমাদের দেশে এ্যান্টিমনি আকর কোথায় পাওয়া যায় এবং চাহিদা কিভাবে মেটানো হয়?
16. উড়িষ্যা-অন্ধ্রপ্রদেশের বক্সাইট আকর ভাণ্ডারের বিবরণ দিন।
17. কোন কোন কারখানায় বক্সাইট থেকে এ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন হয় এবং তাদের ক্ষমতাই বা কতটা?
18. আকর ভাণ্ডারের পরিমাণ এবং উৎপাদন হিসাবে প্রথম দশটি দেশের নাম পর পর লিখুন।
19. এ্যালুমিনা রপ্তানি করার ফলে কি সুবিধা হয়?

10.5 মহার্ঘ ধাতু (Precious Metals)

মহার্ঘ ধাতুর মধ্যে প্রধানগুলি হল স্বর্ণ, রৌপ্য ও প্লাটিনাম। এগুলি এমনিতেই খুব কম পাওয়া যায় এবং আমাদের দেশে এদের আকর ভাণ্ডার খুবই কম।

10.5.1 স্বর্ণ (সোনা)

মূল্যবান ধাতু বলতে স্বর্ণের কথাই সব চাইতে আগে মনে পড়ে। স্বর্ণের উল্লেখ পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতে আছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে স্বর্ণখনি থেকে স্বর্ণ আহরণ প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ বছরের পুরোনো। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকেই সোনার ব্যবহার জানা ছিল।

স্বর্ণের রাসায়নিক চিহ্ন Au, আপেক্ষিক গুরুত্ব 19.32 এবং গলনাঙ্ক 1060K। এই ধাতু বিদ্যুৎ ও তাপ পরিবাহী এবং মৌল অবস্থায় নমনীয় কিন্তু অভঙ্গুর। এর একটি বিশেষ গুণ হল কোনও এ্যাসিড বা এ্যালকালিতে কোনও পরিবর্তন হয় না। অন্য ধাতুর মতো স্বর্ণ বাতাসে বা জলে কিছুতেই কোনও আস্তরণ সৃষ্টি করেনা। এ্যাকয়া রেজিয়া অর্থাৎ নাইট্রিক ও হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডের সংমিশ্রণে তৈরি এ্যাসিডে একমাত্র স্বর্ণ গলানো সম্ভব।

স্বর্ণ প্রকৃতিতে মৌল অবস্থায় খুব কম দেখা যায়। সাধারণত অন্য ধাতুর সঙ্গে মিশ্র অবস্থায় অথবা যৌগিক পদার্থ হিসাবে আকর ভাণ্ডারে দেখা যায়। কয়েকটি আকরের নাম দেওয়া হল : আরজেনটিনিয়ান, সিলভানাই, প্যালাডিয়ান, কিউপ্রিয়ান প্রভৃতি।

স্বর্ণ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয় যথা :

- বহু প্রাচীনকাল থেকেআজ পর্যন্ত স্বর্ণ অলঙ্কার শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
- বহুদেশে স্বর্ণমুদ্রা আছে — এছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণভাণ্ডার সবদেশেই অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে।
- 'সোনার জল' চিনামাটির নানা সৌখিন দ্রব্যে ব্যবহার করা হয়।
- 'জরি' বস্ত্রশিল্পে ব্যবহার করা হয়। জরির অর্থ স্বর্ণ মিশ্রিত সুতা।
- স্বর্ণমিশ্রিত সংকর ধাতু চিকিৎসা করার জন্য এবং শল্যবিদ্যাতে কাজে লাগে।

স্বর্ণ খুব নরম বলে সব জায়গাতেই তাম্র ও রৌপ্যের সঙ্গে সংকর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর বিশুদ্ধতা ক্যারেট (carat) হিসাবে প্রকাশ করা হয়। বিশুদ্ধ স্বর্ণ ২৪ ক্যারেট।

ভারতবর্ষের আকর ভাণ্ডার : আমাদের দেশে স্বর্ণ আকরের সন্ধান পাওয়া যায় কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুতে। এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

- কোলারে 290 কোটি বছরের পুরোনো পাথরে স্বর্ণ আকর আছে। স্বর্ণ পাওয়া যায় কোয়ার্টজ শিরাগুলিতে যেগুলো মাটির নিচে খাড়াইভাবে রয়েছে। একে আকরে স্বর্ণের পরিমাণ এবং শিরাগুলি খাড়াই কাজেই উত্তোলন করতে ক্রমশই নিচে নামতে হয়েছে। খনিগহ্বর প্রায় 3100 মিটার পর্যন্ত চলে গেছে। এখানকার বিভিন্ন জায়গায় আকরে স্বর্ণ আছে প্রতি টনে 4 গ্রাম থেকে 15 গ্রাম।

- কর্ণাটকের রাইচুর জেলায় হাট্টি-মাসকি স্বর্ণভাণ্ডারের স্থান কোলারের পর। এই অঞ্চলে স্বর্ণবাহী দেহগুলি 0.5 থেকে 40 মিটার মোটা এবং ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে 1 কিলোমিটারের বেশি গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। আকরে স্বর্ণের পরিমাণ টন প্রতি আনুমানিক 7 গ্রাম।

● অন্ধ্রপ্রদেশের রামগিরি অঞ্চলে স্বর্ণবাহী কোয়ার্টজ শিরার সন্ধান পাওয়া গেছে। মোট আকর ভাণ্ডার 10 লক্ষ টন যাতে টনপ্রতি 4 থেকে 5 গ্রাম স্বর্ণ থাকতে পারে।

● তামিলনাড়ুর ওয়াইনাদ ক্ষেত্রের স্বর্ণভাণ্ডারের সন্ধান অনেক আগেই জানা ছিল। এখানে কিছুদিন আগে পর্যন্ত খননকার্য চলত। পুরোনো খনি প্রায় আড়াই কিলোমিটার গভীর।

● উপরের স্বর্ণক্ষেত্র ছাড়াও কতকগুলি জায়গার নদীর বালুচরে স্বর্ণ পাওয়া যায়। ব্রহ্মপুত্রর শাখানদীতে, বিহারে সুবর্ণরেখা নদী প্রভৃতি অঞ্চলে দরিদ্র গ্রামবাসীরা প্যানিং প্রণালীতে স্বর্ণ সংগ্রহ করে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই প্রণালীতে স্বর্ণসংগ্রহ কখনই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ব্যবহার্য নয়। এই সব বালুতে প্রতি টনে আনুমানিক 0.1 থেকে 0.2 গ্রাম পাওয়া যায় — বিশেষ বিশেষ এলাকায়।

● পৃথিবীর স্বর্ণ উত্তোলনকারী দেশগুলির তালিকা দেওয়া হল।

1997			1998		
স্থান	দেশের নাম	স্বর্ণ উৎপাদন (টন)	স্থান	দেশের নাম	স্বর্ণ উৎপাদন (টন)
1	দঃ আফ্রিকা	493*	1	দঃ আফ্রিকা	474*
2	আমেরিকা	359*	2	আমেরিকা	364*
3	অস্ট্রেলিয়া	313*	3	অস্ট্রেলিয়া	313*
4	কানাডা	168*	4	কানাডা	164*
5	চিন	153*	5	চিন	161*
6	রাশিয়া	138	6	ইন্দোনেশিয়া	139
7	ইন্দোনেশিয়া	102	7	রাশিয়া	127
8	উজবেকিস্থান	83	8	পেরু	89
9	পেরু	75	9	উজবেকিস্থান	81
10	ব্রাজিল	59	10	ঘানা	73
11	ঘানা	56	11	পাপুয়া নিউগিনি	63
12	চিলি	53	12	ব্রাজিল	55
13	পাপুয়া নিউগিনি	49	13	চিলি	47
14	ফিলিপাইন্স*	34	14	ফিলিপাইন্স*	35
15	জিম্বাবোয়ে	26	15	জিম্বাবোয়ে	27
16	মেক্সিকো	26	16	মেক্সিকো	26
17	কলম্বিয়া	22	17	মালি	22
20	মালি	17	18	কিরঘিজস্থান	22
47	আর্জেন্টিনা*	3	19	কলম্বিয়া	20
			20	আর্জেন্টিনা*	22*

আগের পৃষ্ঠার তালিকা থেকে যে প্রথম পাঁচটি দেশ অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং চিন 1997 ও 1998 সালে উৎপাদনের প্রকারভেদ থাকলেও তালিকায় স্থান ঠিকই আছে। এর পরে অবস্থান ঠিক আছে ফিলিপিন্‌সের। এই তালিকায় মধ্যবর্তী দেশগুলির স্থান পরিবর্তন হয়েছে। সবচাইতে পরিবর্তন হয়েছে আর্জেন্টিনা দেশের 1997-র তালিকায় এই দেশের নাম ছিল 47 নম্বরে — 1998 সালে সেটা হয়ে গেছে 20 নম্বরে — উৎপাদন 3 টন থেকে বেড়ে 22 টন হয়েছে।

● আন্তর্জাতিক হিসাবে অলঙ্কার তৈরি করা এবং স্ক্র্যাপ ব্যবহার করা শতকরা 6 ভাগ কমে গেছে 1998 সালে। কিন্তু এ সত্ত্বেও স্বর্ণের চাহিদা স্থির বলে বাজার দর বিশেষ কমেনি। বিশেষজ্ঞদের মতে এর জন্য অনেকটা দায়ী ভারতবর্ষে স্বর্ণের চাহিদা। ফেব্রিকেশনে ভারতবর্ষে মোট 800 টন স্বর্ণের চাহিদা ছিল।

● আর একটা প্রবণতা লক্ষ করা গেছে আমাদের দেশে। মেডাল এবং মুদ্রার আকারে উপহার দেওয়া অনেক বেড়ে গেছে গত দু-তিন বছরে। জরি শিল্পে অবশ্য স্বর্ণের ব্যবহার কমে গেছে।

● আমরা জানতে পারলাম যে যদিও আমাদের দেশে স্বর্ণের আকর ভাণ্ডার খুবই কম এবং উৎপাদনও খুব কম কিন্তু গোটা পৃথিবীর স্বর্ণবাজারে আমাদের দেশের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল 1998 সালে। 1999-র পরিসংখ্যান এখনও প্রকাশিত হয়নি।

10.5.2 রৌপ্য

মূল্যবান ধাতুর তালিকায় স্বর্ণের পরই রৌপ্যের স্থান। গহনা এবং মুদ্রা নির্মাণে রৌপ্যের ব্যবহার বহুযুগ ধরে চলে আসছে। অবশ্য এখন মুদ্রাতে রৌপ্যের ব্যবহার হয় না কারণ রূপা একটি মহার্ঘ ধাতু যা অন্য শিল্পে প্রয়োজন হয়। প্রকৃতিতে রৌপ্য মৌল অবস্থাতে খুব অল্পই দেখা যায়। এই ধাতুর রাসায়নিক চিহ্ন Ag, আপেক্ষিক গুরুত্ব 105 এবং গলনাঙ্ক 960° 5K

● রৌপ্যের প্রধান আকরিক আরজেনটাইট (Ag_2S),) সেবারজিরাই (AgCl), পরিবেসাইট ($Ag_{16}SB_2S_{11}$) প্রভৃতি।

● রৌপের ব্যবহার করা হয় ফটোগ্রাফি, রাসায়নিক শিল্প এবং সোলাডারিঙে। রৌপ্যকে খুব পাতলা পাতে পরিণত করা যায় — এমনকি 0.00003 সেন্টিমিটার পাতলা পর্যন্ত। 1 গ্রাম রূপা থেকে 2 কিলোমিটার দীর্ঘ তার তৈরি করা সম্ভব।

● আমাদের দেশে আকরিক রৌপ্যের ভাণ্ডার এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। যা অল্প পরিমাণ উৎপাদন হয় সেটা হয় (ক) রাজস্থান এবং অন্যান্য সীসা-দস্তা আকর থেকে ধাতু নিষ্কাশনের সময় বাইপ্রোডাক্ট হিসাবে এবং (খ) কোলার-হাট্টি প্রভৃতি স্বর্ণখনির আকার থেকে ধাতু নিষ্কাশনের সময়।

আমাদের দেশে রৌপ্যের খনি নেই এবং বাইপ্রোডাক্ট হিসাবে কম উৎপাদন হলেও এর চাহিদা যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

আমরা পরের পৃষ্ঠায় পৃথিবীর রৌপ্য উৎপাদনকারী প্রথম দশটি দেশের বিবরণ দিলাম। 1997 সালে দশটি দেশের মধ্যে স্থান ব্রাকেটে দেওয়া হল।

প্রথম দশটির মধ্যে স্থান		দেশের নাম	মোট উৎপাদন (টন)	
1998	(1997)		1997	1998
1	1*	মেক্সিকো	2707	2807
2	2*	পেরু	2099	2024
3	3*	আমেরিকা	1966	1954
4	7	অস্ট্রেলিয়া	1106	1469
5	8	চিলি	1091	1344
6	4	পূর্বতন রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র	1304	1302
7	6	চিন	1180	1196
8	5	কানাডা	1213	1125
9	9*	পোল্যান্ড	1050	1119
10	10*	বলিভিয়া	387	409

উপরের তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর মধ্যে রৌপ্য উৎপাদনকারী প্রথম তিনটি দেশ মেক্সিকো, পেরু এবং আমেরিকার উৎপাদনের মাত্রার সামান্য হেরফের হলেও পারস্পরিক অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হয়নি। অনুরূপভাবে নবম ও দশম স্থানাধিকারী দেশ পোল্যান্ড ও বলিভিয়ারও পারস্পরিক অবস্থান একই আছে অথচ উৎপাদনের পরিমাণে কিছু হেরফের হয়েছে।

ভারতবর্ষে স্বর্ণ ও রৌপ্যের উৎপাদন স্বাধীনতা পরবর্তী কালে যা হয়েছিল সেটা নীচে দেওয়া হল।

	1948	58	68	78	88	91	92	93	94	95
স্বর্ণ (কিলোগ্রাম)	5616	5291	3688	2778	1982	2095	1792	2003	2244	2205
রৌপ্য (কিলোগ্রাম)	398	3416	2926	12138	40958	34539	47391	51228	50209	38068

10.5.3 প্ল্যাটিনাম

প্ল্যাটিনাম শুধু মহার্ঘ ধাতু নয় — এটি পৃথিবীতে খুব কম জায়গায় কম পরিমাণে পাওয়া যায়। এই ধাতু এবং এর কাছাকাছি রাসায়নিক শ্রেণিবিভাগের ধাতু প্যালাডিয়াম গোষ্ঠীকে প্ল্যাটিনাম গ্রুপ মেটাল (Platinum Group Metals বা PGM) বলে বর্ণনা করা হয়।

পৃথিবীতে প্রাচীনতম শিলাসজ্ঞ অর্থাৎ আর্কিয়ান শিলাতেই এই গোষ্ঠীর ধাতু পাওয়া যায়। অতিক্ষারকীয় শিলার স্তরীভূত অংশে এই ধাতুগোষ্ঠী বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। এদের অনুসন্ধান, এবং আকর ভাণ্ডার সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া খুবই শক্ত এবং আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োজন।

এই বহুমূল্য ধাতু যার রাসায়নিক চিহ্ন Pt সাধারণভাবে অলঙ্কারের জন্যই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এর উচ্চ গলনাঙ্ক এবং উচ্চতাপে স্থিতিশীলতার জন্য বহুবিধ শিল্পে এর প্রয়োগ হয়। আধুনিক কালে এর চাহিদা কয়েকটি বিশেষ কারণে বেড়ে গেছে :

এই ধাতু ক্যাটালিস্ট হিসাবে প্রয়োগ করে পেট্রোল ইঞ্জিন থেকে নিঃসৃত গ্যাসে দূষণ কম হয়। সেইজন্য মোটর গাড়ি তৈরি শিল্পে এর চাহিদা বেড়ে গেছে। ইউরোপ, আমেরিকাতে আইন করে মোটর ইঞ্জিনে এই ধাতুর প্রয়োগ করা হচ্ছে।

পারসোনাল কম্পিউটারের ডিস্কে এই ধাতুর প্রয়োগে ডিস্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আজকাল কম্পিউটারের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় এই ধাতুর চাহিদা বেড়ে গেছে।

ভারতবর্ষে এই ধাতুগোষ্ঠীর আকর ভাণ্ডার এখনও আবিষ্কার হয়নি যদিও কয়েকটি জায়গায় অতিক্ষারকীয় শিলাস্তরে এর থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

পৃথিবীতে গত কয়েক বছরের চাহিদার পরিমাণ দেওয়া হল ব্যবহার অনুযায়ী :

	1996	1997 ('000 আউন্স হিসাবে)	1998
অটোমোবাইল	1930	1890	1850
অলঙ্কার	1980	2150	2300
অন্যান্য	1450	1560	1580
মোট	5360	5600	5730

এই পরিপ্রেক্ষিতে ঐ সময়ে কোথা থেকে এই চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়েছিল সেটা নিচে দেওয়া হল :

	1996 (হাজার আউন্স)	1997 (হাজার আউন্স)	1998 (হাজার আউন্স)
দক্ষিণ আফ্রিকা	3440	3720	3740
পশ্চিমী দেশগুলি	360	400	440
রাশিয়ার সঞ্চিত ভাণ্ডার এবং উৎপাদন থেকে বিক্রয়	1200	850	1050
সেকেন্ডারি মেটাল বা অন্য ধাতু নিষ্কাশনের সময় পাওয়া এবং স্ক্র্যাপ থেকে নেওয়া	400	440	490
মোট	5400	5410	5720

আগের আলোচনা থেকে আমরা একটা জিনিষ অনুধাবন করতে পারলাম যে কোনও শিল্পে কোনও খনিজ পদার্থ জরুরি হলে এবং সেটা যদি আমাদের দেশে না পাওয়া যায় তাহলে কয়েকটি চেষ্টা করা হয় :

- নিম্নমানের আকরকে পরিষ্কৃত করে মানোন্নয়ন করে সেটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা;
- স্ক্র্যাপ বা বাতিল যন্ত্রপাতি বা অন্যান্য জিনিষ থেকে সেই ধাতুকে নিষ্কাশন করার চেষ্টা;
- পৃথিবীর যে দেশগুলিতে ঐ সব ধাতু পাওয়া যায় সেগুলো আমদানি করে কাজে লাগান।

উল্লেখ্য, এই নীতি শুধু আমাদের দেশ নয় পৃথিবীর সব দেশই অনুসরণ করে। আরও একটি চেষ্টা চালানো হয় যাতে ঐ ধাতুর বদলে অন্য ধাতু ব্যবহার করা যায় সেজন্য গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

10.6 অধাতব খনিজ (Non-Metallic Minerals)

অধাতব খনিজের সংখ্যা অনেক এবং আমাদের দেশে এগুলোর অনেকগুলিই বহু জায়গায় পাওয়া যায়। ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের সর্বশেষ সমীক্ষায় আকর ভাণ্ডারের পরিমাণ সম্বন্ধে অনুমান করা যায়। নিচে বিশেষ বিশেষ অধাতব খনিজের আকর ভাণ্ডারের মোট পরিমাণ দেওয়া হল। উল্লেখ করা যেতে পারে এই মোট ভাণ্ডারের কিছু প্রমাণিত, কিছু সম্ভাব্য এবং কিছু অনুমিত।

খনিজের নাম	মোট আকর ভাণ্ডার
এপেটাইট (Apatite)	1 কোটি 32 লক্ষ টন
এ্যাসবেসটস (Asbestos)	22 লক্ষ 94 হাজার টন
ব্যারাইটিস (Barytes)	70 কোটি 1 লক্ষ টন
বল ক্লে (Ball Clay)	13 কোটি 8 লক্ষ টন
বেনটোনাইট (Bentonite)	367556686 টন
ক্যালসাইট (Calcite)	10573477 টন
চিনা ক্লে (China clay)	985969 টন
ডলোমাইট (Dolomite)	4967467 টন
ফায়ার ক্লে (Fire clay)	696716000 টন
ফ্লুরাইট (Flourite)	2148493 টন
গারনেট (Garnet)	39513391 টন
গ্রাফাইট (Graphite)	3108682 টন
জিপসাম (Gypsum)	239312000 টন
কায়ানাইট (Kyanite)	2714824 টন
লাইমস্টোন (Limestone)	76446006,000 টন
ম্যাগনেসাইট (Magnesite)	233338,000 টন

খনিজের নাম	মোট আকর ভাণ্ডার
ওকার (Ochre)	22310300 টন
পটাশ (Potash)	20378 মিলিয়ন টন
কোয়ার্টজ এবং সিলিকা স্যান্ড (Quartz and Silika Sand)	983527000 টন
রক ফসফেট (Rock Phosphate)	146.94 মিলিয়ন টন
রকসল্ট (Rock Salt)	6285.000 টন
সিলিম্যানাইট (Sillimanite)	50695467 টন
সোপ স্টোন (Soapstone)	63665000 টন
অভ্র (Mica)	109014 টন

উপরের আকরগুলির ভাণ্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এবার কয়েকটি বিশেষ আকর ভাণ্ডারের আলোচনা করব যেমন চুনাপাথর ও ডলোমাইট; ম্যাগনেসাইট; অভ্র; খনিজ সার। নিম্নে এগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

10.6.1 চুনাপাথর এবং ডলোমাইট

যেসব শিলাসমূহের মধ্যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের পরিমাণ 50 শতাংশের বেশি, সেইসব শিলাসমূহকে চুনাপাথর বলে। এই হিসাবে মার্বেল, খড়ি, ট্যাভারটিন, টুফা বা প্রস্রবণজাত অবক্ষেপ, মার্ল ইত্যাদিকে চুনাপাথর হিসাবে গণ্য করা হয়। কিছু খড়িপাথরে ফোরামিনিফার জীবাশ্ম পাওয়া যায় — এইরকম ধরনের পাথর দিয়ে মিশরের পিরামিড তৈরি হয়েছিল।

ডলোমাইট প্রায়শই চুনাপাথরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে — এই পাথরে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ও ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটের অনুপাত যথাক্রমে ৫৪.৩ শতাংশ এবং ৪৫.৭ শতাংশ। প্রকৃতি অবশ্য এই অনুপাতের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে যে সব চুনাপাথরে ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেটের পরিমাণ 40 থেকে 45 শতাংশ তাদের ডলোমাইট বলা হয়।

বিভিন্ন শিল্পে চুনাপাথরের উপযোগিতা নির্ভর করে তার রাসায়নিক সংযুক্তির ওপর। কিছু স্পেসিফিকেশনের বিষয় আমরা এখানে জানালাম।

	শতকরা হিসাবে :—
ব্লাস্টফার্নেসে ব্যবহারের জন্য (Blast Furnace grade)	CaO 44.5এর বেশি; সিলিকা 7 শতাংশের বেশি; MgO 4এর কম; এ্যালুমিনা 1.5 এর কম; সালফার 0.5 এর কম;
'স্টিলমেল্টিং শপ' এ ব্যবহারের জন্য SMS grade	CaO 47.5 এর বেশি; সিলিকা 1 এর কম; 47.5
সিমেন্ট শিল্পে ব্যবহারের জন্য	CaO – 42এর বেশি; ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড 2.5এর কম; সিলিকা 15 এর কম, ফসফরাস পেন্টাক্সাইড 1 এর কম

রাসায়নিক শিল্পে ক্যালসিয়াম কার্বাইড তৈরি করার জন্য	ক্যালসিয়াম কার্বনেট 95 থেকে 97 সিলিকা 1 থেকে 3; ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড 0.5
কাগজ শিল্পের জন্য	CaO 45 এর বেশি; ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড 3 শতাংশ
রঙহীন গ্লাস তৈরির জন্য	CaO 55র বেশি; ম্যাঙ্গানিজ, সীসা, গন্ধক এবং ফসফরাস প্রতিটি 0.1র কম
বস্ত্রশিল্পে	CaO 94র বেশি; ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড 3.3 কম; লোহা এবং এ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড একত্রে 2 এর কম

ভারতের খনিজ ভাণ্ডার : প্রাক-কেমব্রীয় (Pre Cambrian) যুগ থেকে কোয়ার্টারনারী (আধুনিকতম যুগ) পর্যন্ত বিভিন্ন শিলাস্তরে বিভিন্ন আকারের চুনাপাথর ও ডলোমাইট ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিভিন্ন রাজ্যের ভাণ্ডারগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

বিহার ● সাহাবাদ জেলায় চুনাপাথরের বড় ভাণ্ডার রয়েছে। এই অঞ্চলে ইস্পাতগলনের এবং ব্লাস্টফার্নেসে ব্যবহারের উপযোগী চুনাপাথর পাওয়া যায়।

● সিংভূমে হাজারীবাগ জেলায় সিমেন্ট উৎপাদনের উপযোগী চুনাপাথর পাওয়া যায়; রাঁচী জেলার খিলাড়ীতে অনুরূপ ভাণ্ডার আছে।

মধ্যপ্রদেশ ● কাটনী, কৈমুর, মাইহার ও সাতনার নিকটবর্তী অঞ্চলের চুনাপাথর স্তরগুলি 10 মিটার থেকে 17 মিটার পুরু। কোনও কোনও অঞ্চলের চুনাপাথর ব্লাস্টফার্নেসের উপযোগী হলেও বেশির ভাগ আকরই সিমেন্ট তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

● দ্রুগ ও রায়পুর জেলায় সিমেন্ট নির্মাণের উপযোগী চুনাপাথর বেশ কয়েক জায়গায় পাওয়া যায়।

● জব্বলপুর জেলায় চুনাপাথর এবং ডলোমাইট নানা জায়গা থেকে খনন করা হচ্ছে। ছাতারপুর জেলায় লোহানি অঞ্চলে 20 থেকে 30 মিটার পুরু ডলোমাইট স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ ● আদিলাবাদ, কৃষ্ণা জেলার চুনাপাথর সিমেন্ট শিল্পের উপযোগী।

তামিলনাড়ু ● মাদুরাই এবং সালেম জেলায় চুনাপাথর সিমেন্ট উৎপাদনের উপযোগী যদিও সামান্য পরিমাণে উচ্চমানের চুনাপাথর রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়। মেটুর কেমিক্যাল কোম্পানি এই চুনাপাথর দিয়ে ব্লিচিং পাউডার তৈরি করে।

● দক্ষিণ আর্কট জেলায় চুনাপাথরে সিলিকার পরিমাণ 15 থেকে 46.8 শতাংশ।

রাজস্থান ● রায়ালো, রাজুয়াগড়, নাথদোয়ারা, মাকরানা এবং কিষেণগড়ে মার্বেলপাথরের খনি আছে এবং উন্নতমানের মার্বেল সৌধ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। মাকরানার মার্বেল ভারতবিখ্যাত।

● সোয়াই মাধোপুর, বুন্দি, পালি, ও চিতোর গড়ের আকর ভাণ্ডার সিমেন্ট নির্মাণের উপযোগী। পালি যোধপুর ও চিতোরগড়ের উন্নতমানের ডলোমাইট ব্লাস্ট ফার্নেসে ব্যবহারের যোগ্য।

মেঘালয় ও আসাম ● মেঘালয়ে খাসি পাহাড়ের দক্ষিণে সেলা, মৌসিনরাম অঞ্চলে 2-3টি উন্নত মানের চুনাপাথরের স্তর আছে। সেলা ভোলাগঞ্জে তিনটি 20 থেকে 25 মিটার পুরু চুনাপাথরের স্তর আছে যা রাসায়নিক সামগ্রী এবং ইস্পাত নির্মাণের উপযোগী।

● চেরাপুঞ্জী অঞ্চলে 9 মিটার পুরু ডলোমাইট ও 18 মিটার পুরু চুনাপাথর সিমেন্ট নির্মাণের উপযোগী।

● জয়ন্তিয়া পাহাড়ের চুনাপাথরের পুরু স্তর আছে — এবং আকরগুলি উচ্চমানের। গারো পাহাড়েও সিমসং উপত্যকায় 75 মিটার পুরু উচ্চমানের স্তর রয়েছে।

● মিকির পাহাড়ে কোইলাজান অঞ্চলের চুনাপাথর স্থানীয় সিমেন্ট কারখানায় ব্যবহৃত হয়।

অরুণাচল প্রদেশ ● কামেং এবং সুবনসিরি জেলায় উচ্চমানের ডলোমাইট পাথরের সন্ধান পাওয়া গেছে। রূপাতে ডলোমাইটের বিশাল ভাণ্ডার। কিন্তু দুর্গম জায়গা এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয় — সেজন্য খনি নিষ্কাশনের কোনও পরিকল্পনা হচ্ছে না। এখানকার ডলোমাইট উন্নত মানের — এবং এর থেকে ম্যাগনেশিয়াম ধাতু নিষ্কাশন করা সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

পশ্চিমবঙ্গ ● জলপাইগুড়ি জেলায় জয়ন্তী-বক্সাদুয়ার অঞ্চলে দুটি ডলোমাইটের স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে। উপরের স্তরটি 380 মিটার পুরু এবং সুবিস্তৃত। মজুত ভাণ্ডার অনেক।

উড়িষ্যা ● সুন্দরগড়, কোরাপুট এবং সম্বলপুর জেলায় চুণাপাথরের ভাণ্ডার আছে। বীরমিত্রপুরে চুনাপাথর ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

গুজরাট ● এখানকার কেলাসিত চুনাপাথরে ক্যালসিয়াম অক্সাইডের পরিমাণ 43.9 থেকে 52.9 শতাংশ। এগুলি সিমেন্ট শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

উত্তরপ্রদেশ ● আলমোড়া, পিথোরাগড় অঞ্চলে চুনাপাথরের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে। এরা সিমেন্ট ও চুণ নির্মাণের উপযোগী।

রাজ্যভিত্তিক চুনাপাথর ভাণ্ডারের পরিমাণ নীচে দেওয়া হল :

রাজ্য	প্রমাণিত ভাণ্ডার (কোটি টন)	মোট ভাণ্ডার (কোটি টন)
অন্ধ্রপ্রদেশ	94.1	1364
আসাম	6	73
বিহার	16	57
গুজরাট	2	810
কর্ণাটক	69	1685
মধ্যপ্রদেশ	365	801
মহারাষ্ট্র	53	345
মেঘালয়	4	426
উড়িষ্যা	12	101
রাজস্থান	182	657
উত্তরপ্রদেশ	12	152
পশ্চিমবঙ্গ	0.64	3.5

● প্রসঙ্গত বলা যায় চুনাপাথর মোটামুটি সব দেশেই ঘরোয়া চাহিদা মেটাতেই চলে যায়। কোনও দেশই বিশেষ পরিমাণে চুনাপাথর আমদানি রপ্তানি করেনা। কিন্তু আমাদের করতে হয়।

● আমাদের দেশে চুণাপাথরের 668টি খনি আছে এবং মোট উৎপাদনের অর্ধেক আসে মাত্র 22টি খনি থেকে।

● বিশেষজ্ঞদের মতে 2000 সালে মোট চুণাপাথর লাগবে প্রায় 15 কোটি টনের মতো — যার মধ্যে সিমেন্ট তৈরির জন্য লাগবে আনুমানিক 12.3 কোটি টন। এই প্রসঙ্গে সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এসোসিয়েশনের থেকে পাওয়া তথ্য দেওয়া হল।

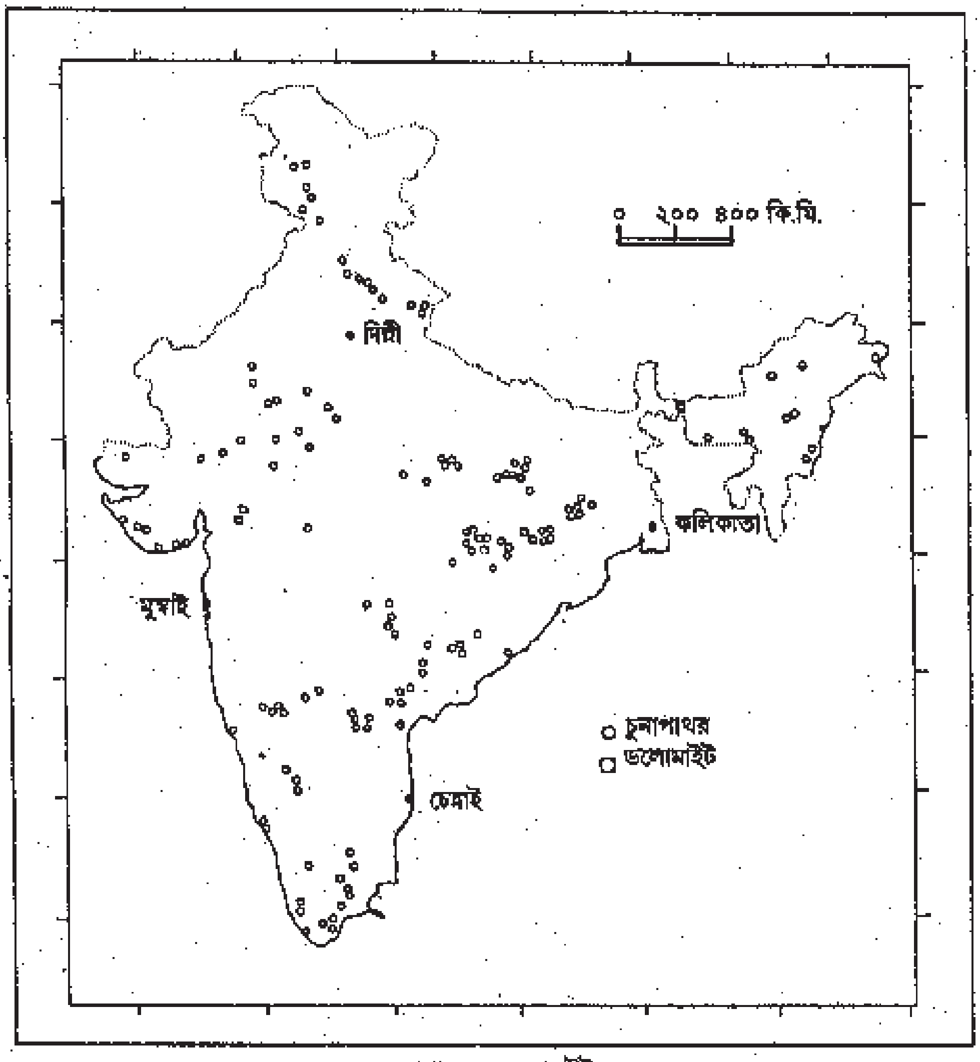

চুনাপাথর ও ডলোমাইট

● পৃথিবীতে সিমেন্ট উৎপাদন সবচেয়ে বেশি হয় চিনে (52.5 কোটি টন); তারপর জাপান (8.8 কোটি টন) এবং তারপর ভারত (9 কোটি টন)। আমাদের দেশে সব কটি সিমেন্ট কারখানার মোট উৎপাদনের ক্ষমতা বছরে 12 কোটি টন — যেটা আমাদের 2000 সালের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল।

ভারতবর্ষে 119 টি সিমেন্ট তৈরির কারখানার পরিচালনা করে 62 টি কোম্পানি। মোট উৎপাদনের আনুমানিক 92 শতাংশ বেসরকারি কোম্পানি তৈরি করে এবং বাকি 8 শতাংশ সরকারি কারখানায় তৈরি হয়।

- আরো একটি তথ্য জানানো প্রয়োজন। স্টীল তৈরির কারখানাতে চুনাপাথর ব্যবহারে প্রযুক্তি বিদ্যার জন্য নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এখন স্টীল তৈরির সিলিকা কম আছে (Low Silica) চুনাপাথরের প্রয়োজন। দেরাদুন অঞ্চলে চুনাপাথর খনির কাজ ব্যাহত হয়েছে পরিবেশবিদদের জন্য। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত আমাদের 17 লক্ষ টন কম সিলিকাসম্পন্ন চুনাপাথর আমদানি করতে হয়েছিল। মেঘালয়ের লিলাঙ উপত্যকায় উচ্চমানের চুনাপাথর পাওয়াতে আশা করা যাচ্ছে এই সমস্যা কিছু মিটবে।

- ভারতবর্ষে কম সিলিকাসম্পন্ন ডলোমাইটের আকর ভাণ্ডার অনেক। স্টীল কোম্পানিগুলি এই আকর কেনে পশ্চিমবঙ্গের জয়ন্তী; মধ্যপ্রদেশের বরাওয়াড় থেকে। এইসব জায়গার ডলোমাইটে সিলিকার পরিমাণ 1 থেকে 3 শতাংশ। এই সব অসুবিধার জন্য স্টীল কারখানাগুলো চাইছে ডলোমাইটের বদলে ডুনাইট (Dunite) নামে অতিক্ষারকীয় শিলা ব্যবহার করতে।

10.6.2 ম্যাগনেসাইট

ম্যাগনেসাইটের রাসায়নিক সংযুতি হল $MgCO_3$ এবং এটাই ম্যাগনেশিয়াম ধাতুর প্রধান আকর। এর উপযোগিতা নানা রকমের :

- মূল ব্যবহার তাপরোধকারী রিফ্রাক্টরী ইট নির্মাণে;
- বিশেষ ধরনের সিমেন্ট (Sorel Cement) তৈরি করার জন্য; এটা খুব তাড়াতাড়ি জমাট বাঁধে।
- ম্যাগনেশিয়াম ধাতু নিষ্কাশনের জন্য; এবং
- ম্যাগনেশিয়ামের লবণ তৈরি করার জন্য।

শিল্পে ব্যবহার্য্য ম্যাগনেসাইটে প্রায় 85 শতাংশ ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড থাকে।

ভারতবর্ষের আকর ভাণ্ডার : মাত্র তিনটি রাজ্যে ম্যাগনেসাইটের সন্ধান পাওয়া গেছে; তামিলনাড়ু, কর্ণাটক এবং উত্তরপ্রদেশ। এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

তামিলনাড়ু : ● সালেম জেলায় চক পাহাড়ে প্রায় 11.26 বর্গকিলোমিটার জুড়ে অতিক্ষারকীয় শিলা আছে — এরই মধ্যে কয়েকটি জায়গায় ম্যাগনেসাইটের ভাণ্ডার আছে। ম্যাগনেসাইট ডুনাইট শিলার মধ্যে শিরারূপে আছে যেগুলি প্রস্থে 0.8 থেকে 4.3 মিটার পর্যন্ত। এখানকার ভাণ্ডার খুবই উন্নত মানের। এর মধ্যে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড গড়ে 47.5 শতাংশ; সিলিকা 1.8 এবং লৌহ ও এ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড 0.08 শতাংশ।

কর্ণাটক : ● হাসান এবং মহীশূর জেলায় কয়েকটি ভাণ্ডার আছে তবে খনিজের পরিমাণ বেশি নয়। অবশ্য মহীশূরের দোদকন্যার ম্যাগনেসাইটের প্রকৃতি সালেমের মতো।

উত্তরপ্রদেশ : ● কুমায়ুন পাহাড়ে আলমোড়া জেলার ম্যাগনেসাইট ভাণ্ডার প্রধানত কেলাসিত এবং এর মধ্যে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইডের পরিমাণ 38.3 থেকে 45.1 শতাংশ। সিলিকার পরিমাণ নগণ্য। মজুত ভাণ্ডারের পরিমাণ আনুমানিক 6.3 কোটি টন।

প্রয়োজনীয় তথ্য : ● ভারতবর্ষে ম্যাগনেসাইটের ভাণ্ডার প্রচুর কিন্তু তবুও ডেড বার্ন্ট ম্যাগনেসিয়া Dead burnt Magnesia যাতে সিলিকার পরিমাণ 6 শতাংশের কম — আমদানি করতে হয়। সালেম এবং আলমোড়া ম্যাগনেসাইটে ঘনীভবন বা পরিস্রুত করা প্রয়োজন — কারণ এই দুই জায়গায়ই সিলিকার অংশ বেশি।

● ভারতবর্ষের মোট উৎপাদনের 78 শতাংশ আসে সালেমের ভাণ্ডার থেকে; 15 শতাংশ অসে আলমোড়া-পিথোরাগড় থেকে এবং কর্ণাটক, জম্মু-কাশ্মীর রাজস্থান থেকে বাকি চাহিদা মেটানো হয়।

● প্রযুক্তিবিদদের মতে সমুদ্রের জল থেকে ম্যাগনেসাইট নিষ্কাশন করলে — সেটা আমাদের সিলিকা-কম ম্যাগনেসাইটের চাহিদা মেটাতে পারবে।

10.6.3 অভ্র

ভারতীয়রা অতি প্রাচীন কাল থেকে অভ্র সম্বন্ধে অবহিত ছিল। 'অভ্র' কথাটি হিন্দু ধর্মগ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অভ্রভস্ম উল্লেখ আয়ুর্বেদে আছে।

অভ্র একটি বিশেষ প্রকারের খনিজ। রাসায়নিক দৃষ্টিতে এর সাধারণ সংযুতি জলযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম পটাসিয়াম সিলিকেট। এর সঙ্গে বিভিন্ন অনুপাতে ম্যাগনেশিয়াম, লৌহ, সোডিয়াম প্রভৃতি থাকে এবং তখন খনিজগুলির বিভিন্ন নাম দেওয়া হয় যেমন ফ্লগোপাইট, বায়োটাইট, প্যারাগোনাইট প্রভৃতি।

অভ্র বলতে সাধারণত মাসকোভাইট $[H_2K\ Al_3(SiO_4)_3$ কেই বোঝায়। এর বিশেষ ধর্ম এই যে একে সমান্তরালভাবে অনুভূমিক সম্ভেদ (basal cleavage) বরাবর পাতলা করলে সহজেই বিভক্ত করা যায়।

মাসকোভাইট অভ্রের কদর বা উৎকর্ষ নির্ভর করে, এর রঙ, অকলঙ্কিত আকৃতি এবং সূক্ষ্ম পরতে বিভক্ত হওয়ার চরিত্রের ওপর। মাসকোভাইট 0.025 পাতলা পাতে বিযুক্ত করা সম্ভব। বিভিন্ন শিল্পে এর প্রয়োজন হয় — বিশেষ চরিত্রের জন্য :

● পাতের সূক্ষ্মতা, বিদ্যুৎ, তাপ সহসক্ষমতার জন্য বৈদ্যুতিক শিল্পের ব্যবহার। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে মাসকোভাইট অভ্রই ব্যবহৃত হয়। যদিও কিছু ক্ষেত্রে কৃত্রিম অভ্র ব্যবহার করা হচ্ছে।

● ফ্লগোপাইট অভ্রের তাপ সহনশীলতা বেশি হওয়ায় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই অভ্র ব্যবহৃত হয়।

উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা এবং গবেষণাগারে অভ্রের কৃত্রিম প্রতিকল্প দ্রব্য উৎপন্ন হওয়ায় অভ্রের চাহিদা সাম্প্রতিককালে কমে গেছে।

● আমাদের দেশে অভ্র আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ব্যবস্থাতে, চিত্রাঙ্কনে এবং অলঙ্করণে ব্যবহৃত হয়।

ভারতবর্ষের আকর ভাণ্ডার : প্রধান ভাণ্ডারগুলি কয়েকটি জায়গায় সীমাবদ্ধ :

(ক) বিহারে গয়া-হাজারীবাগ অঞ্চল;

(খ) রাজস্থানে আজমীর-ভিলওয়ারা-টঙ্ক অঞ্চল এবং

(গ) অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর অঞ্চল।

বিহার : ● মোট উৎপাদনের প্রায় 65 শতাংশই এই রাজ্য থেকে উৎপন্ন হয়। এই অভ্র অঞ্চল 160 কিলোমিটার দীর্ঘ এবং প্রস্থে প্রায় 16 কিলোমিটার। গয়া - হাজারীবাগ - মুঙ্গের - ভাগলপুর অঞ্চলে এটা বিস্তৃত। আকর থাকে পেগমাটাইট শিরার মধ্যে যেগুলির আকৃতি ও মাপ নানা ধরনের। 500 মিটার দীর্ঘ, 30 মিটার চওড়া এবং 210

মিটার গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত পেগমাটাইটের সন্ধান পাওয়া গেছে। পেগমাটাইট নানাধরনের খনিজের ধারক শিলা বলে একে "খনিজের যাদুঘর" আখ্যা দেওয়া হয়।

রাজস্থান : ● অভ্র অঞ্চল জয়পুর — ভিলওয়ারা — টঙ্ক — পালি জেলার মধ্য দিয়ে উদয়পুর জেলা পর্যন্ত প্রায় 320 কিলোমিটার বিস্তীর্ণ। গড় প্রস্থ প্রায় 96 কিলোমিটার। এখানে কিছু খনি থেকে বিশাল আয়তনের বেরিল (Beryl) পাওয়া গেছে যার ওজন 20 টন।

অন্ধ্রপ্রদেশ : ● এই অভ্র অঞ্চল অনেকটা কাস্তে আকৃতির এবং আনুমানিক 1500 বর্গকিলোমিটার বিস্তীর্ণ। এই অঞ্চলের পেগমাটাইটের নির্ধারিত বয়স 157 কোটি বছর। এখানে পেগমাটাইট দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে নানারকমের হয়ে থাকে।

মোট উৎপাদন : অভ্রের উৎপাদনের সম্বন্ধে তথ্য নিচে দেওয়া হল :

1991	1992	1993	1994	1995
3607	2742	2082	2055	1721

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অভ্রের উৎপাদন গত পাঁচবছরে ক্রমেই কমছে এবং ১৯৯৫ সালে এটা ছিল ১৯৯১ সালের অর্ধেকেরও কম। অথচ ১৯৯১ সাল পর্যন্ত অভ্র উৎপাদনে ভারতের স্থান ছিল পৃথিবীতে উৎপাদনকারী দেশগুলির তালিকায় প্রথম। ঐ সময় গোটা পৃথিবীতে অভ্রের উৎপাদন ছিল 214000 টন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করা যায় — যে আধুনিককালে অভ্রের কৃত্রিম প্রতিকল্প দ্রব্য অনেক বেশি উৎপন্ন হচ্ছে যাতে অভ্রের চাহিদা ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত আমাদের দেশের আকর ভাণ্ডারে অভ্র খনিজ খুবই বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে এবং মাটির নিচে বেশি গভীর পর্যন্ত খনকার্য চালিয়ে তার উত্তোলন ক্রমশই দুষ্কর হয়ে পড়ে। এজন্য উৎপাদনের পরিমাণও ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

তৃতীয়ত ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা করে কোনও নতুন আকর-ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যায়নি গত কয়েকবছরে।

অনুশীলনী 4

১। স্বর্ণের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

২। সোনার আকর ভাণ্ডারের সংক্ষিপ্ত বিবিরণ দিন।

৩। স্বর্ণ উত্তোলনকারী দেশগুলির প্রথম দশটির নাম লিখুন এবং উৎপাদনের পরিমাণের সূচনা দিন।

৪। ১৯৯৮ সালে পৃথিবীতে স্বর্ণ উৎপাদন এবং চাহিদা সম্বন্ধে আপনি কি কি জানতে পেরেছেন?

৫। রৌপের আকর কি এবং কিসে ব্যবহৃত হয়।

৬। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সোনা ও রূপার উৎপাদনের পরিবর্তন সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

৭। প্রথম দশটি রৌপ্য উৎপাদনকারী দেশ কি কি এবং এদের উৎপাদনই বা কত?

৮। প্ল্যাটিনাম কোন্ কোন্ কাজে ব্যবহৃত হয়?

৯। অধাতব খনিজ কাকে বলে এবং কয়েকটির উদাহরণ দিন।

১০। চুনাপাথর কি কি শিল্পে ব্যবহৃত হয়? এবং এদের কি কি বৈশিষ্ট্য?

১১। মধ্যপ্রদেশ এবং বিহারের চুনাপাথরের ভাণ্ডারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

১২। উত্তরপূর্ব ভারতের চুনাপাথর ভাণ্ডার সম্বন্ধে আপনি কি জানেন তা লিখুন।

১৩। ভারতের চুনাপাথরের মোট আকর ভাণ্ডারের বিবরণ দিন।

১৪। সিমেন্ট শিল্প সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

১৫। ভারতের ম্যাগনেসাইট ভাণ্ডারের বিবরণ দিন।

১৬। অভ্র কি কাজে ব্যবহৃত হয় এবং আমাদের দেশে কোন্ অঞ্চলে পাওয়া যায়?

১৭। খনিজ সার কি এবং কোথায় পাওয়া যায়?

১৮। ফসফেটের মোট আকর ভাণ্ডারের বিবরণ দিন।

১৯। জিপসাম কি কাজে লাগে এবং আমাদের দেশে কত উৎপাদন হয়?

২০। অন্ধ্রপ্রদেশের হীরকভাণ্ডারের বিবরণ দিন।

10.7 খনিজ সার

আমাদের দেশ মূলত কৃষিপ্রধান দেশ — কাজেই এখানে খনিজ সারের মূল্য অপরিসীম। খনিজ সারের মধ্যে অনেকরকম ফসফেট শিলাকেই অন্তর্ভুক্ত করা হলেও প্রধান খনিজ হল ক্যালসিয়াম ফসফেট। বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ব্যবহারযোগ্য এই জাতীয় শিলা "রক ফসফেট' নামে পরিচিত। এর মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণে ক্লোরিন, ফ্লোরিন প্রভৃতি থাকে। রক ফসফেটের মূল উপাদান এ্যাপেটাইট যার রাসায়নিক সংযুতি সবসময় একরকম হয়না। সাধারণভাবে এপেটাইট হল $Ca_5 (PO_4)_3 (F, Cl, OH)$ কিন্তু অনেকক্ষেত্রে PO_4 এর জায়গায় VO_4, ASO_4, SO_4 বা CO_3-র উপস্থিতিও দেখা গেছে।

ফসফেট আকরের প্রধান ব্যবহার সুপার ফসফেট নামে সার তৈরির কাজে। এছাড়া এর থেকে ফসফরাস ধাতু ও ফসফরিক এ্যাসিড তৈরি হয়। ফটোগ্রাফি, কাঁচ নির্মাণ, আতসবাজি, দেশলাই, তৈলশোধন ও চিনির কারখানায় ফসফরাস ও ফসফরিক এ্যাসিডের বিশেষ ব্যবহার আছে।

খনিজ সারের মধ্যে অন্যতম হল জিপসাম। এর রাসায়নিক সংযুতি হল জলযুক্ত ক্যালসিয়াম সালফেট। সুপরিচিত সার অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈরি করতে জিপসামের প্রয়োজন আপনাদের জানা আছে। এছাড়াও জিপসাম কাজে লাগে প্লাস্টার অফ প্যারিস, সিমেন্ট, কাগজ ও বয়ন শিল্পে।

এবার আমরা উপরিউক্ত দুই খনিজ সারের আকর ভাণ্ডার নিয়ে আলোচনা করব।

10.7.1 ফসফেট খনিজ

ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এই খনিজের সন্ধান পাওয়া গেছে — এবার রাজ্যভিত্তিক বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে।

রাজস্থান ● উদয়পুর জেলার ঝামারকোটরা অঞ্চলে ভারতের বৃহত্তম ফসফেট ভাণ্ডার অবস্থিত। এই আকরে সিলিকার ভাগ 0.36 থেকে 53.4 শতাংশ।

ফসফরাস পেন্টাঅক্সাইড গড়ে 30 শতাংশ — যদিও এর প্রসার 9.38 থেকে 37.2 শতাংশ। এখানে আনুমানিক 1 কোটি টন ফসফেটের ভাণ্ডার প্রমাণিত হয়েছে।

● উদয়পুরের কানপুর অঞ্চলে ফসফেট স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানকার শিলাস্তর জটিল ভাঁজের আকারে বিন্যস্ত। এখানকার আকর মধ্যমানের — ফসফরাস পেন্টাঅক্সাইডের পরিমাণ 10 থেকে 15 শতাংশ।

মধ্যপ্রদেশ : ● ঝাবুয়া জেলায় দুটি স্তরে ফসফেটের সন্ধান পাওয়া গেছে। আকরবাহী স্তরগুলি 100 মিটার থেকে 2000 মিটার পর্যন্ত দীর্ঘ এবং 25 থেকে 100 মিটার পুরু। দুটি স্তরে মোটামুটি ফসফরাস পেন্টাঅক্সাইডের পরিমাণ 10 থেকে 28 শতাংশ। মধ্যপ্রদেশ খনিজ নিগম কাটাম্বা, কেলকুয়া থেকে আকর সংগ্রহ করছে।

উত্তরপ্রদেশ : ● মুসৌরী অঞ্চলে 120 কিলোমিটার জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় ফসফেট আকরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে মালদেওটা, পারিটিকা ও দুরমালার ভাণ্ডারগুলো তাৎপর্যপূর্ণ। স্তরগুলির বেধ 1 মিটার থেকে 150 মিটার। গড়ে 20 শতাংশ ফসফরাস পেন্টাঅক্সাইড আছে।

● তেহড়ি গাড়োয়ালে ও ললিতপুরেও আকর ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে।

বিহার : ● সিংভূম অঞ্চলে নান্দরূপ অঞ্চলে এ্যাপেটাইট-ম্যাগনেটাইট শিলা দেখা যায়। এদের মধ্যে ফসফরাসে পেন্টাঅক্সাইডের পরিমাণ গড়ে 15 শতাংশ।

পশ্চিমবঙ্গ : ● পুরুলিয়ার বেলডি অঞ্চলে, সিংভূমের অনুরূপ এ্যাপেটাইট - ম্যাগনেটাইট আকরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানকার সঞ্চয়ের পরিমাণ 0.15 কোটি টন যার মধ্যে 10 থেকে 25 শতাংশ ফসফরাস পেন্টাঅক্সাইড প্রমাণিত হয়েছে। এই আকর ভাণ্ডারের কিছু অংশ গুঁড়ো অবস্থায় সোজাসুজি মাটিতে মিশ্রিত করা যায় — আর কিছু অংশ সার নির্মাণে ব্যবহার করা হয়।

অন্ধ্রপ্রদেশ : ● বিশাখাপত্তনম জেলার সীতারামপুর অঞ্চলে পেগমাটাইট শিলার মধ্যে এ্যাপেটাইট-ম্যাগনেটাইটের সন্ধান পাওয়া যায়। এই আকরে ফসফরাস পেন্টাঅক্সাইডের পরিমাণ গড়ে 42 শতাংশ।

মোট আকর ভাণ্ডার ● ফসফেটের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ এর সমীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। গত কয়েক দশকের মোট ভাণ্ডারের পরিমাণ নিচে দেওয়া হল। এই সম্পদ ভাণ্ডার অবশ্য আনুমানিক

	1995	1980	1985	1990	1994
রক ফসফেট	61	139	177	195.91	199.01
		সব পরিমাণই মিলিয়ন টনে দেওয়া হল			

● আমাদের আকর ভাণ্ডারে (P_2O_5) ফসফরাস পেন্টাঅক্সাইডের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। উন্নত মানের অর্থাৎ 31 শতাংশের বেশি P_2O_5 খুব কম পরিমাণ এবং খুব কম জায়গায় আছে।

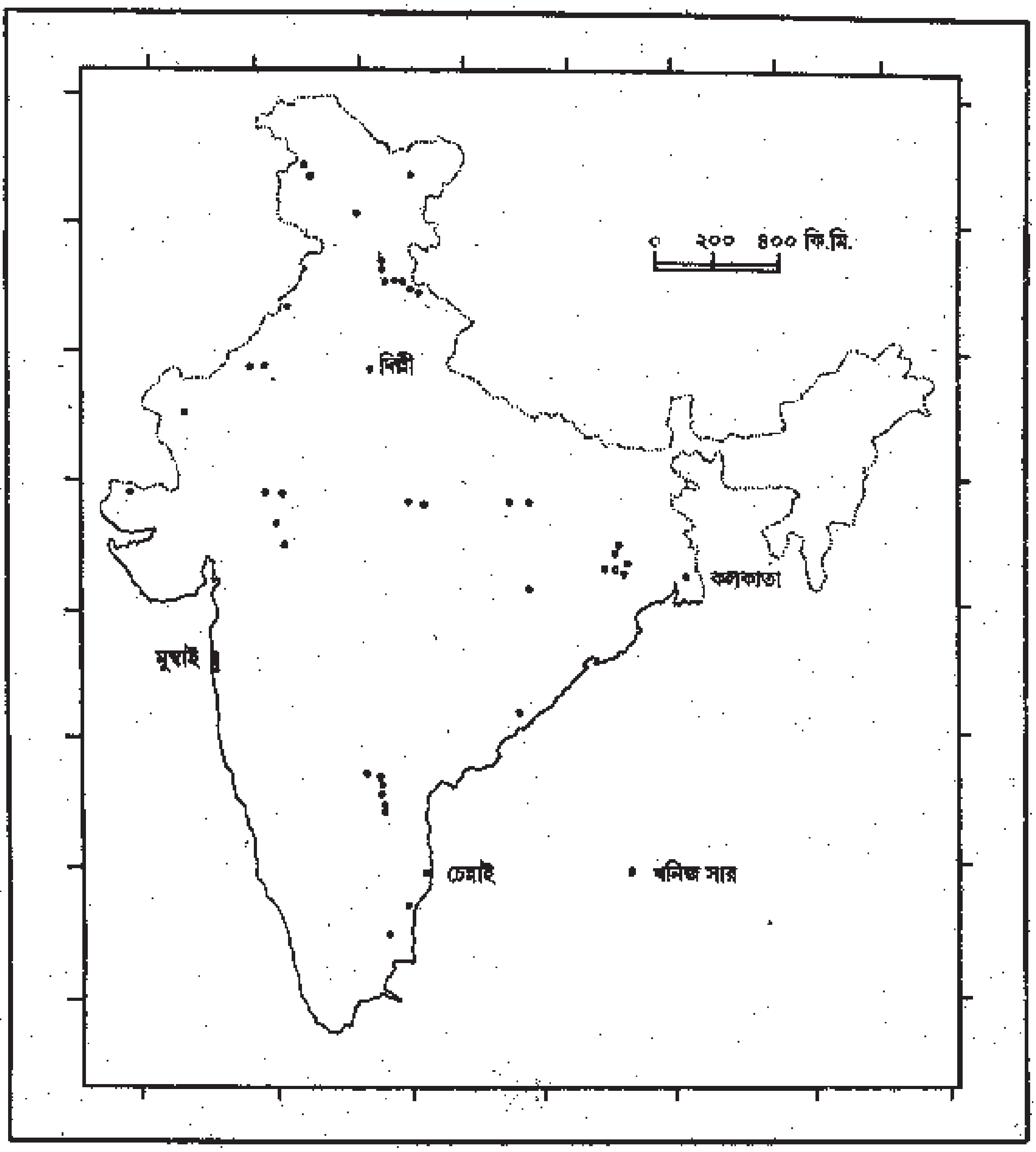

খনিজ সার

● অবশ্য শুদ্ধীকরণ প্রক্রিয়ায় — নিম্নমানের আকরকে উন্নতমান করা সম্ভব।

● আমাদের দেশে আকর ভাণ্ডার ছোট আয়তনের এবং বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো। কাজেই বড় আয়তনের খনি কিংবা বড় আকারের সার তৈরির কারখানা গড়ে উঠছে না। আমরা বক্সাইট পড়বার সময় দেখেছি যে বড়মাপের খনি যন্ত্র ব্যবহার করা যায় বলে প্রতি টন আকর উত্তোলনে গড়ে কম খরচ পড়ে। কারখানাও বড়মাপের হলে — প্রতি টন সার তৈরি করতে কম খরচ পড়ে।

● সরকারি হিসাবে 2000 সালে ফসফরাস পেন্টাঅক্সাইডের মোট চাহিদা দাঁড়াবে প্রায় 47 লক্ষ 50 হাজার টন। বা 4.75 মিলিয়ন টন।

এই তুলনায় আমাদের উৎপাদন নিচে দেওয়া হল :

	1991	1992	1993	1994	1995
এ্যাপেটাইট	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
ফসফোরাইট	0.55	0.47	0.96	1.22	1.29
				সব পরিমাণ মিলিয়ন টনে	

অর্থাৎ 1991 থেকে 1995 এ্যাপেটাইট উৎপাদন প্রায় এক ছিল এবং ফসফোরাইটের উৎপাদন সামান্য বেড়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে 4.75 মিলিয়ন টন চাহিদা মেটাতে গেলে আমদানি করা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

● আমাদের সার তৈরির কারখানা যারা আমদানি করা আকরের উপর নির্ভর করে সেগুলোর বেশির ভাগই বন্দরের কাছাকাছি। অনেকের মতে — সার তৈরির কারখানা যদি আকর ভাণ্ডারের কাছাকাছি অর্থাৎ 300 থেকে400 কিলোমিটারের মধ্যে করা হয় তাহলে P_2O_5 বা ফসফরাস পেন্টাঅক্সাইড বস্তু রক ফসফেট থেকে তৈরি করতে কম খরচ পড়বে — এবং আমদানি করা রক ফসফেট থেকে ফসফরাস পেন্টাঅক্সাইড করতে যা খরচ হয় তার সঙ্গে সস্তা অথবা সমান খরচ হবে।

10.7.2 জিপসাম

বিশেষজ্ঞদের মতে প্রাচীন যুগে মিশরীয়রা জিপসাম কাজে লাগিয়েছিল পিরামিড তৈরি করার জন্য। গ্রীক ও রোমানরাও এর ব্যবহার জানত। এর রাসায়নিক সংযুক্তি হল জলযুক্ত ক্যালসিয়াম সালফেট ($CaSO_4 . 2H_2O$) যাতে ক্যালসিয়াম অক্সাইডের পরিমাণ 32.5 শতাংশ। প্রকৃতিতে সাধারণত তিন শ্রেণীর জিপসাম লক্ষ্য করা যায় :

(ক) স্বচ্ছ কেলাসিত সেলেনাইট (Selenite) : উন্নত মানের সেলেনাইট মাইক্রোস্কোপ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কাজে লাগে।

(খ) অস্বচ্ছ পিণ্ডাকৃতি আলাবেষ্টার (Alabaster) : এটি প্রধানত বাড়ির প্লাস্টার করার কাজে ব্যবহার হয়।

(গ) সিল্কের সূতাকৃতি সাটিনস্পার (Satinspar) : এটিও বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

জিপসামের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হয় সারশিল্পে - অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈরি করার জন্য। আমাদের দেশে খনিজ গন্ধক নেই — সেইজন্য কৃত্রিম উপায়ে তৈরি এ্যামোনিয়ার সঙ্গে জিপসামের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়

এ্যামোনিয়াম সালফেট তৈরি হয়। প্রতি টন সিমেন্ট উৎপাদনে 0.05 টন জিপসামের প্রয়োজন। জিপসামকে 130°K পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হলে জলকণিকার 15 শতাংশ বিলুপ্ত হয় এবং এই ধরনের পোড়ানো জিপসামের সঙ্গে জিপসাম গুঁড়ো করে জল মিশিয়ে প্লাস্টার অফ প্যারিস তৈরি করা হয়।

ভারতবর্ষের আকর ভাণ্ডার

আমাদের দেশে জিপসামের উল্লেখযোগ্য ভাণ্ডার আছে রাজস্থান, জম্মু-কাশ্মীর, তামিলনাড়ু এবং গুজরাটে। নিচে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

রাজস্থান : ● এখানে বিভিন্ন আকার ও আয়তনের 250-র বেশি ভাণ্ডার আছে। যার মধ্যে বিকানীরের ভাণ্ডার গুরুত্বপূর্ণ। এখানকার সঞ্চয়গুলি ধীরেরা, জামসার, আনন্দগড়, বাল্লার প্রভৃতি অঞ্চলে দেখা যায়। স্তরগুলি 0.5 থেকে 2 মিটার পর্যন্ত পুরু হয়ে থাকে এবং বালি ও কাদা পাথরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে। এখানকার জিপসামের কিছু অংশ বিহারের বিখ্যাত সিন্ধ্রী সার কারখানায়; নানা সিমেন্ট কারখানায় এবং পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের জমি সংস্কারের কাজে লাগে।

● গঙ্গানগর জেলায় রঘুনাথপুর, ধান্দ্রা, বারাওলা প্রভৃতি জায়গায় যথেষ্ট জিপসাম ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে।

● নাগর জেলায় বাদওয়াসি, মাংলোট, বালোয়া ও ভার্নি অঞ্চলে জিপসামের খনি থেকে নিয়মিত আহরণ করা হয়ে থাকে।

জম্মু-কাশ্মীর : বারামূলা জেলায় উন্নতমানের জিপসাম প্রাক-কেমব্রীয় (Pre-Cambrian) শিলাস্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই স্তরগুলির মধ্যে জিপসামের পরিমাণ 92.9 শতাংশ।

দোদা জেলার রামবান অঞ্চলে প্রাক-কেমব্রীয় শিলাস্তরে জিপসাম পাওয়া যায়। জিপসামের পরিমাণ 90 শতাংশ। জিপসামের সঙ্গে এ্যানহাইড্রাইট মিশ্রিত আছে।

ওপরের দুটি জায়গার জিপসামই স্বচ্ছ এবং উন্নতমানের।

তামিলনাড়ু : ● এরাজ্যে কোয়েম্বাটুর ত্রিরুচিরাপল্লী রমানাথপুরম প্রভৃতি জায়গায় জিপসামের আকর ভাণ্ডার থেকে আহরণ করা হচ্ছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাজস্থানের পর তামিলনাড়ুর স্থান।

গুজরাট : ● এরাজ্যে কচ্ছ, পোরবন্দর, ব্রোচ, সবরকণ্ঠা প্রভৃতি জেলায় বিভিন্ন আয়তনের আকর ভাণ্ডার পাওয়া গেছে। এখানে কিছু জায়গায় সেলেনাইট কেলাস পাওয়া যায়।

উত্তরপ্রদেশ : ● এখানে মধ্যম মানের জিপসাম ভাণ্ডার নৈনিতাল, গাড়োয়াল এবং কুমায়ুন জেলায় পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের জিপসামের মোট ভাণ্ডারের পরিমাণ হাজার টনের হিসাবে নিম্নরূপ :

প্রমাণিত	সম্ভাব্য	অনুমিত	মোট
19700	40300	180000	240000

1991 থেকে 1995 পর্যন্ত এই আকরের উৎপাদনের পরিমাণ মিলিয়ন বা দশ লক্ষ টনের হিসাবে ছিল নিম্নরূপ :

1991	1992	1993	1994	1995
1.56	1.30	1.80	1.73	1.74

জিপসামের চাহিদার তুলনায় আমাদের উৎপাদন সামান্য বেশি কাজেই আমরা স্বনির্ভর দেশ।

10.8 রত্ন - উপরত্ন (Precious and Semi-precious Stones)

অতি প্রাচীনকাল থেকেই রত্ন-উপরত্ন বা মণি-মুক্তার ব্যবহার হয়ে আসছে। রোমান গ্রন্থকার প্লিনির বিবরণে দেখা যায় যে প্রাচীনযুগে সবচেয়ে বেশি রত্ন-খনিজ ভারতবর্ষেই আহরণ করা হত। উৎপত্তির কারণ হিসাবে এই খনিজগুলিকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয় যেমন (ক) সামুদ্রিক জৈব উপাদানের দ্বারা উৎপন্ন যথা মুক্ত (Pearl), পলা (Coral) এবং (খ) প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় (জৈব উপাদান ছাড়া) সৃষ্ট — যেমন হীরক(Diamond) চুনি, পান্না প্রভৃতি।

বর্তমানে রসায়নাগারে সংযোজন (Synthetic) প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন রকমের রত্ন খনিজ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। যদিও এগুলি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ও রাসায়নিক দিয়ে একই রকমের — অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এদের বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করা সম্ভব।

রত্ন-উপরত্নের বৈশিষ্ট্য হল : দুষ্প্রাপ্যতা, স্থায়িত্ব, কাঠিন্য এবং সর্বোপরি সৌন্দর্য। প্রাকৃতিক রত্ন খনিজকে কেটে এবং মসৃণ করে এদের ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তি বাড়ানো হয়। এদের ওজনের একক হল মেট্রিক ক্যারেট যেটা হল 200 মিলিগ্রামের সমান। কয়েকটি রত্ন-উপরত্নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

10.8.1 হীরক

ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে হীরক(Diamond) আবিষ্কৃত হয় প্রায় 3000 বছর আগে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে হীরকের উল্লেখ আছে। এর রাসায়নিক সংযুতি (c)। রাসায়নিক দিক থেকে হীরক, গ্রাফাইট (কালো সীসা বা পেন্সিলের উপাদান) এবং কাঠ কয়লা সমতুল্য। হীরক খনিজের মধ্যে সবচাইতে শক্ত — অথচ গ্রাফাইট অনেক নরম। এর প্রধান পরমাণু বিন্যাসের প্রভেদ।

হীরকের মূল ব্যবহার অলঙ্করণে। অবশ্য, হীরকের ব্যবহার হয় বিভিন্ন শিল্পে — এর কাঠিন্যের জন্য। শিলাস্তর ছেদনের ড্রিলিং যন্ত্রে বীট তৈরিতে হীরক অপরিহার্য। পাথর ও কাঁচকাটার জন্য এই খনিজ ব্যবহৃত হয়। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপায়ে হীরক তৈরি হয় — এখন নানা দেশে এই উপায়ে হীরক উৎপন্ন করা হয়।

হীরক ভাণ্ডারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল :

- অন্ধ্রপ্রদেশে তিনরকমের ভূতাত্ত্বিক পরিবেশে হীরক ভাণ্ডার আছে। (ক) কিম্বারলাইট নামে এক বিশেষ আগ্নেয়শিলার মধ্যে প্রাথমিক সঞ্চয়রূপে (খ) কংগ্লোমারেট পাথরে দ্বিতীয় প্রজন্মের সঞ্চয়রূপে এবং (গ) কর্করীয় সঞ্চয় রূপে। গুন্টুর জেলায়, কৃষ্ণা নদীর তীরে কোলুরু অঞ্চলে খুব প্রাচীনকালে হীরার খনি ছিল। গ্রেট মোগল

(787 ক্যারেট), কোহিনুর (186 ক্যারেট) প্রভৃতি বিখ্যাত হীরক এখানে পাওয়া গিয়েছিল। কৃষ্ণা নদীর তীরে অন্যান্য পুরোনো খনিবলয়কে বলা হত "গোলকোণ্ডা হীরক বলয়"।

ওয়াজরাকারুর অঞ্চলে কিম্বারলাইট এই অঞ্চলের একমাত্র হীরক ভাণ্ডার বলে জানা ছিল। সমীক্ষা করে নতুন কিছু কিম্বারলাইটের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং অনুসন্ধান চলছে।

- মধ্যপ্রদেশের পান্না অঞ্চল আধুনিক যুগে হীরক উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। এখানে তিনরকম পরিবেশেই হীরকভাণ্ডার আছে। পান্না অঞ্চলের হীরকের মূল উৎস ধরা হয় মাঝগাঁও অতিক্ষারকীয় পাইপ শিলা যা পান্না থেকে আনুমানিক 19 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।
- বিহারের কোয়েল ও শঙ্খ নদীর উপত্যকা থেকেও অতীতে হীরক সংগ্রহ করা হত।

সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুসারে আমাদের দেশের মোট ভাণ্ডারের অনুমিত পরিমাণ প্রায় দশলক্ষ ক্যারেট।

10.8.2 কোরান্ডাম

এর রাসায়নিক সংযুতি এ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড Al_2O_3 এবং এতে এ্যালুমিনিয়াম 52.9 শতাংশ থাকে। কাঠিন্যের মাপকাঠিতে হীরকের পরই এর স্থান। রঙের বিচারে এই খনিজ তিন রকমের হয় :

রক্তিম বর্ণের কোরান্ডাম - চুনি, নীলাভ কোরান্ডাম-নীলা এবং হাল্কা হলুদ বা বর্ণহীন কোরান্ডাম - পোখরাজ বলে পরিচিত।

কাঠিন্যের জন্য কোরান্ডাম ঘর্ষণ শিল্পে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও ঘড়ির 'জুয়েল' হিসাবে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে এবং চূর্ণ পালিশের কাজে কোরান্ডাম অপরিহার্য। আরেক ধরনের কোরান্ডাম যেটা আসলে কোরান্ডাম এবং ম্যাগনেটাইটের মিশ্রণ একে বলা হয় এমারি (emery) যা ঘর্ষনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

রত্ন শ্রেণীর (চুনি) কোরান্ডামের স্বল্প ভাণ্ডারের খোঁজ পাওয়া গেছে — তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এবং কর্ণাটকে। কাশ্মীরের উধমপুর জেলার পাদার অঞ্চলে আনুমানিক 5000 মিটার উপরে একটি নীলার ভাণ্ডার আছে - অবশ্য এর আয়তন খুবই ছোট। এছাড়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে শিল্প শ্রেণীর কোরান্ডামের সঞ্চয় দেখা যায়। সমীক্ষা করে দেখা গেছে - আহরণ করা যেতে পারে এমন ভাণ্ডারের মোট পরিমাণ প্রায় 15500 টন।

10.8.3 বেরিল

সবুজ রঙের স্বচ্ছ, কলঙ্কবিহীন এবং দ্যুতিময় বেরিল খনিজকে পান্না বলা হয়। এর রাসায়নিক সংযুতি $3BeO.Al_2O_3.6SiO_2$ অর্থাৎ বেরিলিয়াম-এ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট যাতে BeO-র পরিমাণ 14 শতাংশ এবং বেরিলিয়ামের পরিমাণ 5 শতাংশ।

বেরিল হচ্ছে একমাত্র খনিজ যা থেকে বেরিলিয়াম ধাতু নিষ্কাশন করা হয়। এই ধাতু এ্যালুমিনিয়ামের মতো সাদা এবং হাল্কা এবং অনেক তাপ সহ্য করতে পারে — এর গলনাঙ্ক 1280°K। বেরিলিয়াম-তামা এ্যালয়-প্রায় ইস্পাতের মতো শক্ত। এই এ্যালয়ের কাঠিন্য, বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা, তাপ সহ্য করার ক্ষমতার জন্য বিভিন্ন শিল্পে যেমন মোটর ইঞ্জিন উড়োজাহাজ প্রভৃতি তৈরি করতে অনেক কাজে লাগে।

রত্ন শ্রেণীর বেরিল খনিজের রঙের উপর ভিত্তি করে নানা নামকরণ হয়েছে যেমন :

(ক) স্বচ্ছ সবুজ রঙের বেরিল — পান্না (খ) রক্তিম বা গোলাপী রঙ — মর্গানাইট; (গ) নীলাভ রঙের —

এ্যাকোয়ামেরিন (ঘ) হরিদ্রাভ রঙের — হ্যালিডোর। এদের মধ্যে পান্না এবং এ্যাকোয়ামেরিনের বেশী চাহিদা এবং ব্যবহার হয়।

- বেরিল পাওয়া যায় পেগমাটাইট শিলাতে — যাতে অভ্র পাওয়া যায়।

- রত্ন শ্রেণীর বেরিল কেবল রূপান্তরিত অতি ক্ষারকীয় শিলার মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। রাজস্থানের রাজগড়, ভুবানি, টেকাই, গুমগুডা প্রভৃতি অঞ্চলে পান্নার ভাণ্ডার আছে। এইসব অঞ্চলে রূপান্তরিত অতিক্ষারকীয় আগ্নেয় শিলার মধ্যে পেগমাটাইটের কাছেই পান্না রত্ন পাওয়া যায়।

- এ ছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশে, বিহারে, কাশ্মীরে, তামিলনাড়ুতে প্রভৃতি জায়গায় পান্না ও এ্যাকোয়ামেরিনের সন্ধান পাওয়া গেছে কিন্তু এইসব ভাণ্ডারের আয়তন খুবই ছোট।

10.8.4 টোপাজ

টোপাজের রাসায়নিক সংযুতি জল ও ফ্লোরিনযুক্ত এ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট। এর কাঠিন্য কোরান্ডামের থেকে কিছু কম। এর সাধারণ নাম "পোখরাজ" অবশ্য Sapphire বা এ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডও রত্নবাজারে পোখরাজ বলে পরিচিত। হাল্কা হলুদ রঙের অলিভিন (Olivine) খনিজকেও অনেকসময় পোখরাজ বলা হয়।

অস্বচ্ছ এবং অপরিচ্ছন্ন টোপাজ - কাঠিন্যের জন্য খনিজ ঘষার কাজে লাগে।

ভারতবর্ষে বিহার রাজ্যের সিংভূম অঞ্চলে এবং মহারাষ্ট্রের ভান্ডারা অঞ্চলে পোখরাজের সন্ধান পাওয়া গেছে।

উপরিউক্ত খনিজ ছাড়াও রত্ন-উপরত্ন খনিজগুলির মধ্যে গোমেদ (Zircon); বৈদুর্যমণি (Cat's eye), গারনেট (garnet), টুরমালিন (tourmaline), এ্যামেথিস্ট (amethyst), ওপাল (opoal) ইত্যাদি অলঙ্কার শিল্পে বিশেষ ভাবে ব্যবহার হয়। এই সব খনিজ যে সব শিলায় পাওয়া যায় — সে শিলাস্তর অনেক জায়গায় থাকলেও রত্নভাণ্ডার খুব কম জায়গায়ই আছে এবং যেখানে আছে সেখানকার ভাণ্ডারের আয়তন খুবই ছোট।

10.8.5 মুক্তা

এর সৃষ্টি হয় একপ্রকার সামুদ্রিক প্রাণীর (ঝিনুক, Oyster shell) শরীর থেকে নিঃসৃত তরল উপাদানের কঠিনীভবন প্রক্রিয়ার সাহায্যে। অসমতল মুক্তা গাত্রের উপর আলোর রশ্মির প্রতিফলনের জন্যই এর দ্যুতি উজ্জ্বল। ঝিনুকের ভেতরে বালুকণা বা ঐ জাতীয় কোনও সামগ্রী প্রবেশ করলে ঝিনুকটির দেহ থেকে নিঃসৃত রস ঐ পদার্থটির উপর আবরণ সৃষ্টি করে এবং এই ভাবে মুক্তার সৃষ্টি হয়। মুক্তা তিনরকমের (Natural), সাধিত (Cultural) tourmaline বং কৃত্রিম ভাবে উৎপন্ন।

ভারতবর্ষে তামিলনাড়ুর তিনভেলী অঞ্চল থেকে মুক্তা সংগৃহীত হয়।

10.9 নির্মাণ দ্রব্য খনিজ (Building Stones বা Dimensional Stones)

নির্মাণ কাজে খনিজের ব্যবহার খুব প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ করা যেতে পারে :

● মহাবলীপুরম, মাদুরাই, রামেশ্বরমের মন্দির গ্রানাইট পাথর দিয়ে তৈরি।

● খাজুরাহোর বিখ্যাত মন্দির, সারনাথ, সাঁচীর স্তূপ; ফতেপুর সিক্রী, পুরী, কোণারকের মন্দির, বিগ্রহ প্রভৃতি এক বিশেষ ধরনের বালিপাথর দিয়ে তৈরি।

● কোণারকের এবং পুরীর বহু মূর্তি খন্ডালাইট পাথরে তৈরি। আধুনিক যুগেও এই ধরনের খনিজ বিবিধ কাজে লাগে। নদীর বাঁধ, ব্রিজ, রাস্তা, বড় বাড়ি, কারখানা সব কিছু তৈরি করতেই লোহা, সিমেন্ট, কংক্রিট, বালি প্রভৃতি অনেক কিছু লাগে। আমাদের দেশের প্রত্যন্ত গ্রাম এমন অনেক আছে যেখানে বাড়ি তৈরির মূল উপাদান হল, পাথর, চুণ এবং কাদামাটি।

নির্মাণের কাজে ব্যবহার করতে হলে খনিজের কয়েকটা গুণ থাকা দরকার : (ক) কাঠিন্য - যে পাথর শক্ত নয় - তাকে নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা যায় না (খ) এই পাথরগুলিতে এমন কিছু গুণ থাকা দরকার যাকে প্রয়োজন মতো কেটে বিশেষ আকারের করা যায়। (গ) এছাড়া, পাথরের রঙ ও পালিশ নেওয়ার ক্ষমতাও আজকাল বিবেচনা করা হয়। গ্রানাইট এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

গ্রানাইট : গত কয়েক দশকে গ্রানাইট এবং মার্বেলের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে — বিশেষ করে বিলাসবহুল বাড়ি তৈরি বেড়ে যাওয়াতে। আমাদের দেশে নির্মাণকার্যে ব্যবহার করা যায় এরকম গ্রানাইট বহু জায়গায় আছে — এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে এর চাহিদা বেড়ে যাওয়াতে ভারতীয় ভূবৈজ্ঞানিক সর্বেক্ষণ এক বিশেষ সমীক্ষা চালায় এবং বেশ কয়েকটি আকর ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যায়। এখানকার পাথরের বিভিন্ন ধরনের নামও দেওয়া হয় যে নামে এগুলি বাজারে পরিচিত। মানচিত্রে ঐসব ভাণ্ডারের অবস্থান দেখানো হল।

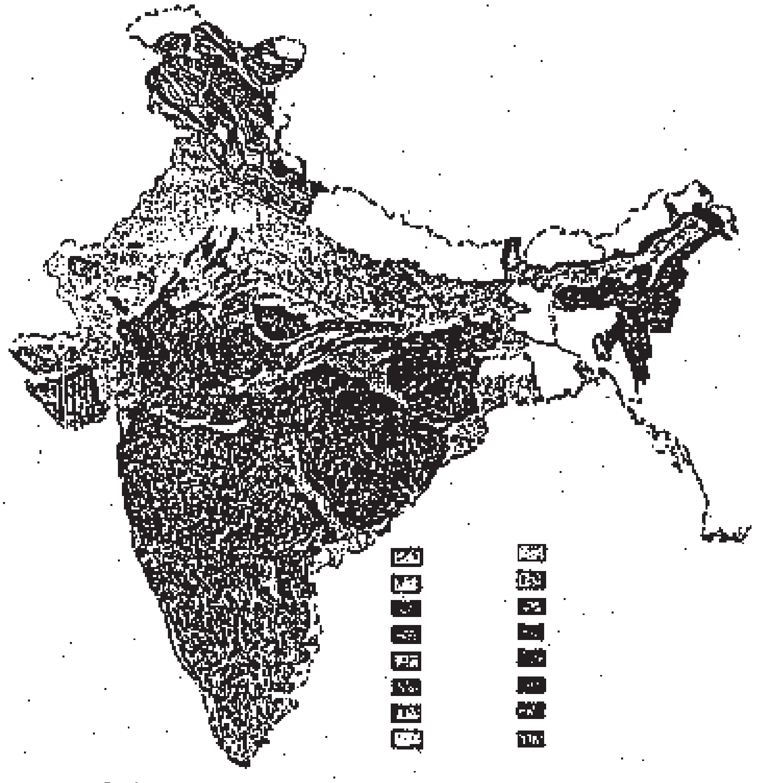

ভারতে নির্মাণশিল্পে ব্যবহারযোগ্য গ্রানাইটের উল্লেখযোগ্য জায়গাগুলির অবস্থান।

অনুশীলনী 5

১। নির্মাণদ্রব্য খনিজের কি কি গুণ থাকা দরকার?

২। নির্মাণের কাজে গ্রানাইটের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৩। আমাদের দেশে কোথায় কোথায় রপ্তানিযোগ্য গ্রানাইট পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে লিখুন।

৪। খনিজ তেল আমাদের দেশে কোথায় কোথায় পাওয়া যায়?

৫। বোম্বাই-র মহীসোপান অঞ্চলের পেট্রোলিয়াম ভাণ্ডারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৬। আমাদের দেশে পেট্রোলিয়াম এবং পেট্রোলিয়াম জাত পণ্যের আমদানি-রপ্তানির সম্বন্ধে আপনি কি জানেন সেটা লিখুন।

৭। কয়লার ব্যবহার কোন শিল্পে প্রয়োজন?

৮। রাণীগঞ্জ-ঝরিয়া কয়লাক্ষেত্র সম্বন্ধে আপনি যা জানেন সেটার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৯। গোদাবরী কয়লা ক্ষেত্র সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখুন।

১০। ভারতের লিগনাইট ভাণ্ডার কত এবং কোথায়?

১১। ভারতের পাঁচটি রাজ্যের কয়লাভাণ্ডারের পরিমাণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

১২। টার্শিয়ারী এবং গণ্ডোয়ানা কয়লা ভাণ্ডারের পরিমাণ কত?

১৩। ভারতের শক্তি উৎপাদনে কয়লা এবং অন্যান্য উৎস সম্বন্ধে আমরা কি তথ্য জানি সেটা লিখুন।

১৪। কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কি?

১৫। খোলামেলা খনি এবং ভূগর্ভস্থ খনি'র মধ্যে পরিবেশ সংক্রান্ত কি পার্থক্য আছে?

এই নির্মাণের কাজে ব্যবহারযোগ্য গ্রানাইট (Dimension stone Granite) সম্বন্ধে কিছু তথ্য দেওয়া হল :

- এই পাথর প্রথমে রপ্তানি করা হয়েছিল 1925 সালে। অন্ধ্রপ্রদেশের চিতুর জেলার কুপুম গ্রানাইটের রঙ কালো এবং ইংলেন্ডে কবরের ওপর ফলক তৈরির জন্য — কিছু পাথর রপ্তানি হয়েছিল।

- বর্তমানে গ্রানাইট উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতের স্থান পঞ্চম এবং রপ্তানিকারক দেশগুলির তালিকায় স্থান তৃতীয়।

- আমাদের দেশের গ্রানাইট সবচাইতে বেশি রপ্তানি হয় — জাপানে (40 শতাংশ); 39 শতাংশ যায় ইউরোপীয় দেশগুলিতে; 7 শতাংশ আমেরিকাতে; এবং বাকিটা পৃথিবীর বিভিন্ন রাজ্যে।

- আমাদের দেশে রপ্তানিযোগ্য গ্রানাইটের ভাণ্ডার-অনেক এবং সমীক্ষা অনুসারে ভাণ্ডারের পরিমাণ 170 কোটি কিউবিক মিটার। পৃথিবীর মোট আকর ভাণ্ডারের 20 শতাংশ আমাদের দেশে আছে এবং যে 300 রকমের পাথরের চাহিদা আছে তার অর্ধেকেরও বেশি ধরনের পাথর এখানে পাওয়া যায়।

- 1996-97 সালে আমাদের দেশে গ্রানাইটের মোট উৎপাদন হয়েছিল 13,50,000 টন (পৃথিবীর মোট উৎপাদনের 397 শতাংশে এবং রপ্তানি করে 1140 কোটি টাকা উপার্জন করেছিলাম। 1997-98 সালে রপ্তানি বাবদ 1400 কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছিল।

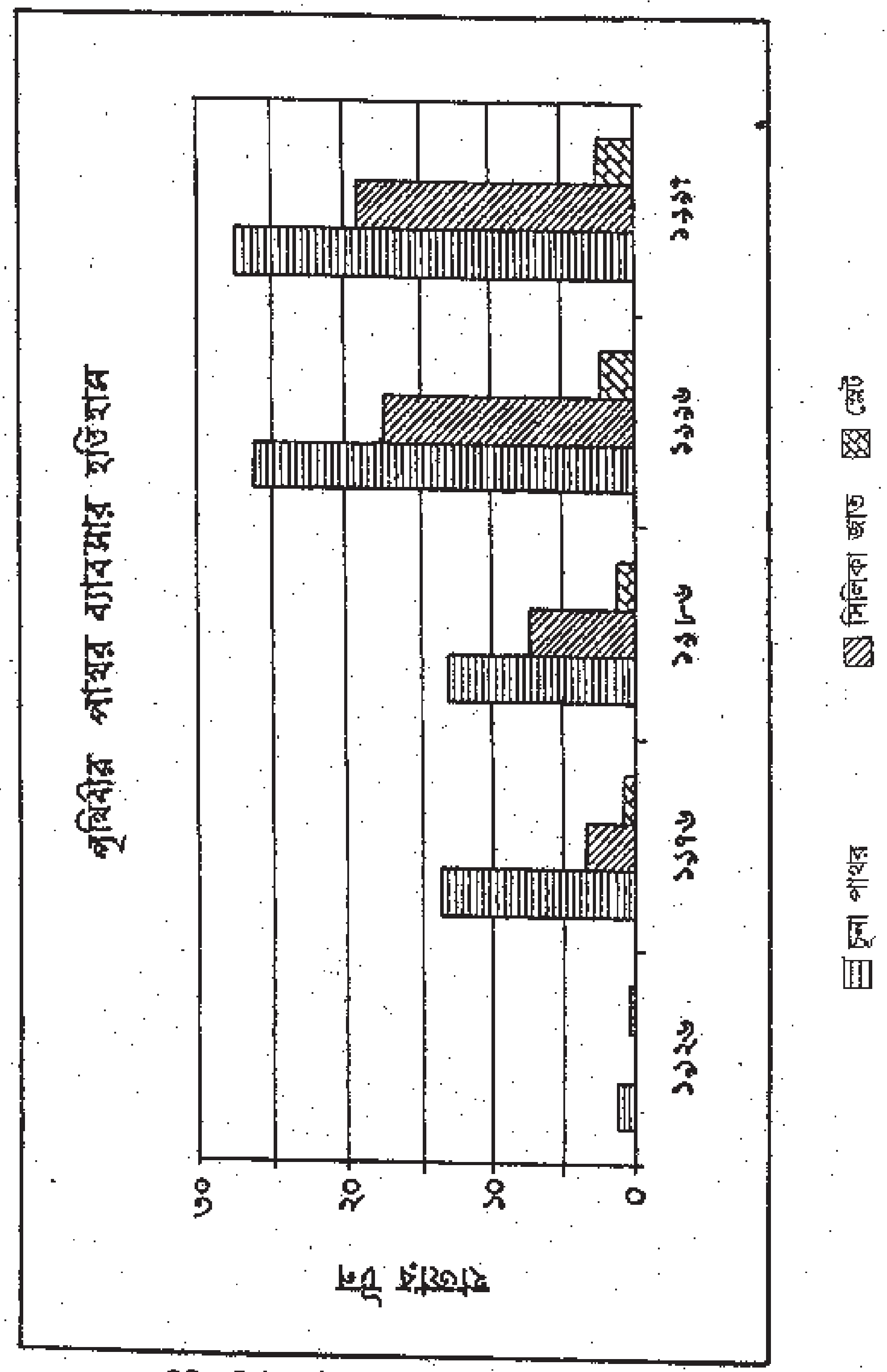

পৃথিবীতে নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত পাথরের ক্রমবর্ধমান চাহিদার চিত্র

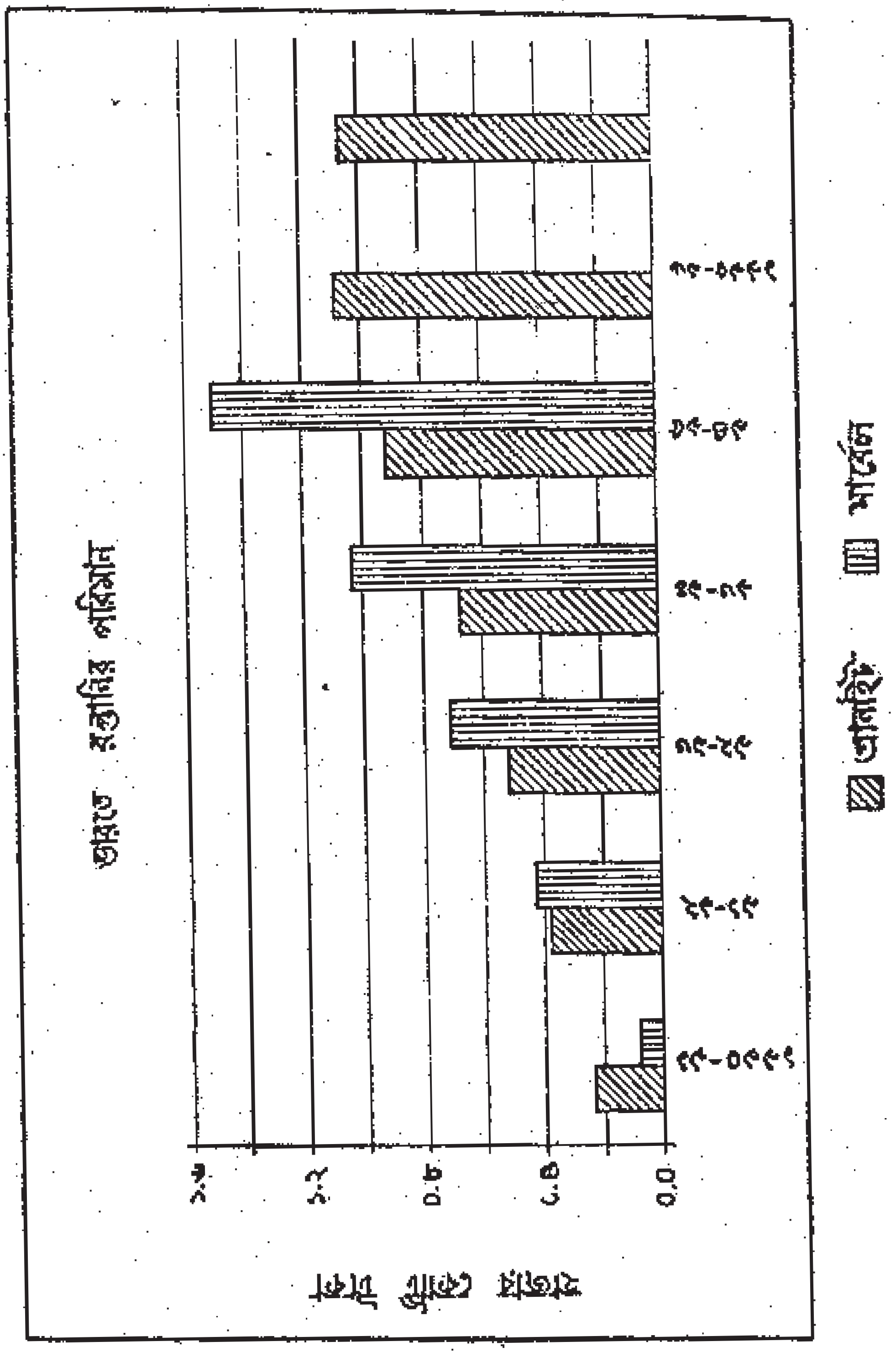

গ্রানাইট ও মার্বেলের রপ্তানির পারবর্তন

- বর্তমানে এদেশে রপ্তানির ব্যবসায়ে গ্রানাইট উত্তোলন করে, পালিশ করতে পারে এমন সংস্থার সংখ্যা 200। এছাড়া ছোট মাঝারি মাপের প্রায় 2000 সংস্থা আছে।

- মানচিত্রে যে সব জায়গাগুলির অবস্থান দেখানো আছে ওখানে প্রায় 99000 বর্গকিলোমিটার জায়গা জুড়ে বিশেষ অনুসন্ধান করেছে ভারতীয় ভূবৈজ্ঞানিক সর্বেক্ষণ এবং মাটির নীচে 10 মিটার পর্যন্ত ভাণ্ডারের পরিমাণ জানা গেছে 380 কোটি টন রঙবেরঙের গ্রানাইট এবং 47 কোটি টন কালো গ্রানাইট।

10.10 প্রাকৃতিক জ্বালানি (Natural Fuel)

জ্বালানি বা শক্তির উৎস প্রকৃতিতে সাধারণত তিন প্রকার যথা খনিজ তেল ও গ্যাস; কয়লা এবং আণবিক খনিজ। আণবিক খনিজ থেকে শক্তি উৎপাদন প্রযুক্তিবিদ্যার উপর নির্ভরশীল এবং খুব অল্পপরিমাণ থেকে বহুগুণ শক্তির উৎপাদন সম্ভব। কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম খুব কম দেশেই পাওয়া যায় — তাছাড়া এগুলো বিশেষ সময়ের বা প্রাচীনত্বের পাললিক শিলাতে থাকে। আমাদের দেশের ভাণ্ডারগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিচে দেওয়া হল।

10.10.1 খনিজ তেল

খনিজ তৈলকে সাধারণভাবে পেট্রোলিয়াম বলা হয় — এই শব্দটি ল্যাটিন। ল্যাটিন ভাষায় "পেট্রা"র অর্থ প্রস্তর এবং "অলিয়ম" অর্থে তৈল বোঝায়। কথাটির অর্থ প্রস্তরে সঞ্চিত তেল। প্রকৃতিতে পেট্রোলিয়াম যে ভাবে থাকে তাকে পরিশ্রুত করে তবেই ব্যবহার করা যায়। অপরিস্রুত তেলের রাসায়নিক সংযুক্তি হল প্রধানত হাইড্রো কার্বনের জটিল মিশ্রণ ও সেই সঙ্গে অল্প পরিমাণ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, গন্ধক ও ভ্যানাডিয়াম।

প্রকৃতিতে অপরিস্রুত তেল গ্যাস অথবা বিটুমেন/টার অ্যাসফাল্ট রূপে দেখা যায়। প্রাচীনকালেই মানুষ পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার জানত তবে শক্তির উৎস হিসাবে এর ব্যবহার মোটামুটি আধুনিক যুগে ইঞ্জিন আবিষ্কারের পরই বেড়ে গেছে।

- পরিস্রুত খনিজ তেল থেকে পেট্রোল, কেরোসিন, মোম ইত্যাদি উৎপন্ন হয়।

- পেট্রোলিয়াম জাত উপাদান থেকে নানারকম জিনিষ তৈরি করা হয় যেগুলো নিত্যপ্রয়োজনে লাগে যেমন নাইলন বস্ত্র, গৃহসজ্জার ফরমাইকা, ডেকোলাস প্রভৃতি।

ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম 1825 খৃষ্টাব্দে আসাম রাজ্যের তেলের অবস্থিতির সম্বন্ধে জানা যায়। 1865 খৃষ্টাব্দে মাকুম অঞ্চলে তৈলকূপ খনন করা হয় এবং 1867 খৃষ্টাব্দে ডিগবয়ের তৈলক্ষেত্রের আবিষ্কার হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে প্রধানত আসামে এবং বর্তমানে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত পাঞ্জাবের কিছু অংশে খনিজ তেলের অনুসন্ধান এবং আহরণ করা হত। স্বাধীনতা লাভের পর 'তৈল ও গ্যাস কমিশন' (Oil and Natural Gas Commission) ও 'অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড' দেশের বিভিন্ন অংশে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা চালিয়ে কয়েকটি তৈলভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছে — এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

- আসামের তৈলক্ষেত্রের আয়তন প্রায় 40,000 বর্গকিলোমিটার। এই বলয় আসামের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, গারো-খাসি-মিকির পার্বত্য অঞ্চল ও নাগাল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার গুরুত্বপূর্ণ তৈলক্ষেত্রগুলি হল : নাহারকাটিয়া, মোরান, রুদ্রসাগর, ডিগবয়, লাকোয়া ও গেলেকি।

- গুজরাটের কাম্বে অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে তৈলাধারের সন্ধান পাওয়া গেছে যেমন মেহেসানা, আমেদাবাদ, তারাপুর, ব্রোচ ইত্যাদি। এই অঞ্চলে তৈল ভাণ্ডারের পরিমাণ আনুমানিক 40 কোটি টন।

• বোম্বাই-এর মহীসোপান অঞ্চলের ব্যাপ্তি প্রায় 300 কিলোমিটার যদিও রত্নগিরির দিকে এর বিস্তার আনুমানিক60 কিলোমিটার। এই মহীসোপান (Shelf area) অঞ্চলেই ভবিষ্যতের তৈলক্ষেত্র আবিষ্কারের সম্ভাবনা আছে। বর্তমানে 'বোম্বে হাই' (Bombay High) কাম্বের সামুদ্রিক অঞ্চলের তথা ভারতবর্ষের খনিজ তেলের প্রধান ভাণ্ডার। এখানে আনুমানিক250 কোটি টন তেলের ভাণ্ডার আছে।

• পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় অববাহিকায় উল্লেখযোগ্য তৈল ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যায় নি। কিছু বৈজ্ঞানিকের মতে এখানে হাইড্রোকার্বনের সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু উপযুক্ত আধারের অভাবে কোন ভাণ্ডারের সৃষ্টি সম্ভব হয়নি।

• ওপরের তথ্য থেকে আমরা জানলাম যে ভারতবর্ষের স্থলাঞ্চলে মাত্র দুজায়গায় পশ্চিমে গুজরাটে ও উত্তর পূর্বে আসাম অঞ্চলেই একমাত্র তেলের ভাণ্ডার আছে। সমুদ্রতীর থেকে দূরে মহীসোপান অঞ্চলে "বোম্বে হাই" একমাত্র জানা তৈল ভাণ্ডার — যদিও কৃষ্ণা-কাবেরী অঞ্চলেও সম্ভাবনা রয়েছে।

• আমাদের দেশে চাহিদার তুলনায় — উৎপাদনের পরিমাণ অনেক কম হওয়ায় — প্রচুর অপরিশ্রুত তেল আমাদের আমদানি করতে হয় বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে। ক্রমবর্ধমান চাহিদার আনুমানিক 40 শতাংশের কিছু বেশি আমাদের দেশে উৎপন্ন হয়।

• মানচিত্রে তৈল শোধনাগার এবং পাইপ লাইনের অবস্থান দেখান হল।

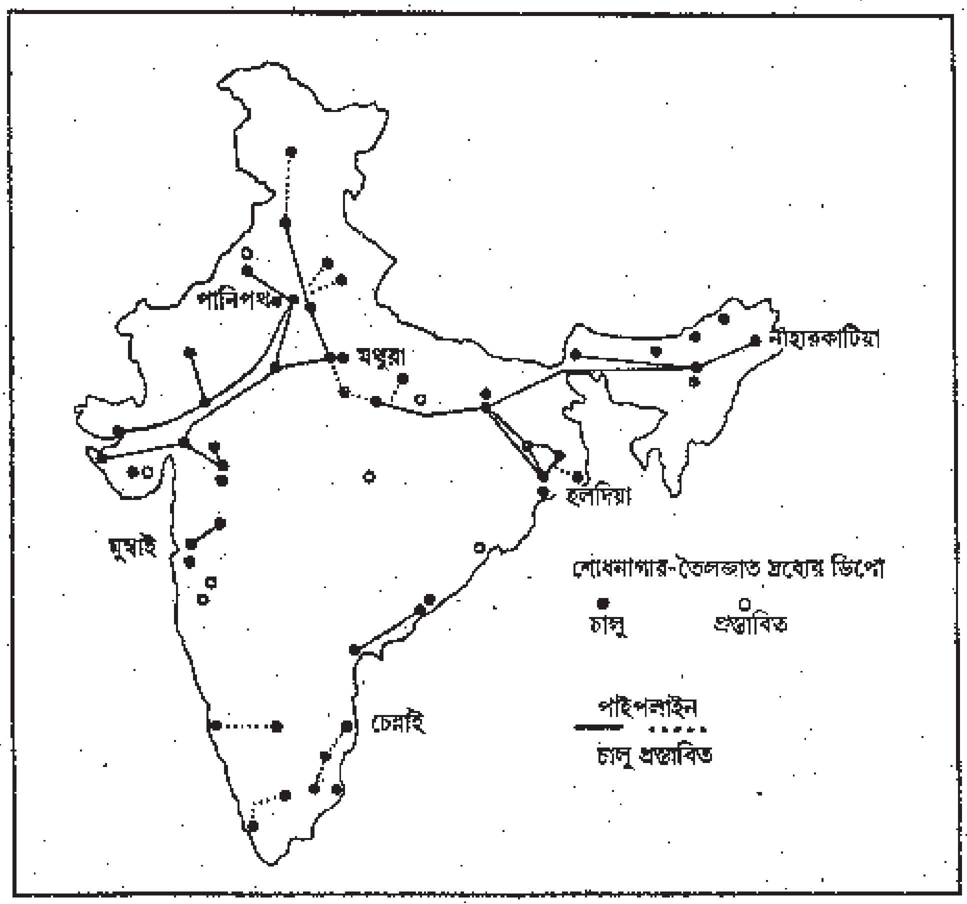

ভারতে তৈল শোধনাগারগুলির অবস্থান

- রাজস্থানের জয়সালমীর, বিকানীর-নাগৌর এবং বিকানীর অঞ্চলে সমীক্ষা চালিয়ে কিছু তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে। এখান থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস আহরণ করা হচ্ছে। তেলের ভাণ্ডারের সন্ধান চলছে।

- আমাদের দেশের তৈল ও গ্যাসের উৎপাদন, আমদানি প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু তথ্য দেওয়া হল :

উৎপাদন	পরিমাণ	মূল্য (কোটি টাকা)	পরিমাণ	মূল্য (কোটি টাকা)
	1991		1995-96	
অপরিশ্রুত পেট্রোলিয়াম	30 মিলিয়ন টন	7289	35 মিলিয়ন টন	11,047
প্রাকৃতিক গ্যাস	14441 মিলিয়ন কিউবিক মিটার	2163	17826 মিলিয়ন কিউবিক মিটার	3505

আমদানি - রপ্তানি (কোটি টাকার হিসাবে)

	রপ্তানি	আমদানি	রপ্তানি	আমদানি	রপ্তানি	আমদানি
	1990-91		1991-92		1992-93	
অপরিশ্রুত পেট্রোলিয়াম	0.0	6066	0.00	7810	0.00	10575
পেট্রোলিয়াম জাতপণ্য	1003	46602	1214	5218	1606	6359

গত পাঁচ বছরে আমাদের দেশে পেট্রোলিয়ামের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় এবং আন্তর্জাতিক বাজারের মূল্য বেড়ে যাওয়ায় আমদানি খাতে ব্যয়ের পরিমাণ কয়েক হাজার কোটি টাকা বেড়ে গিয়েছে।

এই সঙ্গে শহর ও গ্রামাঞ্চলে গাড়ির ব্যবহার ও গ্রামাঞ্চলের কেরোসিনের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় চাহিদার উর্দ্ধগতি অব্যাহত রয়েছে। গ্রামে জঙ্গলের আয়তন কমে যাচ্ছে — লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কাজেই কেরোসিন ব্যবহার বাড়ছে। এছাড়া 'শ্যালো' ইত্যাদির জন্য ডিজেলের চাহিদাও বাড়ছে। তেলের বদলে কয়লা ব্যবহারের দিকে বিশেষ অগ্রগতি হয়নি। এইসব 'কয়লা'র ওপর আমাদের নির্ভরশীলতা বাড়ছে।

10.10.2 কয়লা ও লিগনাইট

কয়লার প্রয়োজনীয়তা এবং এর গুরুত্বের জন্য একে কালো হীরা (Black Diamond) বলা হয়ে থাকে। আনুমানিক নবম শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে জ্বালানি হিসাবে কয়লার প্রচলন হয়েছিল এবং বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের আবিষ্কারের সাথে সাথে কয়লার ব্যবহার এবং গুরুত্ব অনেকগুণ বেড়ে যায়। কয়েকটি ব্যবহারের কথা নীচে জানানো হল :

- তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে (Thermal power) কয়লার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক।

- ইস্পাত নির্মাণে কোক কয়লা (Metallurgical grade) অপরিহার্য।

- অঙ্গারীকরণ প্রক্রিয়ায় কয়লা থেকে 'কোক' (Coke) ছাড়াও উৎপন্ন হয় নানা রাসায়নিক পদার্থ যেমন ফেনল, ন্যাপথালিন, আলকাতরা প্রভৃতি। এছাড়াও রবার, প্লাস্টিক, ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যও উৎপন্ন হয়।

- মানুষের নিত্য ব্যবহার্য বহু বস্তু উৎপাদনে কয়লা অপরিহার্য বহু কোটি বছর পূর্বের বনাঞ্চলের উদ্ভিদ থেকেই কয়লার সৃষ্টি। প্রথম পর্বে উদ্ভিদের প্রধান উপাদান যথা সেলুলোজ, প্রোটিন, রেসিন প্রভৃতির ব্যাপক রাসায়নিক পরিবর্তন হয় এবং এই পর্বের শেষে, এক অঙ্গারময় পদার্থ (Peat) পিটের সৃষ্টি হয়। পরবর্তী পর্বে 'পিট' ভূগর্ভের চাপ ও তাপমাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন খনিজের সৃষ্টি করে যাতে পর্যায়ক্রমে কার্বনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় : প্রথমে পিট থেকে হয় লিগনাইট (65 থেকে 75 শতাংশ কার্বন); তারপর বিটুমিনাস কয়লা (78 থেকে 92 শতাংশ কার্বন); এবং সর্বশেষে এ্যানথ্রাসাইট (92 শতাংশের বেশি কার্বন) তৈরি হয়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন কয়লা ক্ষেত্রগুলির অবস্থান ম্যাপে দেখান হল। এখানে দুটি ভাগ করা হয়েছে কয়লা এবং লিগনাইট। এছাড়া অবশ্য আরও একটা শ্রেণীবিভাগ ভূবিজ্ঞানীরা করে থাকেন বয়স অনুসারে। আমাদের দেশে বেশির ভাগ কয়লা ক্ষেত্রই গন্ডোয়ানা শিলাসংঘের -- এবং অল্পকিছু 'টারশিয়ারী' শিলাসংঘের মধ্যে পাওয়া যায়। আমরা প্রথমে গন্ডোয়ানা যুগের কয়লাক্ষেত্রের আলোচনা করব তবে সম্পদভাণ্ডার বর্ণনা করার সময় প্রদেশ হিসেবে দেখানো হবে।

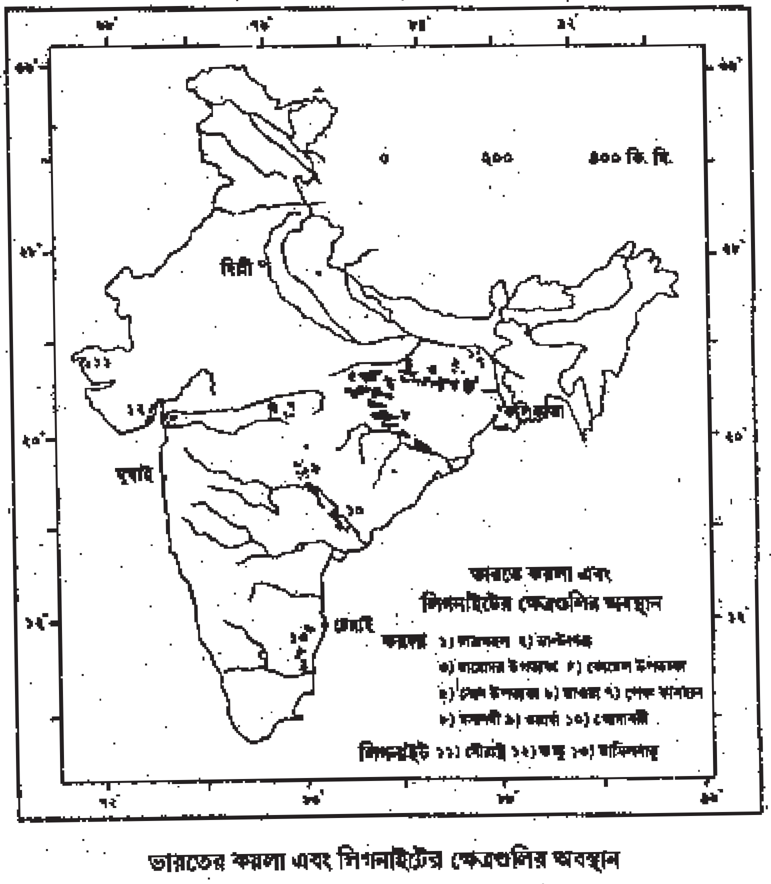

ভারতের কয়লা এবং লিগনাইটের ক্ষেত্রগুলির অবস্থান

১ ● রাণীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রে কয়লার খনি চালু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এই ক্ষেত্রের অধিকাংশ অংশই বর্ধমান জেলায় — অবশিষ্টাংশ বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায়। এখানকার কয়লাক্ষেত্রের অধিকাংশ উৎপাদন হয় ভূ-নিম্নের খাদ থেকে।

● ভারতীয় ভূবৈজ্ঞানিক সর্বেক্ষণের সাম্প্রতিক সমীক্ষাতে বীরভূম জেলার দেওয়ানগঞ্জ, পাচামি প্রভৃতি অঞ্চলে কয়লাক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই কয়লাক্ষেত্রের উত্তর ভাগে 40টি কয়লাস্তর (0.5 থেকে8.7 মিটার পুরু) পাচামি অঞ্চলে কোনও কোনও জায়গায় দুটি স্তর মিলিত হওয়ার জন্য 91 মিটার থেকে 159 মিটার পুরু একটি কয়লাস্তরের সৃষ্টি হয়েছে।

● বাঁকুড়া জেলার বারজোড়া অঞ্চলে 1 থেকে 3 মিটার পুরু নয়টি কয়লাস্তর আছে এবং কয়লা যদিও নিম্নমানের কিন্তু অনায়াসে খননযোগ্য।

২ ● ঝরিয়া কয়লা ক্ষেত্র বিহারের ধানবাদ জেলায় — এর বিস্তৃতি 450 বর্গকিলোমিটার এবং এখানকার কয়লা ভারতের কয়লাশিল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ইস্পাত কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় উত্তম শ্রেণীর কোক কয়লা একমাত্র এই অঞ্চলেই উৎপাদিত হয়ে থাকে। এখানে 18টি সুবিস্তৃত কয়লাস্তর চিহ্নিত হয়েছে এবং কোনও কোনও স্থানে বিভাজনের দরুন 46 পর্যন্ত কয়লাস্তর লক্ষ্য করা হয়।

৩ ● পূর্ব বোকারো : বোকারো কয়লাক্ষেত্র পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত হওয়ার দরুন পূর্ব এবং পশ্চিম দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এই অঞ্চলের কয়লার মধ্যে জলীয় ভাগ খুবই কম; এবং এদের মধ্যমমানের কোক কয়লার মর্যাদা দেওয়া হয়। কারগালি, কাথারা প্রভৃতি স্তরের কয়লা ধৌতাগারে শোধনের পর ঝরিয়ার উত্তম মানের কোক কয়লার সাথে মিশ্রণ করা হয় ইস্পাত শিল্পে ব্যবহারের জন্য।

৪ ● পশ্চিম বোকারো অঞ্চলে 13টি সুনির্দিষ্ট কয়লার স্তর বর্তমান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কয়লার ছাই-এর পরিমাণ শতকরা 25 ভাগের বেশি।

৫ ● রামগড় ক্ষেত্রটিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। পূর্বদিকে প্রধান কয়লাক্ষেত্র এবং পশ্চিমে মহুয়াটুংরির কয়লাক্ষেত্র। পূর্বের ক্ষেত্রে 12টি প্রধান কয়লা স্তরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানকার কয়লার ছাই-এর পরিমাণ 20 থেকে28 শতাংশ। সুতরাং ধৌতাগারে এদের শোধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহুয়াটুংরিতে 1 থেকে20 মিটার পুরু 18টি কয়লাস্তর রয়েছে।

৬ ● দক্ষিণ করণপুরা : এই অঞ্চলে বহু কয়লাস্তর এই কয়লাক্ষেত্রকে বিশিষ্টতা আরোপ করেছে। এখানে 1 থেকে54 মিটার পুরু 42টি বিভিন্ন কয়লাস্তর চিহ্নিত হয়েছে। এই কয়লাক্ষেত্রের আরগাড়া, সিরকা, কুরসে প্রভৃতি স্তরের কয়লা উচ্চমানের যাতে ছাই-এর পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম (20 থেকে24 শতাংশ)।

৭ ● উত্তর করণপুরা : এই ক্ষেত্রের অধিকাংশ কয়লা নিম্নমানের এবং কোক নির্মাণের পক্ষে অনুপযুক্ত। অবশ্য বাদাম, রোগে প্রভৃতি জায়গার কয়লা কোক নির্মাণের পক্ষে উপযুক্ত।

৮ ● কোয়েল উপত্যকার পুটার, আউরাঙ্গা এবং ডাল্টনগঞ্জ অঞ্চলে কারহারবাড়ি স্তরে কয়েকটি পাতলা কয়লাস্তর বর্তমান। এদের ছাই-এর পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে কম। আউরাঙ্গা ক্ষেত্রের 7টি কয়লাস্তর নিম্নমানের এবং কেবল বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহারযোগ্য।

৯ ● রাজমহল ক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার সীমান্ত থেকে উত্তরে গঙ্গার ধারে পিরপইন্তি পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ক্ষেত্রে পাঁচটি কয়লা ক্ষেত্র যথা, হুরা, চুপড়িভাটা, পাঁচওয়াড়া, মহুয়াগাড়ি ও ব্রাহ্মণী — চিহ্নিত আছে।

১০ ● তালচির এবং ইবনদীর কয়লাক্ষেত্র উড়িষ্যায় মহানদীর উপত্যকায় দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কয়লার ভাণ্ডার। এখানে কয়লা স্তর অনেকগুলি এবং বিভিন্ন মানের। তালচির ক্ষেত্রে কয়লার মান নিম্নস্তরের। কোশালা অঞ্চলে কয়লাস্তর কয়েকটি একত্রিত হয়ে 140 মিটার পুরু এক বিশাল কয়লাস্তরে পরিণত হয়েছে।

ইবনদীর উপত্যকার কয়লাক্ষেত্র উড়িষ্যার সম্বলপুর ও সুন্দরগড় জেলা থেকে মধ্যপ্রদেশের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত। মধ্যপ্রদেশে এই কয়লাক্ষেত্র মান্দ-রায়গড় নামে পরিচিত। এই কয়লাক্ষেত্রে ওরিয়েন্ট, রামপুর প্রভৃতি খনিতে ভূগর্ভস্থ খাদ থেকে কয়লা সংগ্রহ করা হয়।

১১ ● মহানদী উপত্যকায় মান্দ-রায়গড়, কোরবা এবং হেসদো-আরন্দ কয়লাক্ষেত্রগুলি অবস্থিত। শোণ নদীর উপত্যকায় সিংরৌলি, বিশ্রামপুর সোহাগপুর, সোনহাট, টাটাপানি-রামখোলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কয়লাক্ষেত্র নর্মদা উপত্যকায় পেঞ্চ-কানহান-তাওয়া কয়লাক্ষেত্র সুপরিচিত। কোরবা কয়লাক্ষেত্রে উচ্চমান ও নিম্নমান কয়লাভাণ্ডার আছে। এখানকার উচ্চমানের কয়লা ভূগর্ভস্থ খনি থেকে এবং নিম্নমানের কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য মানিকপুর, ভেলাই থেকে উন্মুক্ত খাদ থেকে সংগ্রহ করা হয়। হেসদো-আরন্দ ক্ষেত্রে কয়লার ছাই ও জলীয় ভাগ একত্রে 24 থেকে 39 শতাংশ। সোহাগপুর কয়লাক্ষেত্রে মোটামুটি 5 টি কয়লাস্তর দেখা যায়।

উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর এবং মধ্যপ্রদেশের সিধি জেলায় অবস্থিত সিংরৌলি কয়লাক্ষেত্র ভারতবর্ষে কয়লা উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। এই ক্ষেত্রে একাধিক মোটা কয়লাস্তর আবিষ্কৃত হওয়ায় ব্যাপকভাবে খোলা খাদ কেটে কয়লা আহরণ করা হয়। এর মধ্যে কিছু কয়লা সিংরৌলি, ওরবা প্রভৃতি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহার করা হয়।

সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত রামখোলা টাটাপানি কয়লাক্ষেত্রে পাঁচটি কয়লাস্তর আছে যাতে ছাইয়ের পরিমাণ খুব কম। পেঞ্চকানহান তাওয়া কয়লাক্ষেত্র নর্মদা নদীর দক্ষিণে পেঞ্চ কানহান ও তাওয়া নদীর অববাহিকায় অবস্থিত। এ অঞ্চলে পেঞ্চ উপত্যকার কয়লা কোক কয়লার পর্যায়ভুক্ত নয় কিন্তু কানহান ক্ষেত্রের কয়লা কোক জাতীয়। তাওয়া উপত্যকায় পাথরখেবাই প্রধান খনি এবং সারণি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লার চাহিদা এই অঞ্চল থেকেই পূরণ করা হয়ে থাকে।

১২ ● গোদাবরী নদীর অববাহিকায় অবস্থিত কয়লাক্ষেত্র গোদাবরী কয়লাক্ষেত্র নামে সুপরিচিত। আনুমানিক 17000 বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত এই গন্ডোয়ানা অববাহিকা প্রায় 350 কিলোমিটার দীর্ঘ। 1889 খৃষ্টাব্দে এখানে খনন কার্য শুরু হয় — এক শতাব্দীর অধিক ধরে এই কয়লাক্ষেত্র দক্ষিণ ভারতের চাহিদা পূরণ করে আসছে। এখানকার 53টি বিভিন্ন খনির মধ্যে অধিকাংশই ভূগর্ভস্থ। রামাগুন্দেম, বিজয়ওয়াড়া, মেট্টুর, মাদ্রাজ, রায়চুর প্রভৃতি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে এই কয়লা ব্যবহৃত হয়। এছাড়া সিমেন্ট কারখানা, মানুগুড়ুর ভারী জল (Heavy Water) উৎপাদন কেন্দ্র, বালকোর অ্যালুমিনিয়াম কারখানা প্রভৃতির প্রয়োজন মেটায় এই কয়লাক্ষেত্র।

১৩ ● মহারাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য কয়লাক্ষেত্রগুলি হল : প্রাণহিতার অববাহিকায় অবস্থিত কয়লাক্ষেত্র; ভানডেব ও উমরের কয়লাক্ষেত্র। প্রাণহিতার কয়লা নিম্নমানের। কামথি কয়লাক্ষেত্রের স্তরগুলি সরু (1.5 থেকে 6 মিটার) এবং নিম্নমানের (ছাই 25 থেকে 40 শতাংশ)।

টারশিয়ারী যুগের কয়লা ভাণ্ডার

এই ধরনের কয়লাভাণ্ডার দেখা যায় মাত্র কয়েকটি অঞ্চলে। এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হল :

● মেঘালয়ের গারো-খাসি এবং আসামের মিকির পাহাড় অঞ্চলে এই ধরনের কয়লা ভাণ্ডার আছে। এই কয়লায় গন্ধকের পরিমাণ 2 থেকে 5 শতাংশ এবং স্তরগুলি কয়েক সেন্টিমিটার থেকে তিন মিটার পুরু। মাওলং, পাইনুরমূলা প্রভৃতি স্থানে কয়লা আহরণ করা হয়।

● নাগা-পাতকোই পাহাড়ের পাদদেশে সংকীর্ণ কিন্তু দীর্ঘ বলয়ে এই কয়লা দেখা যায়। অরুণাচলে নামচিক-নামপুক; আসামে মাকুম এবং নাগাল্যান্ডে ঝানজি-দিসাই ও বোরজান কয়লাক্ষেত্র এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

● উত্তর পূর্ব ভারত ছাড়াও টারশিয়ারি যুগের কয়লা ক্ষেত্র দেখা যায় উত্তর পশ্চিমে জম্মু-কাশ্মীরে। কয়লাস্তরগুলি কয়েক সেন্টিমিটার থেকে 3 মিটার পর্যন্ত পুরু কিন্তু অনিশ্চিত আকৃতি।

ভারতের লিগনাইট ভাণ্ডার

লিগনাইটের নাম বাদামী কয়লা। এর তাপ উৎপাদন ক্ষমতা কম। তামিলনাড়ু, রাজস্থান ও গুজরাটের লিগনাইট ভাণ্ডার ঐসব অঞ্চলের তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সব রাজ্যে উন্নতমানের কয়লার ভাণ্ডার না থাকায় লিগনাইটের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। ভাণ্ডারগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল :

● তামিলনাড়ুর নেভেলিতে ভারতবর্ষের লিগনাইটের বৃহত্তম ভাণ্ডার। লিগনাইট স্তরটি 0.2 মিটার থেকে 28 মিটার পুরু (গড়ে 12 থেকে 14 মিটার)। এই স্তরটির নতি সামান্য, কাজেই উন্মুক্ত খাদ (40 থেকে 120 মিটার গভীর) থেকে লিগনাইট উত্তোলন করে সরাসরি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে চলে যায়। এছাড়া ইউরিয়া কারখানায়ও ব্যবহৃত হয়।

● গুজরাটে কচ্ছ এবং ভারুচ জেলায় লিগনাইটের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে সমীক্ষা এবং খননকার্য চলছে।

● রাজস্থানে বারমের, বিকানীর এবং নাগোর জেলায় লিগনাইটের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং সমীক্ষা চলছে।

● কাশ্মীরে অনন্তনাথ, বারমূলা ও শ্রীনগরে নিম্নমানের লিগনাইট পাওয়া যায়।

ভারতের কয়লাভাণ্ডারের পরিমাণ (এই তথ্য ভারতীয় ভূবৈজ্ঞানিক সর্বেক্ষণ থেকে প্রকাশিত পুস্তক থেকে নেওয়া হয়েছে — এটিতে 1.1.1999 পর্যন্ত সব কাজের সমষ্টিগত মূল্যায়ন :

	প্রমাণিত	সম্ভাব্য	অনুমিত	মোট
		মিলিয়ন টন হিসাব অনুসারে		
পশ্চিমবঙ্গ	10570.36	10981.29	4352.06	25903.91
বিহার	34401.00	28420.83	5934.77	68756.60
মধ্যপ্রদেশ	12502.72	21795.24	8474.47	42772.43
উত্তরপ্রদেশ	574.80	487.00	–	1061.70
মহারাষ্ট্র	3927.53	1357.37	1684.17	6969.07
উড়িষ্যা	9623.10	21990.91	17447.19	49061.20
অন্ধ্রপ্রদেশ	7094.82	3313.78	2928.67	13337.21
আসাম	259.37	26.83	34.01	320.21

	প্রমানিত	সম্ভাব্য	অনুমিত	মোট
	মিলিয়ন টন হিসাব অনুসারে			
অরুণাচল প্রদেশ	11.04	47.96	90.23	149.23
মেঘালয়	117.83	40.89	300.71	459.43
নাগাল্যান্ড	3.43	1.35	15.16	19.98
মোট টারশিয়ারী কয়লা	411.86	77.32	397.84	887.02
মোট গন্ডোয়ানা কয়লা	78964.33	88349.21	40821.33	207864.87
মোট কয়লার পরিমাণ (1200 মিটার গভীর পর্যন্ত)	79106.19.	88426.53	41219.17	208751.89

উৎপাদন - আমদানি - রপ্তানির পরিমাণ

	1991	1991	1995-96	
উৎপাদন	পরিমাণ (মিলিয়ন টন)	মূল্য (কোটি টাকা)	পরিমাণ (মিলিয়ন টন)	মূল্য কোটি টাকা
কয়লা	229	6949	270	11,352
লিগনাইট	16	418	22	877

	1990-91		1991-92		1992-93	
	রপ্তানি	আমদানি	রপ্তানি	আমদানি	রপ্তানি	আমদানি
কয়লা	8.7	756.4	15.2	900.7	50.2	1309.4
কোক	0.3	32.9	0.3	135.8	0.3	736
	সব পরিমাণই কোটি টাকাতে					

অন্যান্য তথ্য : ● পৃথিবীর সব দেশের মোট কয়লা উৎপাদন 1995 সালে ছিল 3316 মিলিয়ন টন যার মধ্যে ভারতের স্থান ছিল তৃতীয় স্থানে। প্রথম স্থানে চিন (1257 মিলিয়ন টন) এবং দ্বিতীয় স্থানে ছিল আমেরিকা (577 মিলিয়ন টন) হিসাব মতো, পশ্চিম ইউরোপে এবং পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়নে কমেছিল এবং চিন, আমেরিকা, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, কলম্বিয়া, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে বেড়েছিল।

● ভারতবর্ষের কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ 1995-96 সালে ছিল 270 মিলিয়ন টন। ঐ বছরে মোট শক্তি উৎপাদনে কে কতটা ভাগ উৎপন্ন করেছিল সেটা দেওয়া হল —

কয়লা	মোট শক্তি উৎপাদনের	50	শতাংশ
লিগনাইট		3.4	শতাংশ
দেশের পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য		16.4	শতাংশ
আমদানিকৃত পেট্রোলিয়াম		17.7	শতাংশ
প্রাকৃতিক গ্যাস		8.9	শতাংশ
জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র		2.7	শতাংশ
আণবিক কেন্দ্র		0.9	শতাংশ

উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা : আমাদের দেশের মোট শক্তি উৎপাদনের প্রায় 50 শতাংশ আসে কয়লা খনির উৎপাদন থেকে। কাজেই এদের সম্বন্ধে কিছু তথ্য এখানে দেওয়া হল :

- সরকারি হিসাবে কয়লার চাহিদা 27 কোটি টন (1995-96) থেকে বেড়ে 2001-02 সালে দাঁড়াবে 38 থেকে 40 কোটি টন এবং 2009-10 সালে বেড়ে হবে প্রায় 69 কোটি টন। এখানে জানা দরকার যে গোটা কয়লা উৎপাদনই শক্তির কাজে লাগানো হয়না। 1995-96 সালের হিসাব অনুযায়ী কয়লা উৎপাদনের 67 শতাংশ খরচ হয়েছিল বিদ্যুৎ উৎপাদনে, 13 শতাংশ ইস্পাত শিল্পে, 20 শতাংশ সিমেন্ট, সার কারখানা ও অন্যান্য শিল্পে।

কয়লার সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চিত্র নিম্নরূপ —

1973	1995-96	2001-2002
8000 মেগাওয়াট	51,000 মেগাওয়াট	180,000 মেগাওয়াট

- উল্লেখ করা যেতে পারে যে কয়লা খনির ঠিক পাশেই বা নিকটে খুব কম জায়গাতেই এমন শিল্প আছে যাতে পুরো কয়লা লাগে। অবশ্য ভারতবর্ষে কয়লা ব্যবহার করে অনেক শিল্পই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, সিমেন্ট ও সার কারখানা মোটামুটি ভাবে কয়লাভাণ্ডার গুলির কাছাকাছি অবস্থিত। এখন দেখা যাক যে 1995-96 সালে 27 কোটি টন উৎপন্ন কয়লা কিভাবে পরিবহন করা হয়েছিল

রেল দ্বারা	নিজের ওয়াগন বা সড়ক পরিবহন	রোপওয়ে	কনভেয়ার
15.6 কোটি টন (57 শতাংশে)	5.4 কোটি টন (20 শতাংশ)	0.6 কোটি টন	0.6 কোটি টন

আমাদের কয়লার চাহিদার আনুমানিক 94 শতাংশে আমাদের দেশেই উৎপন্ন হয়। উন্নত মানের কোকিং কয়লা ও বিশেষ ধরনের কয়লা আমদানি করতে হয়।

- গত পঁচিশ বছরে কয়লা উৎপাদনের মাত্রা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে — কিন্তু এর বেশির ভাগই এসেছে খোলামেলা খনি (opencast mine) থেকে। 1973-74 সালে খোলামেলা খনি থেকে উৎপাদন হত 1.6 কোটি টন যেখানে 1994-95 সালে উৎপাদন হয়েছে 16.7 কোটি টন। এটা ঠিক যে এইভাবে উৎপাদন না বাড়ালে আমাদের চাহিদা মেটানো সম্ভব হত না কারণ ভূগর্ভস্থ খনি করতে সময় অনেক বেশি লাগে। কয়লা খনি জাতীয়করণের

নময় 1973-74 সালে ভূগর্ভস্থ খনি থেকে কয়লা উৎপাদন হত 5.83 কোটি টন যেটা 1995-96 সালে বেড়ে হয়েছে 7.7 কোটি টন।

খোলামেলা খনিতে যে পরিবেশের দূষণ বেশি হয় — সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব।

- উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আমাদের অনেক খনিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োজন হচ্ছে — যাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থের অনেকটাই আসছে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক এবং জাপান এক্সিম ব্যাঙ্কের কাছ থেকে। খনির আধুনিকীকরণ এবং কোল-হ্যান্ডলিঙ প্ল্যান্ট (Coal Handling Plant) বাবদ এই দুই ব্যাঙ্ক থেকে আনুমানিক 99 কোটি ডলার ঋণ পাওয়া গেছে। এরমধ্যে জাপান ব্যাঙ্ককে 53 কোটি ডলার ইয়েনে শোধ দিতে হবে। এইসব কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গিয়েছে যাতে আগামী দিনের শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা আমরা পূরণ করতে পারি।

খনিজ সম্পদে স্বনির্ভরতা এবং আমদানি-রপ্তানি

খনিজের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে আলোচনা এবং বিভিন্ন ম্যাপ এর মাধ্যমে তাদের অবস্থান সম্বন্ধে জানা গেছে। এবার গোটা দেশের খনিজ সম্পদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করবো। ম্যাপে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ভাণ্ডারের অবস্থান দেখানো হয়েছে — যাতে পরে যখন আমরা শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করব তখন আপনাদের সুবিধা হয়।

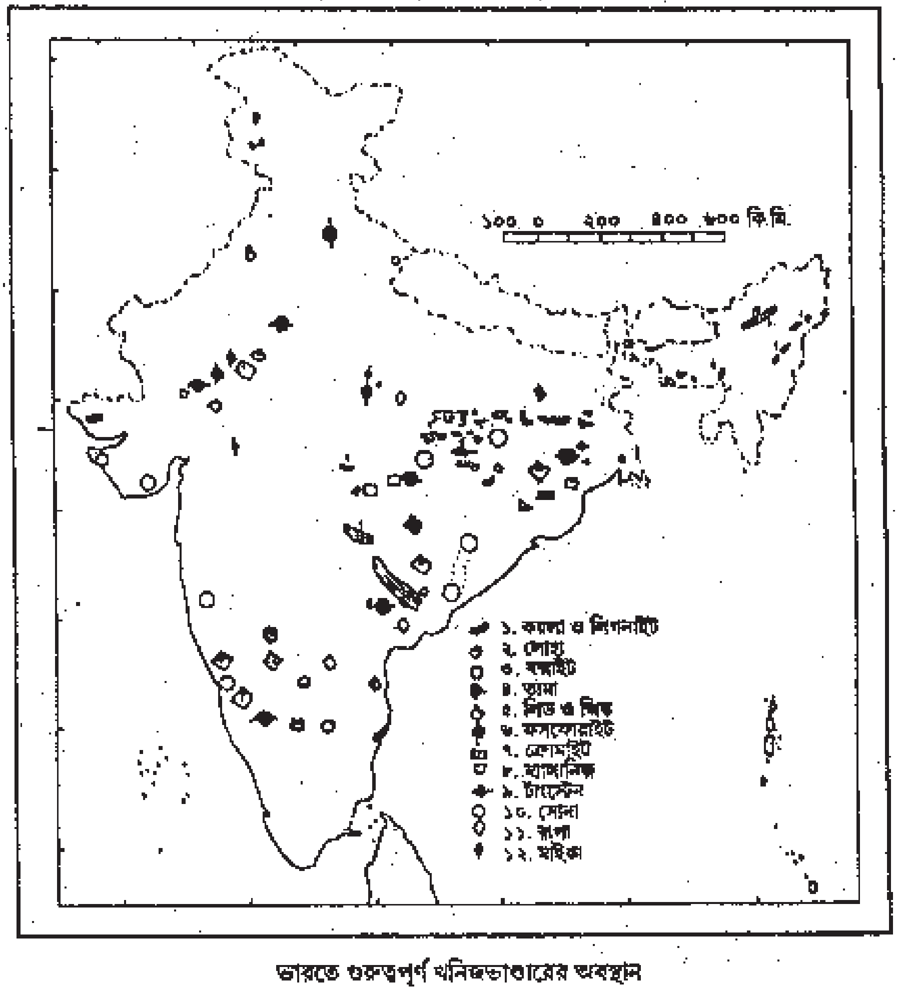

ভারতে গুরুত্বপূর্ণ খনিজভাণ্ডারের অবস্থান

আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করার সময় আমরা সেই খনিজ ভাণ্ডারের পরিমাণ এবং দেশের চাহিদা স্থ জানিয়েছি। শিল্পের চাহিদা মেটানোর মত আকর ভাণ্ডার আছে কি নেই এটার ওপরই ঐ দেশের সনির্ভরতার বিচার হয়। তবে এক্ষেত্রে একটা জিনিস বোঝা দরকার যে আকর ভাণ্ডার যদি যথেষ্ট থাকে তখনও যে কোনও দেশ সেই খনিজ আমদানি করতে পারে — যদি বিশ্বের খোলা বাজারে সেই আকর বা ধাতু উচিৎ মূল্যে পাওয়া যায়। খনির কাজ শুরু করতে বহু মূলধন ও প্রযুক্তিবিদ্যা লাগে — এবং খুব চট্‌পট্ এটা শেষ করা যায় না। খোলাবাজারে ঐ ধাতু বা খনিজ পাওয়া গেলে সেটা শিল্পে দ্রুত উন্নতিতে সাহায্য করে — এবং দ্বিতীয়ত নিজের দেশে "সঞ্চিত ভাণ্ডার" চট্ করে ক্ষয় হয়ে যায় না। খনিজ সম্পদ ব্যবহার সম্বন্ধে সরকারি নীতি সেইজন্য অনেক বিচার বিবেচনা করে নেওয়া হয়ে থাকে।

বর্তমানে আমাদের দেশে খনিজ সম্পদ ভিত্তিক শিল্পের চাহিদার হিসাবে ঐ শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল খনিজের মোট আকর ভাণ্ডারের বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞ ঐ খনিজগুলিকে নীচের কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন :

প্রচুর — যেখানে আকর ভাণ্ডার চাহিদার তুলনায় প্রচুর বেশি;
পর্যাপ্ত — যেখানে মোট আকর ভাণ্ডার ঐ শিল্পের চাহিদার তুলনায় অনেক
কম — যেখানে আমাদের আমদানির ওপর নির্ভর করতে হয়
খুবই কম — যেখানে সবটাই আমদানির ওপর নির্ভর করে।

আমাদের দেশের আকর ভাণ্ডারের শ্রেণীবিন্যাস নীচে দেওয়া হল :

খনিজ শ্রেণি	প্রচুর	পর্যাপ্ত	কম	খুবই কম
জ্বালানি	নন কোকিং কয়লা		কোকিং কয়লা, অপরিশ্রুত পেট্রোলিয়াম	
লৌহ ও এ্যালয়	লৌহ আকর	ধাতুশিল্পে ব্যবহার যোগ্য ক্রোমাইট; ম্যাঙ্গানীজ	তাপরোধক শিল্পে ব্যবহারযোগ্য ক্রোমাইট	নিকেল ; কোবাল্ট টাংস্টেন; মলিবডেনাম, ভ্যানাডিয়াম
লৌহেতর বা অলৌহ ধাতব খনিজ এবং অন্য ধাতব খনিজ	ধাতু শিল্পে ব্যবহার যোগ্য বক্সাইট	দস্তা	বক্সাইট (রাসায়নিক এবং তাপরোধক শিল্পে ব্যবহারযোগ্য) তামা, সীসা	এ্যান্টিমনি, স্বর্ণ প্ল্যাটিনাম গ্রুপ রৌপ্য, টিন
বিভিন্ন শিল্পে প্রয়োজনীয় অধাতব খনিজ	জিপসাম, ইলমেনাইট রুটিল, চুনাপাথর অভ্র; ডলোমাইট (কম সিলিকা যুক্ত আকর বাদ দিয়ে)	করান্ডাম গ্রাফাইট	এ্যাপেটাইট রককফসফেট এ্যাসবেসটস	পটাশ প্রাকৃতিক গন্ধক
রত্ন-উপরত্ন				হীরক, এমারেল্ড স্যাফায়ার, রুবি
অন্যান্য খনিজ	নির্মাণ শিল্পে ব্যবহারযোগ্য গ্রানাইট; মার্বেল			

এই এককের আলোচনায় দেখা যায় যে বিভিন্ন ধাতুর আকর ভাণ্ডার আমাদের দেশে কম — একমাত্র লৌহ আকর এবং অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর আকর। এই পরিপ্রেক্ষিতে গত কয়েক দশকের খনিজ উত্তোলনের হিসাব দেখি যেটা চিত্রে দেখান হয়েছে — তাহলে একটা জিনিষ পরিষ্কার জানা যায় — যে স্বাধীনতাপরবর্তী যুগে আমরা ধাতব খনিজের উত্তোলন অনেক বেশি করছি — এবং এর অগ্রগতি অধাতব খনিজের থেকে অনেক বেশি। চিত্রে দেখা

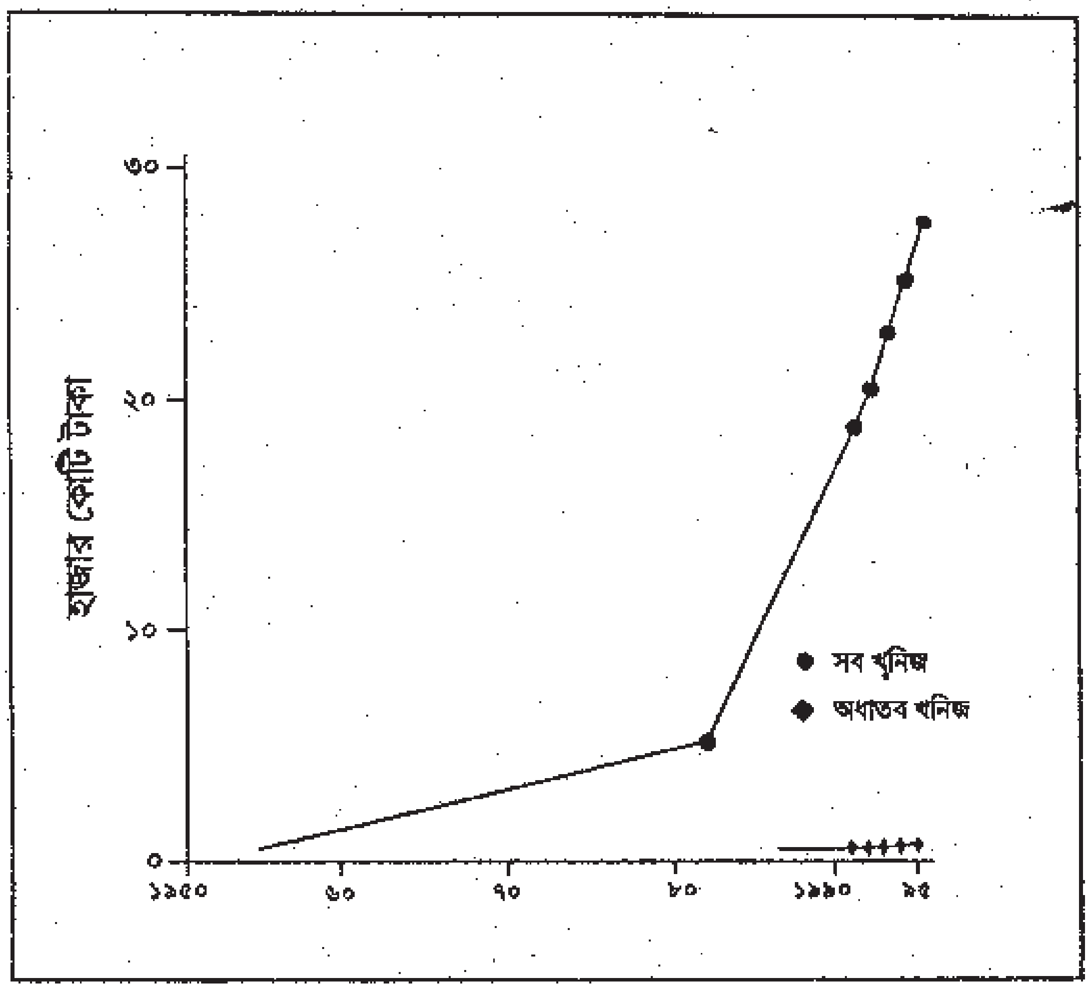

খনিজ উৎপাদনে অগ্রগতি (১৯৫২-১৯৯৫)

যাচ্ছে সব খনিজের উত্তোলন 1980 সাল থেকে প্রচুর বেড়েছে অথচ অধাতব খনিজের উৎপাদন বিশেষ বাড়েনি — কাজেই ধাতব খনিজ, জ্বালানি অন্যান্য খনিজের উত্তোলনই বেড়েছে।

এবার আমরা খনিজ সম্পদের আমদানি-রপ্তানি সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য জানাচ্ছি :

- 1996-97 সালে খনিজ সম্পদের আমদানির মূল্য মোট আমদানির 24.7 শতাংশ ছিল। টাকার অঙ্কে এটা ছিল প্রায় 34300 কোটি টাকা।

ঐ একই সময়ে খনিজ সম্পদের রপ্তানির মূল্য মোট রপ্তানির মূল্যের 16 শতাংশ ছিল। অবশ্য এই প্রসঙ্গে এটা জানা দরকার ঐ বছর হীরক, এমারেল্ড এবং কয়লা কম রপ্তানি হয়েছিল।

● 1996-97 সালে আমরা 83 টি দেশ থেকে বিশেষ বিশেষ খনিজ আমদানি করেছিলাম — টাকার মূল্যে 98 শতাংশ করা হয়েছিল মাত্র 22টি দেশ থেকে। নীচে দেশগুলিকে সাজিয়ে দেওয়া হল।

1996-97	মোট আমদানির মূল্যের শতাংশ
1. বেলজিয়াম	19.5 শতাংশ
2. নাইজিরিয়া	15.3 শতাংশ
3. সৌদি আরব	12.2 শতাংশ
4. ইউনাইটেড আরব এমিরেট	10.00 শতাংশ
5. অস্ট্রেলিয়া	8.3 শতাংশ
6. কুয়েত	8.00 শতাংশ
7. ইরান	7.10 শতাংশ
8. ইংল্যান্ড	6.10 শতাংশ
9. মালয়েশিয়া	2.2 শতাংশ
10. ইস্রায়েল	2.0 শতাংশ
11. হংকং	1.0 শতাংশ থেকে 2 শতাংশ
12. চিন	1.00 শতাংশ থেকে 2 শতাংশ
13. অন্যান্য দেশ	1 শতাংশের কম

উপরের শ্রেণীবিন্যাস থেকে আমরা জানতে পারলাম যে আমাদের দেশের চাহিদা মেটাতে যে পরিমাণ আমদানি করতে হয় তার পঞ্চাশ শতাংশের বেশি খরচ হয় — মাত্র চারটি দেশে। চিনের মত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ থেকে মাত্র 1 শতাংশ থেকে 2 শতাংশ মূল্যের দ্রব্য আমদানি হয়।

● 1996-97 সালে রপ্তানির ক্ষেত্রে আমরা 129টি দেশে বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য রপ্তানি করেছিলাম। মূল্যভিত্তিক বিচারে প্রথম কয়েকটি দেশের নাম দেওয়া হল :

স্থান	দেশের নাম	মোট রপ্তানির মূল্যের ভাগ
1	আমেরিকা	27.6 শতাংশ
2	হংকং	19.5 শতাংশ
3	জাপান	14.3 শতাংশ
4	বেলজিয়াম	12.8 শতাংশ
5	থাইল্যান্ড	3.3 শতাংশ
6	চিন	2.9 শতাংশ
7	ইস্রায়েল	2.3 শতাংশ
8	সিঙ্গাপুর	2.1 শতাংশ

এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য জানা দরকার আমরা অনেক জিনিষই রপ্তানি করি পালিশ করে, পরিস্রুত করে। আমদানি করা সেই জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি এবং গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। আমরা হীরা, এমারেল্ড প্রভৃতি আমদানি করি আকর হিসাবে — এবং আমাদের দেশে কারিগরী বিদ্যা কাজে লাগিয়ে সেগুলোর দাম বাড়িয়ে পুনঃরপ্তানি করি। যেসব খনিজে কিছু পরিশোধন করলে মূল্য বেড়ে যায় সেগুলোকে রপ্তানি ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এছাড়াও খনিজ দ্রব্য থেকে কিছু তৈরি করে রপ্তানি করতে পারলে শুধু খনিজ দ্রব্য থেকে বেশি মূল্য পাওয়া যায়। 1994-95 সালের হিসাব দেওয়া হল মূল্যের হিসাবে :

রপ্তানি করা দ্রব্য	মূল্যের পরিমাণ	উদাহরণ
1. খনিজ যেভাবে খনি থেকে পাওয়া যায় (Raw, unprocessed)	1735.2 কোটি	লৌহ আকর ম্যাঙ্গানীজ আকর
2. খনিজকে আধা বা পূর্ণ পরিসৃত অবস্থায় Semi-processed বা processed	14,096.6 কোটি	পালিশ করা হীরক; পরিসৃত অভ্র; কোক, গ্রানাইট-মার্বেল
3. খনিজ থেকে তৈরি দ্রব্য (manufactured mineral based products)	4596.2 কোটি	সিমেন্ট, গ্রাফাইট crucibles ; ধাতুর এ্যালয় এবং পেট্রো-লিয়ামজাত পণ্য

- আমদানি-রপ্তানির ব্যাপারে খনিজ শিল্প সবসময়েই বেশি নির্ভর করে আমদানির উপর। 1994-95 সালে খনিজ রপ্তানি হয়েছিল 15,831 কোটি টাকার আর আমদানি হয়েছিল 19,365 কোটি টাকার। ঐ একই বছরে ধাতু ও এ্যালয় রপ্তানি হয়েছিল 2755 কোটি টাকার এবং আমদানি হয়েছিল 8565 কোটি টাকার।

- উদারনীতির ফলে আমাদের খনিজ শিল্পে বিদেশী মূলধন নিয়োগ চালু হয়েছে যেটা এতদিন সম্ভব হত না। শিল্পের অন্যান্য সেক্টরে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে — উদারনীতির ফলে — কিন্তু খনি ও খনিজ শিল্পে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। বিশেষজ্ঞদের মতে খনি ও খনিজ শিল্পের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় দুটো জিনিষ অর্থাৎ সহজলভ্য শক্তি এবং ইনফ্রাস্ট্রাক্চারের উন্নতি। কিন্তু এ দুটো বিষয়েই আমাদের দেশে অনেক পরিকল্পনা থাকলেও বাস্তবে বেশি উন্নতি হয়নি।

একক 11 ❑ সম্পদ হ্রাস, সম্পদ সংরক্ষণ এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন (Depletion of Resource, Conservation and Sustainable Development)

এই অধ্যায়ে আলোচ্য তথ্যাবলি EGO 06 : ব্লক 1-এ সংশ্লিষ্ট অংশে সন্নিবেশিত হওয়ায় এখানে সেগুলির পৃথক আলোচনা করা হল না।

গ্রন্থপঞ্জী

1.	অর্থনৈতিক ভূগোল ও সম্পদ শাস্ত্রের পরিচয়	—	অনীশ চট্টোপাধ্যায়	—	2000
2.	জনসংখ্যা ভূগোল	—	জ্যোতির্ময় সেন	—	1999
3.	অর্থনৈতিক সম্পদ সমীক্ষা	—	তরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌতম মল্লিক	—	2000
4.	সম্পদ সমীক্ষা	—	অজিত কুমার শীল	—	1998
5.	ফলিত ভূ-বিদ্যা	—	কল্পনা মিত্র, পূরবী সেনগুপ্ত	—	2000
6.	জনবিজ্ঞান ও জনসংখ্যা উন্নয়ন	—	মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার	—	2000
7.	সম্পদ সমীক্ষা	—	সুধাংশু শেখর ভট্টাচার্য		
8.	Study Material Elective Geo. EGO : 06	—	জ্যোতির্ময় সেন	—	2000
9.	A Geography of Population	—	R. C. Chanda	—	1992
10.	Economic Geography	—	Guha and Chatterjee	—	2000
11.	World Resource	—	U. N. De Publication	—	2000-01
12.	World Resources and Industries	—	E. W. Zimmermann		
13.	পরিবেশ	—	অনীশ চট্টোপাধ্যায়	—	2000
14.	Economic Survey (2000-2001)	—	Government of India		
15.	Economic Geography	—	T. A. Hartshorn J. N. Alexander	—	2000

Notes

Notes